শারদীয়া ১৩৯৪

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

গতবছর তোমার সৈকতে আমি আমার বন্ধু অনেক খেলেছি। এখনও আমাদের মনে পড়ে কিভাবে ছোট ছোট ঢেউগুলো আমাদের সঙ্গে খেলতো—কখনো পিছু পিছু আসতো, আবার পরক্ষণেই দূরে পালিয়ে যেত। শক্ত বালির উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে দুষ্টু ঢেউগুলোকখনো কখনো ঝাউবনের ফাঁকে হারিয়ে যেত। ঝিনুক কুড়োতে কি মজা, ই না? এছাড়াও আমরা দেখেছি আরো কত মজার জিনিস—জেলেরা তাদের ডিঙিতে চড়ে সমুদ্রের বুকে মিলিয়ে যায়। ফিরে আসে। দড়ি টেনে তাদের জা গুটিয়ে আনে। তখন নানান জাতের মাছে জাল বোঝাই।

আমরা তোমাকে ভুলিনি, তোমাকে আমরা ভালবাসি, দীঘা। তাই তো ইচ্ছে করে বারবার তোমার কাছে ফিরে যাই।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ
ট্যুরিস্ট ব্যুরো ৩/২ বিনয়-দল-দীনেশ বাগ (ঈস্ট) কলিকাতা-৭০০ ০০১
ফোন ঃ ২৮-৮২৭১ গ্রাম ঃ TRVELTIPS
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

TB 511A/87

সংসদের অনন্য অভিধান গ্রন্থমালা

সর্বশেষ সংস্করণ

Samsad Students Bengali English Dictionary 20·00

সঙ্কলক ঃ গোলোকেন্দু ঘোষ ও ডঃ ধানী রায়

বাঙলা ভাষার থিসরাস্

সংসদ সমার্থশব্দকোষ 400

সঙ্কলক ঃ অশোক মুখোপাধ্যায়

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত

Samsad English Bengali Ictionary 47·50

Samsad Bengali English Ictionary 45·00

Samsad Student's English Bengali Dictionary 22 50

সংসদ বাঙ্গালা অভিধান ৪০·০০

অঞ্জলি বসু সম্পাদিত

SAMSAD COMMON WORDS DICTIONARY 14 00

সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান (২য় সংস্করণ যন্ত্রস্থ)

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের

বাঙ্গালা ভাষার অভিধান

দু'খণ্ডে প্রকাশিত ।। প্রতি খণ্ড ৮০·০০

সাহিত্য সংসদ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা ৯, ফোন ৩৫-৭৬৬১, ৩৫-৩১৯৫

কিশোর জ্ঞান ও বিজ্ঞান

পুজো সংখ্যা ঃ 1987

● সূচীপত্র ●

☐ **অপ্রকাশিত রচনা**

অলডাস হাক্সলিকে লেখা বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর পত্র ॥ সংকলন ও সম্পাদনা দিবাকর সেন 3

☐ **বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস**

সাগরিকা ॥ ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য 178 ঃ রক্তের মধ্যে বিষ ॥ অদ্রীশ বর্ধন 130 ঃ গোলক রহস্য ॥ সমরজিৎ কর 142

☐ **রোমাঞ্চকর প্রবন্ধ**

অচিন দেশের অচিন পাখি ॥ শ্রীপান্থ 9

☐ **বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞানের গল্প**

মৌ-কা সা-বি-স বনাম ঘনাদা ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র 17 ঃ চকমকি মণি ॥ লীলা মজুমদার 25 ঃ পেট লাইব্রেরী ॥ নারায়ণ সান্যাল 30 ঃ মেঘ চোর ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 11 ঃ সায়েন্স ॥ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় 225 ঃ কম্পাস ॥ সংকর্ষণ রায় 35 ঃ স্টার ওয়ার ও ডঃ ত্রিভুবন ॥ নিরঞ্জন সিংহ 38 ঃ নীলাভ-সবুজ আলোর রহস্য ॥ পার্থসারথি চক্রবর্তী 44 ঃ নগেনবাবু খগেনবাবু ॥ কিন্নর রায় 58 ঃ অভিযান ॥ জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকার 233

☐ **বিশেষ প্রবন্ধ ঃ কারিগরি ও প্রযুক্তিবিদ্যা**

বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার ॥ জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য 81 টোকাম্যাক ॥ সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র 86 ঃ ব্রিডার রি-অ্যাকটর-দ্বিতীয় প্রজন্ম ॥ শান্তিময় ও এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ঃ 89 মহাকাশের হাতছানি ॥ বিমান বসু 93 ঃ সমুদ্র গবেষণায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ॥ সুবীর দত্ত 97 ঃ রোগ নির্ণয়ে প্রযুক্তি ॥ আশিস দাশ 101 ঃ মানব কল্যাণে জিন প্রযুক্তি ॥ মৃন্ময়ী দাস 107

☐ **রঙিন ফিচার**

কথা-বলা পাখি ॥ অজয় হোম 73 ঃ বাঘ নিয়ে গবেষণা ॥ রতনলাল ব্রহ্মচারী 121 ঃ পরিবেশের বিষাক্ত উদ্ভিদ ॥ তারকমোহন দাস 127 ঃ তামা-কাহিনী ॥ দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 75 ঃ চেনা-অচেনা ফুল ॥ এণাক্ষী বিশ্বাস 125

☐ **চিত্র কাহিনী**

পরাভূত জলযান ॥ গৌতম কর্মকার 161

খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 49

☐ **কার্টুন**

শৈল চক্রবর্তী ॥ 62, 85, 104 ঃ রেবতীভূষণ ॥ 16, 24, 187, 211

তন্তুশ্রী বাংলার তাঁত, বাংলার শাড়ী

ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাণ্ডলুম এণ্ড
পাওয়ারলুম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ
(পঃ বঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
৬এ রাজা সুবোধমল্লিক স্কোয়ার, ৭ম তল, কলিকাতা-৭০০০১৩

☐ **বিজ্ঞানভিত্তিক অনুবাদ গল্প**
শনি-রবি (আর্থার সি ক্লার্ক) ॥ ধরণী ঘোষ 228
ইউটোপিয়ার চোর (ম্যাক রেনল্ডস)॥ সৌরেন ভট্টাচার্য 188
☐ **নিজে নিজে কর**
ইলেকট্রনিক ফ্যান রেগুলেটর ॥ বিপ্লব ব্যানার্জী 70 ঃ হেডফোন রেডিও ॥ সৌম্য মিত্র 63 ইলেকট্রনিক ওজন যন্ত্র ॥ দিলীপকুমার পাঠক 68
☐ **সায়েন্স এক্সপেরিমেন্টস**
অন্তহীন জলপাত্র, হাত না ভিজিয়ে জল থেকে তোলা ॥ সমীরকুমার ঘোষ 156 ঃ আপনি ঘোরে খুরোর কল, স্বচ্ছ ইঁট ॥ সন্তোষ মিত্র 153 ঃ গরমে সাদা ও শীতকালে রঙিন পোষাক, অভিকর্ষজ বল অগ্রাহ্যকারী ফানেল ॥ শাহ্‌জাহান তপন 157 ঃ আগুন নেভানো যন্ত্র, মেঘ বৃষ্টি জল ॥ অপরাজিত বসু 159
☐ **নির্বাচিত প্রবন্ধ**
রামন এফেক্ট ॥ জয়ন্ত বসু 199 ঃ সুবিরল ঘটনা, সুপার নোভা ॥ রমাতোষ সরকার 196 ঃ বাংলায় সাম্প্রতিক বিজ্ঞান চর্চা ॥ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার 214 ঃ বাংলায় বিজ্ঞান পত্র-পত্রিকা ॥ অশোক দাস 219
☐ **ছড়া ও কবিতা**
অন্নদাশঙ্কর রায় 113, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 113, অমিতাভ চৌধুরী 113, বরেন গঙ্গোপাধ্যায় 114, দক্ষিণারঞ্জন বসু 114, অমিত রায় 114, কৃষ্ণ ধর 115, গৌরাঙ্গ ভৌমিক 115, পূর্ণেন্দু পত্রী 206, আনন্দ বাগচি 218, রবীন সুর 34, অশোককুমার মিত্র 43, শৈলেন কুমার দত্ত 43, রাখাল বিশ্বাস 57, সুখেন্দু মজুমদার 129, কার্তিক ঘোষ 129, সুধীন্দ্র সরকার 129, রূপক চট্টরাজ 129, লক্ষণকুমার বিশ্বাস 129, আশা দেবী 109, জ্যোতিভূষণ চাকী 109, মুস্তাফা নাশাদ 109, শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায় 109, রতনতনু ঘাটী 109, সাধনা মুখোপাধ্যায় 232, ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 96, ভবানী প্রসাদ মজুমদার 96, প্রণব সেন 195, সুনীল বসু 218, প্রবীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 218, জয়ন্ত মণ্ডল 218
☐ **স্বভাব বিজ্ঞানীর জীবন চরিত**
প্রকৃতিবিজ্ঞানী গোপাল চন্দ্র ॥ সুধাংশু পাত্র 201 ঃ নক্ষত্র-বিজ্ঞানী রাধাগোবিন্দ ॥ রবীন বসু 205 ঃ কৃষি বিজ্ঞানী শিবপ্রসাদ ॥ অমিত চক্রবর্তী 207 ঃ বসু বিজ্ঞান মন্দিরের আশু-বিনয় বাবু ॥ দিবাকর সেন 212 ঃ বিজ্ঞানব্রতী সত্যেন্দ্রনাথ ॥ কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 210
☐ **প্রতিযোগিতা**
সুপার কুইজ কনটেস্ট ও ফটো কুইজ ॥ 17, 124 ঃ বুদ্ধি-শুদ্ধি প্রতিযোগিতা ॥ সমীর মণ্ডল 78 ঃ অঙ্কের ধাঁধা ॥ রতন মোহন খাঁ 117 ঃ সংখ্যার খেলা ॥ অমরনাথ রায় 119 ঃ সুপার আই-কিউ টেস্ট ॥ জয়ন্ত দত্ত 118

ছবি ঃ অলয় ঘোষাল, সুবোধ মণ্ডল ঃ **প্রচ্ছদ** ঃ সমীর মণ্ডল
প্রধান সম্পাদক ঃ **সমরজিৎ কর**
সম্পাদক ঃ **রবীন বল** সহ-সম্পাদক ঃ **জয়ন্ত দত্ত**।

বিদ্যালয়ে ভর্তির নিশ্চিত সযোগ
দেবাশীষ বল ও বঙ্কিম চক্রবর্তী সম্পাদিত

গাইড টু অ্যাডমিশন টেস্ট-১৯৮৮

১ম খণ্ড ॥ নার্সারী, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী
২য় খণ্ড ॥ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী
৩য় খণ্ড ॥ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী
প্রতি খণ্ড ২০·০০ ভিপি ২২·০০

ভর্তি পরীক্ষার সিলেবাস, নরেন্দ্রপুর, পুরুলিয়া, ও রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের প্রশ্নোত্তর এবং সরকারী বিদ্যালয়ে জয়েন্ট এন্ট্রান্স '৮৪, হিন্দু, হেয়ার, বালিগঞ্জ গভঃ, বাগবাজার মালটিপারপাস্ গার্লস্ ও নির্বাচিত বিদ্যালয়ের প্রশ্নোত্তর এবং অতিরিক্ত সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সম্বলিত তৃতীয় মুদ্রণ।

হাননান আহ্‌সান প্রণীত
স্পোর্টস্ ক্যুইজ ১৬·

ছবি, ছড়া ও গল্পের বই

কথামালার গল্প	॥ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৫·০০
কচিমুখের ছড়া	॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র ৫·০০
রাঙ্গাছবি	॥ যোগীন্দ্রনাথ সরকার ৫·০০
খেলার সাথী	॥ যোগীন্দ্রনাথ সরকার ৫·০০
ছবিতে সাধারণ জ্ঞান	॥ অখিল নিয়োগী ১০·০০
আবোল তাবোল	॥ সুকুমার রায় ১০·০০
কচ্ছপ ও ঈগল পক্ষী	॥ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৫·০০
টেনিদার কুটিমামা	॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৫·০০
বাঘ সাপ ভূত	॥ দেবাশীষ বল ৬·০০
ঠাকুমার ঝুলি	॥ দক্ষিণারঞ্জন বসু ৮·০০
ঠাকুরদাদার ঝোলা	॥ দক্ষিণারঞ্জন বসু ১০·০০
ছবিতে খেলাধূলা	॥ পুষ্পেন সরকার ৬·০০
মনোহর ডাকাত	॥ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৮·০০
ছোটদের রামায়ণ	॥ খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১০·০০
ছোটদের মহাভারত	॥ খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১০·০০
Learn More Words	॥ Baul & Reeves 7·00

অসিতকুমার ভৌমিক প্রণীত
সাহিত্য ক্যুইজ ১৬·

রঞ্জন প্রকাশন
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৪

অলডাস হাক্সলিকে লেখা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পত্র

অলডাস হাক্সলি ছিলেন সেকালের একজন বিখ্যাত লেখক ও চিন্তাবিদ। জন্ম 1894 সালে। লেখাপড়া করেন লণ্ডনের ইটন্ স্কুলে ও অক্সফোর্ডের বেলিয়ল্ কলেজে। চাকুরী জীবন শুরু করেন সরকারী দপ্তরে। এসময়ে তিনি কিছুদিন শিক্ষকতাও করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তিনি কিছুকাল সাংবাদিকতারও কাজ করেন। এর পর থেকে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে। ক্রমশ তিনি সমগ্র বিশ্বের কাছে পরিচিত হন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর পত্রটিতে হাক্সলি-র যে গ্রন্থখানির কথা উল্লেখ করেছেন সেটি সম্ভবত 1923 সালে প্রকাশিত "Antic Hay" নামক উপন্যাসটির প্রসঙ্গে।

1923 সালে আচার্য জগদীশচন্দ্র ষষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সফরে ইয়োরোপে যান। এই সফরে তিনি তাঁর নবলব্ধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্পর্কে 15 নভেম্বর তারিখে লণ্ডন ইউনিভার-সিটিতে, 20শে নভেম্বর তারিখে লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে, 26শে নভেম্বর তারিখে লণ্ডন ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ সায়েন্সে, 6ই ডিসেম্বর তারিখে রয়্যাল সোসাইটি অব মেডিসিনে ও 7ই ফেব্রুয়ারী 1924 তারিখে ইণ্ডিয়া অফিসে বক্তৃতা দেন। এই সব বক্তৃতার মাঝেই জগদীশচন্দ্র হাক্সলি-কে চিঠি লিখেছিলেন। চিঠি পেয়ে হাক্সলি জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনতে এসেছিলেন। জগদীশচন্দ্রের 7ই ফেব্রুয়ারীর বক্তৃতাটি ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই সভায় জগদীশচন্দ্র তাঁর সালোকসংশ্লেষণ পরিমাপক যন্ত্রটির (ফটোসিন্থেটিক বাবলার রেকর্ডার) পরীক্ষা ও উদ্ভিদের রসের উৎস্রোত সংক্রান্ত পরীক্ষা প্রদর্শন করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড সহ প্রায় সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষ। সভা শেষ হ'লে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে সম্বোধন করে জর্জ বার্নার্ড'শ তাঁর চিরাচরিত গাম্ভীর্যকে বজায় রেখে বলেছিলেন—"ডঃ বোস শীঘ্রই হয়তো এমন একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করবেন, যা দিয়ে রাজনীতিবিদ্ ও অন্যান্যদের কার্যক্ষমতা যন্ত্রলিপির মাধ্যমে এঁকে দেখাবেন এবং বিভিন্ন ধরনের কাজে ওদের দক্ষতাও নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করতে সক্ষম হবেন।"

এই সফরের পর থেকে হাক্সলি-র সঙ্গে আচার্য-জগদীশচন্দ্রের সম্পর্ক আরো গভীর হয়। হাক্সলি তাঁর ভারত ভ্রমণকালে কলকাতার বসুবিজ্ঞান মন্দিরে এসেছিলেন। সে সময় আচার্য জগদীশচন্দ্র নিজে তাঁকে বিজ্ঞান মন্দিরের কার্যকলাপ ঘুরিয়ে দেখান। হাক্সলি তাঁর এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত 1925 সালে প্রকাশিত "Jesting Pilate" গ্রন্থে প্রাঞ্জল-ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি একটি কপি জগদীশচন্দ্রকে পাঠিয়ে দেন। 1929 সালে প্রকাশিত বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের কার্যবিবরণীতে গ্রন্থটির নির্বাচিত অংশ বিশেষ পুনরায় মুদ্রিত হয়। সম্প্রতি অলডাস হাক্সলি (**Aldous Huxley**)-কে লেখা আচার্য জগদীশচন্দ্রের একটি অপ্রকাশিত চিঠির সন্ধান পাওয়া গেছে। মূল চিঠি ও তাঁর বঙ্গানুবাদ পাঠকদের উদ্দেশে তুলে ধরা হলো।

[**মূল পত্র**]

Artillery mansions
75 Victoria Stn.
London S. W.
19. 12. 23

My dear Mr. Huxley,

I am once more in London, and am hoping to have the pleasure of meeting you. I was very pleased to read very appreciative review of your last book.

My recent work would have interested you. New experimental devices have been perfected of extreme sensitiveness by which I have been able to solve the problem of the Ascent of Sap. My new Photosynthetic Recorder opines automatic tracings of the assimilation of Plants. It will interest you that minute traces of extract of thyroid gland increases assimilation by more than 50 percent.

We shall be in London till the 27th Dec. We return to the above address once more by the second week of January. If you happen to be in London we shall be delighted to see you.

With kindest regards,
yours Sincerely
J C. Bose

[অনুবাদ]

আর্টিলারি ম্যানসনস
75, ভিকটোরিয়া স্টেশন
লণ্ডন. এস. ডবলিউ

19. 12. 23

প্রিয় হাক্স্‌লি,

আমি আবার লণ্ডনে এসেছি। আশা করছি আপনার সঙ্গে দেখা হবে। আপনার শেষ গ্রন্থের [সদ্য প্রকাশিত] প্রশংসাসূচক সমালোচনা পড়ে খুবই খুশী হয়েছি।

আমার বর্তমান গবেষণার কাজ আপনার ভাল লাগতে পারে। গবেষণার জন্য তৈরি নতুন যন্ত্রপাতিগুলোকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ধরে রাখার জন্য নিখুঁত করা হয়েছে। এই সব যন্ত্রের সাহায্যে আমি রসের উৎস্রোত সংক্রান্ত সমস্যাবলী সমাধান করেছি। উদ্ভিদ কিভাবে খাদ্য তৈরি করে তা আমার নতুন যন্ত্র "ফটোসিন্থেটিক রেকর্ডার" স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ধরে রাখতে সক্ষম। জেনে আশ্চর্য হবেন যে থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিষ্কাশিত রস খুবই অল্প-মাত্রায় প্রয়োগ করলে খাদ্য তৈরির হার শতকরা 50 ভাগের চাইতেও বেশি বৃদ্ধি পায়।

আমরা 27শে ডিসেম্বর পর্যন্ত লণ্ডনে থাকবো। জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ ওপরের ঠিকানায় ফিরে যাবো। আপনি যদি লণ্ডনে আসেন দেখা হবে। খুব খুশীও হব।

ইতি

জে. সি. বসু

সঙ্কলন ও সম্পাদনা : দিবাকর সেন

---

* চিঠিটি অধ্যাপক অরুণ কুমার রায়চৌধুরী তাঁর সম্প্রতি আমেরিকা সফরকালে Rice University Research Center থেকে সংগ্রহ করেন ও বর্তমান সঙ্কলককে প্রদান করেন।

Artillery Mansions
75 Victoria St
London S.W.
19.12.23

V
5/1/24

My dear Mr Huxley.

I am once more in London, and am hoping there to have the pleasure of meeting you. I was very pleased to read very appreciative review of your last book.

My recent work would have interested you. New experimental devices have been perfected of extreme sensitiveness by which I have been able to solve the problem of the Ascent of Sap. My new Photosynthetic Recorder gives automatic tracings of the assimilation of plants. It will interest you that minute traces of extract of thyroid gland increase assimilation by more than 50% per cent.

We shall be in London till the 27th Dec. We return to the above address once more by the second week of January. If you happen to be in London we shall be delighted to see you.

With kindest regards

Yours Sincerely

J C Bose

মূল চিঠির প্রতিলিপি

অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
ও শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

ছোটদের বিশ্বকোষ

[ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ]

১ম ঃ ৩৫·০০ ; ২য় ঃ ২৫·০০ ; ৩য় ঃ ৩০·০০ ;
৪র্থ ঃ ৩৫·০০ ; ৫ম ঃ ২৫·০০ ; ৬ষ্ঠ ঃ ৪০·০০

সভ্যতা-সংস্কৃতি-জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাই আজ দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে। ক্রমাগত নিত্যনোতুন তথ্যে আর তত্ত্বে পরিপুষ্ট হচ্ছে তার ভাণ্ডার। সত্যিকারের মানুষ হতে হলে, এ-সমস্ত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে নেওয়া উচিত সেই ছোট্টবেলা থেকেই।

…বইটি বর্ণনানুক্রমিক করলে তা কিশোর পাঠক-পাঠিকার কাছে সহজবোধ্য বা চিত্তাকর্ষক হতো না, দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমরা তা অনুভব করেছি। তাই গ্রন্থের কলেবর অযথা বৃদ্ধি না করে, বইটিকে আমরা বিষয়বস্তু হিসেবে ভাগ করে নিয়েছি।

…ছেলেমেয়েদের কতটুকু জানা উচিত, কতটুকু তথ্য দিলে তারা তা গ্রহণ করতে পারবে—কোন্‌টা তাদের পক্ষে আবশ্যক এবং বুঝবার পক্ষে কষ্টকর, এই মাত্রাজ্ঞানের অভাব বইটির কোথাও অনুভব করতে দেননি সম্পাদকদ্বয়। ফলে বইটি সার্থক কিশোরপাঠ্য হয়ে উঠতে পেরেছে—হয়েছে সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক।

সুকুমার সরকার-এর

বুক অব্‌ নলেজ [১৯৮৭] ১৬·০০

কে? কি? কোথায়? কেন? কবে?—এ-বইতে তরুণ বা শিশুমনের এই কৌতূহলকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সংবর্ধিত করা হয়েছে। তার চির-অশান্ত জ্ঞানপিপাসাকে ছোট-ছোট প্রশ্ন আর উত্তরের মধ্যে দিয়ে কিছু পরিমাণে পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর নির্বাচন, নোতুন তথ্য ও তত্ত্বের সংযোজন, ভাষার সরলতা বইটির উৎকর্ষতা ও জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছে সন্দেহ নেই। তিরিশটি সংস্করণ হয়ে যাওয়া এ-বইটির কথা নোতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা ৭০০ ০৭৩

বিশ্বসাহিত্য চিত্রকথা

একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা

বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিকদের উল্লেখযোগ্য এক একটি রচনার অবিস্মরণীয় চিত্ররূপ বাংলা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে। খ্যাতিমান বিদেশী শিল্পীদের আঁকা মূল চিত্রাবলীর প্রয়োজনীয় সংযোজন করে তাতে বর্ণসুষমা প্রয়োগ করেছেন তোমাদের প্রিয় শিল্পী গৌতম কর্মকার। যে কোন বয়সের পাঠক-পাঠিকার কাছে এক একটি চিত্রকথা মূল রচনার অবিস্মরণীয় এক একটি চরিত্রকে যেমন জীবন্ত করে তুলবে, চিত্রনাট্যের প্রাঞ্জল বর্ণনা তেমনি পাঠককে দেবে মূল রচনা পাঠের অলৌকিক আস্বাদ।

এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে

গ্যালিভার্স ট্রাভেলস্‌ ॥ থ্রি মাস্কেটিয়ার্স ॥ কিডন্যাপড ॥ ড্রাকুলা ॥ ম্যাকবেথ ॥ অলিভার টুইস্ট ॥ দ্য হাউণ্ড অব বাসকারভিলস্‌ ॥ দ্য টাইম মেসিন ॥ মবি ডিক ॥ ইলিয়াড ॥ বেনহুর জার্ণি টু দি সেণ্টার অব দি আর্থ ॥

বহুবর্ণ অফসেটে ছাপা প্রতিটির দাম তিন টাকা

রত্নেশ্বর রায় প্রণীত

হাতে কলমে ইলেকট্রনিকস ১২.

শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ
8/1A, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-700 073

পরীক্ষায় নিশ্চিত সাফল্যের জন্য এই বইগুলি পড়ুন !

A Group of Examiners

• Higher Secondary English Digest

[First & Second Paper Combined]

অধ্যাপক এন. চৌধুরী, এম এ

• উচ্চ-মাধ্যমিক বাংলা সহায়িকা

[BENGALI DIGEST] [প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র]

Ten Professors

• উচ্চ-মাধ্যমিক পদার্থ বিজ্ঞান সহায়িকা • উচ্চ-মাধ্যমিক রসায়ন সহায়িকা

• উচ্চ-মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান সহায়িকা

• Higher Secondary Physics Companion

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ.

• প্রশ্নোত্তরে উচ্চ-মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান • প্রশ্নোত্তরে উচ্চ-মাধ্যমিক অর্থবিজ্ঞান

• প্রশ্নোত্তরে উচ্চ-মাধ্যমিক বাণিজ্যিক অর্থবিজ্ঞান

অধ্যাপক ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক চক্রবর্তী

• প্রশ্নোত্তরে উচ্চ-মাধ্যমিক ইতিহাস

অধ্যাপক চৌধুরী ও অধ্যাপক সান্যাল

• প্রশ্নোত্তরে উচ্চ-মাধ্যমিক দর্শন

অধ্যাপক সান্যাল ও অধ্যাপক গাঙ্গুলী

• প্রশ্নোত্তরে উচ্চ-মাধ্যমিক কারবার সংগঠন

বৈশিষ্ট্য

- প্রতিটি বই উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা-সংসদ প্রদত্ত নমুনা প্রশ্ন (Model questions) ও অনুরূপ অসংখ্য প্রশ্নোত্তরে সমৃদ্ধ।
- প্রতিটি বই-এর আমূল পরিবর্ধিত-সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।
- ভাল কাগজে পরিষ্কার নির্ভুল ঝকঝকে ছাপা।

জয়দুর্গা লাইব্রেরী ॥ ৮এ, কলেজ রো ঃ কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অচিন দেশের অচিন পাখি

শ্রীপান্থ

'এমন সময় এক কাণ্ড হয়েছে। সেই দেশে এক সর্বনেশে চিল থাকত। সে গরু, মহিষ, হাতি ঘোড়া, যা পেত তাই ধরে গিলত। খালি সেই মেছুনীর কাছে সে জব্দ ছিল। মেছুনীর ঝুড়ি ধরতে এলেই মেছুনী তাকে এমন বকুনি দিত যে সে পালাবার পথ পেত না। কিন্তু তাতে তার রাগ আরও বেড়ে যেত, আর সে, ভাবত যে, যেমন করেই হোক একদিন ঐ ঝুড়িটা কেড়ে নিতে হবে।'

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই'-এর এই মেছুনী আর চিল অনেকেরই চেনাজানা। গল্পের নাম—'পিপঁড়ে আর হাতি আর বামুনের চাকর।' আনমনা মেছুনীকে ফাঁকি নিয়ে চিল সেদিন সত্যি সত্যি ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়েছিল তার মাথার ঝুড়ি তারপর— • • •

'সেই দেশের রাজার মেয়ে ছাতে বসেছিলেন। দাসী তাঁর চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল! রাজার মেয়ে আকাশের দিকে দেখছেন, এমন সময় তাঁর চোখে কী যেন পড়ল। রাজার মেয়ে চোখ বুঁজে বললেন,—দাসী দেখ দেখ, আমার চোখে কী পড়েছে! দাসী কাপড়ের কোন পাকিয়ে, তাতে থুথু লাগিয়ে তাই দিয়ে রাজকন্যার চোখের ভিতর থেকে ভারি চমৎকার একটা ছোট্ট কালো জিনিস বার করলে।'

'টুনটুনির বই'-এর পড়ুয়ারা জানে সে জিনিসটি আসলে 'একটা ঝুড়ি। তার ভিতরে কতকগুলি মাছ আছে, আর দু'জন লোক কুস্তি লড়ছে।

চিল মেছুনীর মাথা থেকে ওই ঝুড়ি নিয়েই পালিয়ে ছিল। যে দেশে মেছুনীর ঝুড়িতে দু'জন পালোয়ান লড়াই করতে পারে,বামুনের চাকর মরা হাতি পুটলিতে বেঁধে লাঠির ডগায় ঝুলিয়ে দিব্যি পথ চলতে পারে, মানুষসুদ্ধ ঝুড়ি সে দেশের রাজকন্যার চোখে কুটো বলে মনে হতে পারে, সে-দেশে এমন 'সর্বনেশে চিল'ও থাকতে পারে, বই কি! মনে নেই, ওই চিলের পাখার শোঁ-শোঁ শব্দ শুনে সাতশো মোষ ট্যাঁকে গুঁজে ছুটে পালিয়েছিল গোয়ালা?

এ চিল অচেনা দেশের অচিন পাখি।

আমাদের চেনাজানা পৃথিবীতেও নাকি একদিন ছিল এমনই সব পাখি। সিন্ধবাদ নাবিকের নিজের চোখে দেখা সেই পাখিটিকে মনে পড়ে? তাঁর দ্বিতীয় বারের সমুদ্র যাত্রায় একটি দ্বীপে নেমেছেন সিন্ধবাদ। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল বিশাল একটি গম্বুজ। মসৃণ। ধবধবে শাদা। তার চারপাশ ঘিরে ঠাহর করার চেষ্টা করলেন সিন্ধবাদ—জিনিসটি ঠিক কী। কিন্তু কোথাও কোনও দরজা খুঁজে পাওয়া গেল না। এমন মসৃন যে, ওপরে ওঠার চেষ্টা বৃথা। সিন্ধবাদ একটা জায়গায় দাগ কাটলেন। তারপর শুরু করলেন গম্বুজ পরিক্রমা। ঘুরে এসে তিনি মনেমনে হিসাব করলেন—তাঁকে ঘুরতে হয়েছে পঞ্চাশ পা। পা মানে, পদক্ষেপ।

বিস্ময় বিমূঢ় সিন্ধবাদ যখন বস্তুটি নিয়ে ভাবছেন তখন

হঠাৎ আকাশে বিশাল একখণ্ড মেঘের আবির্ভাব। সূর্য ঢেকে গেল। আর, তারপর সেই মেঘ নেমে এল মাটিতে। সিন্ধবাদ দেখলেন তিনি একটি বিরাট পাখির ছায়ায়। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় পাগড়ি খুলে নিয়ে তিনি নিজেকে বেঁধে ফেললেন পাখির পায়ের সঙ্গে। ঘাসের মতো পা। পাখি বুঝতেও পারল না তার পা জড়িয়ে রয়েছেন একজন দুঃসাহসিক মানুষ।

সিন্ধবাদকে নিয়ে সে পাখি নামল একটি পাহাড়ের চূড়ায়। সে তখনও জানে না তার পা জড়িয়ে রয়েছে মানুষ। সিন্ধবাদ বলছেন—এ পাখির খাদ্য রাশি রাশি সাপ। এত সাপ সে খেতে পারে যে, একটা আস্ত হাতি খেয়ে ফেলাও শক্ত নয়।

সিন্ধবাদ নাবিকের উপাখ্যানে এ-পাখির নাম—রুক। কেউ কেউ বলেন—রক। সেই যে শাদা গম্বুজটি তিনি দেখেছিলেন সেটি আসলে সে পাখিরই ডিম। রক পাখির ডিম।

এ-পাখি কি সত্যিই কোনদিন ছিল এই পৃথিবীতে? আলবৎ ছিল, বলবেন মার্কোপোলো। সিন্ধবাদকে যদি বা কাল্পনিক অভিযাত্রী বলে ধরে নেওয়া যায় মার্কোপোলোকে অবশ্যই নয়। তিনি সত্যকারের ভ্রমণকারী। তিনি লিখছেন ঃ

মাদাগাস্কারের লোকেরা বলেন বছরের একটা বিশেষ মরশুমে দক্ষিণ দিকে থেকে এইদ্বীপে উড়ে আসে এক বিশাল

পনের কোটি বছর আগে বিলুপ্ত পাখি আর্কিওপটেরিক্স।

পাখি। নাম তার—রুক। দেখতে অনেকটা ঈগলের চেয়ে অনেক, অনেক বড়। এত বড় যে, ইচ্ছে করলে সে-পাখি অনায়াসে একটা আস্ত হাতি ছোঁ মেরে তুলে নিতে পারে।

যাঁরা সে-পাখি দেখেছেন তাঁরা বলেন—এ-পাখির এক একটি ডানার মাপ ষোল পা। এক একটা পালক আট পা!

পারস্যের একটি পুঁথিতে এই পাখির ছবিও রয়েছে। তার ঠোঁটে একটি হাতি। দুই পায়ের নখে আর দু'টি। যেন বাজ পাখি তিনটি ইঁদুর নিয়ে চলেছে!

সবই কি নিছক কল্পনা? উপেন্দ্রকিশোরের গল্পের পাখি না-হয় অচেনা দেশের অচেনা পাখি। সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে দিব্যি মিলে যায় সেই চিলের বিবরণ। কিন্তু কী দেখেছিলেন সিন্ধবাদ নাবিক? মার্কোপোলোকেই বা কোন্ পাখির কাহিনী শুনিয়েছিলেন মাদাগাস্কারের লোকেরা। পৃথিবীর আদ্যিকালে একধরণের বিশাল পাখি ছিল সে-খবর আমরা জানি। সে পাখির নাম—ARCHAEOPTERYX সে সব প্রায় পনেরো কোটি বছর আগেকার কথা। দশ কোটি বছর আগে আবির্ভূত হয়েছিল আর এক পাখি—ICHTHYORNIS. তারপর এল নতুন পাখি—DIATRYMA. ওরা নাকি ছিল সাড়ে ছয় ফুট উঁচু। স্পষ্টতই সিন্ধবাদ কিংবা মার্কোপোলো এসব পাখির কথা বলেন নি। কেননা, ওঁরা কেউ কোটি কোটি বছর আগেকার মানুষ নন। তবে কি ওঁরা কিম্বয় বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়েছিলেন অ্যালবাট্রস নামে সেই সুন্দর পাখিটির দিকে। অ্যালবাট্রস, ওঁদের মাপে বিশাল কোন পাখি হয়তো নয়। মেললে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ওদের ডানা বড়জোর বার মিটারের মতো। হতে পারে ওঁরা কোনও বিশাল ঈগল কিংবা শকুন দেখেছিলেন। হতে পারে ওঁরা কোনও মেঘখণ্ডকেই কল্পনা করেছিলেন বিশাল পাখি বলে!

ওঁরা কে কী দেখেছিলেন, কী শুনেছিলেন, তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা আজ নিরর্থক। ওঁরা কল্পনার চোখে চার পাশের পৃথিবীরদিকে তাকিয়েছিলেন বলেই না আমরা আজও এভাবে কল্পনার ডানা মেলে দিতে পারছি আকাশে। সেখানে বাংলার লোককথার মোষ-ধরা চিল উড়ে বেড়ায়, সেখানে তিন তিনটি হাতি নিয়ে দিব্যি উড়ে যায় রক পাখি!

পুরন্দর চৌধুরী চোখ থেকে কালো চশমাটা খুলে ফেলে বললেন, অসীমা, এবার আমি তোমাকে এমন একটা দৃশ্য দেখাবো, যা তোমার আগে পৃথিবীতে কেউ কখনো দেখেনি। এ রকম দৃশ্য কেউ কল্পনাও করেনি।

ছোট একটা রকেট আকাশের এক জায়গায় গোল হয়ে পাক খাচ্ছে। কমপিউটারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কমপিউটারই রকেটটাকে ঘোরাচ্ছে।

দুটি মাত্র আসন। পাশাপাশি বসে আছেন পুরন্দর ও অসীমা। পুরন্দরের মুখখানা ফর্সা ও একেবারে গোল প্রায় চাঁদের মতন, তাঁর চোখের মণি দুটো নীল। তাঁর বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। বৃষ্টি-বিজ্ঞানী হিসেবে সারা পৃথিবীতে তাঁর নাম। সাহারা মরুভূমিতে তিনি এক মাসে এক শো ইঞ্চি বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে তিনি সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করেছেন। এ জন্য তাঁর প্রশংসা যত হয়েছে, নিন্দেও হয়েছে প্রায় ততটাই।

মেঘ থেকে ইচ্ছে মতন বৃষ্টিপাত ঘটানো এখন আর নতুন কিছু ব্যাপার নয়! কিন্তু তিনি অন্য দেশ থেকে মেঘ তাড়িয়ে এনে সাহারায় বৃষ্টি ঝরিয়েছেন। সেই দেশে এবার বৃষ্টি কম হবে। একে মেঘ-চুরি বলা যায়। রাষ্ট্রসঙ্ঘে অনেক-গুলি দেশ দাবী তুলেছে যে মেঘ-চুরি আইন করে বদলানো দরকার।

অসীমার বয়েস সাতাশ। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সে ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করে। পুরন্দর চৌধুরী বোস্টন শহরে একটি আবহাওয়ার বিষয়ে আলোচনায় যোগ দিতে এসেছিলেন। সেখানে অসীমার সঙ্গে তাঁর হঠাৎ আলাপ হয়। অসীমা নিজেই পুরন্দর চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিল।

সেই আলোচনা সভায় কারপভ নামে একজন বৈজ্ঞানিক পুরন্দরকে মেঘ-চোর বলে গালাগাল দেওয়ায় তিনি এমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে চিৎকার করে কিছু বলতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান।

যখন তিনি চোখ মেললেন, তখন তিনি দেখলেন তাঁর মাথার কাছে বসে আছে এই সুন্দরী মেয়েটি। সে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

এই দুনিয়ায় পুরন্দর চৌধুরীর আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। তিনি বিয়েও করেন নি। বিদেশে একটি অচেনা বাঙালী মেয়েকে তাঁর সেবা করতে দেখে তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কে?

অসীমা বলেছিল, আপনি আমায় চিনতে পারবেন না, কিন্তু আমি আপনার ছোট ভাইয়ের মেয়ে।

পুরন্দর প্রথমে বিশ্বাস করেন নি। তাঁর একটি ভাই ছিল ঠিকই, কিন্তু সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে পঁচিশ বছর আগে! সেই ভাইয়ের নাম ছিল দিকবিজয়।

অসীমা বলেছিল, আমার বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে যান নি, তিনি দেশ ছেড়ে ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত আলাস্কায় এসে সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন। বিয়ে করেছিলেন একটি এস্কিমো মেয়েকে। তিনিই আমার মা। আমার বাবার বাঁ চোখের ভুরুর ওপর একটা কাটা দাগ ছিল, খুব ছোটবেলায় আপনিই তাঁকে একবার স্কেল দিয়ে ঐখানে মেরেছিলেন তাই না? আমার বাবা কিন্তু আপনাকে খুব ভালবাসতেন, মৃত্যুর আগেও আপনার কথা বলেছিলেন।

বিদেশে এসে এমনভাবে একজন রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়কে খুঁজে পেয়ে পুরন্দর চৌধুরী দারুণ খুশী হয়ে উঠেছিলেন। তারপর তিনি আর অসীমাকে ছাড়তে চান নি। তাঁর নিজস্ব রকেটে তিনি অসীমাকে নিয়ে বহু জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর আবহাওয়ার নানা রকম রহস্য দেখাচ্ছেন।

ঘুরতে ঘুরতে এখন ওঁরা এসেছেন আলাস্কার আকাশে। অসীমা তার বাবা-মায়ের সঙ্গে যেখানে থাকতো, সে জায়গা-টাও দেখা হয়ে গেছে। সেখানে অবশ্য এস্কিমোদের ইগ্লুর বদলে এখন বড় বড় এয়ারকণ্ডিসান্ড বাড়ি উঠেছে। পুরন্দর চৌধুরী বললেন, নীচের দিকে তাকিয়ে দেখো, ওটা কী দেখছো বলতে পারো?

অসীমা বললো, দেখতে পাচ্ছি একটা সোনালি রঙের পাহাড়। চূড়ার বরফের ওপর রোদ পড়েছে বলে সত্যিই সোনার মতন ঝকঝক করছে।

—ঐ পাহাড়টার নাম জানো?

অসীমা ইতিহাসের ছাত্রী হলেও ভূগোলও বেশ ভালোই জানে। সে বললো, আমি আলাস্কার এত দূরে কখনো আসি নি বটে, তবে এই পাহাড়টার নাম মাউন্ট চেম্বারলিন। তার পাশেই যে কুয়াশায় ঢাকা হ্রদ, তার নাম লেক শ্রেভার।

পুরন্দর খুশী হয়ে বললেন, বাঃ! এবার তোমাকে আমি যা দেখাবো, তা কিন্তু তুমি কাউকে বলতে পারবে না। সারা পৃথিবীতে দারুণ হৈ-চৈ হবে এই নিয়ে, কিন্তু তুমি মুখ খুলতে পারবে না। ব্যাটা কারপভ্ কী রকম জব্দ হয় এবার দেখো।

অসীমা মৃদুভাবে বললো, বৈজ্ঞানিকদের উচিত নয় কিন্তু একজন আর একজনকে জব্দ করা।

—বোকাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, তাদের জ্ঞান কতটুকু! আমাকে মেঘ-চোর বলে, এত সাহস? আমি অন্যায়টা কী করেছি? সাইবেরিয়া থেকে মেঘ এনেছি সাহারায়। সাইবেরিয়ায় অত বরফ, সেখানে বৃষ্টি না হলে ক্ষতি কী আছে?

অসীমা বললো, কিন্তু একবার এরকম শুরু করলে, তারপর যদি যে-কোনো দেশ অন্য দেশের মেঘ চুরি করতে শুরু করে? মনে করুন, ইণ্ডিয়ার সঙ্গে পাকিস্তানের ঝগড়া হলো, তখন আপনি পাকিস্তান থেকে সব মেঘ উড়িয়ে নিয়ে চলে এলেন। তখন সে দেশের মানুষের কী অবস্থা হবে?

আমি পৃথিবীর মানুষকে আর একটা জিনিস শিখিয়ে দিয়ে যাবো। যাতে ও রকম মেঘ চুরি হলেও কোনো ক্ষতি হবে না। যাক গে, সে কথা পরে। তুমি তো ইতিহাসের ছাত্রী, পৃথিবীতে শেষ তুষার-যুগ কবে এসেছিল জানো?

—এটা ঠিক ইতিহাসের বিষয় নয়, প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার। তবু আমি এটা জানি। শেষ হিমযুগ হয়েছিল তের হাজার বছর আগে।

—ঠিক বলেছো। এই লেক শ্রেভার তৈরি হয়েছিল সেই সময়ে। মাউন্ট চেম্বারলিনের বরফ গলা জল এই লেকে এসে জমে। আবার এই জল বাষ্প হয়ে উড়ে গিয়ে মাউন্ট চেম্বার-লিনের চূড়ায় গিয়ে আবার বরফ হয়ে যায়। এই সাইকেল চলছে।

—যেমন সমুদ্রের জল মেঘ হয়ে উড়ে যায়। আবার মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়ে সমুদ্র ভরাট হয়।

—ওটা তো ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের মতন হলো। আসল বৃষ্টির হিসেবটা তোমাকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিচ্ছি। সারা বছরে পৃথিবী থেকে কত জল বাষ্প হয়ে মেঘে উড়ে যায় জান? পঁচানব্বই হাজার কিউবিক মাইল। তার মধ্যে আশী হাজার কিউবিক মাইলই যায় সমুদ্র থেকে। আবার

ঠিক আশী হাজার কিউবিক মাইলই বৃষ্টি হয়ে সমুদ্রে ফিরে আসে। আর মাত্র পনেরো হাজার কিউবিক মাইল বৃষ্টি নিয়ে পৃথিবীর এত মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা সব বেঁচে আছে। প্রকৃতির হল এটাই নিখুঁত হিসেব। কিন্তু এবার মানুষের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং মানুষের জন্য বেশী বৃষ্টি দরকার।

—আপনি এখানে আমাকে কী দেখাবেন বলেছিলেন?

—হ্যাঁ। এই যে নীচে দেখছো লেক শ্রেভার, এখানে একটা মজার ব্যাপার ঘটছে। এখানে যতখানি জল বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে। ঠিক ততখানি বৃষ্টি হয়ে ফিরে আসছে না। কিছুটা কম ফিরে আসছে। অর্থাৎ হ্রদটা একটু একটু করে শুকোচ্ছে। আমি হিসেব করে দেখেছি, এই হ্রদটা পুরোপুরি শুকোতে আরও দশ হাজার বছর লাগবে।

—আপনি কী করে জানলেন? ঠিক দশ হাজার বছর লাগবে?

—অঙ্কের হিসেব! তুমি পৃথিবীর যে কোন পাহাড়, নদী, পুকুর, খাল-বিলের কাছে আমায় নিয়ে যাও, আমি অঙ্ক কষে বলে দেবো, সেখান থেকে কত জল বাষ্প হচ্ছে আর কত জল বৃষ্টি হয়ে ফিরে আসছে। এই অঙ্ক আমার থেকে ভালো আর কেউ জানে না। কারপভও কিছুটা জানে, তবে আমার চেয়ে কম।

—আমি তো ইতিহাস পড়ি, অঙ্ক আমার মাথায় বিশেষ ঢোকে না।

—ইতিহাসেও তো অঙ্ক লাগে। অবশ্য সাধারণ যোগ-বিয়োগ। আচ্ছা ইতিহাসের ছাত্রী, তুমি আটলান্টিস নামে লুপ্ত সভ্যতার কথা জানো? সেটা কোথায় ছিল বলো তো?

—এটাও কিন্তু ইতিহাসের বিষয় নয়। আটলান্টিসের ব্যাপারটা গ্রীক লেখকদের জল্পনা-কল্পনা। অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজি হয়েছে, এখনো কোথাও তার সন্ধান পাওয়া যায় নি ঠিকঠাক।

—আমি যদি বলি এই লেক শ্রেভারের তলাতেই চাপা পড়ে আছে?

—সেটা দশ হাজার বছর পরে জানা যাবে!

পুরন্দর চৌধুরী হা-হা করে হেসে উঠলেন। ছোট্ট একটা মশলার কৌটো খুলে একটা লবঙ্গ খেয়ে বললেন, তুমি একটা নেবে নাকি?

অসীমাও একটা লবঙ্গ নিল।

পুরন্দর চৌধুরী বললেন, তুমি আর আমি কেউই তো দশ হাজার বছর বাঁচবো না! ততদিনে পৃথিবীতে মানুষই থাকবে কিনা সন্দেহ! দশ হাজার বছর তো দূরের কথা, আমি দশ বছরও অপেক্ষা করতে রাজি নই!

অসীমা চোখ বড় বড় করে বললো, তা হলে কি আপনি এই লেকটা খুঁজে দেখতে চান? এর তো প্রায় সবটাই বরফে ঢাকা!

পুরন্দর মাথা নেড়ে বললেন, খোঁড়াখুঁড়ি তো তোমাদের কাজ! আমি জল নিয়ে কারবার করি। জল কি খুঁড়তে হয়? এই যে এত বড় একটা লেক পড়ে আছে এখানে, এটা অপ্রয়োজনীয়, তাই না? কোনো মানুষ এখানে আসে না। দশ হাজার বছর ধরে লেকটা নিজে নিজে শুকোতোই, অত দিন অপেক্ষা না করে এখনই এটাকে শুকিয়ে ফেললে কেমন হয়?

—এত বড় লেকটা শুকোবেন কি করে? সেই জল ফেলবেন কোথায়?

—মেঘ করে ছড়িয়ে দেবো! সেই মেঘ কারপভের দেশে পাঠিয়ে দেবো। ও খুব মেঘ মেঘ বলে চ্যাঁচামেচি করছিল যে!

—এই বিশাল হ্রদের জল যদি মেঘ হয়ে যায়, সেই মেঘ থেকে অন্য জায়গায় বৃষ্টি হবে। এক সঙ্গে হঠাৎ বৃষ্টি বেড়ে গেলে পৃথিবীর দারুণ কোন ক্ষতি হয়ে যাবে না!

—কী আর হবে! সাইবেরিয়ায় বড় জোর এক ইঞ্চি বেশী বরফ জমবে!

অসীমা হেসে ফেলে বললো, আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। এতবড় লেকী কী শুকিয়ে ফেলা যায়?

পুরন্দর বললেন, বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যখন প্রথম হয়, তখন সবাই অবিশ্বাস করে। তোমাকে আর একটি ছোট্ট ঘটনা বলি। ঘটনাটা ছোট কিন্তু তার ফলটা হয়েছিল বিরাট। দশ লক্ষ বছরেরও কিছু বেশী আগে, এই পৃথিবীর উত্তাপ হঠাৎ একটু কমে গিয়েছিল। এ রকম হয়। পৃথিবীর উত্তাপ মাঝে মাঝে কমে বাড়ে। মাঝে মাঝে এই ধরো—দশ পনেরো হাজার বছর পরে পরে। আমি যে-বারের কথা বলছি, সেবারে পৃথিবীর উত্তাপ কমেছিল মাত্র তিন থেকে চার ডিগ্রি ফারেনহাইট। সেন্টিগ্রেটের হিসাবে খুব বেশী হলে দুই পয়েন্ট দুই। অতি সামান্য, তাতেই গোটা উত্তর আমেরিকাটা বরফে ঢেকে গিয়েছিল। কোথাও কোথাও বরফ জমে গিয়ে ছিল এক হাজার ফিট উঁচু। তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? এটা কিন্তু প্রমাণিত সত্য!

অসীমা বললেন, আপনার কথা অবিশ্বাস করবো কেন? আমি ভাবছিলুম, আপনি আমাকে ছেলেমানুষ ভেবে ঠাট্টা করছেন!

না এসব ঠাট্টার ব্যাপার নয়। এবার বুঝলে তো পৃথিবীর উত্তাপ একটুখানি কমে গেলেই কী কাণ্ড হয়? সেই রকম পৃথিবীর উত্তাপ যদি খানিকটা বাড়িয়ে দেওয়া যায়। তা হলেই সব বরফ গলতে শুরু করবে। আগে এই তাপ কমা বাড়াটা সূর্যের ওপর নির্ভর করতো। এখন মানুষই তা পারে। যে-সব পাগলগুলি অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা জমিয়ে রেখেছে, সেগুলো যদি একসঙ্গে ফাটাতে শুরু করে তা হলে পৃথিবীর সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাবে!

যে কথা জানি। এত বড় লেকটাকে বাষ্প করে দেবার

জন্য আপনিও একটা অ্যাটম বোমা ফাটাবেন নাকি।

আমি ওসব বোমা-টোমায় বিশ্বাস করি না! আমি পুরন্দর চৌধুরী, আমার আবিষ্কার সব সময় মৌলিক। আলাস্কার এই চেম্বারলিন পাহাড়ের কাছে জনমনুষ্য নেই। এখানেই হবে আমার আবিষ্কারের পরীক্ষা। শুধু তুমি থাকবে তার সাক্ষী। তুমি আমার ভাইয়ের মেয়ে, তাই তোমাকে এই মহান দৃশ্য দেখার সুযোগও দিচ্ছি। দশ হাজার বছর পরে যে হ্রদটার শুকিয়ে যাওয়ার কথা দিল, সেটাকে আমি নিশ্চিহ্ন করি দেবো পাঁচ মিনিটে।

সত্যিই কী তা সম্ভব!

এক্ষুনি দেখতে পারে!

এতবড় লেকটার জল বাষ্প হয়ে গেলে যে বিরাট মেঘ হবে, তার ধাক্কায় আমাদের রকেট টিঁকতে পারবে?

আমরা মেঘলোকের অনেক উঁচুতে উঠে যাবো! মেঘ আর কতটা উঠতে পারে!

তারপর এতবড় মেঘকে আপনি সাইবেরিয়ায় পাঠাবেন? সবটা নাও পাঠাতে পারি, কিছু কিছু বিক্রিও করতে পারি। যে-সব দেশে বৃষ্টি কম, তাদের কয়েক টুকরো দেওয়া যেতে পারে।

ততদিন আপনি এই মেঘ জমিয়ে রাখবেন কোথায়?

উড়িয়ে নিয়ে বেড়াবো? এক দেশ থেকে আরেক দেশে উড়ে যাবে। যে-কোনো দেশের ওপর দিয়েই মেঘ উড়ে যাওয়া তো বে-আইনী নয়।

কিন্তু এই মেঘের সঙ্গে অন্য দেশের মেঘ উড়ে যেতে পারে না?

তা পারে অবশ্য! জানো অসীমা, এত বড় একটা জল-ভরা মেঘ যদি আমাদের অধিকারে থাকে, তা হলে সেই মেঘ খানাকে উড়িয়ে উড়িয়ে আমরা পৃথিবীর সব মেঘ এক সঙ্গে জুড়ে নিতে পারি! তখন কোথায় কখন বৃষ্টি হবে, তা আমি ঠিক করছি। আমি হবো আকাশের দেবতা ইন্দ্র। আমার নাম পুরন্দর, তার মানে জানো তো? যে-ক'জন বৈজ্ঞানিক আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে, আমার নামে নিন্দে রটিয়েছে, তাদের দেশে আমি ইচ্ছে করলে এক ফোঁটাও বৃষ্টি না দিতে পারি! বিশেষ করে ঔ কারপভকে আমি একবার শিক্ষা দিতে চাই!

অসীমা হঠাৎ মুখ নীচু করে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলে।

পুরন্দর একটু রেগে গিয়ে বললেন, এখনো বুঝি তোমার সন্দেহ হচ্ছে!

অসীমা বললেন, না তা নয়। আপনি পঁচানব্বই হাজার কিউবিক মাইল লম্বা একবিশাল মেঘ নিয়ে আকাশে আকাশে ফেরিওয়ালার মতন ঘুরছেন, আর সব কটা দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করছেন বৃষ্টি নেবে? বৃষ্টি নেবে? এটা ভাবতেই কী রকম মজা লাগছে!

পুরন্দর বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো। এটা মজারই ব্যাপার। আমি সত্যি সত্যি অবশ্য সে রকম কিছু করবো না। আমি তো মেঘের ব্যবসাদার নই। মানুষের ক্ষতি করতেও চাই না। শুধু ঐ কারপভ আমাকে মেঘ-চোর বলেছে, ওর দেশে আমি এই একাণ্ড মেঘটা পঠিয়ে দিয়ে বলবো, এই নাও ধার শোধ! সাইবেরিয়ায় কয়েক ইঞ্চি বরফ বেড়ে যাবে!

অসীমা বললেন, কিন্তু সাইবেরিয়ার যাবার আগেই যদি এই মেঘ কোথাও ভেঙে পড়ে! কোনো দেশকে ভাসিয়ে দেয়?

পুরন্দর বললেন, সে রকম একটু ঝুঁকি আছে ঠিকই। এই কৃত্রিম মেঘের চরিত্র কী হবে তা বলা যায় না। তবে নতুন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সময় এ রকম একটু ঝুঁকি নিতেই হয়। অবশ্য আমার যতদূর ধারণা, আমি মেঘটাকে ঠিক চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবো!

মনে করুন, সাইবেরিয়ার দিকে না গিয়ে এই মেঘটা আপনার দেশ কলকাতার আকাশের ওপর ভেঙে পড়লো, তা হলে সেই শহরের অবস্থা কী হবে?

এটা দেখছো অসীমা, এটা আমার নিজের তৈরি……৭

এ রকম জল ভরা টলটলে মেঘ হঠাৎ ভেঙে পড়লে কলকাতার অর্ধেক বাড়ি ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে। কিন্তু সে রকম অবস্থা আমি হতেই দেবো না। মেঘটা এদিক-ওদিক গেলেই আমি কাটিয়ে দেবো কোন নির্জন জায়গায়!

এবারে তিনি নীচু হয়ে তাঁর বসবার জায়গায় তলা থেকে তলা থেকে একটি ফাইবার গ্লাসের বাক্স বার করলেন। সেই বাক্সের মধ্যে ফুটবলের সাইজের একটু ধাতুর বল।

সেই বলটা হাতে নিয়ে তিনি বললেন—এটা দেখছো, অসীমা। এটা আমার নিজের তৈরি। মার্কারির সঙ্গে আরও এগারোটি ধাতু মিশিয়ে তৈরি হয়েছে এই নতুন অ্যালয়। এর গুণ হচ্ছে জলের ছোঁয়া লাগলেই এটা গরম হতে শুরু করে। তারপর উত্তাপ এমন বাড়বে যে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না! দ্যাখো, হাত দিয়ে দ্যাখো, বাতাসে যে জল কনা আছে, তাতেই এটা গরম হতে শুরু করেছে। সেই জন্যই এটাকে এয়ারটাইট অবস্থায় রাখতে হয়!

অসীমা হাত দিয়ে দেখল, সত্যিই বলটা বেশ গরম।

পুরন্দর বললেন, আমার হিসেব অনুযায়ী জলের মধ্যে মেশবার পর পাঁচ মিনিটেই এর উত্তাপ এত বাড়বে যে গোটা লেকটারই বরফ গলে গিয়ে বাষ্প হয়ে যাবে! তারপর আমরা দেখবো ওর তলায় আটলান্টিস আছে কিনা! দু' রকম আবিষ্কারই হবে, কী বলো!

অসীমা জিজ্ঞেস করলো, আমরা মেঘলোকের ওপরে উঠে গেলে মেঘের তলায় কী আছে তা দেখবো কী করে?

—আপনার এই গোল ধাতুটা কি একবার গরম হয়েই নষ্ট হয়ে যাবে?

—না, না, না, এর ধ্বংস নেই। এটা যতবার ইচ্ছে ব্যবহার করা যাবে। সব জল শুকিয়ে গেলেই এটা আস্তে আস্তে আবার ঠাণ্ডা হতে শুরু করবে। এইবার তা হলে শুরু হোক!

অসীমা তার কোটের পকেট থেকে একটা ছোট্ট রিভলবার বার করে বললো, পুরন্দর চৌধুরী, ঐ বলটাকে আপনি আবার ঐ এয়ারটাইট বাক্সে ঢোকান। এবার আমাদের ফিরে যেতে হবে!

দারুন অবাক হয়ে চোখ কপালে তুলে পুরন্দর বললেন, এ কী অসীমা? তুমি ওটা তুলে আমাকে ভয় দেখাচ্ছো কেন?

অসীমা বললো, আপনার দিকে অস্ত্র তুলতে হয়েছে বলে আমরা দুঃখিত। কিন্তু না হলে আপনি আমার কথা শুনতেন না। প্রকৃতিকে ধ্বংস করা একটা অপরাধ। অলাস্কার একটি লেক শুকিয়ে সাইবেরিয়ায় এত বড় একটা মেঘ পাঠালে প্রকৃতিতে মহা বিপর্যয় শুরু হয়ে যাবে! ডক্টর কারপভের ওপর রাগ করে আপনি পৃথিবীর ক্ষতি করতে চাইছেন!

পুরন্দর এক ধমক দিয়ে বললেন, বোকা মেয়ে! ওটা

ঐ বলটাকে আবার আপনি এয়ারটাইট বাক্সে ঢোকান।

সরিয়ে রাখো! পাঁচ মিনিটে এত বড় একটা মেঘ সৃষ্টি করার রেকর্ড করবো আমি। তার সঙ্গে তোমার নামটাও থাকবে আমার ভাই ঝি হিসেবে।

—আমি আপনার ভাইঝি নই! আমি কারপভের মেয়ে।

—অ্যাঁ?

—হ্যাঁ, আমার মা বাঙালী মেয়ে।

—তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলে? তুমি একটা স্পাই।

—ঠিক মিথ্যে বলিনি। আমার বাবা আপনাকে বড় ভাইয়ের মতন শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু তিনি বলেন, আপনি এক দেশের মেঘ অন্য দেশে নিয়ে গিয়ে পাগলামি করছেন। সমুদ্র থেকে খাল কেটে সাহারায় জল আনা হচ্ছে, অন্য দেশের মেঘ আনার দরকার নেই!

—তুমি, তুমি আমার এমন একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার নষ্ট করে দিতে চাও? তুমি আমার ওপর গুলি চালাও, আমাকে মেরে ফেলো, তবু এই গোলাটা আমি ছুঁদে ফেলবোই। আমি মরে গেলেও পৃথিবীর লোক জানবে যে পুরন্দর চৌধুরী কত বড় বৈজ্ঞানিক ছিল।

অসীমা একবার বাইরের দিকটা দেখে নিয়ে পুরন্দরের দিকে স্থির ভাবে চেয়ে রইলো।

পুরন্দর রকেটের একটা অংশ খুলতে যেতেই অসীমা বললো, ওটা খুলবেন না। তা হলে আমরা গুঁড়ো হয়ে যাবো!

—আমি এটা বাইরে ছুঁড়বোই!

—ছুঁড়ুন তা হলে। কিন্তু জানলা-টানলা খুলবেন না। এই সকেটের মধ্যে ফেলুন, নীচের পর পর কয়েকটা ভাল্‌ব খুলে গিয়ে এটাকে বাইরে বার করে দেবে!

—তার মানে? তুমি কী বলছো? জানলা খুলবো না কেন?

—ডক্টর পুরন্দর চৌধুরী আপনি আবহাওয়া বিজ্ঞানী। আমি কিন্তু শুধু ইতিহাসের ছাত্রী নই। কম্পিউটারেই আমার বিশেষ আগ্রহ। আগে থেকে প্রোগ্রাম করে রেখে-ছিলাম। কম্পিউটার এখন রকেটটাকে বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে পৃথিবীর অনেক ওপরে নিয়ে এসেছে। লেকটাকে কি আর দেখতে পাচ্ছেন? এখান থেকে আপনার বলটা ছুঁড়লেও লেকে পড়বে না। বলটা আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে না?

পুরন্দরের মুখটা হাঁ হয়ে গেল। এই সুন্দর চেহারার মেয়েটার মাথায় এতসব বুদ্ধি! বায়ুমণ্ডলের বাইরে তাঁর অ্যালয়টা অকেজো!

অসীমা বলটা পুরন্দরের হাত থেকে নিয়ে ফেলে দিল সকেটে। তারপর বললো, ওটা মহাশূন্যেই থাক। কোনো দিন জলের ছোঁয়া পাবে না। পৃথিবীর জল যেমন আছে তেমন থাকুক!

ফার্টুন : রেবতীভূষণ

মৌকা-সা-বি-স

বনাম ঘনাদা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

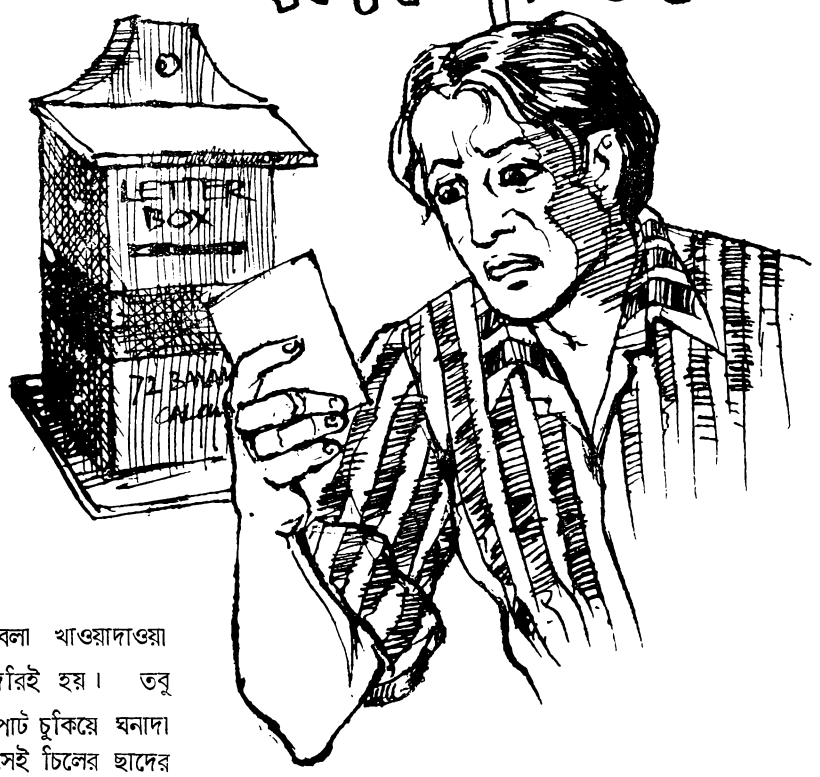

ছুটির দিন। দুপুর বেলা খাওয়াদাওয়া শেষ হতে একটু দেরিই হয়। তবু যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সে পাট চুকিয়ে ঘনাদা তাঁর খাওয়া সেরে—নিজস্ব সেই চিলের ছাদের টঙের ঘরে উঠে যাওয়ার পরই সবাই একসঙ্গে দোতলার সিঁড়ির বাঁকে শিশিরের ঘরে গিয়ে জমায়েৎ হয়েছি।

জমায়েৎ যে হয়েছি তা ঠিক খোশ-মেজাজ নিয়ে গুলতানি করবার জন্য নয়। তার বদলে রীতিমত একটা লজ্জা আর অপমানের জ্বালা নিয়ে।

লজ্জা আর অপমানের জ্বালাটা যা নিয়ে তারই ব্যাপারেই শিবু তখন নিচের খাবার ঘরে খাওয়া শেষ করার পর আমাদের সঙ্গে ওপরে না এসে বাইরের গেটের পাশের লেটারবক্স হাতড়াতে গেছে আর আমরা শিশিরের ঘরে এসে জড় হয়ে অধীর আগ্রহে তার জন্যে অপেক্ষা করছি।

অপেক্ষা বেশীক্ষণ করতে হ'ল না। মিনিট দশেকের মধ্যেই শিবু এসে হাজির হল, কিন্তু যে চেহারা নিয়ে সে দেখা দিলে তাতে ফলাফল সম্বন্ধে কোন সংশয়ের অবকাশ না থাকলেও হতাশ কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না—কি আজও কিছু নেই?

থাকবেনা না কেন—শিবু হতাশ কণ্ঠটা আরো গাঢ় করে জানালে—যা থাকবার তাই আছে।

তার মানে নেই—টিটকিরির চিরকুট!—হতাশার সঙ্গে বেশ একটু ক্ষোভের জ্বালা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেও শিবুর হাত থেকে চিরকুটটা নিয়ে না পড়ে পারলাম না।

পড়ার অবশ্য নতুন কিছু নেই। বেশ কিছুক্ষণ থেকে সোজাসুজি স্পষ্ট সমস্যার ধাঁধাটাঁধার বদলে যে ধরনের জ্বালা ধরানো টিটকিরির চিমটি আসছে তারই আর একটু নমুনা।

এবারেও সেই পোস্টকার্ডের মাপের একটা ধবধবে শাদা

কার্ড। তার সম্বোধন নেই। কোথা থেকে আসছে তার কোন হদিশ নেই। কার্ডের মাঝামাঝি মোটা মোটা অক্ষরে শুধু লেখা—**ভুয়ো**।

এ রকম কার্ড এ ক'দিন আরো কয়েকটা পাওয়া গেছে। এক না হলেও সবগুলিই অপমান করা টিটকিরি দিয়ে লেখা।

এই জাতের যে কার্ড পাওয়া গেছে তাতে তার ভাষণ সংক্ষিপ্ত হলেও ভাষা একটু বিস্তারিত ছিল।

মাপজোকে এক হলেও সে কার্ডে বক্তব্য একেবারে অস্পষ্ট নয়।

লেখার ধরন ধারণ অবশ্য এক। প্রমাণ আকারের শাদা কার্ডের মাঝখানে পরপর মোটা মোটা অক্ষরে তিনটি কথা সাজানো।

কে না কারা ?
এখনো বুঝলে কিছু
ভুয়ো।

এর পরের চিঠিটা আর একটু বড় হলেও মোটেই ধোঁয়াটে নয়। তার একটি খোঁচাই স্পষ্ট করে দেওয়া। পর পর তিন লাইনে সাজিয়ে লেখা—

কোথায় এখন
টঙের ঘরের তিনি !
ডুব মেরেছেন কোথায় ?

নিয়মিত ভাবে পর পর এ ধরনের ভেংচিকাটা চিঠি নিয়ে মেজাজগুলো তখন আমাদের কি হয়েছে তা বোধহয় বলে বোঝাবার দরকার নেই।

এ যে মৌ-কা-সা-বি-স এর কাণ্ড সে বিষয়ে কোনমতেই আমাদের সন্দেহ নেই।

কিন্তু কে সে—মৌ-কা-সা-বি-স ?

কে না কারা ?

আমাদের এমন কানমলা দেবার এ গরজই বা তার বা তাদের কেন ?

আর আমাদেরই এই বাহাত্তর নম্বরের বাসার ডাকবাক্সে তারা তাদের চিঠি চালানই বা করছে কখন ? কিভাবে ?

সারাক্ষণ যতখানি সম্ভব আমরা সজাগ পাহারায় থেকেছি।

সকলে দল বেঁধে না হোক কেউ না কেউ'ত বটেই।

এই এত পাহারার মধ্যে কখন কি ভাবে তারা তাদের এই সব চিঠি চালান করছে আমাদের চিঠির বাক্সে ?

দিনের বেলা ত নয়ই রাত্রেও আমাদের অজান্তে চিঠির বাক্সে কিছু ফেলা, অসম্ভব বললেই হয়। কারণ সন্ধ্যা হতে না হতেই আজকাল আমরা বাইরের গেট চাবি দিয়ে বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছি।

অন্য কারুরত নয়ই আমাদের নিজেদের কারুরও বাইরে থেকে ভেতরে আসতে হলে চাবি দিয়ে গেট না খুলিয়ে আসা যাওয়ার উপায় ছিল না।

এই অবস্থায় আমাদের অজান্তে আমাদের ডাকবাক্সে চিঠি বা চিরকুট চালান কেমন করে সম্ভব।

ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছে তাতে আমরা পরস্পরের ওপর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছি।

আমাদেরই কেউ কি চুপি চুপি এই সব চালাকি করছে।

কিন্তু কে সে হতে পারে ?

এ রকম মজার বেয়াড়াপনা করে তার লাভই বা কি !

আর তাছাড়া মৌ-কা-সা-বি-স যে সব মাথাগুলোনো ধাঁধার রহস্য আমাদের সামনে সাজিয়ে ধরেছে একা এমন কিছু করার মত বুদ্ধিও আমাদের কার আছে ?

শিবুর ?

না। কোনো একটা মজার ব্যাপার নিয়ে বেশ একটু হৈ চৈ বাধিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ছাড়া আর কোনো এলেম তার থাকার পরিচয় তো এখনো পেয়েছি বলে মনে হয় না।

যদিই বা এরকম ক্ষমতা তার থাকে আপাততঃ তা অনুমানের মধ্যে রেখে অন্যদের কথা বিচার করে দেখতে পারি।

প্রথমে নিজেকে বিচারের দাঁড়িপাল্লায় তুলে চোখ বুজেই সরাসরি বাদ দিতে পারি।

না, আমি দু চারটে খোঁচা দিয়ে সোজা কথাকে কখনো কখনো প্যাঁচাল করতে পারি কিন্তু ভেবে চিন্তে সাজিয়ে গুছিয়ে একটা ধাঁধা বাধানো—সে আমার কর্ম নয়।

আমার পর বাকি থাকে শুধু গৌর আর শিশির।

তা দু দুজনের কেউ যে ফেলনা নয় একথা অকপটে স্বীকার না করে উপায় নেই।

কিন্তু বাদ সেধেছে দুজনের নিজস্ব চরিত্রের বিশেষত্ব।

গৌর ইচ্ছে করলে সবই পারে। কিন্তু সকলের সঙ্গে সমান উৎসাহে যে কোনো ধান্দায় মাততে আপত্তি না থাকলেও 'মৌ-কা-সা-বি-স'-এর মত বাহাদুরির জন্যে নিজের গরজে সময় আর বুদ্ধি খরচ সে করবে বলে মনে হয় না।

শিশিরের পক্ষে সে রকম কিছু করা অবশ্য সম্ভব।

কিন্তু ব্যাপারটা আরো তাহলে জমকালো হওয়া দরকার।

জমকালো না হোক ব্যাপারটা এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে একটা গায়ে জ্বালাধরানো টিটকিরির চাবকানি-র আভাস আছে বলে অবশ্য শিবু, গৌর, শিশির কারুরই সামান্য গা-ঝাড়া দিয়ে তাচ্ছিল্য করার ভাবটা আর নেই।

রহস্যটার একটা মীমাংসা তাই না করলেই নয়।

কিন্তু কিভাবে সে ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া যায় ঠিক মত বুঝতে না পেরে আপতত শিবুর ওপরেই একটু চড়াও হয়ে বললাম, লেটারবক্স হাতড়ে তুই শুধু এই লেখাটুকু পেলি ?

তার মানে ? হঠাৎ আক্রমণটা কোন দিক দিয়ে যায়—কেনই বা এমন বেয়াড়া তা বুঝতে না পেরে শিবু বেশ একটু

গরম মেজাজ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কি বলতে চাইছিস তোরা।

আমরা···আমরা মানে—বলবার কিছু না পেয়ে আমরা তখন তোৎলামিতে পৌঁছে গেছি।

আমাদের হয়ে শিবুই কথাগুলো গরম মেজাজে জানিয়ে দিলে—তার মানে আমি ওই কাটা কার্ডের টুকরোটা লিখে আনতে দেরী করছিলাম বলতে চাস ?

না না—আমরা এবার অপ্রস্তুত হয়ে সব প্রতিবাদ জানালাম।

তা—মানে তা কেন বলব—মানে বলছিলাম কি···

ও সব বাজে কথা রাখ—শিবুর চড়া মেজাজ ঠাণ্ডা হল না—স্পষ্ট আমায় যে সন্দেহ করছিস তা সাহস করে স্বীকার কর না।

না, না, মানে,—আমরা অপ্রস্তুত হয়ে যা বলতে যাচ্ছিলাম শিবু তাতে বাধা দিয়ে বললে—শোন, মিছিমিছি কথা বাড়িয়ে ত লাভ নেই। সত্য কথাটা তাই আমাদের সকলেরই স্বীকার করা ভালো। আসল ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছে তা এই যে রহস্যটার ঠিকমত কোনো হদিস না পেয়ে আমরা সকলেই সকলকে মনে মনে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছি। আমি নিজে এখন তা অকপটে স্বীকার করছি যে আমি নিজেও তাই করে একদিন হাতেনাতে আসল আসামীকে ধরবার মতলবে ছিলাম। তার জন্যে বেশ একরকম ফাঁদও পেতেছি।

সত্যিই তুই আমাদেরই কাউকে সন্দেহ করেছিস্—অবিশ্বাস্য স্বরে জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না।

আর তাকে ধরবার জন্যে ফাঁদও পেতেছিস—নিজের কানকেই বিশ্বাস না করতে পেরে একটু রুক্ষ গলায় জিজ্ঞাসা করলাম—কাকে ?

কাকে জানতে চাইছিস্—শিবু বিনা দ্বিধায় জানাল—কাকে না করেছি সেইটিই বরং জিজ্ঞাসা কর। তবে সে প্রশ্নেরও সঠিক জবাব দিতে পারব না।

তার মানে ?—একটু ধমক দেবার ভঙ্গিতে বলবার চেষ্টা করলাম,—কি আবোল-তাবোল বকছিস্।

হ্যাঁ, শুনলে আবোল-তাবোলই মনে হয়—শিবু অকপটে স্বীকার করলে—কিন্তু কথাটা পুরোপুরি ঠিক। সন্দেহ যখন শুরু হয়েছে তখন এক এক করে কেউই বাদ পড়েনি।

কেউই বাদ পড়ে নি !—নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে না পেরে বললাম,—সন্দেহ করেছিস্ এক এক করে আমাদেরই সকলকে !

হ্যাঁ, তাই করেছি।—শিবু সোজাসুজি জানালে—আর তার মধ্যে প্রথম কাকে সন্দেহ করেছি শুনবি ?

এ ধরনের কথায় মেজাজ ঠিক রাখা যায় ? বেশ একটু কড়া গলাতেই বললাম—সেইটেই তো জানতে চাই।

বেশ, শোন তাহলে—শিবু যেন নিজের দায়টা কাটিয়ে নিয়ে বললে—প্রথম সন্দেহ করেছি আর কাউকে নয়, এই তোকেই !

আ- আ-আমাকে ! আমি তোতলা হয়ে কথাটা যখন জিজ্ঞাসা করতে পারলাম, ঘরেও অন্যদিকে তখন চাপা হাসির শব্দটা খুব অস্পষ্ট নয়।

সেটা গ্রাহ্য না করে তোৎলামিটা এবার কাটিয়ে উঠে প্রায় ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, প্রথম সন্দেহ করলি এই আ-মা-কেই। মানে আমি প্রথমে মৌ-কা-সা-বিস-এর ওই গোটা দু-তিন চালাকির খেল দেখিয়ে সে সব প্যাঁচের পুঁজি ফুরিয়ে যাবার পর এমনি করে সবাইকে টিটকিরি দিয়ে বাহাদুরি করছি !

হ্যাঁ,—আমার মেজাজের ঝাঁঝটা গ্রাহ্যই না করে শিবু সোজাসুজি এবার স্বীকার করলে—হ্যাঁ, প্রথমে তোর ওই বোকা বোকা ভাবগতিকটা হয়ত একরকম সেজে থাকা বলেই সন্দেহ হয়েছিল। তারপর অবশ্য···

শিবুকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে জ্বলন্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলাম—তারপর অবশ্য কি—?

তারপর—শিবু এবার একটু হেসেই বললে—বুঝলাম যে তোমায় সন্দেহ করাটা সম্পূর্ণ ভুল। মানে···

শেষ পর্যন্ত বুঝলে তাহলে সে কথা ? খুশি হয়ে শিবুকে একটু তারিফ জানাতে যাচ্ছিলাম ! কিন্তু তা আর হল না। শিবু তখন তার বক্তব্যটা শেষ করে বলছে—মানে তখন খেয়াল হয়েছে যে বোকা সাজাটা সহজ হলেও তোমার পক্ষে মৌ-কা-সা-বি-স-এর ওই সব প্যাঁচের একটা গল্প ফাঁদা তোমার কর্ম নয়। সে বুদ্ধি তোমার নেই।

এ অপমানের কি জবাব নেই ?

থাকলেও তখন তা ভেবে বার করতে না পেরে নীরবে তা হজম করে শিবুর কথাই শুনে যেতে হল।

শিবু তখন বলছে—তোমাকে বাতিল করে তখন গৌর-শিশিরের কথা ভাবছি। হ্যাঁ, ওদের দুজনের পক্ষেই এরকম একটা বাহাদুরি দেখানো অসম্ভব নয়, আর বিশেষ করে ওদের যা দস্তুর দুজনে সেইরকম জোট বেঁধে যদি কাজ করে।

শিবু একটু থেমে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে এবার বললে,—কিন্তু সেইটেই আর সম্ভব নয়।

সম্ভব নয় !—আমি গৌর আর শিশিরের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন ? তা সম্ভব নয় কেন ?

তাও বুঝিয়ে বলতে হবে ?—শিবু আমার মূঢ়তায় তার হতাশাটা গলার স্বরে বুঝিয়ে দিয়েই বললে—লীগ চ্যাম্পিয়ন-সিপ-এর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে না। এখন ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান জোট বাঁধবে কি ; মুখ দেখাদেখিও বন্ধ !

না, না, তা কেন—গৌর আর শিশির দুজনেই প্রতিবাদ করে জানালে—ও সব খেলাধুলোর ঝগড়া আমরা মাঠেই

রেখে আসি। ও ঝগড়া বাড়ি বয়ে আনব না কি ?

ঠিক, ঠিক, আমারই ভুল হয়েছে। শিবু নিজের ভুল স্বীকারের সঙ্গে মুখ টিপে একটু হেসে বললে, - কিন্তু আসামী-দের তালিকা থেকে একে একে সবাই বাদ যাবার পর পড়েছি ফাঁপরে। আমাদের চিঠির বাক্সের ও সব নাক-কান মলা চিঠি দিয়ে মজা করছে কে বা কারা ?

সত্যিই কি ব্যাপারটা তাহলে ভূতুড়ে কিছু ?

এ ব্যাপারে একমাত্র যিনি সব সন্দেহের বাইরে আছেন এ বিপাকে পড়ে এবার তাঁর শরণ নেবার কথা ভাবতে হচ্ছে। 'হ্যাঁ, টঙের ঘরে সেই তিনি। মৌ-কা-সা-বি-স-এর এ রহস্যের কোনো সমাধান যদি থাকে তাহলে একমাত্র তাঁর কাছেই তা পাওয়া সম্ভব। তাই তাঁর শরণই এবার নিতে হবে।

তা নিতে চাও না ও - একটু সন্দেহ প্রকাশ করতেই জানতে চাইছিলাম—কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি সন্দেহের বাইরে কেন মনে করছ ?

করছি,—শিবু একটু গম্ভীর হয়েই জবাব দিল গোড়ায় মৌ-কা-সা-বি-সি-এর চিঠিগুলো তাঁর নিজের হাতের লেখার নকল দেখে।

তাঁর নিজের হাতের নকল ! —শিশিরই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—সে লেখা যে নকল তা বুঝলে কি করে ?

বুঝলাম তাঁর হাতের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে,—শিবু ব্যাখ্যা করে এবার বোঝালে—ও'র হাতের লেখা আমাদের কাছে অতি সামান্যই আছে। একবার আমাদের এই বাহাত্তর নম্বর ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার হুমকি দিয়ে যখন খবরের কাগজের বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপন দেখে ভাড়ার আবেদনের চিঠি লিখে-ছিলেন বনোয়ারীকে দিয়ে ডাকে পাঠাবার জন্য, তখন সে সব চিঠি ডাকবাক্সের বদলে আমাদের কাছেই জমা করেছি। সেই চিঠির লেখার সঙ্গে মিলিয়ে বুঝলাম এ লেখা ঘনাদার। সেই নিজের লেখারই নকল।—নকল শুধু আমাদের ধোঁকা দেবার জন্য। এ ধোঁকা দেবার চালাকি কে বা কারা করছে তা বার করবার জন্য টঙের ঘরের তাঁরই শরণ নিতে হবে।

আরে মেঘ না চাইতেই জল !—গৌর টিপ্পুনি কাটলে—সিঁড়িতে তখন চটির আওয়াজ বোধহয় শোনা যাচ্ছে।

গৌর ভুল বলেনি। মিনিট কয়েক বাদে বিদ্যাসাগরী জোড়া চটির আওয়াজ নিচ থেকে ওপরে উঠে তখনকার আস্তানাঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে আবার আমাদের দরজায় ফিরেই বোধহয় কড়া ঠেলা দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আর দরকার হল না।

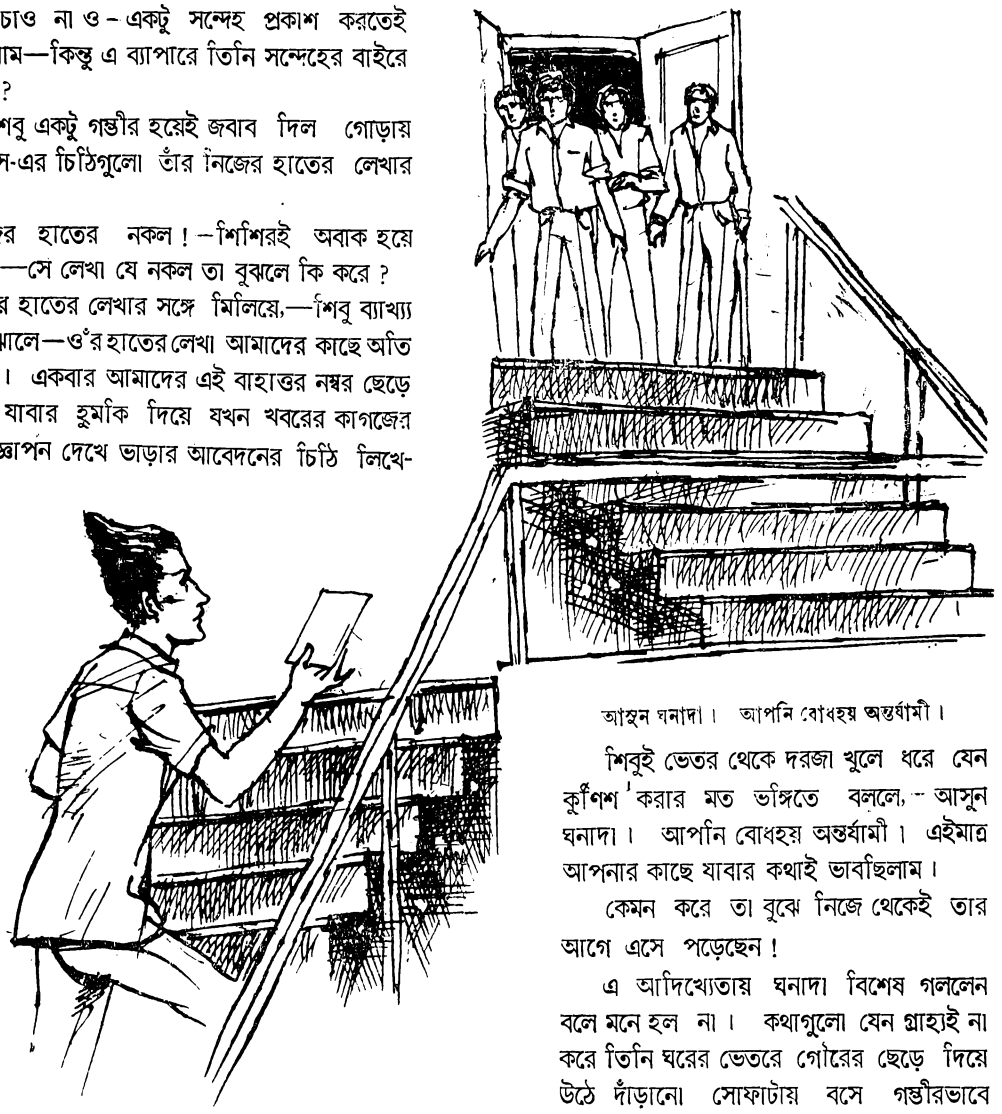

আসুন ঘনাদা। আপনি বোধহয় অন্তর্যামী।

শিবুই ভেতর থেকে দরজা খুলে ধরে যেন কুর্ণিশ করার মত ভঙ্গিতে বললে, -- আসুন ঘনাদা। আপনি বোধহয় অন্তর্যামী। এইমাত্র আপনার কাছে যাবার কথাই ভাবছিলাম।

কেমন করে তা বুঝে নিজে থেকেই তার আগে এসে পড়েছেন !

এ আদিখ্যেতায় ঘনাদা বিশেষ গললেন বলে মনে হল না। কথাগুলো যেন গ্রাহ্যই না করে তিনি ঘরের ভেতরে গৌরের ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ানো সোফাটায় বসে গম্ভীরভাবে

বললেন,—ব্যাপার কি বল ত, এমন ছুটির দিন বিকেলে তোমরা আড্ডাঘরের বদলে এখানে এসে জমা হয়েছ, আমার কাছেও যাবার কথা ভাবছিলে? কি হ'ল কি হঠাৎ এমন?

হঠাৎ নয় --শিবুই গলাটা ভারী করে জানালে,—ব্যাপারটা হয়েছে অনেকদিন। ছেলেখেলা বলে কিন্তু এখন আর উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। মীমাংসার জন্যে তাই আপনার শরণ নিতে যাচ্ছিলাম।

সে কথা ত অনেকবার শুনলাম,—ঘনাদা একটু অধৈর্যের সঙ্গে বললেন,—কিন্তু ব্যাপারটা হয়েছে কি?

একটু চুপ করে আমাদের সকলের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে ঘনাদা হঠাৎ যেন দিব্য-দৃষ্টি পেয়ে বললেন,—সেই তোমাদের মৌ-কা-সা-বি-স আবার খোঁচা দিয়েছে! চিঠি দিয়েছে কিছু আবার!

চিঠি দিয়েছে, আবার দেয় নি,—শিবু হেঁয়ালি করে জানাবার চেষ্টা করাতে তার ওপর বিরক্ত হয়ে ঘটনাটা যা দাঁড়িয়েছে ঘনাদাকে একটু বিস্তারিত করে জানালাম।

সেই সঙ্গে মৌ-কা-সা-বি-স-এর শেষ চিঠিগুলোও দেখাতে ভুললাম না।

ঘনাদা যেরকম গম্ভীর মুখে আমাদের পেশ করা কাগজ-পত্র প্রথমে দেখছিলেন শেষের দিকে হঠাৎ তা বদলে তাচ্ছিল্য ভরে হেসে ওঠাতে কিন্তু আমাদের অবাক হতে হল।

এই! এই তোমাদের সমস্যা!—ঘনাদা ওঁর কাছে জড় হওয়া কাগজের টুকরোগুলো সামনের টেবিলের ওপর নাড়া চাড়া করতে করতে বললেন, করে দেওয়া এ যদি রহস্য হয়, তাহলে তার সমাধান এইগুলোর মধ্যেই করে দেওয়া আছে। এই কাগজের টুকরোগুলোর মধ্যেই।

আমরা অবাক হলাম। সেই সঙ্গে ঘনাদা বোধহয় আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করছেন এই সন্দেহ করে একটু চুপ।

ক্ষোভটা গোপন না করে একটু তেতো গলাতেই জানতে চাইলাম,—সমাধানটা আছে বুঝলাম, কিন্তু সেটা কোন ভাষায় তা একটু জানাবেন? ভাষাটা বাংলা না এসপেরাণ্টো গোছের কিছু?

না, না ওসব কেন হবে!—ঘনাদা জড় করা কার্ডগুলোর একটা তুলে নিয়ে তার পেছনের সাদা পাতার সামনে যা লেখা আছে সেই কথাগুলোই নিজের পকেট থেকে একটা কলম বার করে লিখতে লিখতে বললেন, এই কার্ডের এক পিঠের লেখাটাই অন্য পিঠে লিখলাম। একটু মন দিয়ে পড়লে মানেটা বোঝা জলের মত সহজ হবে বলে মনে করি।

কথাটা শেষ করে নিজের হাতের দুপিঠে লেখা কার্ডটা অন্য কাগজগুলোর মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে হঠাৎ উঠে পড়ে দরজা দিয়ে ছাদের সিঁড়ির দিকেই পা বাড়াতে বাড়াতে যা বললেন তাও একটা ধাঁধা। বলে গেলেন—এবার লেখাটা পড়তে পারবে আশা করি। লেখা না পড়তে পারো কলম পড়লেই চলবে।

এ আবার কি আজগুবি কথা?

মনে হল ঘনাদার বিদ্যাসাগরী চটির শব্দ ন্যাড়া ছাদের সিঁড়িতে মিলিয়ে যাবার আগে তাঁকে মানেটা বোঝাবার জন্যে ধরে নিয়ে আসি।

কিন্তু সেটা আর পারলাম না। তার বদলে মৌ-কা-সা-বি-স-এর টুকরো কার্ডগুলোর ভেতর থেকে ঘনাদার উল্টো পিঠে লেখা কার্ডটা খুঁজে বার করে একটু জল দিয়ে পড়বার চেষ্টা করলাম!

কিন্তু তাতে লাভ কি হ'ল।

কার্ডটার এক পিঠে যা লেখা ছিল ঘনাদা অন্য পিঠে ঠিক তাই লিখেছেন।

মূল কার্ডটায় লেখা ছিল একেবারে সংক্ষিপ্ত দু টি মাত্র শব্দ—কার্ডের ঠিক মাঝখানে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা—'কে আমি'। কার্ডের অন্য পিঠে ঘনাদা আমাদের সামনে সেই কথাই লিখেছেন 'কে আমি'!

তাহলে?

নেহাৎ সস্তা ধাপ্পা বলে কাগজটা অন্য সবগুলোর সঙ্গে কাগজ ফেলার ঝুড়িতে ফেলতে গিয়ে হঠাৎ ঘনাদার শেষ কথাই মনে পড়ল।

কি বলে গেছেন ঘনাদা?

বলে গেছেন—লেখা না পড়তে পারো কলম পড়লেই চলবে।

ঠিক! ঠিক!

লেখা ক'টার মানে বুঝতে আর দেরী হল না।

এক এক করে অন্য কার্ডগুলোর লেখাগুলোও পড়ে দেখলাম। ঘনাদার কথাই ঠিক। লেখার কলমই লেখককে চিনিয়ে দিয়েছে।

কেমন সে কলম? এমন আজগুবি কিছু নয়। শুধু 'নিব' এ একটু দোষ আছে। ওপর দিকে কলমের টান দেবার সময় খুব মিহি, প্রায় অদৃশ্য কালির ছিটে কাগজের ওপর ছড়ায়।

এই সূক্ষ্ম ছিটে মৌ-কা-সা-বি-স-এর যত চিঠি আমরা পেয়েছি সবগুলিতেই একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়!

সেই ঘরে! তখনই সেই টঙের ঘরে ছুটলাম।

না, বিকেলের খাবারের ফরমাসগুলো গরম গরম এসে পৌঁছোবার জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষাই করলাম।

খাবার কি এল তার বর্ণনার বোধহয় দরকার নেই। শুধু স্পেশ্যাল আইটেমটার একটু বর্ণনা দিই। সেই এক বারকোশ প্রমাণ পূর্ণচাঁদের মাপের একটি নরম পাকের কাঁচাগোল্লা, শাদা জমির ওপর নীলচে লালচে ক্ষীরে বুটি তোলা অক্ষরে লেখা—মৌ-কা-সা-বি-স-এর ভাঙা কলম।

দুলালের®
তালমিছরির

নতুন অবদান

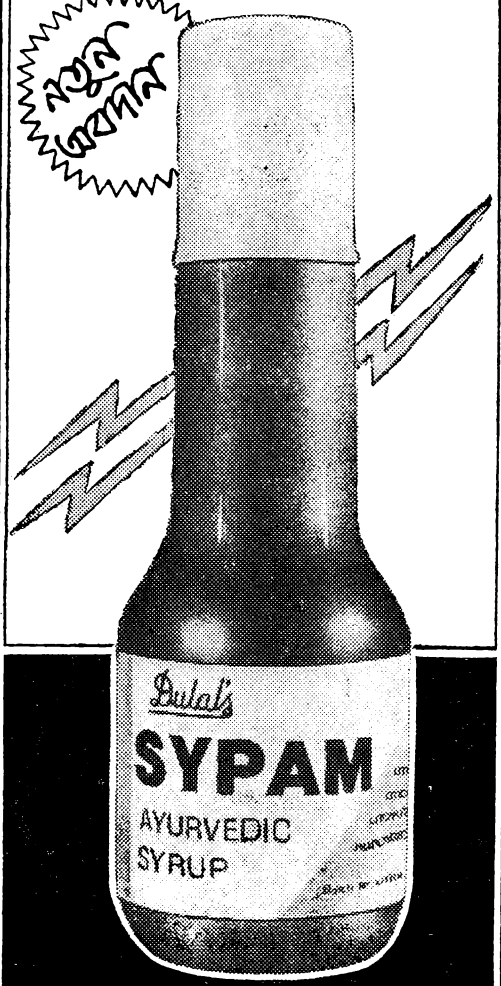

পুষ্টিতে ভরপুর
সর্দি কাশিতে নিশ্চিত আরাম

সিপাম
আয়ুর্বেদিক সিরাপ

মেসার্স ডি.সি. ভড়
8, দত্তপাড়া লেন, কলিকাতা-৬
ফোন ঃ ৩৩-৫৬৭৩

PRASA

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

লেখকদের প্রতি

- বিদ্যালয়পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী ও সর্বসাধারণের উপযোগী জনপ্রিয় বিজ্ঞানের রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হয়।
- পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয় অনুযায়ী শব্দসংখ্যা হওয়া প্রয়োজন।
- রচনার সঙ্গে উপযুক্ত ছবি থাকা প্রয়োজন।
- প্রকাশিত রচনার বিষয়ে সর্বপ্রকার দায়িত্ব লেখকের।
- অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না।
- এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে প্রেরিত রচনাটি অমনোনীত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

গ্রাহকদের জন্য

- কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য 4·00 টাকা। বারো মাসের বৈশাখ-চৈত্র গ্রাহক চাঁদা 40 00 টাকা। হাতে বই নিলে গ্রাহক চাঁদা 35·00 টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।
- গ্রাহকদের ডাকমাশুল লাগবে না। Under certificate of posting-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রি ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত 30 00 টাকা পাঠাতে হবে।
- M. O. বা Bank Draft KISHORE JNAN BIJNAN-এর নামে পাঠাতে হবে।

এজেন্টদের জন্য

- 10 কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা 25 টাকা।
- ভি. পি. বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হবে। ডাকমাশুল লাগবে না।
- এজেন্টদের অর্ডার অনুযায়ী সংখ্যাপিছু 1·00 টাকা করে অগ্রিম জমা রাখতে হবে।
- এলকাভিত্তিক এজেন্সীর জন্য সাক্ষাতে অথবা চিঠিতে যোগাযোগ করুন।

প্রচার সম্পাদক ঃ **কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান**
86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-9

উচ্চমাধ্যমিকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

উচ্চমাধ্যমিক রসায়ন—ডঃ রণজিৎ দাস
উচ্চমাধ্যমিক জীববিদ্যা—ডঃ সান্যাল, ডঃ চ্যাটার্জী, ডঃ দত্ত
উচ্চমাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান—ডঃ প্রতীপকুমার চৌধুরী, ডঃ নিতাই মুখার্জি
উচ্চমাধ্যমিক গণিত—ডঃ জ্ঞানেন্দ্রগোপাল চক্রবর্ত্তী, ডঃ প্রভাত রঞ্জন ঘোষ
ভাষাচর্চা ও সাহিত্যকথা (বাংলা দ্বিতীয় পত্র)—ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, ডঃ নির্মল কুমার দাস
Higher Secondary English Gram. & Comp.—Deb Kumar Chatterjee
Physics & Its Problems—Dr. B. K. Gupta
Physics Objectives—Dr. B. K. Gupta
H. S. Practical Chemistry—Dr. R. Das.
An Introduction to Chemistry—Dr. R. Das
An Introduction to Biology—Dr Sanyal, Dr. Chatterjee, Dr. De,

ওরিয়েণ্টাল বুক কোম্পানী
৫৬ সূর্যসেন স্ট্রিট, কলিকাতা-৯ (৩৫-৪৫৩৪)

শারদোৎসব, সাফ গেম্‌স্‌, বিশ্বকাপ, সোভিয়েত উৎসবকে
সফল করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

উৎসবমুখর কলকাতাকে
সাজিয়ে তুলতে তোমাদের
সহযোগিতাও আমাদের চাই

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ—কলিকাতা পৌরসংস্থা

"...হে বঙ্গের নবীন যুবক, তোমার দুর্ভাগ্য এইযে, তুমি আপনার সম্মুখে কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত পাও নাই। কিন্তু, যদি ইহাকে অপরাজিত চিত্তে নিজের সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করিতে পার, যদি বলিতে পার 'নিজের ক্ষেত্র আমি নিজেই প্রস্তুত করিয়া তুলিব,' তবেই তুমি ধন্য হইবে।"

বেকার যুবকদের অপূর্ব সুযোগ

আপনি কি নিজস্ব ক্ষুদ্র কুটীর শিল্প গড়ার কথা ভাবছেন? নন্দীর নির্ভরযোগ্য কয়েকটি বল প্রেস, পাওয়ার প্রেস, হাইড্রলিক প্রেস, মোজাইক টাইল তৈরীর মেশিন, চামড়ার ব্র্যাকেট মেশিন ইত্যাদি কিনে লিঙ্ক ক্লিপ, সুইচ বক্স, স্টীল ফার্ণিচার, হিন্‌জ টাওয়ার বোল্টস, অটোমোবাইল ও সাইকেল পার্টস, মোজাইক টাইলস জাতীয় নানা জিনিষ তৈরী করে মাসে ২০০০ টাকা উপার্জন করুন। মেশিন কেনার ক্ষেত্রে কোম্পানী সব রকম পরামর্শ দিয়ে থাকে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন।

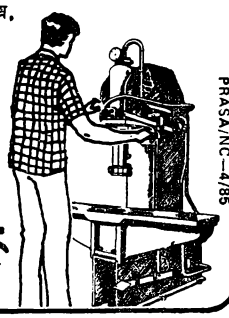

PRASA/NC—4/85

Nandy's®

নন্দী এ্যান্ড কোং

১২৫, বেলিলিয়াস রোড, হাওড়া
ফোন : ৬৯-২০৬১

Insist on Nandy's

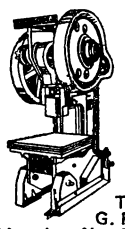

POWER PRESS

Hydraulic Press, Tile Press, Foot Press, G. P. Sheet Corrugating Machine, Nut & Bolt, Insulator Pin, 'J' & 'L' and Bamboo Hook, Dog Nails, Mosaic Tile, Steel Furniture & Shovel Making Plant and Machineries.

Manufacturers

NANDY & CO.

125, Belilious Road
Howrah-1 ● Phone : 69-2061

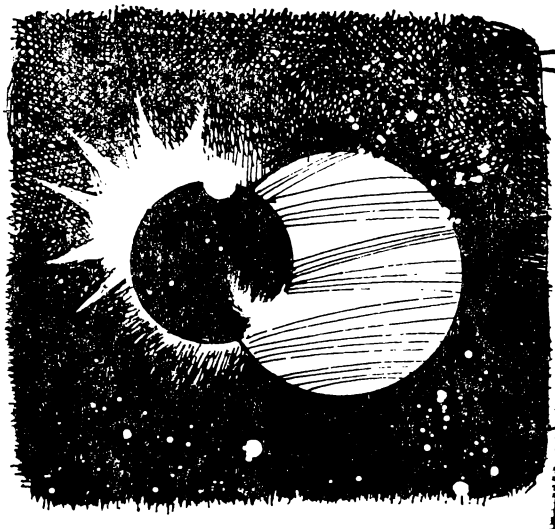

চকমকি মণি

লীলা মজুমদার

উত্তর কলকাতার একটা পুরনো পাড়ার ছাদের নতুন ফ্যাশানেব্‌ল্‌ ফ্ল্যাটে দেয়ালে গাঁথা যে লোহার সিন্দুকটে আছে, মধ্য-কলকাতার কোনো নামকরা দোকান থেকে সেটাকে ওভাবে নিলেমে কেনা ওদের ভুল হয়েছিল। তার কারণ ওর একমাত্র চাবিটাও সঙ্গে ঝোলানো ছিল এবং সব নিলামঘরের যেমন নিয়ম, বিক্রির আগের তিন দিন সেটা সম্ভাব্য ক্রেতাদের সুবিধার জন্য, দোকানে প্রকাশ্যভাবে সাজানো ছিল, যাতে যার ইচ্ছা সে এসে পরখ করে দেখে যেতে পারে। অবিশ্যি উপযুক্ত প্রহরীদের সমক্ষে। সেবার কিছু বেশি সংখ্যায় মূল্যবান আসবাবপত্র একসঙ্গে এসে পড়াতে কয়েকজন অস্থায়ী পাহারাদারের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। তাদের মধ্যে একটু তৎপর আর ধূর্ত কারো পক্ষে সকলের অলক্ষ্যে মোমের প্যাডে ঐ চাবির দুপিঠের ছাপ তুলে নেওয়া এমন কিছু শক্ত কাজ ছিল না।

দুঃখের বিষয় কারিগর যতই ওস্তাদ হক না কেন আর সত্যি কথা বলতে কি মিছিমিছি তো আর কানুকে মাছি-মাস্টার নাম দেয়নি লোকে। মাছির মতো খাড়া দেয়াল বেয়ে তরতর করে পাঁচ-ছয় তলা উঠে পড়া ওর কাছে কিছুই ছিল না। শেখাত না কাউকে। নাক সিঁটকে বলত, মাছিকে টিকটিকিকে ও-ভাবে উঠতেই বা শিখিয়েছে কে?' অনেকের ধারণা ছিল কানুর হাত-পায়ের তেলোর গড়ন অন্য রকম। আবার কেউ কেউ বলত লুকিয়ে লুকিয়ে ও নিশ্চয় হাতে পায়ে কিছু পরে নেয়। ঐ যে রেলগাড়িতে এক রকম তোয়ালে ঝুলোবার হুক বিক্রি করে, সেগুলো দেয়ালে বা দরজায় চেপে দিলে সেঁটে যায়। তাতে হাল্কা তোয়ালে গামছা বেশ ঝুলিয়ে রাখা যায়। কয়েক দিন পরে কে জানে কেন জিনিসটা আর কাজ করে না। যে কারণেই হক না কেন, মানুষমাত্রেই মাঝেসাঝে অপঘাতের বলি হতে পারে। এক্ষেত্রে কানু আপাতদৃষ্টিতে হাজার অলৌকিক ক্ষমতা ধরুক না কেন, তবু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আজ সন্ধ্যায় মাটি থেকে দশ বারো ফুট উঁচুতে থাকতেই কেমন করে তার হাত পা হড়কে, দেয়াল খামচাতে খামচাতে একেবারে নিচে পৌঁছে গেল। হয়তো কোথাও কিছু জখম হয়ে থাকবে, নিদেন হাড়গোড় ভেঙ্গে, কিম্বা সরে গিয়ে থাকতেও পারে, মোট কথা বাড়িটার রকের ওপর পড়েছে তো হাত পা এলিয়ে পড়েই রইল। মনে হল হাত পা যেন আর চলে না; ঐ রকম আধশোয়া ভাবে এলিয়ে আছে তো এলিয়েই আছে। নড়বার চড়বার ক্ষমতা নেই, কিছু ভাবনাচিন্তা করার শক্তি-টুকুও নেই। সুখের বিষয় শত্রুপক্ষের হাতে পড়লেও ক্ষতি নেই। মাছিমাস্টার অমন কাঁচা কাজ করে না। একটা হাতে বাঁধা মাদুলীর মধ্যে যা পোরা যায় না, তার বেশি কোনো হাতিয়ারও নেই। সেকালের পেশাদারদের মতো নেংটি পরে, তেল মেখে হড়হড়ে গা, চিমটি দিয়ে ধরা যায় না এমনি প্রায়—ন্যাড়া মাথা নিয়ে ঠিক যেন বিজ্ঞাপন দিতে দিতে কানু কাজে বেরোয় না। নীল সবু ঠ্যাং প্যান্টালুন

রবারের চপ্পল (সেটি অবিশ্যি খুলে রাখা হয়), সামনে পেছনে সমান লম্বা চুল, যে-কোনো ভদ্রলোকের ছেলের মতো চেহারা। সে দিক দিয়ে কোনো ভয় নেই।

একই ভাবে পড়ে থেকে থেকে কেমন ঢুল আসছিল আর সঙ্গে কানে একটা একটানা গুনগুন শব্দও পৌঁছচ্ছিল। হঠাৎ কানুর চোখের ঘুম ছুটে গেল ; তার সম্বিৎ ফিরে এল ; সে চমকে উঠে গেল। অনেক কাল পরে তার গলার ধারে কোতরঙ্গে কাটানো ছোটবেলাকার কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার কারণটাও মনে পড়ে গেল। স্নানের ঘাটের পাশে সেখানে খানিকটা পোড়ো জমি ছিল, তার পেছনে পুরনো একতলা বাড়িতে একজন স্থানীয় জমিদার অনেক দিন আগে একটা পাঠশালা করে দিয়েছিলেন। সেই পাঠশালাতে কানু পড়ত। পড়ত মানে যেত আসত, বাইরের ফাটা চাতালে অন্যান্য বিখ্যাত লোকদের মতো অনেক সময় হাঁটু গেড়ে বসেও থাকত ; পকেট থেকে গুলতি বের করে অংক কষতে ব্যস্ত বন্ধুদের কাগজের গুলি কিম্বা নুড়ি মারত। ক্লাসে অংক স্যার হয় দেখেও দেখতেন না, নয়তো এতই অন্যমনস্ক যে কিছুই লক্ষ্য করতেন না। তাঁর শেষটাও ভারি অদ্ভুত। রহস্যজনকভাবে হঠাৎ একদিন অদৃশ্যও হয়ে গেলেন।

বিশেষ করে সেই দিনের কথাই হয়তো আজ কুড়ি বছর পরে কানুর মনে পড়ল। তার আগের দিন গঙ্গায় বড় বান ডেকেছিল ; সে সময় এদিককার ঘাটটাট সব ডুবে যায় ; পরে চাতালে নতুন নতুন ফাটল দেখা যায়। তা সেদিনও কানু ক্লাসে অংকের খাতা না আনার জন্য চাতালে হাঁটু গাড়ল। কত করে অংক স্যারকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে খাতাটা খুঁজেই পেল না, তা আনবে ! অন্যমনস্ক ভাবে ভ্রূকুটি করে স্যার চাতাল দেখিয়ে দিলেন।

রোদের তেজ ছিল না, হাঁটু গাড়তে ভালোই লাগছিল। হঠাৎ চোখ পড়ল চাতালে একটা নতুন ফাটল ধরেছে আর তার ভিতরে একটা কোনো সাপের কি অন্য জানোয়ারের চোখ, কিম্বা কোনো মণিমুক্তও হতে পারে, কেমন যেন সবুজ আলো ছিটোচ্ছে। তার থেকে কানু চোখ ফেরাতে পারছিল না ; অথচ দুচোখ ঝলসে যাচ্ছিল, মাথা ঝিমঝিম করছিল, মনে হচ্ছিল এক্ষুনি পড়ে যাবে। বোধহয় কেমন একটা ঘোর লেগে গেছিল, তারি মধ্যে টের পেল অংক স্যার কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন। আঙুল দিয়ে একবার সেই সবুজ আলোটার দিকে দেখিয়ে দিয়েছিল কানু, তারপর আর কিচ্ছু মনে নেই। অংক স্যারও হাঁকডাক করে সবাইকে ডেকে দিয়ে, সেই যে, 'ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি', বলে চলে গেলেন তারপর বেমালুম অদর্শন হলেন। ডাক্তার এসে যখন ওকে

হাত পা এলিয়ে পড়েই রইল.....

দেখেছিলেন কানুকে ততক্ষণে ক্লাসঘরের বেঞ্চিতে শোয়ানো হয়েছে। মুখে মাথায় জলের ছিটে দিতেই সে সুস্থ হয়েও উঠেছিল। কিন্তু মাস্টাররা সকলেই অংকস্যারের খুব নিন্দা করেছিলেন, তা ছেলেরা একটু দুরন্তপনা করেই থাকে, তাই বলে ঠা-ঠা রোদে গরম সানের ওপর হাঁটু গেড়ে বসিয়ে রাখা! বিশেষ করে এই ছেলে যখন হাইস্কুলের সমস্কিত মাস্টারের নিজের কে হয়! এ-সব কথা যখন হচ্ছিল, কানু মট্‌কা মেরে পড়েছিল। তাকে ক-দিনের ছুটি দেওয়া হয়েছিল; তারি মধ্যে সে একবার চাতালের সেই নতুন ফাটলটা দেখে এসেছিল। সেখানে কিচ্ছু চকচক করছে না, ব্যাঙ ট্যাঙের চোখই হবেও বা। কিন্তু সেই ইস্তক অংক স্যারকে আর কেউ দেখেনি।

দেখেনি তো দেখেইনি। কাগজে নিখোঁজ বলে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল; পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল; তারা কোতরঙ্গে আর চারপাশের সব ছোট শহর-গাঁয়ে যথাসাধ্য তদন্তও করেছিল। কিন্তু যে স্বেচ্ছায় নিশ্চিহ্ন হয়, তাকে কি কখনো পাওয়া যায়? নিঃসন্দেহে তিনি স্বেচ্ছায়ই গিয়েছেন, কারণ মেস্‌বাড়ির পাওনা চুকিয়ে ছোট্ট সুটকেস্ আর বিছানা বেঁধে, পাশের অমিয়-ক্যাবিনে এক টাকা দিয়ে পেট ভরে ভাত রুটি আর ঘ্যাঁট খেয়ে, বাস স্টপের দিকে হাঁটা দিতে তাঁকে নাকি দেখা গেছিল। তবে খবরটা ভুলও হতে পারে, কারণ একেকজন একেকটা বাস-স্টপের কথা বলেছিল। নিতান্ত অস্থায়ী ভাবে কাজে এসেছিলেন; ওঁর নামে কোনো মামলা বা অভিযোগও ছিল না; কোনো পাওনাদারও হামলা দেয়নি। কাজেই দুদিনে সবাই তাঁকে বেমালুম ভুলে গেল। কানুও এর পরেও এত মাস্টারের কাছে এত বিচিত্র সাজা পেয়েছিল, যে মনের মধ্যে ক্রমে তাঁর চেহারাটাও ফিকে হয়ে গেছিল।

আজ কেন জানি চোখ বুজে পড়ে থাকতে থাকতে সেই চেহারাটা স্পষ্ট মনে পড়ল। শাদা পাঞ্জাবী, খাটো থান ধুতি পরনে, পায়ে দড়ির তলা কাপড়ের চটি। রোগা, লম্বা অত্যন্ত ফরশা আর কপালের ঠিক মধ্যিখানে বেশ বড় এবং লম্বাটে একটা আঁচিল না জরুল। আসলে অতি ভালো মানুষ, তা কানুও তো কম জ্বালায়নি ওঁকে। সেজন্য হঠাৎ ভারি লজ্জা হল। পিসেমশায়ের সুপারিশে হাই-স্কুলের ছয় ক্লাসে ভরতি হয়েছিল। কোনো মতে টেনেটুনে সাত আর আটও ম্যানেজ করেছিল। কিন্তু ঐ অবধি। আট থেকে নয় তিনবার চেষ্টা করেও যখন হল না, তখন ওর পিসেমশাই রেগেমেগে কান ধরে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। মা-বাপ ছিল না।

সেই ইস্তক চরে খেয়েছে কানু। তবে মন্দ কাটেনি গত কুড়িটা বছর। প্রথমে পালোয়ানজির আখড়ায়, সাগরেদি; তারপর পালোয়ানজির ফ্রেণ্ড ওস্তাদজি তার লোহার কারখানায় ওকে চাকরি দিল। লোহার আলমারি, যে-কোনো সেফ্‌টি তালা-লাগানো সিন্দুক, বাক্স, সেফ্ ওর হাতে পাঁচ মিনিটে ম্যাজিকের মতো নিঃশব্দে খুলে যেত। শেষটা একদিন ওস্তাদজি উপ্টে ওর পায়ে গড় করে একশোটি টাকা প্রণামী দিয়ে বলল 'আমাদের পেশায় পরস্পরের কাছে মিথ্যা বলতে নেই। তোমাকে কাছে রাখতে আমার ভয় হয়। তোমার জয়জয়ন্তী হক। তবে আমার কাছ থেকে যতটা দূরে সম্ভব থাকবে। সে-ও আজ বারো বছর হল।

মনে মনে কানুও তাই চাইছিল। সে বড়ই উচ্চাভিলাষী। নিজের চেষ্টায় খাসা প্রাইভেট প্র্যাকটিস্ গড়ে তুলেছে। গোয়েন্দা বিভাগে তার নাম মাছি-মাস্টার, মাছির মতো সে নাকি খাড়া দেয়াল বেয়ে ওঠা নামা করে, কোনো চিহ্ন রেখে যায় না, এক যদি লক্ষপতির হাহাকারকে চিহ্ন বলে ধরা যায়। গেরস্ত বাড়ির আর খেটে খাওয়াদের দিকে তাকায় না সে। কেউ তাকে দেখেনি, চেনে না, নাম অবধি শোনেনি। যখন লোকে তার আগমন টের পায়, তার অনেক আগেই, সে নিশ্চিহ্ন, নো-পাত্তা এবং সুদূরে। পার্টনার না থাকাতে, নিরাপত্তা ও মানসিক শান্তিও বজায় থাকে। আর্থিক সুবিধাও আছে।

ই কি জ্বালা! অকেজো অপারগ হয়ে অন্য লোকের রকে শুয়ে শুয়েই বা এতকাল পরে এত কথা মনে পড়ছে কেন? এক রকম বলা যায় তার গোটা জীবন কথা। তেমন কোনো উদ্বেগও হচ্ছিল না। এদিকে তো তার সর্বনাশ হতে চলেছে। মাছি মাস্টার হতে হলে—তা নাই বা কেউ তাকে চিনল—রবারের মতো হাত-পা আর মাদুলীতে পোরা সূক্ষ্ম জিনিসগুলোর সদ্ব্যবহার করার ক্ষিপ্রতা চাই হাড়গোড় জোড়া লাগলেও, সে সব যে আর সম্ভব নয়, সে বুদ্ধি কানুর ছিল।

হঠাৎ চমকে চোখ খুলে চেয়ে ভাবে 'তবে কি জাগিনি? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি আর চাঁদ-ডোবার পরেও উত্তর কলকাতার এই অন্ধকার গলিতে এত পস্ট দেখছি কি করে যে সামনে অংক স্যার দাঁড়িয়ে আছেন? কতকাল কারো পায়ের ধুলো নেয়নি কানু, এখন কেন জানি ইচ্ছে হল একটা প্রণাম করে; কিন্তু শরীর যে নড়ে না! অংক স্যার বললেন, 'হয়েছে, হয়েছে, ইচ্ছেই হল সব, ইচ্ছে করাও যা, কাজ করাও তা। এখন চুপ করে শুয়ে থাক। আমি এক্ষুনি আমার লোক নিয়ে আসছি।' এই বলে পাশের গলিতে ঢুকে গেলেন।

কানুর মনে হল সঙ্গে সঙ্গে গুনগুন শব্দটাও থেমে গেল। তবে ওটা ওর নিজের মাথা ঘোরার শব্দও হতে পারে, যদিও কান বোঁ বোঁ করার মতো নয়। হঠাৎ মনে হল, তবে কি ওটা অংক স্যারের মাথা ঘোরার শব্দ? কিন্তু পল কানু, তাতে ওঁর মাথা ঘুরবে কেন? কোনো কারখানায় মেশিনের চাকা ঘোরার শব্দও ঐ রকম। অংক স্যার কি তা হলে সত্যি মানুষ নন? বৈজ্ঞানিকদের তৈরি একটা যন্ত্র মানুষ,

ঐ সবুজ আলোর জন্যেই কি···

ঐ যে কি যেন বলে, কাগজে পড়ে ছিল একবার। এই সময় আবার ঘুম পেতে লাগল, তারি মধ্যে কানু টের পেল খুব ষণ্ডা কারা ওকে তুলে কোল পাঁজা করে, পাশের গলিটা দিয়ে নিয়ে চলল। ঘুমের ঘোরে মনে হল কানে আবার গুনগুন শব্দটা আসছে। চোখের পাতায় যেন পাঁচ কিলো ওজন। অনেক কষ্টে চোখ একটু খুলে মনে হল ওদের সঙ্গে সঙ্গে অংক স্যারও চলেছেন আর তাঁর কপালের আঁচিল থেকে সত্যি একটা স্নিগ্ধ সবুজ আলো বেরুচ্ছে। ওটা কি তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গাড়ির হেডলাইটের মতো, যার সাহায্যে নিজের পথ দেখে চলা যায়? নাকি সার্চ লাইটের মতো, যা দিয়ে অন্যের মনের ভিতরটা দেখা যায়। অংক স্যার যাই হন, তাঁর চেলা হতে কানুর আপত্তি নেই। এখন এই হাড়গোড়ের যন্ত্রণাগুলো গেলে বাঁচা যায়। তার পর আর কিছু মনে নেই।

অনেক দিন লেগেছিল কানুর সেরে উঠতে, হয়তো মাস খানেক কি তারো বেশি। ততদিনে শীত পড়ে এসেছিল। চোখের পাতায় উসুম উসুম গরম লাগাতে চেয়ে দেখে দূরের নীল পাহাড়ের খানিকটা উপর থেকে সূর্য. কেমন মিষ্টি রোদ ছড়াচ্ছে। কিন্তু এ সে কোথায় এসেছে? এ তো তার চিরচেনা গঙ্গানদীর তীর ভূমি নয়। বুক ভরে বাতাস নিল কানু, মনে হল প্রাণটা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

শরীরে মনে কেমন একটা আরাম লাগছিল। পাহাড়ে জায়গা হলেও নিশ্চয় খুব উঁচু নয়, কই পাহাড়ের মাথায় তো বরফ নেই। পায়ের উপর একটা নরম আলোয়ান পাতা। মনে হচ্ছিল এইভাবে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যায়। মাছি-মাস্টারের কথা ভেবে হাসি পেল। তার সঙ্গে কানু সোমের কি? অনেক দিন পরে মনে পড়েছিল ওর নিজের নাম কানাইলাল সোম। দূরে পাহাড়ের দিকে চেয়ে ভাবছিল এতদিনে নিশ্চয় ঐ পাঁচতলা বাড়ির মালিকদের বে-আইনী রোজগারের জমানো ঐশ্বর্য কোনো নিষিদ্ধ উপায়ে কোনো নিরাপদ জায়গায় পাচার করা হয়ে গেছে।

কিন্তু তার সঙ্গে কানুর কি? সে যে উপায়ে ওদের পাপের ভার লঘু করার চেষ্টা করেছিল সেটাকেও খুব সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত কিম্বা আইন সঙ্গত বলা যায় না। তার যে কোনো পরিণামই হক তাতে কানুর কিছু বলার নেই। তার কিনা লোকগুলো কি ঐ ভাবেই জীবন কাটাবে? ওদের কি ঐ যে কি বলে-হ্যাঁ বিবেক—বলে কিছু নেই? পরে কষ্ট পাবে না তো? এই সব ভাবতে ভাবতে আবার ঘুম পেয়ে গেল কানুর। তারি মধ্যে একবার মনে হল ওরা কি খুব সুখী? একটু হাসিও পেল, ও নিজেও তো এদ্দিন দিব্যি সুখেই ছিল, এত কথা কখনো মনে আসে নি। তারপর সত্যি করে ঘুমিয়েই পড়ে থাকবে।

এক সময় চোখ খুলে দেখে সে তখনো সেই ছোট ঘরে আরামে শুয়ে আছে। কোথাও একটা টিমটিমে সবুজ বাল্ব জ্বলছে। তার আলোতে বুঝল অংক স্যার পাশে বসে! সবুজ আলোটা সত্যি সত্যি তাঁর কপালের আঁচিল থেকেই বেরুচ্ছে। পরম নিশ্চিন্তে আবার চোখ বুজে, নিশ্চিন্ত গলায় কানু বলল, এতক্ষণে বুঝেছি। আমিই বদলে গেছি। ঐ সবুজ আলোর জন্যেই কি, দাদা? আপনি কি জাদুকর?

অংক স্যার হেসে ফেললেন, 'না, না, আমি বিজ্ঞানের একজন সামান্য সেবকমাত্র। অল্প স্বল্প গবেষণা করি। জাদু বলে কিছু নেই; লোকে যা বুঝে উঠতে পারে না বলে জাদু। কিন্তু আসলে সব আশ্চর্য ব্যাপারের মূলেই আছে হয় বিজ্ঞান, নয় তো লোক ঠকিয়ে পয়সা আদায় করবার জন্য সাজানো খেলা। যারা সৎ লোক, তারা বলেই দেয় এ সব হল গিয়ে ধাঁধার খেলা বা হাত সাফাই আর যারা ঠগ, তারা বলে এসব জাদুবলে করি, আমরা জাদুকর।

তুমি যদি সব জেনেশুনে আমার ছাত্র হও, আমি খুশি হব। আমি যা খুঁজছিলাম কিন্তু পাচ্ছিলাম না, তুমি তা পাইয়ে দিয়েছিলে মনে আছে। তাই আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আর যদি পুরনো জীবনে ফিরে যেতে চাও, তোমার মাদুলীটা যত্ন করে রেখে দিয়েছি, সেটি ফিরিয়ে দেব আর তোমাকেও ছুটি দেব, তবে বড় দুঃখের সঙ্গে। ও—ও একটা ব্যামো। রেডিয়াম দিয়ে ক্যান্সারের চিকিৎসা হয়। নানান প্রাকৃতিক জিনিস দিয়ে, বশীকরণ দিয়ে পাগলামির চিকিৎসা হয়। তোমার ঐ দুষ্কর্ম করার প্রবৃত্তিও তেমনি একটা ব্যামো। ওর-ও ওষুধ খোঁজা হচ্ছে। তোমার খুঁজে দেওয়া মণিটার সাহায্যে তোমার মগজ থেকে উদ্ধার করে তোমার

সারা জীবনের ভাবনা চিন্তার ছাপ আমি জেনেছি। মনে হয় সে ব্যামোর কারণ দূর হয়েছে, রোগও সেরে গেছে। আমার কিছু বিশ্বাসী সাহায্যকারী দরকার। তুমি এলে তো কথাই নেই।'

আহ্লাদে গলে গিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে কানু বলল, 'আমি যে আকাট মুখ্যু, আমার 32 বছর বয়স। মাছিগিরি ছাড়া কিছু জানি না কিন্তু বুঝতে পারছি সে-ও আর চলবে না। হ্যাঁ, আর কিছু টাকা এক জায়গায় পোঁতা আছে। তবে তার এক পয়সাও সৎভাবে রোজগার হয়নি, ভাবলাম যদি আপনার গবেষণার কাজে লাগে তাহলে আমি কৃতার্থ হই। কিন্তু পাপের টাকা কি আপনারা নেবেন?' অংক স্যার বললেন, 'টাকার আবার পাপ পুণ্য কি রে? অসৎ রোজগারের টাকা অসৎ মালিককে সৎকর্মে লাগাতে হয়। তোর ঐ পাঁচতলা বাড়ির অসৎ মালিক তো তার বাড়িটা আর পাঁচতলার ঘরের সিন্ধুক ভরা টাকা সব আমাদের দান করেছে। ওখানেই আমাদের বিজ্ঞান গবেষণাগার হবে। তাই তো তোর মাথায় সবুজ আলো ফেলে দেয়াল থেকে পেড়ে আনলাম।

কানু বলল, 'পেড়ে আনলেন দাদা? নাকি আছড়ে ফেললেন, যাতে আমায় সুদ্ধু চিকিচ্ছে করতে পারেন। ঐ সবুজ আলোতে কি তা বললেই মনে শান্তি পাই।

অংক স্যার বললেন, আজকাল সিলিকন বলে একটা আশ্চর্য যৌগিক পদার্থ বিজ্ঞানের অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। আগে এর বিষয় প্রায় কোনো বৈজ্ঞানিকই জানত না, তবে আমার ঠাকুরদা স্ফটিক ইত্যাদি সাহায্যে ঐ চকমকিটি তৈরি করেছিলেন; ঐখানে কোতরঙ্গে আমাদের বাড়ি ছিল। 1897 সালের বড় ভূমিকম্পে ভেঙ্গে পড়ে। ঠাকুরদা পরিবারে কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে ছিলেন। কিন্তু তাঁর গবেষণাগারটি খুঁড়েও বের করা যায়নি। এই মণিটি তাঁর তৈরি।

আগে আমার কপালে সত্যি একটা লম্বা আচিল ছিল। ওটিকে অস্ত্র করে তুলিয়ে ফেলেছিলাম। তারপর থেকে ঐ রকম একটা ঢাকনিওয়ালা কৌটোতে মণিটা রাখি। দরকারের সময় কপালে বেঁধে নেই। ঢাকনি ফাঁক করলেই আলো বেরোয়। মস্তিষ্কের ওপর ঐ আলোর কাজ। তুমি ঐ বাড়িতে যাবার আগে মালিকের মাথার গুরুতর রোগ হয়ে ছিল, আমি তার চিকিৎসা করেছিলাম, ঐ মণির সাহায্যে। বলা বাহুল্য সেও একেবারে বদলে গেছে। ঐ বাড়ি ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, সব দান করেছে, কে জানে চোরা চালানিও হয় তো তুলে দিয়েছে। এবার বল্ দুপুরে কি খাবি?'

কানু বলল, 'নলেন গুড় দিয়ে আস্কে পিঠে আর কাউনের চালের পায়েস।'

বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম

96 চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা 71

(ফোন : 44-1554)

পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম এই প্ল্যানেটেরিয়ামটির পঁচিশ বছর পূর্ণ হল।

এই সময়ের মধ্যে নানা চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রায় দেড় কোটি জিজ্ঞাসু মানুষকে মহাকাশ-সংক্রান্ত বহু তথ্য পরিবেশন করেছে।

এখন চলছে তিনটি অনুষ্ঠান : (1) তারকা, তারকাগুচ্ছ ও নীহারিকা, (2) রাশি ও নক্ষত্র এবং (3) আজ রাত্রের কলকাতার আকাশ।

বাংলা, হিন্দি বা ইংরেজিতে ভাষ্যসহ প্রতি রবিবার দশটি এবং অন্যান্য দিনে সাতটি অনুষ্ঠান হয়।

পেট লাইব্রেরী

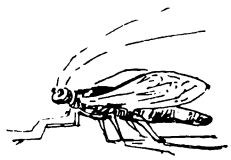

নারায়ণ সান্যাল

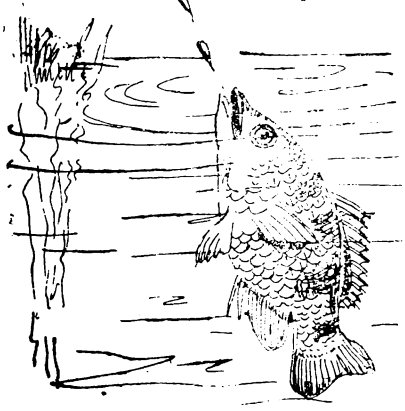

নাতনি অন্তরার তত্ত্বাবধানে চুরাশি সালের কয়েক মাস আমি যে সানফ্রান্সিস্কোর শহরতলী ওয়ালনাট-ক্রীক্-এ কাটিয়ে এসেছি সে-কথা গতবারের পূজা-সংখ্যাতেই কবুল করেছি। অন্তরার বয়স ছিল ছয়, আমারও তাই—তবে ছয়ের পরে আমার বেলা একটা ফালতু 'শূন্য' আছে। দুই সমবয়সী বন্ধু মিলে আমরা দাদু-নাতনি প্রায়ই এখানে-ওখানে বেড়াতে যেতুম। বাইসাইকেলে চেপে। বয়সের বেলা আমার যেমন ছিল একটা বাড়তি শূন্য, সাইকেলের বেলা তেমনি অন্তরার ছিল একটা বাড়তি চাকা।

একদিন বিকালে অন্তরা বললে, চল দাদু, আজ পেট-লাইব্রেরীতে যাই।

Book Library চিনি। সেখানে হামে-হাল আমাকে যেতে হয়, বই লেখার ব্যাপারে। কিন্তু 'পেট-লাইব্রেরী' আবার কী? সেকথা স্বীকার করলে বান্ধবীর কাছে বোকা বনতে হয়। ভাবলুম, 'পেট-লাইব্রেরী' বুঝি বই লাইব্রেরীর এক মার্কিন সংস্করণ, যেখানে পেট-পূজার আয়োজন। থরে থরে সাজানো সুখাদ্য! আমি গম্ভীরভাবে বলি, বেশ তো, চল! কদ্দূর?

—এই তো কাছেই। লার্কি-পার্ক-এর ওদিকে।

ওয়ালনাট-ক্রীকে আমরা যে বাড়িটায় থাকতুম তার পিছনেই মস্ত বড় লার্কি পার্ক। মাপে আমাদের দেশপ্রিয় পার্কের মতো। তার একপ্রান্তে একটা সুইমিং পুল, নানান খেলার সরঞ্জাম। তারই অপরপ্রান্তে আছে একটা বাড়ি। তার নাম ঃ পেট-লাইব্রেরী।

সেখানে পৌঁছে বোঝা গেল, নামটা বাঙলা 'পেট' নয়, ইংরেজী ঃ **Pet**!

এ লাইব্রেরীতে বই থাকে না। থাকে হরেক রকম জীব-জন্তু, পশুপাখি, পোকামাকড়! শুধু ছোটরাই তার সভ্য-সভ্যা হতে পারে। ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত। তবে ছোটদের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে তার অভিভাবককে লাইব্রেরীতে আসতে হয়।

ছোট ছোট খাঁচায়, দাঁড়ে, অ্যাকোয়ারিয়ামে হরেক রকম না-মানুষ। খুদে সভ্য বা সভ্যা ঘুরে ঘুরে খাঁচাগুলি দেখে। ওপন-লাইব্রেরীর বই-র‍্যাকে আমরা যেমন বই দেখি। খাঁচার পাশেই বড় বড় হরফে এবং সহজ ইংরেজীতে ঐ না-মানুষটির পরিচয় লেখা। তথ্য ও তত্ত্ব। সচিত্র বিবরণ। মোদ্দা কথাগুলো। বাচ্চারা তা পড়ে, বিচার করে, শেষমেশ যে-কোন একটি পছন্দ করে। ইস্যু-কাউন্টারে এসে তা জানায়। তখন সেই খুদে মেম্বারকে আঁকাবাঁকা হরফে রেজিস্টারে সই দিতে হয়। গার্জেন সেটাকে কাউন্টারসাইন করেন। তারপর ছোট্ট একটি আধারে সেই বিশেষ না-মানুষটিকে 'ডেলিভারি' দেওয়া হয়। ঐ সঙ্গে তাকে দেওয়া হয় একটি রঙিন ফোল্ডার। তাতে ঐ জীবটির বিষয়ে বিস্তারিত সচিত্র বিবরণ লেখা। কোথায় তাকে পাওয়া যায়, তার বর্গ, গোত্র, প্রজাতির নাম—অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পরিচয়; তার কী বৈশিষ্ট্য, কী তার জীবনযাত্রার প্রণালী। ঐ সঙ্গে আরও লেখা থাকে সে কী খাবে, দৈনিক কতটা খাবে, কী-ভাবে তার খাঁচা সাফা রাখতে

হবে, স্নান করাতে হবে কি না, ইত্যাদি। কোন কোন জীবের খাবার বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে নগদমূল্যে সাতদিনের মতো খাবার কিনে নিয়ে যেতে হয়। হ্যাঁ, সাতদিন! কারণ সাতদিন পরে ঐ না-মানুষটিকে ফেরত দিয়ে অন্য কোন জীবকে 'ইস্যু' করাতে হবে। নতুন না-মানুষ নাও বা না নাও, সাতদিনের মাথায় ওকে ফেরত দিতে হবেই!

আমাদের সামনেই একটি মার্কিন ভদ্রমহিলা ঐ গ্রন্থাগারিককে—না, 'গ্রন্থাগারিক' শব্দটা ভুল প্রয়োগ, তাঁকে 'জীবাগারিক' বলা উচিত—বললেন, এই ক্ষুদে কচ্ছপটাকে অনুগ্রহ করে 'রি-ইস্যু' করে দিন।

জীবাগারিক জানতে চাইলেন, কেন বলুন তো?

—আমার খোকন ওটার প্রেমে পড়ে গেছে। আরও সাতদিন ওটাকে বাড়িতে রাখতে চায়।

জীবাগারিক রাজী হলেন না। বললেন, না, তার নিয়ম নেই। ওকে ফেরত দিয়ে নতুন কোনও প্রাণীকে নিয়ে যেতে হবে।

ভদ্রমহিলা বললেন, কী আশ্চর্য! আমি তো সাতদিনের মধ্যেই এটাকে রিটার্ন করছি। আবার একেই যদি 'ইস্যু' করি, তাহলে আপনার আপত্তি কীসের?

—কিন্তু কেন?

— ঐ তো বললাম, খোকন তাই চায়।

জীবাগারিক বললেন, সে-ক্ষেত্রে আমি ঠিকানা লিখে দিচ্ছি, যে দোকানে ঐ জাতির কচ্ছপ কিনতে পাবেন। সেটাকে কিনে এনে পুষুন। লাইব্রেরীর কোনও না-মানুষকে একই মেম্বার দু-বার ইস্যু করতে পারবে না। এটাই কানুন।

ভদ্রমহিলা বেজার হলেন। কচ্ছপটাকে ফেরত দিলেন। আর কোন না-মানুষ না নিয়েই রাগ করে চলে গেলেন।

আমি তারপর ঐ জীবাগারিকের সঙ্গে আলাপ জমাই। শুনলাম, তিনি এ প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কর্মী নন। কলেজের ছাত্রী। জীববিজ্ঞান-এর ছাত্রী। বিকালে এখানে সবেতন পার্ট-টাইম চাকরি করেন। আমি জানতে চাইলুম, ঐ আইন করার উদ্দেশ্যটা কী?

উনি বুঝিয়ে বললেন, আমাদের উদ্দেশ্য মার্কিন শিশুরা না-মানুষপ্রেমী হয়ে উঠুক। নিজের পোষা জন্তুকে কে না ভালবাসে? আমরা চাই, ভবিষ্যৎ পৃথিবী ব্যাপকভাবে না-মানুষদরদী হোক। তাই প্রতি সপ্তাহে নতুন-নতুন জীবজন্তুর সঙ্গে ছোটদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য এই 'পেট-লাইব্রেরী'র আয়োজন।

অন্তরাকে নিয়ে প্রথমে গোটা জীবাগারটি ঘুরে দেখা গেল। শেষে আমি বলি, রিন্টি, বল কী নিয়ে যাওয়া যায় বাড়িতে?

ও আমাকে ধমক দেয়, তোমার সব কিছুতেই তাড়াহুড়া। কাকে নেব স্থির করার আগে আমাদের স্থির করতে হবে কোন্ সেক্শান থেকে নেব। তাই নয়?

তা বটে। জীবাগারটি ছয়টি সেক্শানে বিভক্ত: অমেরুদণ্ডী, মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী। কিন্তু নামগুলি 'ল্যাটিন' ভাষায় লেখা। ওকে পরখ করবার জন্য বলি, আমি তো নাম শুনে কিছুই বুঝছি না। **Pisces** আর **Aves** মানে কী?

ও খুক্খুক করে হেসে ওঠে। বলে, তাও জান না? Pisces মানে মাছ, আর Aves হচ্ছে পাখি।

—কেমন করে জানলে?

—কতবার গেছি ওসব সেক্শানে।

—বেশ! তুমিই বল, কোন সেক্শানে যাব?

অন্তরা বললে, দেখ গ্র্যাণ্ডপা, পাখি বা স্তন্যপায়ী নিয়ে গেলে খাঁচায় বন্ধ করে রাখতে হবে। সাতদিনে তো আর পোষ মানবে না! খাঁচায় বন্দী করা না-মানুষ আমার একটুও ভাল লাগে না। তাই ও দুটো বাদ!

ফলে, আমরা 'মীনাগার' আর 'পতঙ্গ-নিকেতন' দুটি ঘুরে ঘুরে দেখলুম। সব কথা বলার সময় ও সুযোগ এখানে নেই। দু-একটা নমুনা শোনাই। 'মীনাগারে' একটি মাছের সন্ধান পাওয়া গেল, তার নাম: 'আর্চার ফিশ্'। বাঙলায় বলা যায় 'ধানুকী মাছ'। বর্গটির নাম 'পার্সিফর্মেস' (**Perciformes**)। গণ ও প্রজাতি: *Toxotes Jvculatrix*।

আর্চার ফিশ্: দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া এবং অস্ট্রেলেশিয়ায় পাওয়া যায়। দৈর্ঘ্যে 30 সে.মি. পর্যন্ত হয়। আমরা যেটিকে দেখি তার দৈর্ঘ্য অনেক কম। মাছটার

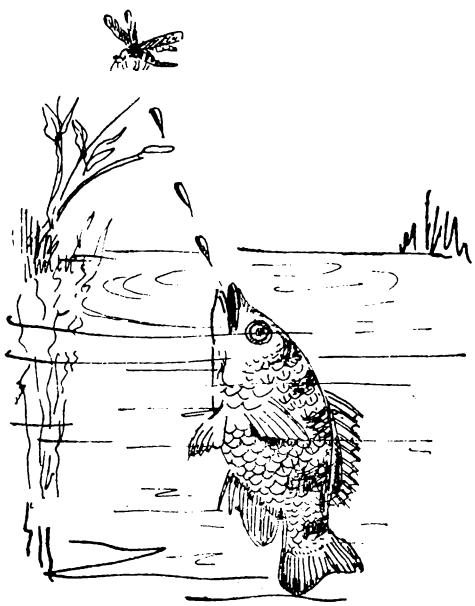

আর্চার ফিশ

বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, মুখ দিয়ে 'পুচুৎ' করে জল ছিটিয়ে জলজ উদ্ভিদের উপর বসে থাকা পোকাকে টিপ্ করে পেড়ে নামাতে পারে! পোকাটা জলে পড়ে গেলেই কপাৎ!

আমাদের উৎসাহ দেখে জীবাগারিক ওকে কিছু খাদ্য দিলেন। অ্যাকোয়ারিয়ামে আছে বেশ কিছু উদ্ভিদ। তার একটি পাতায় উনি রেখে দিলেন একটা ছোট পোকাকে। মাছটার কী ট্রেনিং! সে ঠিক দেখতে পেল। চট করে কাছাকাছি এসে পিচকারির মতো জল ছিটিয়ে পোকাটাকে পেড়ে ফেলল জলে। মুহূর্তে সাফ!

জীবাগারিক কিছুটা বললেন, কিছু পেলাম ছাপানো ফোল্ডারে। মোটামুটি তথ্যটা এই রকম ঃ

এ মাছ য়ুরোপে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানজগতে এ মাছের প্রথম বিবরণ দেন একজন ওলন্দাজ শাসনকর্তা। 1765 সালে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর কথায় কেউ পাত্তাই দেয়নি। জাভা দ্বীপের বাটাভিয়ায় (বর্তমান নাম জাকার্তা, জাভার রাজধানী।) তিনি একটি মাছকে এভাবে পোকা ধরতে দেখে অনেক কষ্টে তাকে পাকড়াও করেন। তাঁর সংগ্রহশালায় অনেক নতুন নতুন প্রজাতির মাছ ছিল। বস্তুত তিনি নিজেই ছিলেন একজন জীববিজ্ঞানী। ঐ অদ্ভুত মাছটির বিষয়ে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটিতে একটি মাছ পাঠিয়ে দেন। সে আমলে জাহাজে এ পথ পাড়ি দিতে মাসতিনেকের বেশি লাগত। যে জাহাজে পাঠিয়েছিলেন তার ক্যাপ্টেন অনেক কষ্টে মাছটিকে লণ্ডনে নিয়ে আসে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ওঁর সহকারীর ভুলে যে মাছটাকে পাঠানো হয় তা 'বাটারফ্লাই ফিশ'—'আর্চার ফিশ' নয়। লণ্ডনের জীববিজ্ঞানীরা অনেক প্রলোভন দেখিয়েও তাকে দিয়ে পিচ্কারি খেলাতে পারলেন না। খবর পেয়ে সে ভদ্রলোক আবার একটি মাছকে পাঠালেন। এবার ঠিক মাছই গেল—কিন্তু জীবিতাবস্থায় লণ্ডনে পৌঁছালো না।

বিজ্ঞান তথ্যটা মেনে নিল না।

দীর্ঘদিন পরে 1902 সালে কয়েকজন রাশিয়ান জীববিজ্ঞানী ঐ মাছটিকে পুনরায় আবিষ্কার করেন। এতদিনে 'আর্চার ফিশ' আজব প্রাণী বলে স্বীকৃতি পেল।

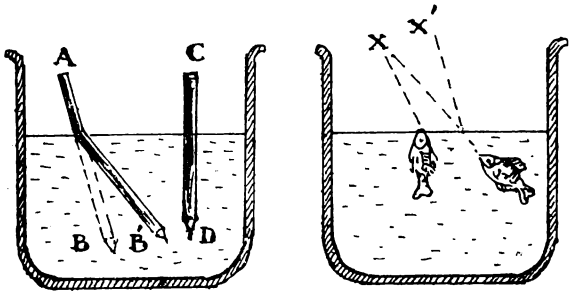

ক. আলোকের প্রতিসরণ খ. আর্চার ফিশের লক্ষ্যভেদ

প্রশ্ন হল, মাছটা কীভাবে নির্ভুল টিপ করতে পারে? দেখা গেছে ওরা দু-মিটার দূরের পতঙ্গকেও নির্ভুলভাবে পেড়ে ফেলতে পারে। জলের ভিতর 'প্রতিসরণে' সে বিভ্রান্ত হয় না! বিজ্ঞানের ছাত্র ব্যাপারটা সহজেই বুঝবে; কিন্তু অন্যদের জন্য একটু বুঝিয়ে বলি। যদি একটি কাচের পাত্রে জল ভরে তার ভিতর একটা পেন্সিল ডুবিয়ে দিই তাহলে বাইরে থেকে মনে হবে জলতল স্পর্শ করার পরেই পেন্সিলটা বেঁকে গেছে। বাস্তব পেন্সিল **AB** কে দেখতে পাব **AB′** অবস্থায়। তাকেই বলে প্রতিসরণ। জলের ভিতর থেকে মাছ তেমনি প্রতিসরণে সব কিছু উল্টোদিকে বেঁকে যেতে দেখবে; যেহেতু তার পক্ষে আলোক-রেখা বাতাসের হালকা-মাধ্যম থেকে জলের ভারী মাধ্যমে প্রবেশ করছে। তার মানে বাস্তবে X বিন্দুতে অবস্থিত পতঙ্গকে সে X′ বিন্দুতে দেখতে পাবে।

তাহলে সে কীভাবে ঠিক টিপ করে?

এর দু-জাতের ব্যাখ্যা।

প্রথম কথা, জল ছোঁড়ার সময় খণ্ডমুহূর্তের জন্য মাছটা জলতলের সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থান করে—যেভাবে বাঁ-দিকের ছবিতে দেখানো হয়েছে। ঐভাবে থাকলে প্রতিসরণ-জনিত বিভ্রান্তি হবে না। কেন? যেহেতু লক্ষ্য করে দেখ পেন্সিলটা **CD** অবস্থানে জলতলের সঙ্গে লম্বভাবে জলে ডোবানো হলে প্রতিসরণ-বিভ্রান্তি হচ্ছে না।

দ্বিতীয়ত, জীনবাহিত-অভিজ্ঞতায় মাছটা ভুল দেখেও ঠিক দেখে! অর্থাৎ চোখে যা দেখে, মস্তিষ্ক তা শুধরে নেয়। যেমন মানুষের চোখ। পদার্থবিদ্যার আইন মোতাবেক আমাদের সব কিছুই উল্টো ভাবে দেখার কথা—কিন্তু জীনবাহিত অভিজ্ঞতায় মস্তিষ্ক আমাদের ঠিকভাবেই দেখায়।

জীবাগারিক এগিয়ে এলেন। আমাদের উৎসাহিত করতে। মেয়েটির বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। বললেন, একটা মজা দেখাই। অ্যাকোয়ারিয়ামের উপর ঐ মাছটাকে দেখতে থাকুন, দেখবেন···

আমি বাধা দিয়ে বলি, আমাকে অত বোকা পাওনি! বুঝেছি! ও পিচকারি করে আমার মুখে জল ছিটাবে।

মেয়েটি বলে, মোটেই না। ও আমার পোষ মানা। এই দেখুন—

সে অ্যাকোয়ারিয়ামের উপর ঝুঁকে পড়ে একদৃষ্টে মাছটাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখল। বললে, কই? ও জল ছিটালো? এবার আপনি দেখুন।

সাহস পেয়ে আমি যেই একই ভাবে দেখতে গেছি অমনি পিচিৎ করে সে জল ছিটিয়ে দিল আমার চোখে। আমি তো অপ্রস্তুত!

রিণ্টি আর সেই মেয়েটি হো হো করে হেসে ওঠে। আমি বলি, সত্যিই মাছটা তোমার পোষ-মানা?

মেয়েটি বললে, মোটেই নয় ! আসল কারণ কি জানেন ? আমি তাকিয়েছিলাম একদৃষ্টে। আর আপনার চোখে পলক পড়েছিল। চোখের পল্লব নড়তেই ও ভেবেছে ওটা পোকা !

আমি বলি, এটাকেই বাড়ি নিয়ে যাওয়া যাক।

অন্তরা রাজী হল না। বলে, ওকে সাতদিন বাড়িতে রাখতে হলে অনেকগুলো পোকা-মাকড়কে হত্যা করতে হবে। ওটা নেব না !

তা বটে ! কিন্তু জীবাগারে তো উদ্ভিদ নেই। তাদের ছাড়া আর কোন্ না-মানুষ আছে যাকে জীবহত্যা না-করে সাতদিন রাখা যাবে।

এরপর আমরা 'মীনাগার' ছেড়ে 'পতঙ্গ-সদনে' এলাম। সেখানেও নানান না-মানুষ। বর্মী, আরাকনিডা, শতপদী, পতঙ্গ।

তার ভিতর থেকে একটা বিশেষ পতঙ্গের কথা বলি ঃ

অল্ডার ফ্লাই বা Alder fly

প্রথমেই লক্ষনীয় fly কথাটা Alder শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। ফলে এটি 'সাঁচ্চা মাছি' নয়। 'ডাইটেরা' বর্গের নয়। এর উপবর্গ হচ্ছে 'মেগালপ্টেরা' (**Megaloptera**)। মূল বর্গটি 'নিউরোপ্টেরা' (**Neuroptera**)।

গণ ও প্রজাতি ঃ *Sialis spp.* অতি প্রাচীন যুগ থেকে এরা টিকে আছে। পতঙ্গ —তাই তিন জোড়া ঠ্যাঙ। ডানা জোড়া পিঠের উপর বেশ সই-সই হয়ে বসে। অ্যান্টেনা বা শুঁড়-জোড়া লম্বাটে। ক্রমাগতই নড়ছে। গায়ের রঙ কালচে। দৈর্ঘ্যে আন্দাজ আড়াই সে. মি. বা এক ইঞ্চি।

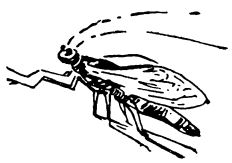

অল্ডার ফ্লাই

ডানা আছে কিন্তু উড়তে পারে না। তাড়া খেলে বড় জোড় মিটার-খানেক উড়ে গিয়ে আবার বসে পড়ে কোন গাছের পাতায়।

বসন্তকালে এদের বাচ্চা হয়। মা পোকা একবারে প্রায় হাজার দুই ডিম পাড়ে। জলের কিনারে। হপ্তা-দুয়েকের মধ্যেই ডিম ফুটে শূককীট জন্মায়। শূককীট অবস্থায় ওরা দীর্ঘ দুটি বছর থাকে ! তখনই আকারে বৃদ্ধি পেয়ে ওরা এক ইঞ্চি পরিমাণ হয়ে যায়। তারপর এরা জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে আসে। রূপান্তরিত হয় পুত্তলীকীটে। এ অবস্থায় হপ্তা-তিনেক কাটে। তারপর খোলস ছেড়ে পূর্ণাঙ্গ 'অল্ডার ফ্লাই'-এ রূপান্তরিত হয়।

ঐ অল্ডার শূককীট মাছের চার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অন্তরা পোকাটাকে দেখিয়ে প্রশ্ন করে, ওকে কী খেতে দিতে হবে ? কী খায় ও ?

—কিছুই নয় ! বললেন জীবাগারিক।

আমি বলি, না, মানে কী খেয়ে ও বাঁচে ?

একই জবাব দিল মেয়েটি, কিছুই নয় !

এ তো মহা যন্ত্রণা !

আবার প্রশ্ন করি, তাহলে ও বাঁচে কি করে ?

—বাঁচে না তো ! মরে যায় ! ওটাকে নিয়ে গেলে সাতদিন পরে আর ফেরত দিতে আসতে হবে না। কারণ পুরো এক সপ্তাহ ও বাঁচে না।

আমি ভয়ে ভয়ে বলি, মে-ফ্লাইয়ের মত ? 'এ ফিমরোপ্টরা' বর্গের পতঙ্গের মত ?

মেয়েটি খুশি হল। বললে. ঠিক তাই। ওদের জীবন শুধু শূককীট আর পুত্তলীকীট অবস্থাতেই সীমাবদ্ধ। পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ দু চার দিন মাত্র বাঁচে। তখন তার একমাত্র কাজ, বংশ রক্ষা করা। পুরুষপতঙ্গটি মিলনান্তে প্রাণত্যাগ করে, আর স্ত্রী-জাতীয় অল্ডার ফ্লাই মৃত্যু বরণ করে প্রসবান্তে ! তাই ওদের দেহে খাদ্য পরিপাক করার খাদ্যনালী নেই। সময় কোথা খাওয়া-দাওয়ার ? আর সে জন্যই ডানা থাকা সত্ত্বেও ওরা উড়তে জানে না ! উড়বার কী দরকার ? আত্মরক্ষা তো অহেতুক ! জীবন যখন পদ্মপত্রে জল ? প্রাণধারণ তো সেই মন্ত্রটা উচ্চারণ করতে ঃ গোত্রং নঃ বর্ধতাম ! তার জন্যে ওড়া-উড়িরই বা কী প্রয়োজন, অথবা খাদ্য গ্রহণ !

রিণ্টি হয়তো সবকিছু বুঝতে পারল না। তবে সাত দিনের মধ্যেই এর অবধারিত মৃত্যুর কথা শুনে সে রাজী হল না।

জীবাগারিক রিণ্টিকে বললেন, আমি বরং তোমাকে আর একটি জীবের নাম 'সাজেস্ট' করতে পারি। যাকে সাতদিন পরে ফেরত দিতে আসতে হবে না !

আমি বাধা দিই। না না ! থাক—

উনি বুঝতে পারেন। বলেন, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। সাতদিন পরে তাকে ফেরত দিতে হবে না এ জন্য নয় যে, সে সাত দিনের মধ্যে মারা যাবে !

—তাহলে ?

—এই একটি মাত্র ব্যতিক্রম আছে। **Exception proves the rule** ! জীবটি হচ্ছে শুঁয়োপোকা। প্রজাপতির শূককীট। ওকে নিয়ে যান। কোন্ গাছের পাতা খাবে, কতটা খাবে, সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। সাত দিনের মধ্যেই সে গুটি কেটে প্রজাপতি হয়ে উড়ে যাবে !

রিণ্টি তো দারুণ খুশি ! বলে, গ্র্যাণ্ডপা ! গ্র্যাণ্ড আইডিয়া ! এই শুঁয়োপোকাটাই নিয়ে চল।

জীবাগারিক রিণ্টির হাতে একটা দু পৃষ্ঠার কার্ড ধরিয়ে দিলেন। বললেন, এতে সাত দিনের ডায়েরি লিখতে হবে। সাতদিন পরে এসে কার্ডটা জমা দিও।

দেখলাম, ডায়েরির পৃষ্ঠার মতো তাতে ছক কাটা। কত তারিখে শূককীট পুত্তলীকীট হ'ল, কবে প্রজাপতি হ'ল, তা লিখতে হবে। ছবি আঁকতে হবে। সম্ভব হলে ক্রেয়ন পেনসিলে এঁকে দেখাতে হবে তার পাখনার রং ও বাহার।

লিখতে হবে, তার কটা ঠ্যাঙ, ক' জোড়া পাখনা, ইত্যাদি প্রভৃতি। সব শেষে একটা নির্দিষ্ট খোপে সার্টিফিকেট লিখতে হবে যে, প্রজাপতিটা তার ঋণ শোধ করতে মুক্ত আকাশে উড়ে গেছে!

হ্যাঁ, ঋণ শোধ বইকি! শৈশবাবস্থায় সে তো গাছের পাতা খেয়েই না-মানুষ হয়েছে! গাছের কাছে সে ঋণী তো বটেই। তাই বড় হয়ে তাকে উদ্ভিদ জগতের ঋণ শোধ করতে যেতে হয়! পুংকেশর থেকে পুষ্পরেণুর মিলনবার্তা সে গর্ভকেশরে পৌছে দেয়। ঘটকালিরি করতে হয়। ফুলও খুশি মনে ঘটক বিদায় করিয়ে দেয়—মিষ্টিমুখ করিয়ে দেয় মধু দিয়ে!

* * *

আচ্ছা, এমন একটা 'পেট লাইব্রেরী' কলকাতায় খোলা যায় না?

মান্‌ছি, এ দেশ গরিব। এখানে অধিকাংশ শিশুকে আমরা দুধের যোগান দিতে পারি না। স্লেট-পেন্‌সিল তো দূরের কথা বাচ্চাদের দু-বেলা দু-মুঠো মুড়ি দেবারও সামর্থ্য নেই এই অভাগা দেশের! ঐ জাতের একটা 'জীবাগার' কলকাতায় বানানোর পরিকল্পনা নিতান্ত বিলাস; আকাশ কুসুম!

সবই মানছি। কিন্তু এই হবু-কল্লোলিনী কলকাতার তো এমন অঞ্চল অনেক আছে যেখানে পূজা প্যাণ্ডেলে 'ডেকরেশন' বাবদ আমরা বছরে দশ বিশ হাজার টাকা খরচ করি। কালীপূজার রাত্রের কয়েক ঘণ্টায় এ শহরে প্রতি বছর যত টাকার বাজি পোড়ে তাতে তো এখানে ডজন খানেক 'পেট লাইব্রেরী' তৈরী হতে পারে! বিধান শিশু উদ্যানে, লেক-এর এক-টেরে, নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়ামে, নিউ-আলিপুরে, যোধপুর পার্কে বা যে কোন বনেদী পাড়ায় চাঁদা তুলে এমন দু-একটি জায়গায় কি তৈরি করা যায় না। যেখানে না-পূর্ণবয়স্করা না-মানুষ দরদী হতে পারে? আমি কিছু 'ডিজ্‌নেল্যাণ্ড' বানাবার প্রস্তাব দিচ্ছি না যে, কোটি-টাকার বাজেট বানাতে হবে?

একটা সুখবর চুপি-চুপি জানাই।

আমি আজ দু বছর ধরে একটা 'না-মানুষী বিশ্বকোষ' লিখছি; একা হাতেই। সেই বইটি লেখার প্রয়োজনে গুরুসদয় রোডের বিড়লা টেক্‌নোলজিক্যাল মিউজিয়ামের গ্রন্থাগার থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। একদিন কথা প্রসঙ্গে তার কর্মকর্তা শ্রীসমর বাগচী আমার কাছে জানতে চাইলেন, আমি কী নিয়ে লিখছি, কেন ঘন ঘন আমাকে ওঁদের লাইব্রেরীতে যেতে হচ্ছে। আমি সুযোগ বুঝে পাণ্ডুলিপির এই কয়টা পাতা ওঁকে পড়ে শোনালুম।

সমর বাগচীকে তোমরা নিশ্চয় চেন। টি. ভিতে প্রায়ই সায়েন্স কুইজ পরিচালনা করেন। পাণ্ডুলিপির এই কটা পাতা পড়ে তিনি দারুণ উৎসাহিত হয়েছেন। আমাকে কথা দিয়েছেন, তিনি চেষ্টা করে দেখবেন। নিতান্ত অসম্ভব না হলে ওঁর প্রতিষ্ঠানেই হয়তো ছোট্ট করে খোলা হবে একটি জীবাগার। ভারতের প্রথম 'পেট লাইব্রেরী'।

হয়তো আমি তা দেখে যাবার সুযোগ পাব না। কিন্তু তোমরা পাবে! হয়তো রিন্টির নাতনিও একদিন এই কলকাতা শহরেই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠ্‌বে শুঁয়ো-পোকাটাকে ফেরৎ দিতে হবে না শুনে। হয়তো আগামী দিনের প্রজাপতিকে ওরা উড়িয়ে দেবে আকাশে, ঠিক যেমন ভাবে আমি আর রিন্টি মুক্ত করে দিয়েছিলাম সেই প্রজাপতিটাকে, যেটা আমাদের সামনেই জন্ম নিয়েছিল!

ছড়া

গন্ধ মেশিন

রবীন সুর

ছোখের জন্যে চশমা আছে কানের জন্যে ফোন,
হৃৎপিণ্ড বিগড়ে গেলে হার্ট-ও পাবে লোন।
কিন্তু যদি টিকোলো নাকে না পাও কোনা ঘ্রাণ—
কিসের ওপর আস্থা রেখে বিপদে পাবে ত্রাণ?
এমন বিপদ হলে কারো আমার কাছে এসো,
বিলেত ফেরত ডাক্তারিতে পাক্কা আমার মেসো
গন্ধ শোঁকার আজব মেশিন বানিয়ে ফেলেছেন:
হাজার টাকা নগদ দিলে ভাড়া খাটাচ্ছেন—
ইচ্ছে মত সুইচ টিপে যখন যেটি দরকার
ইজিচেয়ারে শুয়েই পাবে গন্ধ চমৎকার:
মিষ্টি, টোকো, বোঁটকা, বুনো, আতর মৃগনাভি,
গোবিন্দভোগ চালের পায়েস, ঘৃতগন্ধ গাভি,
মুর্গি মটন, ধোঁকার ডালনা, টাটকা ইলিশ ভাজা,
কজলি আম, জিরেনকাটের নলেন গুড় তাজা—
যন্ত্রখানি খুলে বসলে সর্দিতে নাক বন্ধ
যতরকম জিনিস আছে তাদের পাবে গন্ধ!

পথ কই ? পর্বতসর গ্রামের পাঁচিলের বাইরে দাঁড়িয়ে আমি প্রশ্ন করি ঃ 'ধূ ধূ করছে বালি, বালির মধ্যে পথের কোন চিহ্নই নেই।

'থাকবে কি ক'রে!' আমার সহপাঠী বন্ধু অনিরুদ্ধ দে জবাব দিল। সে আমার সাথী, পার্টনার। বি-এস-সি ফাইনাল ইয়ার-এর ছাত্র আমরা। ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরির ব্যাপারে শিক্ষালাভ করছি এখানে। কিষেণগড়কে কেন্দ্র করে চলছে আমাদের কাজ। কুড়ি জন ছাত্র ও দুজন অধ্যাপক, মোট বাইশজন কিষেণগড়ের ধরমশালায় আশ্রয় নিয়েছি। বিশ জন দশটি দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করছি। দুজন করে নিয়ে এক একটি দল তৈরি করে দিয়েছেন আমাদের অধ্যাপকরা। আমি জোট বেঁধেছি অনিরুদ্ধের সঙ্গে। কিষেণগড় কেন্দ্র ক'রে কিছুদিন কাজের পর আমরা সম্বরে এসেছি। সম্বর থেকে এসেছি পর্বতসর। এখান থেকে সোজা দক্ষিণে রূপনগর পর্যন্ত মানচিত্র তৈরি করব। এ কাজ আমরা দুজনেই করব। বাকি নটি দলকে অন্যান্য জায়গায় মানচিত্র তৈরি করতে বলেছেন অধ্যাপকরা। পর্বতসর থেকে রূপনগর পর্যন্ত পরিক্রমা করতে হবে, কাজেই সন্ধান নিচ্ছি। একটানা বালির মধ্যে কোন পথের চিহ্ন না দেখে আমি ঘাবড়ে গিয়েছি। অনিরুদ্ধকে বিশেষ বিচলিত বলে মনে হ'ল না, তার মতে ভূতাত্ত্বিকরা পথের ওপরে কখনোই নির্ভরশীল হবে না, পথ না থাকলেও তাদের এগিয়ে যেতে হ'বে। মরুভূমির বালির বিস্তারের মধ্যে পথ না থাকাটাই তো স্বাভাবিক ব্যাপার।

'মরুভূমির বালির সমুদ্রের মধ্যে, পায়ে চলা পথ কখনোই তৈরি হয় না।' অনিরুদ্ধ ব'লে চলে, 'পাকা রাস্তা তৈরি করলে তাও বালিতে চাপা পড়ে যায়।'

'কিন্তু কিষেণগড়ের চারপাশে অনেক পায়ে চলা পথ পেয়েছিলাম।' আমি বললাম।

'তা পেয়েছিলাম কারণ কিষেণগড়ের চারপাশে মরুভূমি পুরোপুরি মরুভূমি হয়ে ওঠে নি। এ জায়গাটি পুরোপুরি মরুভূমি।

পুরোপুরি মরুভূমি মানে বালি, বালিয়াড়ি ও বালি ফুঁড়ে ওঠা পাথরের ঢিবি। গাছপালার কোন চিহ্ন নেই কোথাও।

গাছপালা নেই, পথ নেই, লোকালয় নেই, আমাদের একমাত্র ভরসা কম্পাস। কম্পাস দিয়ে দিক নির্ণয় ক'রে এগিয়ে যেতে হবে।

রূপনগর পর্বতসরের ঠিক দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। অতএব কম্পাস দিয়ে দক্ষিণ দিকটিকে নির্ণয় করে দক্ষিণে

যেতে থাকি।

পথ নেই, কম্পাসের সাহায্যে আমরা দুজনে দক্ষিণ-পন্থী। পথহীন পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ আমার 'পথ' নিয়ে যুধিষ্ঠির ও ধর্মের আলাপ মনে প'ড়ে গেল। ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'পথ কি?' যুধিষ্ঠিরের উত্তর ঃ 'মহাজনো যেন গতো স পন্থা'।

পথের সংজ্ঞা জানতে গিয়ে ধর্মের নিশ্চয়ই মরুভূমির কথা মনে হয় নি। যুধিষ্ঠির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা মরু-ভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় কখনোই, কারণ মহাভারতের আমলের মহাজনদের পায়ের চিহ্ন মরুভূমির মধ্যে পড়ে নি কখনো। মহাভারতে সারা ভারতের বর্ণনা থাকলেও মরু-ভূমির উল্লেখ নেই, পাণ্ডবরা সর্বত্রগামী হ'লেও মরুভূমিকে এড়িয়ে চলেছেন।

কম্পাস নির্দেশিত দিকে বেশ কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ কারুর ডাক শুনে থমকে দাঁড়াই। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি, একজন রাজস্থানী বৃদ্ধ উটের পেছনে পেছনে আসছে। সে চিৎকার ক'রে বললে, রূপনগর যেতে চাও তো আমার উটের পেছনে পেছনে চল।

তোমার উটের পেছনে পেছনে যাব কেন! অনিরুদ্ধ বললে, কম্পাস দেখে নির্ভুল চলছি আমরা রূপনগরের দিকে; তুমি বরঞ্চ এস আমাদের পেছনে পেছনে, রূপনগর পৌঁছতে কোন ভুল হবে না।

'আমি যেতে চাইলেও আমার উট কি আর যেতে চাইবে তোমাদের পেছনে পেছনে! দেখি উটের কি মর্জি···

'কিন্তু বৃদ্ধ প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও উটটাকে আমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করাতে পারল না। উট আমাদের পাশ কাটিয়ে ভিন্ন দিকে চলতে থাকে। অনিরুদ্ধ বললে, তোমার উট তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে বুঝতে পারছি না, যে দিকেই যাক রূপনগরের দিকে যাচ্ছে না।'

'কিন্তু আমার উট তো কখনো ভুল করে না। বৃদ্ধ বললে, এপথে অনেক বারই তো ওকে নিয়ে আমি রূপনগর গিয়েছি।'

'কখনো ভুল না করলেও এবার করতে চলেছে। ঠিক পথে ওকে নিয়ে চল তুমি।

'সে আমি পারব না বাপু! বুড়ো কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, 'ও যে দিকে যাচ্ছে সেদিক থেকে এক চুলও নড়াতে পারব না ওকে। বড় একগুঁয়ে জেদী জানোয়ার।

বুড়ো তার উটকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল বালিয়াড়ির আড়ালে, আমরা এগিয়ে চলি বালিয়াড়ি ঘেঁষে। কম্পাসের কাঁটার দিকে নজর রেখে চলছি, কাজেই সোজা রূপনগর পৌঁছে যাব ঘণ্টা তিন-চারের মধ্যে।

'চলতে চলতে মানচিত্র তৈরি করি। একটানা বালি ছাড়া আর কিছু নেই, পাথরের স্তূপ ও ঢিবিগুলি সব বালিতে চাপা পড়ে আছে, বালিয়াড়ির বালির আড়ালে

উটটাকে আমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করাতে পারল না

কি আছে বোঝার উপায় নেই, কাজেই মানচিত্রে বালি ছাড়া আর কিছুই' চিহ্নিত করতে পারি না।

মানচিত্র বালি চিহ্নিত করতে করতে বেলা পড়ে আসে, সন্ধ্যা ঘনায়। পর্বতসর থেকে একটানা প্রায় ছ ঘণ্টা পথ চলেছি, কিন্তু রূপনগরের ধারে কাছেও পেঁছিছি বলে মনে হচ্ছে না।

সার্ভে সব ইণ্ডিয়ার মানচিত্র অনুযায়ী পর্বতসর থেকে সোজা দক্ষিণে রূপনগরের দূরত্ব বারো কিলোমিটারের বেশি নয়। ঘণ্টা চারেকের মধ্যে এই দূরত্ব আমাদের অতিক্রম করা উচিত। কিন্তু একটানা ছ ঘণ্টা পথ চলার পরও যখন গন্তব্যে পেঁছিলাম না, তখন বুঝতে পারি যে আমরা দিগ্-ভ্রান্ত হয়েছি। রূপনগরের বদলে উমরসর গ্রামে পেঁছে আমরা বুঝতে পারি যে সত্যিই দিগ্‌ভ্রান্ত হয়েছি আমরা।

কম্পাসে দিক নির্ণয় করে পথ চলেছি, তথাপি দিগ্‌ভ্রান্ত হলাম কি করে ভেবে পাই না আমরা। আমরা দুজনেই হতবুদ্ধি। অনিরুদ্ধ বললে, 'বুদ্ধিতে এর ব্যাখ্যা নেই।'

বুদ্ধিতে অবশ্যই এর ব্যাখ্যা আছে ··

'আছে।' কিষেণগড়ে ফিরে গিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতার কথা অধ্যাপক সন্তোষ রায়কে বলতে, তিনি বললেন, 'বুদ্ধিতে অবশ্যই এর ব্যাখ্যা আছে।'

আমি বললাম, 'কম্পাস খারাপ হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কি ব্যাখ্যা থাকতে পারে!'

অধ্যাপক রায় বললেন, 'তোমাদের প্রতিটি কম্পাস আমি নিজে পরীক্ষা করেছি, কাজেই কম্পাস খারাপ হ'য়ে যাওয়ার কথা নয়। তোমরা নিজেরাই ভেবে বল, কম্পাসে কোন ত্রুটি না থাকলেও কি কারণে কম্পাসের কাঁটা সঠিক দিক নির্দেশ করে না?'

প্রশ্নটা হেঁয়ালির মত লাগে। আমরা মাথা চুলকে আমি বললাম, 'আপনার প্রশ্নটি যেন একটা ধাঁধা।'

'ধাঁধা না।' সন্তোষ বাবু গম্ভীর মুখে বললেন 'খুবই সহজ একটি বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন। অনিরুদ্ধ, তোমারও কি এ প্রশ্ন ধাঁধার মত লাগছে?'

'না স্যার।' অনিরুদ্ধ জবাব দিল, 'কাছাকাছি লোহা চুম্বক থাকলে কম্পাসের কাঁটা তার দিকে আকৃষ্ট হবে, কাজেই চুম্বকের পাশাপাশি বা কাছাকাছি কোন কম্পাস সঠিক দিক নির্দেশ করবে না।'

'ঠিক বলেছ।' সন্তোষ রায় খুশি হ'য়ে বললেন, 'কিন্তু তোমাদের দুজনের কারুর কাছেই তো কোন লোহা বা চুম্বক ছিল না, কাজেই কিসের আকর্ষণে চুম্বকের কাঁটা দিগ্‌ভ্রষ্ট হ'ল?'

'একটু চিন্তা করে অনিরুদ্ধ বললে, বালি চাপা কোন লোহা বা চুম্বকের পাহাড় হয়তো আমাদের কাছাকাছি ছিল। তারই আকর্ষণে হয়তো কম্পাসের কাঁটা সরে গিয়েছে এবং তার ফলে আমরা দিগ্‌ভ্রান্ত হয়েছি।'

'ঠিক বলেছ'—সন্তোষ রায় সোচ্ছ্বাসে ব'লে উঠলেন, 'বালিয়াড়ির নিচে লোহা বা চৌম্বক শক্তিসম্পন্ন কোন ধাতুর পাহাড় বোধ হয় চাপা আছে। তোমাদের কম্পাসের ওপরে তা প্রভাব বিস্তার করেছে।'

সন্তোষ রায়ের কথা শুনে আমরা উত্তেজিত হয়ে উঠি। দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে আমরা বালি চাপা গুপ্তধনের হদিস পেলাম। বালিয়াড়ির মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে লোহা বা চৌম্বক শক্তি সম্পন্ন ধাতুর পাহাড়।

'দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে যার হদিস পেলে, পার তাকে খুঁজে বের করতে?' সন্তোষ রায় প্রশ্ন করলেন।

'চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।' অনিরুদ্ধ জবাব দিল।

আবার আমরা গেলাম পর্বতসর। সেখানে গিয়েই সেই রাজস্থানী উটওয়ালা বৃদ্ধের দেখা পেয়ে গেলাম। বৃদ্ধ ঠাট্টা করে বললে, 'এবারে নিশ্চয়ই তোমাদের কম্পাসের বদলে আমার উটকে অনুসরণ করবে।'

অনিরুদ্ধ বললে, 'নিশ্চয় করব যদি রূপনগরের দিকে যাই আমরা। কিন্তু আপাততঃ আমরা বালি-চাপা ধাতুর সন্ধান নেব। এখানকার বালিয়াড়ির তলায় ধাতুর ভাণ্ডারের হদিস পেয়েছি।'

'বলো কি!' বৃদ্ধ চমকে উঠল। তারপর তার উটটিকে নিয়ে যেতে উদ্যত হ'ল।

বৃদ্ধ ও তার উটের গমনপথের দিকে তাকিয়ে থেকে অনিরুদ্ধ বলল, 'মনে হচ্ছে এই ধাতুর খোঁজ পেয়ে গিয়েছে এই বুড়ো। হয়তো গোপনে তার খনন শুরু ক'রে দিয়েছে...'

অনিরুদ্ধ যে ঠিক আন্দাজ করেছে তা' বুঝতে পারি আমরা এই বৃদ্ধ ও তার উটকে অনুসরণ করে। বালিয়াড়ির মধ্যে বৃদ্ধ তার উটের সাহায্যে খনন ক'রে বের করছে লোহা-যুক্ত ম্যাগনেটাইট, টাইটেনিয়ামযুক্ত ইলমেনাইট এবং টাংস্টেনযুক্ত উলফ্রাইট।

আমরা ওখানে পৌঁছুতেই বৃদ্ধটি পালিয়ে গেল। বৃদ্ধের সঙ্গে উটটি অবশ্য পালাল না।

আমাদের কাছ থেকে রিপোর্ট পেয়ে রাজস্থান সরকার এখানে খনি গ'ড়ে তোলেন। বৃদ্ধের চোরাই খনির মত সরকারী খনির কাজে লেগে যায় এই উট।

ভূমিকা ঃ প্রথমেই বলে রাখি যে এবার আমি সব কথা খোলাখুলিভাবে বলতে পারব না। কারণ ডঃ ত্রিভুবন এবার যে গবেষণার সঙ্গে জড়িত তা প্রতিরক্ষা দপ্তরের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গোপনীয় গবেষণা। সুতরাং অনিবার্য কারণেই স্থান কাল ও পাত্রদের পরিচয় গোপন রাখতে আমি বাধ্য। কাহিনীর মধ্যে কোন কোন জায়গায় অসংগতি থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে ; তার কারণ লেখাটা প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে সেন্সর করার পরই কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশ করার অনুমতি পেয়েছি। আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধ জানাচ্ছি যে যদি কোন অসংগতি তাঁদের নজরে পড়ে তাহলে তাঁরা যেন নিজেদের কল্পনা নিয়ে এই কাহিনীর সেইসব ফাঁকফোঁকরগুলো ভরিয়ে নেন ঃ আমি আশা করি এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা তাঁদের নিজগুণে এবারের মত ক্ষমা করে নেবেন।

এক

রকেট ব্লাস্ট-অফ এর ঠিক নব্বুই সেকেণ্ড পরে খালি টিভি পর্দায় ফুটে উঠল সামান্য ছোট্ট একটু আলোর বিন্দু। তার দুসেকেণ্ড পরে ওই আলোর বিন্দুটা ফেটে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল আতসবাজির মত। তারপরই টিভির পর্দা অন্ধকার হয়ে গেল। কণ্ট্রোলরুমের অন্য টিভি পর্দায় দেখা যাচ্ছে তখন রকেটটি দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে মহাশূন্যের দিকে।.....

এই শেষ দৃশ্যের ঘটনা সম্পূর্ণ করার আগে আমরা একবার পিছনের ঘটনাগুলো আলোচনা করে নিতে চাই।

* * *

গত মাসখানেকেরও বেশি ডঃ ত্রিভুবনের সঙ্গে আমাদের কোন যোগাযোগ নেই কারণ ডঃ ত্রিভুবন আমাদের কোন খবর না দিয়েই কলকাতার বাইরে কোথায় যেন চলে গেছেন। কোথায় গেছেন এবং কবে ফিরবেন তার কোন হদিশ উদ্ধার করতে না পেরে আমার বাড়িওয়ালা ন্যাটা মিত্তির রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। প্রত্যেকদিন একবার করে ডঃ ত্রিভুবনের বাড়ি থেকে ঘুরে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি করা যায় বলুন তো সোমেশ্বর বাবু ?'

আমি সান্ত্বনা দিই, 'কোন চিন্তা করবেন না মিত্তির মশাই। আমার মনে হচ্ছে কোন গবেষণার ব্যাপারেই ডঃ ত্রিভুবন হঠাৎ কোথাও গেছেন। সময়মত নিশ্চয় খবর দেবেন অথবা ফিরে আসবেন।'

'তাই যেন হয়।' বলে হতাশ ভঙ্গিতে উঠে পড়তেন ন্যাটা মিত্তির। এরকমই চলছিল ; হঠাৎ কয়েকদিন আগে মিত্তির মশায়ের নামে চিঠি এলো ডঃ ত্রিভুবনের কাছ থেকে। চিঠি পেয়ে দারুণ খুশি হলেন মিত্তির মশায়। সংক্ষিপ্ত চিঠি। বিষয়বস্তু হচ্ছে চিঠি পাওয়া মাত্র আমরা দুজন যেন রওনা হই পূর্ব উপকূলের সমুদ্রের ধারের কোন এক জায়গায়। আমি জানি ওই জায়গায় স্থাপিত হয়েছে প্রতিরক্ষা দপ্তরের বিরাট এক মহাকাশ-গবেষণা কেন্দ্র। ওখানেই রয়েছে রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র। যাহোক মিত্তির মশায় দৌড়ঝাঁপ করে

পরের দিনের ট্রেনের টিকিটও জোগাড় করে ফেললেন আমাদের দুজনের জন্য।

ট্রেনে উঠে বেশ ভালভাবে গুছিয়ে বসে ন্যাটা মিত্তির বলে উঠলেন, 'ডঃ ত্রিভুবন কিন্তু আমাদের কথা ভোলেন নি।' আমি ঘাড় কাৎ করে ওঁর কথায় সায় দিলাম। কিন্তু কেন জানি না আমার মনটা ভাল বলছিল না। ডঃ ত্রিভুবন কাউকে কিছু না বলে প্রায় এক মাসের ওপর কলকাতা ছাড়া। আর এখন উনি চিঠি লিখছেন এমন একটি জায়গা থেকে যেখানে রয়েছে মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ও রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র। দুই আর দুই-এ চার হয় এ কথাটা মেনে নিলে এ কথাই মেনে নিতে হয় যে ডঃ ত্রিভুবন প্রতিরক্ষা দপ্তরের হয়ে কোন গবেষণা করছেন। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছিল না তা হচ্ছে উনি এইরকম একটা জায়গায় আমাদের ডেকে পাঠালেন কেন?

যাহোক সময়মত সামরিক প্রহরীদের পরীক্ষায় পাশ করে আমরা ডঃ ত্রিভুবনের কাছে গিয়ে পৌঁছুলাম। আমাদের দেখে ডঃ ত্রিভুবন খুশি হলেন খুব। চারিদিকে চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারলাম জায়গাটা একটা অতি আধুনিক গবেষণারের অংশ। ডঃ ত্রিভুবন একা একাই কিছু কাজ করছিলেন। আমরা ঢুকতেই কাজ বন্ধ করে নিজের চেয়ারে এসে বসলেন। সামনের চেয়ার দেখিয়ে আমাদেরও বসতে ইঙ্গিত করলেন। আমরা বসলাম। ন্যাটা মিত্তির হড়বড় করে কিছু অভিযোগ হয়তো জানাতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ডঃ ত্রিভুবনের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ উনি যেন থমকে গেলেন। ডঃ ত্রিভুবনের মুখের দিকে তাকিয়ে আমিও চমকে উঠলাম। বেশ কিছু-দিন যে উনি বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, একটা সাংঘাতিক মানসিক দুশ্চিন্তার মধ্যে যে সময় কাটাচ্ছেন তা ওঁর চোখমুখের চেহারাই বলে দিচ্ছে। হাসিখুশি মুখটায় যেন কালির ছোপ পড়েছে। শুধু চোখ দুটো যেন আরো উজ্জ্বল বলে মনে হল।

'আপনার শরীর কিন্তু খারাপ লাগছে। কি হয়েছে ডঃ ত্রিভুবন?' প্রথমেই জানতে চাইলেন ন্যাটা মিত্তির।

ডঃ ত্রিভুবন একটু হেসে বললেন, 'ও কিছু নয়। দু-চার দিন বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

আমি বললাম, 'ডঃ ত্রিভুবন কী এমন কাজে হাত দিয়েছেন যে একদম বিশ্রাম নিতে পারছেন না?'

ডঃ ত্রিভুবন আমার কথা এড়িয়ে গিয়ে বললেন "তুমি কেমন আছ বল। মিস্টার মিত্তির আপনি কেমন আছেন?'

'ভাল। তবে আপনার খবর না পেয়ে খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। এখন আপনাকে দেখে সে দুশ্চিন্তাটুকু কেটে গেল।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এবার বলুন ডঃ ত্রিভুবন হঠাৎ আমাদের এমন জরুরী তলব কেন?'

'সব বলব। তার আগে চলো আমার অস্থায়ী ডেরায়। খাওয়া দাওয়ার পর সব ধীরে ধীরে বলব'খন।'

দুই

খাওয়াদাওয়ার পর একতলা কোয়ার্টার্সের বারান্দায় চেয়ার পেতে বসলাম আমরা। শুক্লপক্ষ। কী তিথি ঠিক বুঝতে পারলাম না। সামনের সমুদ্র সৈকতে ছড়িয়ে পড়েছে চাঁদের আলো। সমুদ্রের ঢেউ-এর মাথায় পড়ে তা যেন এক রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। একটা ঠাণ্ডা হাওয়া সমুদ্রের দিক থেকে ভেসে এসে ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের সারা শরীরে। শরীর যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। ন্যাটা মিত্তিরই প্রথম কথা বললেন, 'জায়গাটি বড় সুন্দর।' 'তা ঠিক।' সায় দিলেন ডঃ ত্রিভুবন।

'এবার আমাদের সব খুলে বলুন। সবকিছু জানবার জন্য আমরা মনে মনে ভীষণ ছটফট করছি।' বললাম আমি।

'হ্যাঁ, শুরু করুন ডঃ ত্রিভুবন!' ন্যাটা মিত্তিরও তাগাদা লাগালেন।

'হ্যাঁ করব; কিন্তু ঠিক কোথা থেকে শুরু করব তাই ভাবছি। তবে একটা কথা মনে রাখবেন এখানে যা ঘটছে তা সবই টপ সিক্রেট।'

'তা আগেই অনুমান করেছিলাম।' বললাম আমি।

'মাস কয়েক আগে', শুরু করলেন ডঃ ত্রিভুবন, 'হঠাৎ প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে একটা ছোট্ট চিঠি পেলাম। চিঠির বক্তব্য চিঠি পাওয়া মাত্র যে ফ্লাইট পাব তাতে দিল্লী গিয়ে একজন সামরিক অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। এই যোগাযোগের জন্য একটি সাংকেতিক নম্বরও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কাউকে কিছু না জানিয়ে দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। দমদম এয়ারপোর্টে 'বোর্ড-পাস' নেওয়ার জন্য কাউন্টারের দিকে এগুচ্ছি হঠাৎ একজন সামরিক অফিসার এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন এবং সাংকেতিক নম্বরটা জানতে চাইলেন। জানালাম। ব্যস্, এরপর ওই অফিসারই আমার পুরো দায়িত্ব নিয়ে নিলেন। দিল্লীতে আলাপ আলোচনা সেরে ওঁদের নির্দেশমত এসে পৌঁছুলাম এখানে।'

একটানা কথা বলে যেন একটু দম নেওয়ার জন্য থামলেন ডঃ ত্রিভুবন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, 'আপনারা কাগজে নিশ্চয় পড়েছেন যে এই বছরের গোড়ার দিকে এখান থেকেই ASLV-. রকেটটি মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়; কিন্তু রকেটটি মহাকাশে পেঁছুতে পারেনি। ব্লাস্ট-অফ করার ঠিক 162 সেকেণ্ডের মাথায় ওটা দিগভ্রষ্ট হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে আছড়ে পড়ে।

কাগজের খবরটা ন্যাটা মিত্তিরের পড়া ছিল না বলে উনি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে ডঃ ত্রিভুবন ও আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি বললাম, 'হ্যাঁ আমার মনে পড়ছে। ASLV অর্থাৎ Augmented Sattelite Lunch Vehicles, এই রকেটটি ছিল পাঁচ স্তর বিশিষ্ট। ওজন ছিল ঊনচল্লিশ টন। এর কাজ ছিল একশ পঞ্চাশ কেজি ওজনের

'রোহিণী-উপগ্রহ'কে পৃথিবীর কাছাকাছি কক্ষপথে স্থাপন করা।'

'তুমি ঠিকই বলেছো সোমেশ্বর। কিন্তু ভারতের এই প্রথম চেষ্টা সফল হতে পারে নি।' বললেন ডঃ ত্রিভুবন।

'যতদূর মনে পড়ছে, প্রাথমিক তদন্ত-রিপোর্ট অনুযায়ী 'কোর-মোটর' ঠিকমত কাজ না করার জন্যই নাকি রকেটটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ভেঙে পড়ে।' বললাম আমি।

'কাগজে অবশ্য তাই প্রকাশ করা হয়েছিল।' ধীরে ধীরে বললেন ডঃ ত্রিভুবন।

'আসল ব্যাপার কি তাহলে অন্য কিছু ছিল?' এবার প্রশ্ন করলেন ন্যাটা মিত্তির।

'হ্যাঁ, মিত্তির মশায়। আসল ব্যাপার একটু অন্যরকমই ছিল। আপনি 'স্টার-ওয়ার' কথাটা শুনেছেন নিশ্চয়?' ডঃ ত্রিভুবন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন ন্যাটা মিত্তিরের দিকে।

'জর্জ লুকাসের তৈরি সায়েন্স-ফ্যান্টাসী ছবি। বহুদিন আগে কলকাতায় এসেছিল। আমি তখন দেখেছিলাম।' জবাব দিলেন ন্যাটা মিত্তির।

ডঃ ত্রিভুবন একটু হাসলেন, 'নামটা অবশ্য ওই ছবি থেকেই এসেছে। তবে আসল 'স্টার-ওয়ার' কথাটার অর্থ হচ্ছে মহাকাশ যুদ্ধ। ব্যাপারটা যে সায়েন্স ফ্যান্টাসীর জগৎ থেকে একেবারে বাস্তব জগতে এসে পৌঁছেছে সেকথা পৃথিবী-বাসী প্রথম বুঝতে পারল 1983 সালের তেইশে মার্চ, যেদিন এক শক্তিশালী দেশের সর্বপ্রধান টেলিভিসানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তাঁর দেশবাসীকে পারমাণবিক যুদ্ধের আতঙ্ক থেকে আশ্বস্ত করার জন্য প্রকাশ করলেন মহাকাশ-ভিত্তিক ব্যালিস্টিক মিসাইল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কথা, যার সরকারী নাম হচ্ছে 'স্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভ' আর ডাক নাম হচ্ছে 'স্টার-ওয়ার'।' থামলেন ডঃ ত্রিভুবন।

'ব্যাপারটা আর একটু বুঝিয়ে বলুন ডঃ ত্রিভুবন,' বললেন ন্যাটা মিত্তির।

'ব্যালিস্টিক মিসাইল বলতে বোঝায় এমন অস্ত্র যা কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করার জন্য ছোঁড়া হয়। ব্যালিস্টিক মিসাইল এর নামকরণ করা হয় কোথা থেকে সেগুলি ছোঁড়া হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে। যেমন ইন্টার-কন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল বা ICBM ও সাবমেরিন লঞ্চড্ ব্যালিস্টিক মিসাইল বা SLBM। 'স্টার-ওয়ার' প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আসল কথা হচ্ছে শত্রুপক্ষের কোন ICBM অথবা SLBM যাতে ওঁদের দেশের কোন লক্ষ্যবস্তুকে ধ্বংস করতে না পারে। 'স্টার-ওয়ার' প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে ত্রি-স্তর। অর্থাৎ (1) শত্রুদেশ কোন মিসাইল ছোঁড়ার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তা ধ্বংস করে ফেলা। কোন কারণে তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে (2) মিসাইলটি যখন মহাকাশে উঠে আসবে সেইসময় মাঝপথে ওটাকে ধ্বংস করে ফেলা, আর তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে (3) মিসাইলটি যখন মহাকাশের ভিতর থেকে আবার আবহাওয়া মণ্ডলে ঢুকে লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে যাবে ঠিক তক্ষুনি ধ্বংস করে ফেলা।' ডঃ ত্রিভুবন যেন দম নেওয়ার জন্য থামলেন। আমি আর ন্যাটা মিত্তির এতক্ষণ এই ভয়াবহ ব্যবস্থার কথা শুনছিলাম আর আতঙ্কে শিউরে উঠছিলাম। আত্মরক্ষার নামে যে 'স্টার-ওয়ার' পদ্ধতির ব্যবস্থা করা হচ্ছে তাতে তো সমস্ত পৃথিবীই ধ্বংস হয়ে যাবে মুহূর্তের মধ্যে। হঠাৎ মনে হল ASLV ধ্বংসের কথা বলতে বলতে ডঃ ত্রিভুবন 'স্টার-ওয়ার' এর কথায় চলে এলেন কেন? তবে কি এ দুয়ের মধ্যে কোন যোগাযোগ আছে? কৌতূহল চাপতে না পেরে ডঃ ত্রিভুবন কথাটা সরাসরি জিজ্ঞাসা করতেই উনি বলে উঠলেন, 'তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছো সোমেশ্বর। বঙ্গোপসাগর থেকে ASLV-1 এর ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করার পর আমাদের বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন যে ASLV-1কে কেউ ইচ্ছে করে ধ্বংস করেছে। এর পরই আমার ডাক পড়ে দিল্লীতে।'

"স্টার-ওয়ার' সিস্টেমের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে কি রকেটও ধ্বংস করা যায়?' আমি জানতে চাইলাম।

ডঃ ত্রিভুবন বললেন, 'হ্যাঁ যায়।'

এর পরই আমার ডাক পড়ে দিল্লীতে...

'এরা তো তাহলে শান্তির উদ্দেশ্যে মহাকাশ গবেষণা করতে দেবে না আমাদের।' আমি মন্তব্য করলাম।

'আসলে ওরা এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চাইছে।' বললেন ডঃ ত্রিভুবন।

'কি রকম?' এতক্ষণে মুখ খুললেন ন্যাটা মিত্তির।

'সোমেশ্বরের কথাই ঠিক। ওরা আমাদের মহাকাশ গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যেতে দেবে না এবং ওদের অস্ত্রের ধার পরীক্ষা করবে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের রকেটগুলির উপরে।' খুব ক্ষুব্ধকণ্ঠে মন্তব্য করলেন ডঃ ত্রিভুবন।

'অর্থাৎ ওরা উন্নয়নশীল দেশগুলোর মতামতকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছে না। আপনার হয়তো মনে আছে ডঃ ত্রিভুবন যে 1985 সালের জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে ছটি দেশের একটি শীর্ষ সম্মেলন হয়! এই ছটি দেশ হচ্ছে আর্জেন্টিনা, গ্রীস, মেক্সিকো, সুইডেন, তানজানিয়া ও ভারত। এইসব দেশের নেতারা এই সম্মেলনে যুগ্মভাবে এই সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর করেন যে কোন দেশ কোন ধরনের 'স্টার-ওয়ার' এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বা অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করবে না। মহাকাশকে ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করা চলবে না। মহাকাশ ব্যবহৃত হবে একমাত্র সমস্ত মানবজাতির কল্যাণের কাজে।' বললাম আমি।

'তুমি ঠিকই বলেছ সোমেশ্বর।' বললেন ডঃ ত্রিভুবন। 'তবে এবার হয়তো আমরা একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারব ওইসব শক্তিগর্বে গর্বিত রাষ্ট্রগুলির দিকে।'

ডঃ ত্রিভুবনের শেষ কথায় আমি আর ন্যাটা মিত্তির দুজনেই একটু অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকালাম।

আমাদের মুখের ভাব লক্ষ্য করে ডঃ ত্রিভুবন একটু হেসে বললেন, 'আগামী সপ্তাহে ASLV-2কে মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হবে।'

'এটাকেও যদি ওরা ধ্বংস করে দেয়।' বলে উঠলেন ন্যাটা মিত্তির।

'তা যাতে না করতে পারে তার জন্য এখানে একদল বিজ্ঞানী কয়েকমাস ধরে প্রায় সারাদিনরাত খেটে একধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। গত মাসখানেকের উপর আমার গা ঢাকা দেওয়া ওই এরই কারণে।'

'আপনারা কি সফল হয়েছেন?' জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

ডঃ ত্রিভুবন বললেন, 'তাত্ত্বিকভাবে নিশ্চয়ই সফল হয়েছি। বাস্তবক্ষেত্রেও এইবার পরীক্ষা হয়ে যাবে। প্রতিরক্ষা দপ্তরের অনুমতি নিয়ে আপনাদের নেমন্তন্ন করেছি এই বিশেষ ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য।' কথা শেষ করে একটু হাসলেন ডঃ ত্রিভুবন।

এতক্ষণে আসল ব্যাপারটা জানতে পেরে মনে মনে খানিকটা স্বস্তি পেলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড কৌতূহলও হল। ডঃ ত্রিভুবন একদল সেরা বিজ্ঞানীদের নিয়ে কী এমন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছেন যার সাহায্যে 'স্টার-ওয়ার' এর বিভীষিকাকেও কাটানো যাবে! অস্ত্রের বদলে কি আবার অস্ত্র? ব্যাপারটা জানবার আগ্রহ দেখালাম। ডঃ ত্রিভুবন একটু হেসে বললেন, 'টপ সিক্রেট। এখন কিছু বলতে পারব না।'

তিন

ঊনত্রিশে সেপ্টেম্বর 1987। আজ ASLV-2 মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হবে। বিশাল কণ্ট্রোলরুম মানুষে ভর্তি। প্রধানমন্ত্রীর আসার কথা ছিল; কিন্তু শেষ মুহূর্তে বিশেষ জরুরী কাজে আটকে পড়ায় এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন নি। শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন।

কণ্ট্রোলরুমের একপাশে উঁচু প্লাটফরমের মত। এখানেই রয়েছে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি। অনেকগুলি টিভি পর্দা। একদল বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিদ ভীষণ ব্যস্ত। কিন্তু সবকিছু চলছে খুবই নিঃশব্দে। যাঁরা উৎক্ষেপণ দেখার জন্য কণ্ট্রোলরুমের আসন দখল করে বসে আছেন তারাও একেবারে চুপচাপ। অথচ সবার ভিতরে একটা চাপা উত্তেজনা। একটি কণ্ট্রোল-প্যানেলের সামনে বসে আছেন একজন যাঁর মাথায় হেলমেট বসানো। হেলমেট থেকে একগোছা তার এসে যুক্ত হয়েছে কণ্ট্রোল-প্যানেলের সঙ্গে। আমি আর ন্যাটা মিত্তির এই ভদ্রলোকের পিছনে বসার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। ডঃ ত্রিভুবন বসেছেন এই কণ্ট্রোল-প্যানেলের সামনে! প্যানেলের মাথায় যে কটা টিভি পর্দা বসানো রয়েছে ওগুলো একদম ফাঁকা। অন্যান্য দশ-বারোটা টিভি পর্দায় দেখা যাচ্ছে ASLV-2 উৎক্ষেপণের জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভাবছিলাম এবার সত্যিসত্যি কি ASLV-2কে মহাকাশে তোলা সম্ভব হবে। নাকি গতবারের মত এবারও উৎক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে কেউ ওটাকে লক্ষ্যচ্যুত করে ধ্বংস করে ফেলবে? জানি না ডঃ ত্রিভুবন কি সাবধানতা অবলম্বন করেছেন যাতে 'স্টার-ওয়ার' শক্তিকেও ফাঁকি দেওয়া সম্ভব? এখন শুধু অপেক্ষা করা।

হঠাৎ কণ্ট্রোলরুমের নিস্তব্ধতা ভেঙে কাউণ্ট-ডাউনের আওয়াজ ভেসে এলো দশ-নয়-আট-সাত-ছয় পাঁচ চার-তিন-দুই-এক-শূন্য। কাউণ্ট-ডাউন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড গর্জন ও ধোঁয়ার মধ্যে ASLV-2 ছুটে গেল মহাকাশের দিকে। কণ্ট্রোলরুমের মানুষগুলো প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে টিভি পর্দাগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন। ইলেক্ট্রনিক ঘড়ি সময় জানাচ্ছে। নব্বুই সেকেণ্ডের মাথায় আর একটি ঘটনা ঘটে গেল যার তাৎপর্য আমরা সেই মুহূর্তে ঠিক বুঝতে না পারলেও পরে বুঝেছিলাম। এই ঘটনার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। খালি টিভি পর্দাগুলোর বুকে ফুটে উঠল সামান্য ছোট্ট একটু আলোর বিন্দু। তার দুসেকেণ্ডের মধ্যে ওই আলোর বিন্দুটা ফেটে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল আতসবাজির মত। তারপরই টিভি পর্দা কটা অন্ধকার হয়ে গেল।

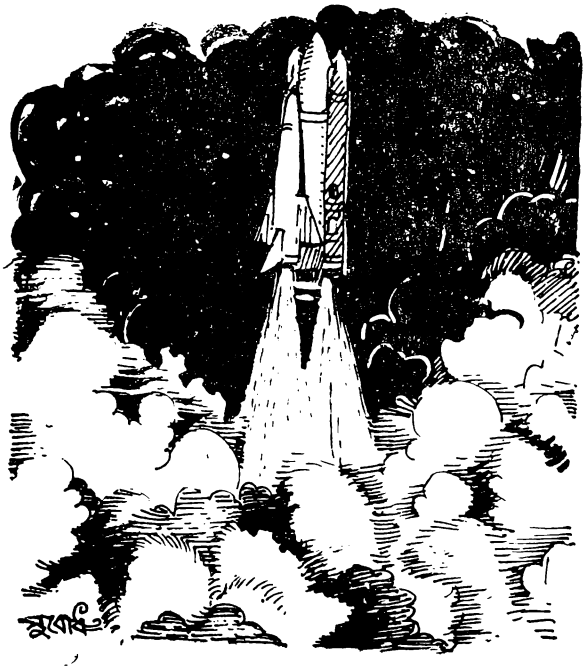

ASLV-2 দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে মহাশূন্যের দিকে

কণ্ট্রোলরুমের অন্য টিভি পর্দায় দেখা যাচ্ছে তখন ASLV-2 রকেটটি দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে মহাশূন্যের দিকে……। ডঃ ত্রিভুবন কণ্ট্রোল-প্যানেলের সামনে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। একটা কথা শুনতে পেলাম ওঁর মুখ থেকে, 'আর ভয় নেই, আমরা জিতে গেছি।'

চার

ASLV-2 রোহিণী উপগ্রহকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপিত করল। ইতিহাস সৃষ্টি করল ভারত মহাকাশ-গবেষণায়। কিন্তু কি ভাবে?

তার উত্তর অবশ্য আমরা পেলাম ডঃ ত্রিভুবনের মুখে। আমাদের প্রশ্নে ডঃ ত্রিভুবন ব্যাপারটা সহজ করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। ডঃ ত্রিভুবন ওঁর কোয়ার্টার্সের বারান্দায় বসে বলতে শুরু করলেন, 'স্টার-ওয়ার' এর যে অস্ত্র দিয়ে মিসাইল বা রকেট উৎক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করা হয় তাকে বলা হয় 'অরবিটাল গান সিস্টেম'। এই অস্ত্র-পদ্ধতির সাহায্যে শুধু উৎক্ষেপণের সময়েই নয়, মহাকাশে বা মহাকাশ থেকে যখন মিসাইল আবার আবহমণ্ডলে ঢুকে লক্ষ্যবস্তু ধ্বংসের জন্য ছুটে যায় তখনো তাকে ধ্বংস করা সম্ভব। এই অস্ত্র-পদ্ধতিতে কক্ষপথে স্থাপিত কোন মহাকাশযান থেকে সেকেণ্ডে দশ কিলোমিটারেরও বেশি জোরে অস্ত্র ছোঁড়া যায়। এই 'অরবিটাল গান সিস্টেম'কে কাজে লাগিয়ে যেসব দেশ নিজেরা মহাদেশকে নিজেদের কুক্ষিগত করতে চাইছে তারা অন্য কোন দেশের উদ্যমকে ধ্বংস করার কাজে উঠে পড়ে লেগেছে।'

'এরকম মারাত্মক অস্ত্রের মোকাবিলা করলেন কীভাবে?' জানতে চাইলেন ন্যাটা মিত্তির।

'দেশী পথেই বলতে পারেন।' জবাব দিলেন ডঃ ত্রিভুবন।

'কীরকম?' এবার আমি প্রশ্ন না করে পারলাম না।

'আপনারা রামায়ণ থেকে একথা জানেন যে পুষ্পক বিমান 'প্রভুর মনের গতি বুঝিয়া মারুতের ন্যায় দ্রুততর গমন করিতে পারিত।'

'পুষ্পক বিমান কি সত্যি সত্যি ছিল ডঃ ত্রিভুবন।' বললেন ন্যাটা মিত্তির।

'ছিল কি ছিল না তা বিতর্কের বিষয় মিত্তির মশায়। কিন্তু চালকের মানসিক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কোন যন্ত্র কি চলতে পারে? উত্তর হচ্ছে পারে। আধুনিক জেট বিমানের পাইলটদের বিমান পরিচালনকালীন বিমান নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয় ও সেইভাবে যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এতে বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হয়। এই সময় সংক্ষেপ করার জন্য পাইলটদের মগজের সঙ্গে জেট-বিমানের যান্ত্রিক যোগাযোগ ঘটানো হচ্ছে একটি বিশেষ ধরনের কম-পিউটারের মাধ্যমে। অবশ্য এজন্য পাইলটকে কিছু প্রাথমিক প্রশিক্ষণও নিতে হচ্ছে যাতে সে তাঁর মনের ইচ্ছেটাকে স্পষ্ট ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হয়। চিন্তার অস্পষ্টতা বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। পাইলটের মাথায় থাকবে একটি বিশেষ ধরনের হেমলেট। এই হেলমেটের তার কণ্ট্রোল প্যানেলের মাধ্যমে কম্পিউটার ও জেট-প্লেনের নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটাবে। এরপর পাইলট মনঃসংযোগকরা মাত্র জেট-বিমান পাইলটের মনের ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে শুরু করবে। আপনারা জানেন না এই বিশেষ বিষয় নিয়ে আমি অনেকদিন থেকে গোপনে গবেষণা চালাচ্ছিলাম।'

'এ কী সম্ভব?' ন্যাটা মিত্তির আবার কথার মধ্যে বাধা দিলেন।

'নিশ্চয়।' 'অরবিটাল-গান-সিস্টেম' থেকে ছোঁড়া দ্রুত-গতির অস্ত্রটিকে লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করার আগেই নষ্ট করতে হবে। কিন্তু কীভাবে? অনেক চিন্তা করে এই বিশেষ পদ্ধতিটিকেই কাজে লাগাবো ব'লে ঠিক করলাম। আফটার অল মানসিক শক্তিকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে ভারতবর্ষই পাইওনীয়র। আমরা সেই যৌগিক মনঃসংযোগ করার ব্যাপারটাকে একটু স্থূলভাবে নানারকমের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজে লাগালাম। এবং এ ব্যাপারে আমরা যে সফল হয়েছি তাতো নিজেরাই দেখলেন। 'ডঃ ত্রিভুবন, এ যে এক অভাবনীয় ব্যাপার।' আমি মন্তব্য করলাম।

'সত্যিই তাই সোমেশ্বর বাবু।' বললেন ন্যাটা মিত্তির। তিনি এও বললেন, 'স্টার-ওয়ার' এর আতঙ্কে সমস্ত পৃথিবী

যখন আতঙ্কগ্রস্ত তখন ডঃ ত্রিভুবনের নেতৃত্বে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এমন একটি শক্তি আবিষ্কার করলেন যা পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষকে অভয় দেবে।'

আমি যোগ করলাম, 'শুধু তাই নয়, যেসব বৃহৎ শক্তি 'স্টার-ওয়ার' ব্যবস্থা করে পৃথিবীর মধ্যে নিজেদেরকে সব থেকে শক্তিশালী বলে মনে মনে গর্বিত হচ্ছেন এবার তাঁদেরও নতুন করে ভাবতে হবে।'

'সোমেশ্বর তোমরা ঠিকই বলেছো। কোটি কোটি টাকা যুদ্ধ আর যুদ্ধাতঙ্ক সৃষ্টির জন্য খরচ না করে এ টাকা সারা পৃথিবীর শান্তির জন্যে খরচ করলে পৃথিবীর মানুষ সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারবে।' ডঃ ত্রিভুবনের কথা শেষ হতে না হতে একজন মিলিটারী অফিসার এসে ডঃ ত্রিভুবনকে স্যালুট জানিয়ে একটা টেলেক্স এগিয়ে দিলেন।

টেলেক্সটা প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দনা!

ছড়া

বিজ্ঞানের ধাঁধা
শৈলেনকুমার দত্ত

গ্যালিলিও নিউটন সূত্রটা কার কী
প্লবতায় প্রমাণিত বস্তুর ভার কি!
টেলিফোন বের করে কে প্রথম দেখালেন
টেলিগ্রাফে বার্তাটা পাঠাতে কে শেখালেন!
কোন্ দেশে দুই ভাই আকাশেতে ভাসলেন
ক্যামেরায় ছবি তুলে কে প্রথম হাসলেন!
রেডিওতে গান শুনি, মার্কনী বানালেন
তার পরে ছবি দেখা টিভিতে কে চালালেন!
সিনেমা কি গ্রামোফোন খুঁটিনাটি আরও কি
কার নামে বিখ্যাত! বলো দেখি পার কি।
ভারতেই বসে বসে মাথাটা কে ঘামালেন!
বুদ্ধির মারপ্যাঁচে ম্যালেরিয়া থামালেন।
কেন এত বিখ্যাত পাস্তুর নামটি—
কী দেখিয়ে লিস্টার বাড়ালেন দামটি!
ওষুধের দুনিয়াতে ফ্লেমিং আর ফিনলে
দুই কুরী, জেনারকে কীসে কীসে চিনলে!
হার্ভের নাম কীসে! প্রিস্টলে কী করেছেন!
গাছেদের প্রাণ আছে যন্ত্রে কে ধরেছেন!
টেরিছেলি-ডালটন-আলবার্ট আরও কি—
নোবেলের খ্যাতি কীসে, বলো দেখি পার কি!

হাওয়ার কথা
অশোককুমার মিত্র

বই পড়ে, দেখে-শুনে, ভেবে ভেবে·বিস্তর—
দেখিয়াছি এ জগতে বায়ু আছে ত্রিস্তর।
একস্তরে চলাচল দেখি শুধু দৃশ্যের,
নানা ছবি চোখে পড়ে চেনা-জানা বিশ্বের।
কেউ দেখি ঢ্যাঙা-পানা ··মেঘ ভেসে চলে ওই···
পথে জল জমা দেখে কারো মুখ ক্রুদ্ধই।
বনে ফুল ফুটে যায়, মাঠে ফলে শস্য
ঘাটে জল ছল্‌কায়—এ সকলি পশ্য
বাতাসের আর স্তর বয়ে চলে শব্দ
টুক্ ক'রে ফল পড়ে হেন জ্ঞান-লব্ধ
কাণ্ডটা জানা যায়। হিস্ হিস্···ফুস্‌ফাস্···
দমাদম্ কটাকট্ বাতাসেরই ঢুস্‌ঢাস্।
তারো চেয়ে বড় কথা বাতাসের ডানাতেই
গন্ধেরা ভেসে আসে—এখবর জানা নেই
এমন মানুষ আর আছে নাকি সত্যি!
ঘ্রাণে ভোজ হয়, হয়, গায়ে লাগে গত্তি
পরিমাণে অবশ্য পুরো নয় অর্ধ।
(যা চড়া বাজার আজ, ঘাম ঝরে দরদর।)
তখনও মিলবে ভোজ? তাও বিনা মূল্যে
বাতাসের কৃপাতেই; হোক আধা কুল্লে।

লাল-সবুজ আলোর রহস্য

পার্থসারথি চক্রবর্তী

বাড়ির সকলেই সৌরাংশুকে এই চাকরি নিতে মানা করেছিল। তাছাড়া নেপালে নাকি আজকাল দারুণ আন্তর্জাতিক চোরাকারবারী শুরু হয়েছে। ছোটকা বলেছিল ভাল লোককেও ধরে নিয়ে জেলে পুরে দিতে পারে, কে দেখতে যাচ্ছে!

সৌরাংশু ওসব কথায় কান দেয়নি মোটেই। তবে টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার একটা খবর ওকে খুবই ভাবিয়ে তুলেছিল। নেপালে কে নাকি নিউক্লিয়ার রিয়্যাকটরে জ্বালানীর থোরিয়াম যাকে বলে 'ফাস্ট ব্রিডার' তৈরি করার এক আশ্চর্য উপায় বের করে অন্য দেশে সেটা চালান করে দারুণ পয়সা লুটছে। বহু চেষ্টা করেও এই লোককে ধরতে পারা যাচ্ছে না। কিন্তু এসব সাত পাঁচ ভেবে লাভ নেই। যা হবার তাতো হবেই।

ছোট বোন লিলিও বলেছিল—দাদা যাচ্ছিস তো নেপালে, ওখানে শুনলাম—'ফাস্ট ব্রিডার মেটাল' কে একজন নাকি তৈরি করছে, তোকে আবার তার মধ্যে জড়িয়ে না ফেলে।

সৌরাংশু এসব হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর একদিন রাতে জিনিস-পত্তর লট-বহর সব নিয়ে উঠল জীবনের প্রথম কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে—দেরাদুন এক্সপ্রেসে হাওড়া স্টেশনে রাত নটায়।

ট্রেনে ভাল ঘুম হয়নি সৌরাংশুর। রিজার্ভেসন কামরা তো কি, রাত দুপুরে যত রাজ্যের গেঁয়োলোক সব হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। সেই সঙ্গে গোলমাল, আর চেঁচামেচি। ওরা নাকি সবাই কোন ইলেকসন মিটিং-এ যাচ্ছে। সৌরাংশু একবার চেকারের খোঁজ করেছিল—কিন্তু তার টিকি দেখা যায়নি। অগত্যা থ্রি-টায়ার বার্থের উপরের সীটে চুপচাপ চোখ বন্ধ করে থাকা ছাড়া আর উপায় কি। সৌরাংশুর অবশ্য শেষ রাতের দিকে একটু তন্দ্রা এসেছিল—কিন্তু ডিহিরি-অন্-শোন স্টেশনে গরম চায়ে—চাই···পুরী চাই এই হাঁকডাকে সেটাও গেল টুটে!

যাই হোক পাটনা স্টেশনে অনেক লোক নেমে গেল। সেই সঙ্গে মিটিং ওয়ালারাও। সৌরাংশু এক কাপ চা খেয়ে হাত পা ছড়িয়ে বসল।

সৌরাংশু রায় সবে এই বছর এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বলতে হবে—পাশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই চাকরি। কলকাতা থেকে অবশ্য একটু দূরে—কিন্তু তাতে কি এসে যায় সৌরাংশুর। ওর এমনিতেই কোলকাতার ভীড়ভাট্টা ভাল লাগে না। তাই নেপালে ব্রেথওয়েট বার্ন জেসপ সংক্ষেপে বি বি জে কোম্পানী থেকে যখন বালানে এই চাকরির প্রস্তাব এল তখন কোনও রকম দ্বিধা না করে এক কথায় সে রাজী হয়ে গেল।

নেপালের এই জায়গার নাম বালান, বিরাটনগরের খুব কাছেই। ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়ও বলা যায়। শহর থেকে দূরে, কোলাহল ও ব্যস্ততার লেশমাত্র চিহ্ন নেই এখানে। ভারত ও নেপাল সরকারের সহযোগিতায় কিছু-দিন আগে বড় বড় সব রাস্তা তৈরি হয়েছে। লোকজনও এখানে অনেক কম। ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ, ডাহুকের

ডাক, উতলা বাতাসের এলোমেলো আলিঙ্গন মনটাকে ভারী নুইয়ে দেয়।

মজফরপুর অথবা জয়নগর দিয়েও বালানে আসা যায়। তবে সৌরাংশুকে যেতে হবে বেনারস হয়ে। কোম্পানীর কিছু জরুরী কাগজপত্র ও সেইসঙ্গে নিতে হবে একজন এ্যাসিস্টাণ্টকে। ওরাই জিপ গাড়ি আর পেপার নিয়ে রেডি থাকবে বেনারস স্টেশনে।

সৌরাংশু জানালার বাইরে দিয়ে তাকাল। ট্রেন বেনারসের গঙ্গা পার হচ্ছে এখন। ওপারেই বেনারস। সৌরাংশু খুব ছোটবেলায় তার বাবা মার সঙ্গে বেনারসে এসেছিল। তার অল্প অল্প স্মৃতি মনে আছে এখনও। গঙ্গার তীরের স্নিগ্ধতা, তার শীতল বাতাস, মন্দিরের ঘণ্টা-ধ্বনি—শৈশবের সেই মধুর স্মৃতি একটা ঝাপটা মেরে গেল সৌরাংশুকে। সত্যি, ভারী ভাল লাগে গঙ্গার ঘাট আর মন্দিরগুলো ট্রেনের জানালা থেকে দেখতে।

দেরাদুন এক্সপ্রেস বেনারস স্টেশনে ঢুকছে। গাড়ি প্রায় দেড় ঘণ্টা লেট।

সৌরাংশু জিনিসপত্তর আগেই গুছিয়ে রেখেছিল। হঠাৎ তার মনে হল—এ্যাসিস্ট্যাণ্ট তো স্টেশনে আসবে, কিন্তু দুজনের কেউই তো কাউকে চিনি না। তাহলে কি করে দেখা হবে?

স্যুটকেশ আর বিছানা নিয়ে সৌরাংশু প্ল্যাটফর্মে নামল। ওর কামরা এঞ্জিনের কাছে। কাজেই প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি আসতে কিছুটা সময় গেল।

বুক-স্টলের পাশে একজন সুদর্শন যুবক একটা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্ল্যাকার্ডে লেখা রয়েছে—সৌরাংশু রায়।

সৌরাংশু এগিয়ে এসে তার পরিচয় দিল। যুবকটি ভারী সপ্রতিভ—সে একগাল হেসে বলল,—আমার নাম নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়। বালানে আপনার সঙ্গে আমিই যাবো। গাড়ি স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বেনারস অফিসের টুকিটাকি কাজ সেরে নিল সৌরাংশু। তারপর নীলাঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে জীপ গাড়িতে গিয়ে বসল। জয়নগর স্টেশন হয়ে ওদের বালান পৌঁছতে হবে।

ড্রাইভার ছোটনলাল উত্তরপ্রদেশের লোক। বেশ স্ফূর্তি-বাজ সেইসঙ্গে সংগীতরসিকও বটে। ধুলোর ঝড়ের মধ্যে দিয়ে সদ্য কেনা কোম্পানীর মারুতি গাড়ি ছুটে চলল—গাড়ির পিছনের স্পীকারে তখন ছোটনলালের হিন্দিগান—'চল্ চলরে নওজওয়ান, রুকনা তেরা কাম নেহি, চলনা মেরা কাম, চল্ চল্‌রে নওজোয়ান।' সৌরাংশুকে মোটামুটি নির্ভীক বলা চলে। শুধু মাঝে মাঝে তার নেপালে টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়ার সেই 'ফাস্ট ব্রিডার' চোরা চালানের কথা মনের পর্দায় ভেসে উঠছিল।

সৌরাংশু, নীলাঞ্জন ও ছোটনলাল সবাই যখন বালানে পৌঁছলো তখন মর্ত্যের আকাশ যেন ফুটো হয়ে অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। এঞ্জিনিয়ারদের কাজের সাইট—আশে পাশে কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্ন মাত্র নেই। উঁচু-নিচু এবড়ো খেবড়ো পাথরের চাঁই ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে আছে। দূরে একটা ছোট্ট নদীর ওপর ব্রীজের সুপারস্ট্রাকচার সবে শুরু হয়েছে। ওয়ার্কার্সদের জন্য টেম্পোরারী মাথায় এ্যাজবেস্টস দেওয়া ছোট ছোট ঘর।

সৌরাংশুর বাংলোটা ছোট্ট—কিন্তু বেশ সুন্দর। ছোটন-লাল হর্ন দিতেই বৃষ্টির মধ্যে বাংলো থেকে একজন বুড়ো লোক—সম্ভবত সে সৌরাংশুর বাবুর্চি, ছাতা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে এল। ছোটনলাল আর নীলাঞ্জন জিনিসপত্তরগুলো ঘরের মধ্যে পৌঁছে দিয়ে ওদের নিজেদের আস্তানায় চলে গেল।

বুড়ো বাবুর্চির নাম এক্সাম মিঞা। রান্নাবান্না সে আগেই সেরে রেখেছিল।

সৌরাংশুর খুব টায়ার্ড লাগছে এখন। কোনরকমে নাকে মুখে কিছু গুঁজে সে বিছানার মধ্যে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়তেই চোখে নেমে এল রাজ্যের ঘুম—যেন কত বছর সে ঘুমোয় নি।

নেপালের সবচেয়ে বড় শহর হল কাঠমাণ্ডু, তারপর বিরাটনগর। বালান থেকে বিরাটনগর জীপে যেতে সময় লাগে প্রায় ঘণ্টা তিনেক। ওদের প্রোজেক্টের বেশির ভাগ কাজকর্মের জন্যই বিরাটনগরে একটা অফিস আছে। সেখানে নেপাল সরকারের অনেক কর্মচারীও নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন।

সৌরাংশুর কাজ হল নেপালে ভারত সরকারের সহযোগিতায় বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রীজ তৈরি করা। ব্রীজ তৈরি করতে গেলে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে হাত দিতে হয়—এক—সাবস্ট্রাকচার, দুই—সুপার স্ট্রাকচার। সাব স্ট্রাকচার তৈরি হয় জলের মধ্যে, ভিত গেঁথে বড় বড় থাম বা পিলার বানিয়ে। সেই পিলারের ওপর বিভিন্ন কৌশল খাটিয়ে তৈরি করা হয় খাঁচার মতো সুপার স্ট্রাকচার। সৌরাংশু তদারকি করবে শুধু সাবস্ট্রাকচারের কাজ—এ ব্যাপারে সে একজন স্পেসালিস্টও বটে।

প্রথম কদিন বিভিন্ন লোকের সঙ্গে আলাপ করে, কাজ কতটা এগিয়েছে, কোথায় কোথায় অসুবিধা হচ্ছে এসব জানতেই সময় কেটে গেল সৌরাংশুর। ভোরবেলা ছটার সময় এককাপ চা খেয়ে সে বেরিয়ে পড়ত—তারপর সারা-দিনের অজস্র এঞ্জিনিয়ারিং কর্মকাণ্ডের নায়ক, বেশ ভালোই লাগছিল তার। তার উপর যেদিন ঢালাইয়ের কাজ থাকত সেদিন তো আর কথাটি নেই। সারারাত ওকে জেগে থাকতে হোত।

আজ রবিবার। কাজ-কর্ম বন্ধ। সৌরাংশু বাড়ি থেকে বেরোয়নি। দফায় দফায় কফি বানাচ্ছে এক্সাম মিঞা। আর

সৌরাংশু বসে বসে আর্থার ক্লার্কের সায়েন্স ফিকসন পড়ছে মনোযোগ দিয়ে। এমন সময় বাইরে কলিং-বেল বেজে উঠল।

সৌরাংশু দরজা খুলে দিতেই একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক, বয়স পঞ্চাশ কি তার কিছু নিচেই হবে, হাতে একটা বড় ব্যাগ, মাথায় বিলিতি হ্যাট, নীল কোট-প্যান্ট পরা, দীর্ঘদেহী নাকটা রোমানদের মতো খাড়া—হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে বললেন—আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। আমার নাম ডাঃ ব্রজেশ শর্মা। ও. এন. জি. সি.—অয়েল এ্যাণ্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনের রেসিডেন্ট ডাক্তার।

সৌরাংশু প্রতিনমস্কার জানিয়ে ওর পরিচয় দিল। ডাঃ শর্মা তার বিলিতি হ্যাট মাথা থেকে নামিয়ে টেবিলের ওপর রাখলেন। এক্সাম মিঞা একটা ইজি-চেয়ার এনে ওঁকে বসতে দিল।

একথা সেকথার পর জানা গেল ডাঃ ব্রজেশ শর্মা পেশায় ডাক্তার হলে কি হবে—ওঁর সখ হচ্ছে দেশ ভ্রমণ করা এবং সেইসঙ্গে সেখানকার জল-মাটি-বাতাস কতটা দূষিত হচ্ছে তার বিবরণ সংগ্রহ করে রাখা। অর্থাৎ ডাঃ শর্মা একজন ডাক্তার তো বটেই, সেই সঙ্গে তিনি একজন এনভাইরন-মেণ্ট স্পেশালিস্ট-ও। সৌরাংশুকে তিনি ওঁর ডাইরিটা বের করে নেপালের বিভিন্ন অঞ্চলের কোনটা কি রকম ভাবে দূষিত হচ্ছে তা দেখালেন। তবে মনে হল এই অঞ্চলের পলিউসন্ বা দূষণ ভারত বিশেষ করে কোলকাতায় পরিবেশ দূষণ থেকে অনেক অনেক কম।

ডাঃ শর্মার কাছে যে হাত ব্যাগটা ছিল আসলে ওটা হচ্ছে একটা কীট-ব্যাগ।

এই কীট ব্যাগে যে সব যন্ত্রপাতি রয়েছে তাই দিয়ে মাটি জল এইসব পরীক্ষা করা যায়। এছাড়া অবশ্য বাতাসের বিভিন্ন দূষণযুক্ত গ্যাস পরিমাপ করার জন্যে তার কাছে একটা নতুন যন্ত্র রয়েছে। এই যন্ত্র থেকে সরাসরি বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, সালফার-ডাই-অক্সাইড, ভাসমান কার্বন কণা ও সীসার পরিমাণ জানা যাবে। জার্মানীর তৈরি এই যন্ত্রটি ওঁকে একজন বন্ধু প্রেজেন্ট করেছেন গত বছর।

সৌরাংশুর ভারী ভাল লাগছিল ডাঃ শর্মাকে। ওর মনে হল প্রকৃতির জীবন্ত সজীব বস্তু পর্যবেক্ষণে যে অফুরন্ত আনন্দ আছে—প্রাণহীন জড় বস্তু পর্যবেক্ষণের সময় কি সেই আনন্দ পাওয়া যায়? একটা অজানা পাখি অথবা পতঙ্গের পিছনে ধাওয়া করে মনটা যে রকম কল্পনায় রঙ্গীন হয়ে ওঠে—প্রাণহীন জড় পদার্থ বিশ্লেষণে বোধহয় ততটা পাওয়া যায় না। তাই মনে মনে সে খুব তারিফ করতে লাগল ডাঃ শর্মাকে।

ডাঃ শর্মা আর মাত্র মাস খানেক এখানে থাকবেন। বিরাট নগরে একটা হোটেলে তিনি উঠেছেন। হোটেল থেকে গাড়ি ভাড়া নিয়ে তিনি নেপালের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিরাটনগরের হোটেলের ঠিকানা জানিয়ে এবং সৌরাংশুকে এই সপ্তাহেই একদিন সেখানে নিমন্ত্রণ জানিয়ে ডাঃ শর্মা বিদায় নিলেন।

সারাদিন কাজ আর শুধু কাজ। এর মধ্যে আবার টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার 'ফাস্ট ব্রিডার' এর চোরা চালানের কথা মনে করিয়ে লিলির চিঠি এসেছে।

আজ খুব ভোরে উঠে পড়ল সৌরাংশু। অনেক কাজ হাতে। নীলাঞ্জনকেও ও জীপ নিয়ে তাড়াতাড়ি আসতে বলেছে। মিরিং-এ নতুন একটা ব্রীজ তৈরির জন্য দু'এক দিনের মধ্যেই সব কাজ শেষ করতে হবে।

নীলাঞ্জন আর ছোটনলাল সাত সকালেই জীপ এনে হাজির। মিরিং এখান থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে। দুটো ছোট ছোট ব্রীজ পেরিয়ে যেতে হয়। দ্বিতীয় ব্রীজটা পেরুতেই সৌরাংশুর চোখে পড়ল ডানদিকের ছোট্ট একটা টিনের বাড়ি। বেশ উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সাধারণতঃ এত ছোট বাড়িতে এই রকম বড় পাঁচিল ওর চোখে পড়েনি। কি রকম যেন একটা কৌতূহল হ'ল সৌরাংশুর। নীলাঞ্জন পাশেই বসেছিল। বোধহয় ব্যাপরটা বুঝতে পেরে সে জিজ্ঞেস করল—'অদ্ভুত লাগছে বাড়িটা তাই না?'

সৌরাংশু উত্তর দিল—'চল একটু ভেতরে ঢুকে দেখা যাক।' ছোটনলালের উৎসাহও নেহাৎ কম নয়। সে অমনি জীপ গাড়িটাকে ঘুরিয়ে একসেলাটরে চাপ দিয়ে একনিমেষে ঐ বাড়ির কাছে এসে হাজির!

না, বাড়িটাকে যত ছোট মনে করা গিয়েছিল আসলে সেটা তত ছোট নয়। কলিং বেল বাজাতেই একজন লোক, মাথায় জটা, বেশ লম্বা দাড়ি, বয়স বছর পঞ্চাশ বাহান্ন এইরকম হবে, চোখে চশমা, নাতিদীর্ঘ কিন্তু গায়ের রং উজ্জ্বল, হঠাৎ দেখলে সন্ন্যাসী বলে ভুল হবে—বাইরে বেরিয়ে এসে বললে—'কাকে চাই?'

সৌরাংশু প্রতিনমস্কার জানিয়ে নিজের পরিচয় দিলো, নীলাঞ্জনের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিল।

লোকটা কেমন যেন নিমরাজি হয়ে ওদের বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল।—'আমার নাম জানকী পট্টনায়ক'—বলতে বলতে ঢুকলেন সন্ন্যাসীর মতো লোকটা। 'কটক কলেজে ফিজিক্স পড়াতাম, এখন রিটায়ার করে এখানে এসে বিশ্রাম করছি।' —'বাঃ ভারী সুন্দর মূর্তিটা তো'—'একটা নারীমূর্তি হাতে নিয়ে নীলাঞ্জন বলে উঠল।

জানকী পট্টনায়ক উত্তর দিলেন—'ওটা ফাইবার গ্লাসের তৈরি, একটা ছাঁচ থেকে এটা আমি বানিয়েছি। আরও অনেক তৈরি করেছি এই ফাইবার গ্লাস থেকে। রেজিন এবং পলিইউরিথেন ফোম দিয়ে—এইসব জিনিস তৈরি করতে হয়। বেশ হাল্কা—দামেও সস্তা পড়ে। নেপালের বাজারে মোটা-মুটি এর চাহিদাও হয়েছে, অল্প স্বল্প যা টাকা পাই তাতে আমার একার চলে যায়।'

'আপনি একা এই বাড়িতে থাকেন'—সৌরাংশু জিজ্ঞাসা করল।

—'বিয়ে-থা করিনি তো, তাছাড়া খুব ছোটবেলায় বাবা মা-কে হারিয়েছিলাম, কাজেই একা থাকার অভ্যেস আমার প্রায় জন্ম থেকেই বলতে পারেন।' রিটায়ার্ড প্রফেসর জানকী পট্টনায়ক ওড়িশার লোক হলে কি হবে—এতো চমৎকার বাংলা বলতে পারেন যে অবাক হয়ে যেতে হয়। উনি ওড়িশার লোক আগে থেকে না বললে কেউ বুঝতেই পারবে না যে উনি বাঙালী নন।

জানকী পট্টনায়ক ওদের আর একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। এটা লম্বাটে ধরনের ঘর—হলঘরের মত অনেকটা দেখতে। সেখানে অনেকগুলো পুতুল পড়ে আছে। তার পাশেই ছাঁচ।

নীলাঞ্জনের ভারী ইচ্ছে সে একটা ফাইবার গ্লাসের তৈরি পুতুল নেয়। জানকী পট্টনায়ককে বলতেই উনি বললেন—'বেশ তো, এই পুতুলটা তুমি নিয়ে যাও।'

—'কত দাম?'—নীলাঞ্জন জিজ্ঞাসা করল।

জানকী পট্টনায়ক হেসে বললেন—'তোমাকে বাপু আর

ব্রীজটা পেরুতেই চোখে পড়ল ডানদিকের ছোট্ট একটা টিনের বাড়ি

দাম দিতে হবে না, ওটা তোমাকে আমি প্রেজেণ্ট করলাম।'

নীলাঞ্জন তো বেজায় খুশি! সৌরাংশু ওর বালানের ঠিকানা দিয়ে তারপর নমস্কার জানিয়ে ছোটনলালের গাড়িতে এসে উঠল।

নীলাঞ্জন বলল—'লোকটাকে দেখে তো ভালই মনে হল, কিন্তু আমাদের দেখে উনি প্রথমে কেমন হকচকিয়ে উঠেছিলেন তাই না?'

'হ্যাঁ, প্রফেসর লোক তো, ওঁরা সাধারণ আর পাঁচটা লোকের থেকে আলাদা হন, সেই জন্যেই বোধহয় প্রথমটা ওই রকম আচরণ করেছিলেন।'

ছোটনলাল বলল—'কিন্তু অত ছোট বাড়িতে ওইরকম উঁচু বিরাট পাঁচিল দেওয়ার মানেটা কি?'

সৌরাংশু বলল—'হয়ত উনি চোর-ছ্যাঁচোড়ের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই অত বড় পাঁচিল দিয়েছেন, কিন্তু নেপালের এই জনমানবহীন জায়গায় চুরি করতে এখানে আসবেই বা কোন ভাগ্যবান চোর?'

নীলাঞ্জন ফাইবার গ্লাসের পুতুলটাকে যত্ন করে একটা বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল। সত্যিই পুতুলটার রূপের তুলনা হয় না। দুটো হাত কাটা, মুখটা একটু নিচের দিকে নামানো একটা নারীমূর্তি, ওভাল সেপড্ অর্থাৎ অনেকটা ডিমের মতোন দেখতে মুখটা, টানা বাঁশির মতো নাক, চুলগুলো ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে, চোখ দুটো খুব ভাসা-ভাসা, মুখে মৃদু হাসি লেগে আছে, সবটা মিলে ভারী লাবণ্যময়ী চেহারা এই পুতুলের। সৌরাংশুর বাড়িতে অনেকটা এইরকম চেহারার একটি জাপানী চিনেমাটির পুতুল ছিল—ওর মা'র ছোট আলমারীতে। কিন্তু তারপর কোথায় যে সেটা হারিয়ে গেল তা আর এখন এতবছর বাদে মনে পড়ে না।

ছোটনলাল নেপালের রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে তার জীপ জোরসে ছুটিয়ে চলেছে—ঘণ্টায় প্রায় সত্তর কিলোমিটার বেগে। দূরে উল্টোদিক থেকে আর একটা জীপ গাড়ি আসছে, তবে ছোটনলালের মতো এইরকম জোরে নয়।

সৌরাংশু ছোটনলালকে একটু আস্তে গাড়ি চালাতে বলল। উল্টোদিকের জীপটা অনেক কাছে চলে এসেছে এখন। এটার মাথার হুড সম্পূর্ণ খোলা। সৌরাংশু দূর থেকে দেখে বুঝল জীপে টুপি মাথায় আর মুখে বর্মা চুরুট নিয়ে বসে আছেন ডাঃ ব্রজেশ শর্মা।

—'কেমন আছেন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব?' গাড়ি থেকে মুখটা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন ডাঃ শর্মা।

—'ভালোই, আপনার খবর কি?'

—এই চলছে একরকম'—উত্তর দিলেন ডাঃ শর্মা।

নীলাঞ্জন ফাইবার গ্লাস পুতুলের বাক্সটা হাতে নিয়ে বসেছিল। সেটার দিকে নজর পড়তেই ডাঃ শর্মা বলে উঠলেন—'কি আছে ওর মধ্যে ভায়া, খাবার-দাবার নাকি?'

নীলাঞ্জন হেসে পুতুলটাকে বের করলো, তারপর ডাঃ শর্মার হাতে ওটা দেখতে দিল।

ডাঃ ব্রজেশ শর্মা পুতুলটাকে বেশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। তারপর গম্ভীর হয়ে নীলাঞ্জনকে বললেন—'পুতুলটা দিন তিনেকের জন্য ধার দিতে পার? খুব জরুরী দরকার।'

নীলাঞ্জন তো শুনে অবাক। এই সুন্দর পুতুলটা ভদ্রলোক বেমালুম চেয়ে বসলেন! একটু চক্ষু-লজ্জাও ওঁর হল না! সৌরাংশুর দিকে একটু আড় চোখে তাকিয়ে পুতুলটা ডাঃ শর্মার হাতে সে দিল।

—'কথা দিচ্ছি, আজ বুধবার ঠিক সামনের শনিবার দিন বিকেলেই ফেরৎ দিয়ে দেব। আচ্ছা চলি, ধন্যবাদ।' এই বলে ডাঃ ব্রজেশ শর্মা হুস করে তার গাড়িটা নিয়ে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ব্যাপারটা দেখে ওরা তিনজনেই বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল। সামান্য একটা পুতুলের উপর ডাঃ শর্মার এত আকর্ষণ হবার কি কারণ থাকতে পারে?

সারাদিন নানা ধরনের মাপজোপ করে, সৌরাংশু, নীলাঞ্জন আর ছোটনলাল বালানের পথে ফিরে আসছে। সন্ধে প্রায় ঘনিয়ে এল। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিও পড়ছে। মিরিং-এর কাছে ব্রিজটার ওপর উঠতেই ডাঃ জানকী পট্টনায়কের বাড়ি আর উঁচু পাঁচিল দেখা গেল। সৌরাংশু দেখল—বাড়ির ভিতর অনেকগুলো গ্যাস ম্যাণ্টল জ্বলছে—তাদের রং নীলাভ-সবুজ, ভারী সুন্দর লাগছে দেখতে। নীলাঞ্জনের ভারী ইচ্ছে প্রফেসর জানকী পট্টনায়কের বাড়ি থেকে আর একটা পুতুল নিয়ে আসে। কিন্তু সৌরাংশুর বাড়ি ফেরার ব্যস্ততা দেখে আর সে কথা বলার সাহস হলো না।

শুক্রবার দিন সকালে ডাঃ ব্রজেশ শর্মা এলেন। নীলাঞ্জনের তখন ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, ও কাজে বেরুবার জন্য রেডি হচ্ছিল।

ডাঃ শর্মা বললেন—'চলুন এঞ্জিনিয়ার সাহেব, একটা রহস্যের সমাধান করে আসা যাক্।'

সৌরাংশু তো একেবারে অবাক। রহস্যটাই বা কি, আর তার সমাধানের প্রশ্নই বা আসছে কোত্থেকে!

ডাঃ শর্মা বললেন—'আসুন তো আমার সঙ্গে, তারপর দেখবেন মজাটা।'

সৌরাংশুকে একদম টানতে টানতে নিয়ে বাইরে এলেন তিনি। বেশ বড় জীপ। গাড়িতে আরও চার-পাঁচ জন সশস্ত্র প্রহরী রয়েছে। সৌরাংশুর ব্যাপারটা দেখে ভারী অবাক লাগছিল।

গাড়ি এসে সোজা থামল যেখানে সে বাড়িটা ওর চেনা —প্রফেসর জানকী পট্টনায়কের উঁচু পাচিল ঘেরা বাড়ি।

বাড়ির বাইরের ঘরের দরজা খোলা। সেখানে আরও চার পাঁচ জন লোক বসে আছে। কোলের দিকে একটা

[শেষাংশ 57 পৃষ্ঠায়]

খুদে বৈজ্ঞানিক

দিলীপ দাস

দেখি, খুদের যন্ত্রমানব কতটা এগোলো।
!!
কাম ইন প্লিজ।
সিট ডাউন প্লিজ মিস্টার পটল।
আরিব্বাস! খুদের তৈরী সেই যন্ত্র মানবটা— কথা কইছে, আবার আমার নাম ধরে ডাকছে!
অদ্ভুত!
এটা রেখে খুদে গেল কোথায়? রোবোটটা একা পেয়ে বকাঝকা দেবে না তো!
আমার নাম রবি। আমাকে ভয় পাবার কিচ্ছু নেই। শ্রীবিজ্ঞানিক খুদে একটু বাইরে বেড়িয়েছেন। কোন কিছু বলার থাকলে আমাকে বলতে পার, আমি ওঁকে বলে দেবো মিস্টার পটল।
কি সাংঘাতিক, এযে একেবারে মানুষের মতো!
কেন মিস্টার পটল, আমাকে মানুষের মতো দেখতে নয় বলে কি আমার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না?
এমন সময়
হ্যাঁরে পটলা তুই এখানে একা একা কি করছিস?
অ্যাঁক, প-পিসিমা!
আমি খুদের কাছে এসেছিলুম। ও আমাকে আসতে বলেছিল, কিন্তু এসে শুনি ও বাইরে কোথায় গেছে।
হতচ্ছাড়াটা যে কোথায় যায় কোথায় থাকে! একটু আগে ওকে দেখলাম ঘরে কি ঠুক্ ঠুক্ করছে! এদিকে ওর জলখাবারটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।
ম্যাডাম পিসিমা।

কে, তুমি আমাকে কিছু বললে বাবা?
কই- না-তো।
ও, তাহলে হয়তো আমিই ভুল শুনেছি!
পিসিমা।
স্পষ্ট শুনেছি- এবার কে ডাকলো?
আ-আমি নয় পিসিমা, ও-।
ও মানে, এখানে দ্বিতীয় কে আছে? আমার সঙ্গে ইয়ারকি!
সত্যি বলছি পিসিমা, আমি নয়, ও। মানে- ঐটা।
তুই কি আমাকে পাগল হাউবেছিস জানোয়ার!
ভাঁক- ভাঁক!
আরে পিসিমা তুমি করছো কি? ও সত্যি বলেছে, আমিই তোমাকে ডেকেছি।
অ্যাঁক!
হ্যাঁ পিসিমা। আমি যন্ত্র-মানব, মিস্টার রবি।
আউঃ!
ও-ওটা কি যন্তরে? ওটা কে এনেছে?
ওটা আমার নয়, খুদে তৈরী করেছে- রোবোটি।

খুদে তৈরী করেছে! অবিকল মানুষের মত যন্তর।
খবরদার, বেশী কাছে আসবেন না। যা জিজ্ঞেস করার ওখান থেকে করুন।
ওমা—একেবারে খুদের গলার স্বর নকল করে কথা কইছে!
রোবোট তো অমনই হয়।
এখন আর কোন কথা নয়। পিসিমা খুদের খাবারটা বরং এখানেই দিয়ে যান, ও এলে দিয়ে দেবো, গুড্ বাই।
আ-আচ্ছা বাবা!
কিছুক্ষণ পর
বলিস কি! খুদে রোবোট তৈরী করেছে?
মাইরি বলছি পুঁটি, আমি নিজে দেখেছি! আমার সঙ্গে কথা বলেছে।
পটল যে ভাবে বললো, ব্যাপারটা একটু মরোজমিনে তদন্ত করতে হচ্ছে!
খুদে বাড়ি নেই? ওর রোবোটটা দেখতে এলুম পিসিমা।
যাও না, ওটা ঘরেই রয়েছে! ও স্কুলে গেছে এখুনি এলো বলে।
মনে হচ্ছে এটাই সেই রোবোট। দেখি তো কেমন কথা বলে—
মিস্টার রোবোট, কেমন আছেন? আমি পুঁটি।
যাঃ ব্বাবা, এ তো কোন সাড়া শব্দই দিচ্ছে না! দেখি তো কি হলো
একি! মডেলটা রোবোটের। ওঃ হো—বুঝেছি এর আসল কলকাঠি

হিঃ-হিঃ-হিঃ, আমার সঙ্গে চালাকি! আমার টাইম হয়ে গেছে, দাঁড়াও ওর রোবোট দিয়েই ওকে টাইট দেওয়াবো।

ওঃ, কি যন্ত্র মানবই না তৈরী করেছিস খুদে। যন্ত্র দিয়ে যে এরকম মানবিক ব্যবহার করানো যায়, সেটা তুইই দেখালি। এবার তো তোকে নিয়ে চারিদিকে হৈচৈ পরে যাবে।
স্রেফ ঐ জন্যেই তো ব্যাপারটা গোপন রেখেছি। তাছাড়া এ জিনিস তো বিদেশে পুরোনো হয়ে গেছে।

তা হোক। আমাদের দেশে তুমকো জবাব নেই। চল, তোর রোবোটটার সঙ্গে আর একটু কথা বলে যাই।
যেতে পারিস তবে, ছুটো কনডেন্সার বদলাবো বলে ওটা এখন স্টপ করে রেখেছি। বরং পরে আসিস।

আরে এখন চলছে না, পরে চলবে। আমি অচল রোবোটই দেখবো। চল, তোর মডেলটাও দেখার মতো।

আসুন আসুন, মিস্টার বৈজ্ঞানিক। আসুন মিস্টার পটল।
ইয়াঃ!
মিথ্যুকের কোথাকার! ঐ তো, রোবোট কথা কইছে!

ক্-কি-কি-কিন্তু—!
অত কিন্তুর কি আছে। মনে হচ্ছে কনডেন্সার ছুটো ও নিজেই ফিট্ করে নিয়েছে।
আমি আপনাদের জন্যই ওয়েট্ করছি। স্কুল ছুটি হয়ে গেল বুঝি?

এটা কি হলো!
এমনটা তো হবার কথা নয়!
সে আবার কি? তোর তৈরী জিনিসকে তুই কি চিনতে পারছিস না!—এ ভাবে নিজেকে যতই লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা কর প্রতিভা যাবে কোথায় গুরু।

আমার অসংখ্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন প্রীবেঞ্জামিন। আপনিই আমার সৃষ্টি কর্তা।
ফ্যান্টাস্টিক!
না-না, এ অসম্ভব!

আপনিই তো এ অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। এখন এ ভাবে অস্বীকার করে নিজেকে বিনয়ী করে তুলবেন না। আপনার হাতটা একটু স্পর্শ করতে দিন।
না—আমাকে ছেড়ে দাও!
খুদে এমন করছে কেন?

একটা যন্ত্র মানবের সঙ্গে তোর এরকম অভদ্র ব্যবহারের মানে কি খুদে?
এটা যন্ত্র মানব নয়-যন্ত্র দানব!

ওরে বাবারে বাঁচাও!
পটল পালিয়ে আয়, রোবোটটাকে দানোয় পেয়েছে!

খুদে রোবোট তৈরী করেছে আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না! দেখে আসি বেক্সন জিনিয়স!
SEPT-87

গড়াম
বাপরে!
অফ!

মর্কট, তোর চোখে কন্‌জাংটিভাইটিস হয়েছে নাকি! দেখে ছুটতে পারিস না?
ইওফস্‌!
মেডবো তুমি! একসকিউজ মি মেডবো। রোবোট, আমার রোবোট—
রোবোট! তুই রোবোট তৈরী করেছিস ভাল কথা, তার জন্যে এত উচ্ছ্বাসের কি আছে?
ন-না, আমার র-রোবোট কেমন যেন—!
আ-মোলোযা! আমার আমার করে হেদিয়ে মোলো। তুই কি এমন জিনিস আবিস্কার করেছিস যে লোককে গুঁতো মেরে জানাতে হচ্ছে? চল, দেখে আসি!
মেডবো!
কই কোথায় তোর রোবোট?
ঐ তো—!
গুড মর্নিং মেডবো। আসতে আজ্ঞা হোক। আমার নাম রবি।
তাই তো রে, এযে একেবারে রোবোটের মতই লাগছে! তারপর বুলিও যখন ছুটছে।
হ্যাঁ, কোন কিছুতেই আমি কম্মতি নই।
খুদে তুই যা যন্ত্র মানব করেছিস তাতে তো দেখছি যন্ত্র আর মানবে কোন তফাৎ নেই। ইউনিক্‌!
কি-কিন্তু মেডবো আমি এতটা হওয়ার মতো করিনি! মনে হচ্ছে এতে ভুতে ভর করেছে!

বলিস কি! নিজে রোবোট তৈরী করে বলছিস তুই করিসনি, আবার বলছিস ভূতে ভর করেছে? পাগল হলি নাকি?

খবরদার বলছি, আমার নামে অমন ভুতুড়ে বদনাম দেবেন না!

ভূত তো মানুষের ওপর ভর করে শুনেছি— এখন দেখছি ভূত যন্ত্র মানুষও রেহাই দিচ্ছে না!

হুম্, এসবই খুদের কৃতিত্ব। এমন জিনিস দেখে আমরাই ভরকে যাচ্ছি, ভূতদের আর দোষ কি!

খুদের আবিষ্কার শেষমেষ ভূতের থপ্পরে পরে জলাঞ্জলি যাবে মেজকা?

মোটেই না। দাওয়াই দিতে হবে।

দাওয়াই!

সেটা কি মেজকা?

খুব সিম্পল্। ঐ সুইচ্ বোর্ড থেকে একটা তার টেনে এনে ওটার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে সুইচ্ অন্ করে দে। দেখবি--

তার মানে ইলেকট্রিক্ চার্জ!

ঐ-ঐ দ্যাখ, নাম শুনেই ভূত-বেক্সন ধরফরিয়ে উঠেছে!

পুঁটি তুই!

তুই এখানে কি করে?

কি করে নয়— এই হল খুদের টেকনিক্যাল নো হাউ। বাকিটা তোমরা আন্দাজ করে নাও। হাঃ-হাঃ-হাঃ, হোঃ-হোঃ-হোঃ।

মানে সব গাঁড়াবকল!

ইস্, তুই আমার প্রেস্টিজ পাংচার করে দিলি পুঁটি?

ঠকালে ঠকতে হয়। তবে আমি শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাব ভেবেছিলুম। কিন্তু মেজকার দাওয়াই আমাকে ভেতরে থাকতে দিলে না। কি করবো— তোর ব্যাডলাক!

এখন বোঝা গেল, খুদে সন্ডায় বাজিমাৎ করতে গেছিল!

[48 পৃষ্ঠার পর]

চেয়ারের উপর মুখ নিচু করে বসে রয়েছেন প্রফেসর পট্টনায়ক।

—'এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই'—বললেন ডাঃ শর্মা —'অনুজ ত্রিপাঠি, ওরফে প্রফেসর জানকী পট্টনায়ক। 'আর আমার নাম,'—এই বলে হাসতে হাসতে ডাঃ শর্মা বলতে লাগলেন—

—শান্তিস্বরূপ আহুজা—চিফ ইনভেস্টিগেটর রেয়ার মিনারেল থেপট কনস্পিরেসি গভরমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া। —এই বলে একটা বর্মা চুরুট ধরিয়ে তিনি হো হো করে হাসতে লাগলেন।

সৌরাংশুর কেমন যেন গোলমাল লাগতে লাগল। পট্টনায়ক হলেন গিয়ে অনুজ ত্রিপাঠি, আর ডাঃ ব্রজেশ শর্মা শান্তিস্বরূপ আহুজা। ব্যাপারটা মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো অবস্থা নয় কি? একি তবে সেই ছোট বোন লিলির সাবধান করে দেওয়া ফাস্ট ব্রিডারের রহস্যজনক কাণ্ডখারখানা?

আহুজার নির্দেশে এইবার অনুজ ত্রিপাঠিকে ওর দলবল এ্যারেস্ট করে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল।

সৌরাংশুর দিকে তাকিয়ে আহুজা বললেন—খুব অবাক হচ্ছেন তাই না, আসলে আপনার বন্ধু নীলাঞ্জনকে ধন্যবাদ, এই ফাইবার গ্লাসের পুতুলটা আমাকে দেবার জন্য। ওই পুতুলের মধ্যে এই থোরিয়াম অক্সাইড চালান করে দিতেন এই প্রফেসর জানকী পট্টনায়ক ওরফে অনুজ ত্রিপাঠি। আপনার বন্ধুর পুতুলের গায়ে এই থোরিয়াম অক্সাইড সামান্য লেগেছিল। কেমিক্যাল এ্যানালিসিস করে আমাদের কাছে সেটা ধরা পড়েছে।'

নীলাঞ্জনও ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ছোটনলালকে নিয়ে পৌঁছে গেছে। আহুজা নীলাঞ্জনকে পুতুলটা ফিরিয়ে দিয়ে ধন্যবাদ জানাল। তারপর আমাদের সকলকে আজ রাত্রিতে ওর বাসায় নিমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিলেন।

শান্তিস্বরূপ আহুজা আসলে ভারত সরকারের একজন ডাকসাইটে ইনভেস্টিগেটর। ওঁর বাড়িতে সেদিন রাত্রে নিমন্ত্রণ খেতে খেতে যা জানা গেল সেটা এই :

এই প্রফেসর জানকী পট্টনায়ক নামধারী অনুজ ত্রিপাঠি একজন মিনেরোলজিস্ট। মিনেরোলজিস্টরা বিভিন্ন ধরনের মিনারেল অর্থাৎ খনিজ বস্তু নিয়ে গবেষণা করে থাকেন। অনুজ ত্রিপাঠি বেশ কিছুদিন ধরে নেপালে যাতায়াত করে জানতে পারেন—বালানের কাছে এই থোরিয়াম অক্সাইড বা মোনাজাইট স্যাণ্ড-এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে থোরিয়াম আছে, প্রায় শতকরা দশভাগ। ব্যস, আর যায় কোথায়—তিনি রাতারাতি এখানে জায়গা কিনে নিয়ে এই মোনাজাইট স্যাণ্ড থেকে একটা বিশেষ উপায়ে তার মধ্যে যে সব অশুদ্ধি থাকে অর্থাৎ টাইটানিয়াম, আয়রন, বালি, ফসফেট—এইসব সরিয়ে দিতেন। তারপর ইউরেনিয়াম আর বিরল মৃত্তিকার ধাতু (rare earth) কে সরিয়ে থোরিয়াম বের করে নিতেন। এই থোরিয়াম নিউক্লিয়ার পাওয়ার রিয়্যাকটরে খুবই দরকার। এই রিয়্যাকটর থেকে প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। আমাদের বোম্বাইয়ের কাছে তারাপুরে এইরকম একটা এ্যাটমিক পাওয়ার স্টেশন আছে (TAPS)। এ ছাড়াও দক্ষিণ ভারতের কলপাক্কমে এই রকম একটা রিয়্যাকটর কিছুদিন আগে চালু হয়েছে—যার থেকে প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে।

অনুজ ত্রিপাঠি একটা আন্তর্জাতিক চক্রের পাল্লায় পড়ে এবং প্রচুর টাকার লোভে এই থোরিয়াম বিদেশে চালান করে দিচ্ছিলেন বেশ কিছুদিন থেকে। ওঁর চালাকিটাও ছিল মন্দ নয়—ফাইবার গ্লাসের পুতুলের মধ্যে থোরিয়াম ঢুকিয়ে বিদেশে চালান দিতেন। এই জিনিস চালান দিয়ে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়েছেন। সন্ধের পর থেকেই ওঁর (অর্থাৎ অনুজ ত্রিপাঠির) বাড়িতে নীলাভ-সবুজ আলোর রোশনাই দেখে আমার প্রথম সন্দেহ হয়। কারণ থোরিয়াম অক্সাইডকে উত্তপ্ত করলে এই রকম নীলাভ-সবুজ আলোর আভা দেখা যায়। এ্যাটমিক রিয়্যাকটর বা চুল্লীতে এই ধাতুর ব্যবহার আছে—তখন একে বলা হয় ফাস্ট ব্রিডার। ভারত সরকার আর নেপাল গভরমেণ্টের জয়েণ্ট এ্যাকসনে এই মিনারেল মাল পাচার চক্রকে ধরে ফেললেন ইনভেস্টিগেটর আহুজা।

বাইরে হুহু করে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। সেদিন শান্তিস্বরূপ আহুজার বাড়িতে মুরগীর মাংস আর বিরিয়ানী জমেছিল বেশ ভালো।

ছড়া

রঙিন বেলুন
রাখাল বিশ্বাস

গা ছম্ ছম্ শিখর ছুঁয়ে টেলিগ্রাফের তারে,
তার ভেতরেই রাত নেমেছে দেখছি বারে বারে।
চন্দ্রযানের রকেট চেপে দেখবো আকাশটাকে,
আর তখনই মেঘের ডাকে শব্দ ঘিরে রাখে।
দুলকি চালের ভুলকি ছিল বিজ্ঞানী চোখ মেলে,
গাছগুলি সব দাঁড়িয়ে আছে কেমন হেসেখেলে।
জল চিনেছে নদীর মায়া মঙ্গলে ভীড় প্রাণের
রঙিন বেলুন হাওয়ায় ওড়াই চিরকালীন গানের॥

এক

হাওড়া স্টেশনে কেউ কাউকে দেখতে পান নি। দেখার কথাও ছিল না। অথচ দুজনেই চলেছিলেন এক দিকে।

ওড়িশার অনেকখানি ভেতরে যাবে বলে গাড়ি ছেড়ে ছিল হাওড়া থেকেই। গার্ড সাহেব নিশান নাড়লেন, সবুজ সিগন্যাল জ্বলল বেশ একটু রাত করেই। কুলি হাঁকাহাঁকি ভিড়, ঠ্যালাঠেলি, এসব তো ছিলই।

ফার্স্ট ক্লাসের একটা আস্ত ক্যুপ রিজার্ভ করা ছিল নগেনবাবুর নামে। কোচ নম্বর, টিকিট নম্বর মিলিয়ে নগেনবাবু উঠে এলেন। পেছনে পেছনে কুলির মাথায় একটা বিশাল কালো ট্রাঙ্ক, একটা ছোট স্যুটকেস। বাঁ হাতে মাথার ভার সামলাতে সামলাতে মালবওয়া মানুষটি ডান হাতে হ্যাণ্ডেলঅলা একটা বড় বেতের ঝুড়ি বয়ে নিয়ে আসছিল।

নগেনবাবু কথা কম বলেন, গম্ভীর। চোখে পুরু সবুজ কাচের চশমা। দেখলে পঞ্চাশের বেশি বয়েস মনে হয়। সাধারণ ধুতি, পাঞ্জাবি পরে আছেন। পাঞ্জাবিটি পাতলা হ্যাণ্ডলুমের, সবুজ রঙ। ধুতির পাড়ও সবুজ। নগেনবাবুর মাথাভর্তি কাঁচাপাকা চুল। এত গরমেও নগেনবাবু ঘামছেন না।

কুলিকে ভাড়ার পয়সা মিটিয়ে জানলার কাচ নামিয়ে বাইরে তাকালেন নগেনবাবু। আর তখনই গোটা হাওড়া স্টেশন তাঁর চোখের সামনে নড়ে উঠল। তারপর প্রথমে একটু আস্তেই, পরে বেশ জোরে গাড়ি. আলো এবং অন্ধকার পেরিয়ে যেতে লাগল। প্রথম স্টপ খড়্গপুর। এখনও এক ঘণ্টার বেশি সময়। কি ভেবে নগেনবাবু একবার তাকালেন তাঁর বাঁ হাতের ঘড়ির দিকে। ঠিকসময়ের সাত মিনিট পরে ছাড়ল গাড়ি।

নিজের মতো শব্দ করতে করতে, কখনও হুইসিল দিয়ে গাড়ি পেরিয়ে যাচ্ছে আলো এবং অন্ধকার। সেদিকে একবার তাকিয়েই নগেনবাবুর ঠোঁটের কোণে কি এক রহস্যময় হাসির ঢেউ উঠেই মিলিয়ে গেল। মাথার ওপর থেকে ধীরে কাঁচাপাকা চুলের বোঝাটি নামিয়ে রেখে দিলেন পাশে।

এই ক্যুপের আলোয় নগেনবাবুর মাথাটিকে একমাত্র সৈয়দ কিরমানির মাথার সঙ্গে তুলনা করা যায়। একটিও চুল নেই কোথাও। একটু ভালো করে নজর করলেই দেখা যাবে নগেনবাবুর মাথার চারপাশে কেমন একটা সবুজ সবুজ আলোর রেখা।

চশমা খুলে পাশ পকেটে রাখলেন। নজর করলে দেখা যাবে ভুরু বলে কিছুই নেই নগেনবাবুর, এমন কি চোখের পাতাও না।

ট্রাঙ্কে কোনো তালা ছিল না। কিন্তু কিভাবে যেন বন্ধ করা ছিল, যেমন খাঁজে খাঁজে আটকে থাকে কিছু। সিন্থেটিক ফাইবারের ছোট স্যুটকেসটা নামিয়ে রাখার জন্যে একবার তাকানোই যথেষ্ট ছিল। হাওয়ায় অল্প ভেসেই ট্রেন-কামরার মাটিতে ধীরে নেমে এল স্যুটকেস। সামান্য শব্দও হলো না। নিজের অস্বাভাবিক লম্বা বুড়ো আঙুল দিয়ে ট্রাঙ্কের ঐ বন্ধ হওয়ার খাঁজটিতে কেমন যেন ধীরে চাপ দিলেন নগেনবাবু। একবার দুবার তিন বার, খুলে গেল।

চশমা খুলে ফেললে বেশি আলো সহ্য করতে পারে না নগেনবাবুর চোখ। তাই বসে বসে তিনি ইচ্ছে করতেই

ক্যুপের বড় আলো বদলে গিয়ে জ্বলে উঠল নীল আলো। আরাম পেল নগেনবাবুর চোখেরা।

আবছা মতো নীল নীল আলোয় নগেনবাবু কালো ট্রাঙ্কের গভীর থেকে তাড়াতাড়ি হাতড়ে বের করে আনলেন হাত, পা, মুণ্ডু সবই খুব উঁচু জাতের ফাইবার গ্লাসে তৈরি। পাকা হাতে নয়, নিজের ভাবনা আর ইচ্ছাশক্তিতে জুড়ে ফেললেন পটাপট। বাবু ভুবনমোহন রোবট তার সাড়ে তিন ফুট শরীর নিয়ে গট গট করে উঠে এসে লম্বা স্যালুট দিল নগেনবাবুকে। খুশিতে তার কপালের ছোট্ট আলো আর বুকের বড় আলো দপদপ করে জ্বলে উঠল। ঝিঁ-ঝিঁ-র ডাকের থেকে একটু জোরে পিঁ-পিঁ করে একটা শব্দ ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত ক্যুপে। গাড়ি তখন অন্ধকার ছিঁড়তে ছিঁড়তে গুমগুম শব্দ তুলে কোনো খাল বা ছোট নদী পার হচ্ছিল।

নগেনবাবু ভাবনার তরঙ্গ দিয়ে ভুবনমোহনকে বুঝিয়ে দিলেন তাঁর ক্ষিদে পেয়েছে। সেই বড় বেতের ঝুড়ির ভেতর অনেক রকম ফুল। ভুবনমোহন পোকা আছে কিনা দেখে দেখে নানান ফুল দিয়ে নগেনবাবুর রাতের খাওয়ার ডিশ তৈরি করে দিচ্ছিল। ফুলের পোকাকে বড় ভয় পান নগেনবাবু। ঘেন্নাও করেন।

ছুটে যাওয়া ট্রেন-কামরার ভেতর নীল নীল আলোর মায়ায় শাদা বেল, রজনীগন্ধা, জুঁই, রঙিন সন্ধ্যামালতী, দুধে আলতা সব বেছে, সাজিয়ে নগেনবাবুর রাতের খাওয়া গুছিয়ে দিচ্ছিল ভুবনমোহন। আলোর কাছে উড়ে আসা মাত্র একটি পোকাকে দেখে বারে বারে নাক কুঁচকোচ্ছিলেন নগেনবাবু। বোধ হয় একটু ভয়ও পাচ্ছিলেন।

সবুজ প্যান্ট, সবুজ শার্ট পরা খগেনবাবুও এই ক্যুপের থেকে বেশ কিছুটা দূরে এমনই একটি ক্যুপের ভেতর একই নাটক করে যাচ্ছিলেন। তাঁরও কুচকুচে কালো কেশের বোঝাটি ট্রেন ছাড়ার পরই খুলে রাখা হয়ে গেছিল পাশে। সেই চকচকে মাথাটি ঘিরে সবুজ আলোর রেখা।

শার্ট-প্যান্ট, ধুতি-পাঞ্জাবির ফারাক ছাড়া নগেনবাবু খগেনবাবুর চেহারা একইরকম। আর আলাদা মাথার চুলের রঙটি। নগেনবাবুর কায়দাতেই ট্রাঙ্ক খুলে খগেনবাবু তাঁর ইচ্ছে দিয়ে দিয়ে জুড়ে ফেলে যাকে দাঁড় করালেন, তার নাম বজ্রবরণ। সেই একই স্টাইলের স্যালুট পাওয়া। কপালে, বুকে জ্বলে ওঠা খুশির আলো। অথচ এঁরা কেউ-ই কাউকে চেনেন না। জানেনও না।

গাড়ি খড়্গপুরের আগে একটু আস্তে হয়ে গেল। স্টেশনের আশপাশে অনেক আলো।

ফুল দিয়ে ডিনার শেষ করতে করতে খগেনবাবু আর নগেনবাবু দুজনেই ইচ্ছে দিয়ে তাঁদের ভুবনমোহন আর বজ্রবরণকে আলাদা করে দিলেন। ট্রাঙ্কের গভীরে মুণ্ডু, হাত, পা হিসেবে আবার শুয়ে পড়ল তারা। মাথার চুল ফিরে এল ঠিক ঠিক জায়গায়। চোখে চশমাও। গাড়ি ততক্ষণে নানান রকম শব্দ আর আলো বোঝাই স্টেশনে ঢুকে পড়েছে।

একটা ছোট ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি ছাড়তেই নগেনবাবু টান টান হয়ে বসলেন। ট্রেন তখন ধীরে আলো আর ভিড় পেরিয়ে যাচ্ছে। স্টেশন পেরিয়ে যেতেই নগেনবাবু মাথার চুল খুলে রাখলেন, চোখের চশমাও। তারপর ইচ্ছে দিয়ে সিন্থেটিক স্যুটকেস খুলে ফেললেন চটপট। ভেতর থেকে একটা চৌকো বোর্ড বার করলেন নগেনবাবু সেটাকে সামনে রেখে কি যেন ভাবতে লাগলেন, আর তাতেই আলোর রেখায় তৈরি হয়ে গেল গোটা একটা ম্যাপ।

নগেনবাবু মন দিয়ে ম্যাপ দেখতে লাগলেন। আর মাঝে মাঝেই ঘাড় নাড়তে নাড়তে আপন মনেই কি সব বিড় বিড় করছিলেন। কোনো কোনো আলোর রেখা মুছে আবার নতুন রেখা তৈরি হয়ে যাচ্ছিল।

গাড়ির দুলুনিতে খগেনবাবুর একটু একটু ঘুম আসছিল। এ গ্রহের যাবতীয় অভ্যাসের অনেকগুলিই তাঁকে রপ্ত করে নিতে হয়েছে, এখানে মানিয়ে থাকার জন্যে। রজনীগন্ধা, জুঁই, বেলফুলে রাতের খাওয়া সেরেছিলেন খগেনবাবু। কয়েকটা মুচকুন্দ আর কাঠগোলাপও ছিল, ফলে রাতের খাওয়াটা বেশ একটু ভারিই হয়েছে। তার ওপর লোভে পড়ে দোনা-মোনা করতে করতে রজনীগন্ধাটা খেয়ে ফেললেন। তেমন টাটকা মনে হচ্ছিল না। এখন অম্বল না হয়ে যায়। দুটি অ্যান্টাসিড নেবেন কিনা ভাবছিলেন, এমন সময় তাঁরও ম্যাপের কথা মনে পড়ল। আর কি ভেবে যেন মনটা খারাপ হয়ে গেল তখনই।

ইচ্ছে দিয়ে দিয়ে সিন্থেটিক ফাইবারের স্যুটকেস খুলে ম্যাপ বার করলেন খগেনবাবু। সেই বোর্ডের ওপর আলোর রেখা। আলোয় আলোয় ফুটে ওঠা নানান সংকেত দেখতে দেখতে খগেনবাবু হাই তুললেন। একবার দুবার তিনবার! বজ্রবরণকে একবার জুড়বেন ভাবলেন। তারপর কি ভেবে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লেন। বোর্ডের ওপর আলো তখনও অবলীলায় নানান রেখা এঁকে যাচ্ছিল।

ঘুমের মধ্যে রিমোট কন্ট্রোলে ঘুড়ি ওড়ানোর স্বপ্ন দেখলেন খগেনবাবু। সুতো ছাড়া ঘুড়িকে দিব্যি মাটিতে বসে বসে ইচ্ছেমতো খেলাচ্ছেন। প্যাঁচ খেলছেন। কাটছেন। কেউ-ই পেরে উঠছে না তাঁর অদৃশ্য সুতোর মাঞ্জার সঙ্গে। একসময় ঘুড়ির গায়ে নিজের মুখটাই ফুটে উঠতে দেখলেন খগেনবাবু। কেমন একজন দুঃখী দুঃখী খগেনবাবু। বজ্রবরণ হঠাৎ ঘুড়ি হয়ে তেড়ে এল তাঁর দিকে। খগেনবাবু রিমোট কন্ট্রোলে নানানরকম বোতাম টিপেও বজ্রবরণের হামলা থেকে বাঁচতে পারছেন না। যত সরে সরে যাচ্ছেন, বজ্রবরণ ততই ধেয়ে আসছে।

ভো-কাট্টা, ভোকাট্টা! নিজের কাটা মুখকে হাওয়ায়

ভেসে যেতে দেখে বেশ কষ্টই পেলেন খগেনবাবু। স্বপ্ন ভেঙে পাশ ফিরে শুতে শুতে বুঝতে পারলেন তিনি এখনও গাড়িতেই শুয়ে।

ট্রেনে উঠে নগেনবাবুর ভালো ঘুম হয় না। ভুবন-মোহনকে জুড়ে তার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে রাতের অনেকটাই কাটিয়ে দেয়া যাবে এমন ভাবতে ভাবতে তিনি ভুবন-মোহনকে জুড়ে ফেললেন। আর ভুবনমোহনের এগনো পেছনো—সবটুকুই যখন তাঁর ইচ্ছের ভেতর, তাই পরপর ভুবনমোহনকে পাঞ্জা কষাকষিতে হারিয়ে দিতে তাঁর কোনো অসুবিধেই হচ্ছিল না। আর এভাবে রাত বেড়ে যাচ্ছিল।

এক ঘেয়ে পাঞ্জা কষাকষিও আর ভালো লাগছিল না। হঠাৎ ইচ্ছের চুম্বক দিয়ে বেতের ঝুড়ির ভেতর থেকে একটা দুটো তিনটে বেলফুল তুলে আনলেন। ট্রেন-ক্যুপের এই নীলচে আলোয় তিনটে বেলফুল নীল আকাশে তারা হয়ে ফুটে উঠল। ওদের ঐ শূন্যেই একটু ঘুরপাক খাওয়ালেন নগেনবাবু। প্রথমে আস্তে, তারপর জোরে। ঘোরার গতি দ্রুত হতেই বেলফুলের শাদা পালক সব গড়িয়ে গেল হাওয়ায়। নগেনবাবু আবার হাওয়া থেকে একটা একটা পাপড়ি জুড়ে ফুল তৈরি করে ফেললেন ঐ শূন্যেই, তারপর আবার তাদের নিয়ে শূন্যে খেলতে লাগলেন।

এসবই ভুবনমোহন অবাক হয়ে দেখছিল। খুশিতে তার কপাল আর বুকের আলো জ্বলে উঠছিল বারে বারে।

একসময় আর এই ফুল-খেলাও ভালো লাগল না নগেন-বাবুর। জানলার কাচ তুলে বাইরে ছুটে যাওয়া পৃথিবীর আকাশে তিনি একে একে তিনটি বেলফুলের অঞ্জলি দিলেন, ভাসিয়ে দিলেন।

আর তারপরই তার মনে হলো মানসিক যোগ-বিয়োগ খেলার কথা। অন্য আর একটি বোর্ড বার করে আনলেন স্যুটকেসের ভেতর থেকে, পদ্ধতি একই। বোর্ড সাজিয়ে একটা দুরূহ অঙ্কের কথা ভাবলেন। ইলেকট্রনিক সংখ্যারা ফুটে উঠল বোর্ডের গায়ে। উল্টো দিকে ভুবনমোহন গালে হাত দিয়ে ফেলেছে। পাকা দাবাড়ুর ভঙ্গি দেখে দেখে নকল করা। বসার কায়দাটা পর্যন্ত, যেমন ঝুঁকে থাকে সবাই। নগেন-বাবুর দুরূহ অঙ্কের চাল নিজের কমপিউটার ব্রেন দিয়ে কাটতে চাইছে ভুবনমোহন। পাতলা জ্যোৎস্না মোড়া কোনো রোগা নদী, আর তার দুপাশের বিশাল শাদা বালির চর পেরিয়ে ট্রেন তখন সামনে দৌড়ে যাচ্ছিল।

দুই

সকাল ছটায় কটক পেঁছিল গাড়ি। তার আগেই তৈরি হয়েছিলেন নগেনবাবু, খগেনবাবু। স্টেশন থেকে তিন টাকা রিকশ ভাড়া দিয়ে বাদামবাড়ি বাস স্ট্যাণ্ড এলেন দুজনে। আলাদা আলাদা তারপর নগেনবাবু ওখান থেকেই উঠে পড়লেন চক্রতীর্থের বাসে। কোনারক চলে যাবেন। আর খগেনবাবু বাস স্ট্যাণ্ড থেকে একটু দূরে ফুটে থাকা কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া দেখে মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর পেড়েও ফেললেন। টাটকা ফুলে লাঞ্চ কেমন হবে ভাবতে ভাবতে রোমাঞ্চিত খগেনবাবু ধরতে পারলেন না কোনারক যাওয়ার বাসটি।

ইচ্ছে করলে তিনি অবশ্য উড়ে চলে যেতে পারতেন মালপত্র সুদ্ধু। কিন্তু এই দিনের আলোয় এত লোকের সামনে...।

কয়েকদিন আগে আসা আলোর সংকেত আদেশটির কথা মনে হতেই খগেনবাবুর মন খারাপ হয়ে গেল। তবু ভেসে আসা অনুশাসনটি অস্বীকার করার উপায় নেই। রেহাই নেই কোথাও পালিয়ে গিয়ে। ইদানিং পৃথিবীর জল হাওয়ায় খগেনবাবুর ভেতর যেন এক গোপন অসুখের আয়োজন। তার কোনোটার নাম দুঃখ, কোনোটার নাম ভয়, ভালোবাসা, রাগ, মন খারাপ, লোভ, বিষণ্ণতা।

বাদামবাড়ি স্ট্যাণ্ড থেকে দশটা নাগাদ বাস পেলেন খগেনবাবু। ভুবনেশ্বর পেঁছিলেন বেলা এগারোটা কুড়ি। সেখান থেকে আবার বাস। এবং এবারে বিকেল বিকেল কোনারক। হলুদ মতোন আলোয় সূর্যমন্দির নতুন হয়েই দাঁড়িয়ে। কে বলবে এত প্রাচীন কারুকাজ!

ট্যুরিস্ট লজেই জায়গা মিলল খগেনবাবুর। খাতায় সই করার সময় পদবীর জায়গায় কি লিখবেন, এমন ভেবে মাথা চুলকোতে গিয়েই আগের নামটি চোখে পড়ল—নগেন নস্কর, কলকাতা-13, রুম নম্বর 9। রুম নম্বর 10-এর ঘরে খগেনবাবু অবলীলায় লিখলেন—খগেন নস্কর, কলকাতা-13।

ট্যুরিস্ট লজের উঠোনে অনেক সবুজ আর রঙ। অনেক গাছ এবং ফুল। নগেনবাবু ঠিক করলেন একটু বাদেই রাতের খাবার বিষয়টা ঠিক করে নেবেন। আর পাঠানো সংকেত মতো আজই শেষ রাত। তবু কেন জানি না বিশ্বাস হয় না। মায়া বাড়ে চারপাশের ধুলো-মাটি, রোদ-হাওয়া, ফুল-পাখির জন্যে।

রোদের রঙ ধীরে মুছে যাচ্ছে। খগেনবাবু কোনারক মন্দিরের সামনের ঘাসের ওপর শুয়ে মাটি, ঘাস শুঁকছেন। তাঁর মাথায় পরচুলা, চোখে ভারি কাচের রঙিন চশমা। খয়েরি রঙের জিভ বের করে নগেনবাবু একবার এক কাত ফিরে ঘাসের স্বাদ নিলেন। আলতো করে চিবিয়ে এদিক ওদিক তাকালেন। না, কেউ দেখে ফেলে নি। এই ঘাসের রসে ইতিহাসের ধুলোর গন্ধ পেলেন। বেশ ভালো লাগছে। তাঁর গলা দিয়ে সেই অনেক অনেক দিন আগের রাজ-রাজরা, সেনাপতি, মন্ত্রী, ঘোড়া, হাতির স্মৃতিচিহ্ন ধীরে শেকড় চারিয়ে দিচ্ছিল।

আলো ধীরে মুছে গেলে চারপাশে জ্বলে ওঠে ইলেকট্রিক ফোকাস। শেষ আলোর দিকে তাকিয়ে মন্দিরের উঠোনে দাঁড়ানো নগেনবাবুরও কেমন মন কেমন করে উঠল। দূরে

দু পাশে লম্বা ঝাউয়ের জঙ্গল……

কোথায় যেন ডেকে যাচ্ছে নাম না জানা পাখি। অচেনা কোনো ফুলের গন্ধ নিয়ে ভেসে আসছে বাতাস।

এই বিদায়ী আলো, ফুলের গন্ধ, পাখির ডাকের ভেতর দাঁড়িয়ে নগেনবাবু মহাশূন্যের অনেক, অনেকগুলো স্তর পেরিয়ে আসা সংকেতের কথা ভাবতে ভাবতে আমূল কেঁপে উঠলেন। পৃথিবীর মানুষের মতোই চোখে জল এল, উনি টেরও পেলেন না।

সূর্যমন্দিরের গায়েই যেন সূর্য মুছে গেল। চারপাশে এখন ইলেকট্রিকের আলো। ট্যুরিস্ট, যাত্রীরা সকলেই মন্দির ছেড়ে উঠে এসেছেন পাঁচিলের ওপর। মন্দিরের ঠিক মাথার ওপর আশ্চর্য স্থির একটি তারা।

চওড়া পাঁচিলের ওপর দিয়ে ধীরে হাঁটছিলেন নগেনবাবু, একটু যেন অন্যমনস্ক। শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে দূর থেকে, কুকুরেরও। হাওয়া দিচ্ছে ধীরে। ইলেকট্রিক ফোকাসে মন্দিরের চেহারাই অন্যরকম। মনে হতে পারে আকাশের গায়েও যেন এই পাথরের রথই ছায়াছবি হয়ে লেগে আছে।

এসব দেখতে দেখতেই সেই চওড়া পাঁচিলের ওপর আবছা মতো আলোয় নগেনবাবু দেখতে পেলেন খগেনবাবুকে। এবং নগেনবাবুকে খগেনবাবু। ধুতি প্যান্ট শার্ট পাঞ্জাবি আর মাথার চুলের রঙটি ছাড়া এ যেন একই ছাঁচে তৈরি দুটি শরীর। একই উচ্চতা, শরীরের গড়নও হুবহু এক। চশমা খুলে ফেললেন দুজনেই, পাতাহীন চোখের মণিতে চোখ আটকে কি যেন কথা হলো। বুকের ওপর ডান দিকে ফুটে ওঠা তীব্র বিদ্যুৎরেখা ছুঁয়ে গেল—নগেনবাবু থেকে খগেনবাবুকে। খগেনবাবু থেকে নগেনবাবুকে।

দুজনেই মাথা নিচু করে রইলেন।

এক মিনিট দু মিনিট তিন মিনিট।

চারপাশে কোনো শব্দ ছিল না। তারপর কি এক রহস্যময় হাসি খেলে গেল নগেনবাবুর মুখে, খগেনবাবুর মুখেও। বুকের বিদ্যুৎরেখা আবার সংকেত বিনিময় করল। দুজনে ধীরে পাঁচিল ধরে ধরে হেঁটে কোনারক মন্দিরে ঢোকার মূল গেটের পাশ দিয়ে যে পাথরের সিঁড়ি, সেখান দিয়ে ধীরে নেমে এলেন। তারপর কোনো কথা না বলে ট্যুরিস্ট লজের ঘরে।

সে রাতে জ্যোৎস্নায় বড় মায়া ছিল। ট্যুরিস্ট লজের বারান্দায় অকৃপণ চাঁদের আলো। ধুলোটে, মায়াবী আলোয় লজের বারান্দায় মুখোমুখি বসেছিলেন খগেনবাবু নগেনবাবু। মাথা থেকে নিজের কাঁচা পাকা পরচুলাটিকে উড়িয়ে নিয়ে এসে হাওয়ায় দুবার পাক খাইয়ে জায়গামতো বসিয়ে দিলেন নগেনবাবু। খগেনবাবু কিছু না বলে পা নাচিয়ে যাচ্ছিলেন। উঠোনে কাঠ গোলাপের ভারী পাতা চুঁইয়ে সবুজ জ্যোৎস্না ঘাসের গায়ে মিশে যাচ্ছিল।

সে রাতে আর এই পৃথিবীর অভ্যাস মতো ঘুম এল না নগেনবাবুর এবং খগেনবাবুরও।

শেষ রাতে তাঁরা ট্যুরিস্টলজের ঘরের দরজায় তালা দিয়ে কেয়ার টেকারকে চাবি দুটো দিলেন। দুজনের হাতেই স্যুটকেস, ভারি ট্রাঙ্ক। এখন রাত চারটে। পরিষ্কার আকাশে ফালি চাঁদ। রাস্তায় নেমেই অন্ধকারে মাথার ওপর হাওয়ায় নিজের নিজের স্যুটকেস আর ট্রাঙ্ক ভাসিয়ে দিলেন নগেনবাবু, খগেনবাবু। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে চারটে বড় রুমাল ধীরে ভেসে যাচ্ছে আকাশে।

কেউ কোনো কথা বললেন না। শুধু বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা আলো বিনিময় হলো একবার, দুবার।

সোজা পিচ রাস্তা মাড়িয়ে হেঁটে গেলে পি ডব্লু ডি বাংলো। তারপর আবার বাঁ দিকে হাঁটা। দুপাশে লম্বা লম্বা ঝাউয়ের জঙ্গল। মাথার ওপর ভাঙা চাঁদ।

চন্দ্রভাগা আর সমুদ্র মিশে যাওয়ার আশপাশ থেকে উঠে আসা লাইট হাউসের আলো একটা বড় পাখি হয়ে চক্কর মারছিল আকাশে। চিরে দিচ্ছিল অন্ধকার। পেছনে রিকশর হর্ন ছিল। আর খুব জোরে ছুটে যাওয়া জিপ, প্রাইভেট কার আর ট্যুরিস্ট বাসের আলো, শব্দ। কখনও মাথার ওপর রাতচরা পাখির ডাক।

কোনো কিছুই নগেনবাবু খগেনবাবুকে টলাতে পারছিল না। মহাকাশের অনেকগুলো স্তর পেরিয়ে আসা সংকেত — 'তোমাকে মরে যেতে হবে। আর কোনো কাজ নেই তোমার এখানে ; বদলে আসবে নতুন কেউ', তাদের এই অন্ধকারে আবার মনে পড়ে গেল।

ঘণ্টা খানেকের বেশি হাঁটার পর ক্রমশই সমুদ্রের গর্জন কানে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ঝাউবনের ভেতর দিয়ে হাওয়া বইছিল। শব্দ উঠছিল দীর্ঘশ্বাসের। জ্যোৎস্না দিতে দিতে ক্ষয়ে যাচ্ছিল চাঁদ।

নগেনবাবু খগেনবাবু হাওয়ায় তাঁদের মাথার পরচুল উড়িয়ে দিলেন। নীলচে মতো আলো মিশে গেল চাঁদের রেখার সঙ্গে। চোখ থেকে টেনে নামিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন চশমা। তাঁদের পালকহীন চোখের মণিতে চাঁদ বিঁধে গেল। বুকের মধ্যে ফুটে ওঠা বিদ্যুৎরেখা বলে দিচ্ছিল সেই ভয়ংকর কালো গহ্বরটা কাছেই, খুব কাছে। যেখানে পা দিলে শুধুই তলিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা নগেনবাবু খগেনবাবুর, সঙ্গে ভুবনমোহন আর বজ্রবরণেরও। তারপর আবার যে কে সেই। অন্য কারোর জন্যেই আর সেই গহ্বর ওত পেতে থাকবে না।

বুকের সংকেত জানিয়ে দিচ্ছে জায়গাটা খুব কাছেই।

কি ভেবে প্রথমে নগেনবাবু, তারপর খগেনবাবু দৌড়তে গেলেন উল্টো দিকে। ফিরে যাবেন ট্যুরিস্ট লজে যেভাবে হোক, কিংবা অন্য কোথাও।

অন্ধকারের সাঁড়াশী, কিংবা সমুদ্রের জল, অথবা সেই ভয়ংকর গহ্বরের মায়া তাঁদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল সংকেতে পাঠানো নির্দেশ অনুযায়ী।

পলকহীন চোখে চাঁদ, চারপাশের পৃথিবী, ঝাউবন দেখতে দেখতে নগেনবাবু খগেনবাবু টের পেলেন তাঁদের বুক, তলপেট, হাঁটু, কনুই সব ছেঁচড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে মাটিতে ঘষটানি খেতে খেতে।

কার্টুন : শৈল চক্রবর্তী

হেডফোন রেডিও

সৌম্য মিত্র

পুজোর ছুটিতে একটা ছোট্ট সুন্দর হেডফোন রেডিও বানিয়ে ফেললে কেমন হয় ? আরে না, না এক্ষুনি রেগে গিয়ে পাতা উল্টে অন্যান্য গল্প উপন্যাস বা কমিক্স পড়তে শুরু করা ঠিক হবে না। কারণ এটা সেই মান্ধাতা আমলের ক্রিস্টাল হেডফোন সেট নয়, যেগুলোতে গান শুনতে হলে কানের সেনসিটিভিটি বাদুড়ের মত হওয়া দরকার। তাছাড়া ক্রিস্টাল সেটের মতো এতে মোটেই সিকি কিলোমিটার এরিয়াল টাঙাতে হবে না।

ও বুঝেছি, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এ পড়েছিলাম এরকম রেডিও নাকি অ্যামেরিকায় খুব চালু হয়েছে।

রাইট ! ওখানে বাচ্চারা এগুলো খুব পছন্দ করে। কোনো ঝামেলা নেই, স্রেফ হেডফোন রেডিওটি মাথায় গলাও, সুইচ্ অন্ করো আর গান শোনো। সব থেকে বড় কথা এই রেডিওতে ব্যাটারি লাগবে মোটে একটি, আর সার্কিটটা এতোই ছোট যে কোনো মুড়ি লজেন্সের প্লাস্টিকের বাক্সে একে পুরে ফেলা যাবে।

আবিশ্বাস ! এ অসাধ্য সাধন কি করে সম্ভব হলো ?

সবই আই সি'র লীলা, থুড়ি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের অবদান।

তার মানে রেডিওটা পুরো আই সি দিয়ে তৈরি ?

না, পুরোটা নয়, তবে রেডিওর প্রাণপাখি স্বরূপ রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যামপ্লিফায়ার, এ জি সি, আর ডিটেকটর, এই তিন ভাগই একটি আই সি দিয়ে তৈরি।

আই সি শব্দটা বহুবার শোনা। আচ্ছা আই সি মানে কি ?

আই সি হলো ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ।

আই সি ! কিন্তু এতো ডিক্সনারির কথা। আই সি যে কি বস্তু তা তো বুঝতে পারলাম না।

সার্কিট কাকে বলে জানো ?

কেন জানবো না, কোনো ইলেক্ট্রনিক্স প্রজেক্ট বানাতে হলে রেসিস্টর, ক্যাপাসিটর, ট্রানজিস্টর, ডায়োড ইত্যাদি জুড়ে কি করে সেটা বানাতে হবে তার নক্সাই হলো সার্কিট।

ভেরি গুড্। আচ্ছা এবার চিন্তা কর, ওই রকম গোটা পাঁচ ছয় ট্রানজিস্টার দশ বারোটা ডায়োড আর কুড়ি পঁচিশটা রেসিস্টর, ক্যাপাসিটর দিয়ে তৈরি একটি সার্কিটকে বিশেষ পদ্ধতিতে একটা ট্রানজিস্টারের আকারে ছোট করে আনা হলো। এই ক্ষুদ্রাকৃতি সার্কিটকেই আই সি বলা হয়।

ও বুঝেছি, তার মানে বলতে চাইছো খুব ছোটো ছোটো রেসিস্টর, ক্যাপাসিটর, ডায়োড, ট্রানজিস্টর ইত্যাদি বানিয়ে তাদের মাইক্রোস্কোপের তলায় সোল্ডার করে আই সি বানানো হয়, তাই না ?

উঁহু ঠিক তা নয়, এরকম সার্কিটকে হাইব্রিড সার্কিট বলে। টিভিতে যেমন থাকে ?

না, টিভিতে একত্রে ভাল্ব এবং ট্রানজিস্টার ব্যবহারকে বলে হাইব্রিড। বুঝলাম, এ তাহলে অন্য হাইব্রিড।

হ্যাঁ, এই পদ্ধতিতে তৈরি সার্কিটও খুব ছোট হয় তবে আই সি'র মতো অতো ছোট হয় না। এর কারণ, আই সি-তে একটা পাতলা সিলিকন বা গ্যালিয়াম আর্সেনাইড ধরনের অর্ধপরিবাহীর (Semiconductor) ওপর বিশেষ ফোটো-লিথোগ্রাফি পদ্ধতিতে আণুবীক্ষণিক রেসিস্টর, ট্রানজিস্টর ইত্যাদি তৈরি করা হয়। ছাপাখানার ব্লক যে পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়, এটা অনেকটা সেই রকম বলা যেতে পারে। রেসিস্টর, ক্যাপাসিটর ইত্যাদি তৈরি হয়ে গেলে অত্যন্ত পাতলা অ্যালুমিনিয়ামের প্রলেপের সাহায্যে তাদের বৈদ্যুতিক সংযোগ সৃষ্টি করে সার্কিট পুরো করা হয়। তারপর ওই সিলিকন বা গ্যালিয়াম আর্সেনাইডের টুকরো বা চিপ্ (Chip) কে উপযুক্ত প্লাস্টিক সেরামিক বা ধাতুর তৈরি কেসের মধ্যে পুরে ফেলা হয়। কেস (Case) থেকে বেরিয়ে থাকে অনেকগুলি ঠ্যাঙ বা লেগ (leg)। কেসের ভিতরে আই সি বা সার্কিটের প্রধান প্রধান সংযোগস্থল থেকে চুলের মতো অনেক অনেক সরু সোনার তার টেনে এনে ওই ঠ্যাঙের সঙ্গে জোড়া হয়। ফলে আমরা বাইরে থেকে আই সি-র ঠ্যাঙের মাধ্যমে ভিতরের সার্কিটের প্রধান প্রধান জায়গা-গুলির সঙ্গে বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন করতে পারি। যেহেতু একটি সার্কিটে সাধারণত অনেকগুলি প্রয়োজনীয় সংযোগ থাকে, তাই বেশির ভাগ আই সি-তেই বেশ অনেকগুলি ঠ্যাঙ থাকে।

এবার বুঝেছি। সেবার যখন আমাদের টিভি খারাপ হলো তখন দেখেছি, টিভির ভেতরেও কালো কালো শোঁয়া-পোকার মতো অনেক ঠ্যাঙওয়ালা কি সব আছে। ওগুলোই আই সি তাই না ?

হ্যাঁ, ঠিক ধরেছো।

কি মজা, এবার থেকে একগাদা ঠ্যাঙওয়ালা কম্পোনেন্ট দেখলেই আই সি বলে ঠিক চিনে নিতে পারবো।

এইরে, আমি বোধহয় তোমায় ঠিক বোঝাতে পারিনি।

যদিও বেশির ভাগ সার্কিটে সাধারণত অনেকগুলি ঠ্যাঙই থাকে, তাহলেও কিছু কিছু এমন সার্কিটও আছে যেখানে কেবল মাত্র দুটি বা তিনটি প্রধান সংযোগ বিন্দু থাকে। সে ক্ষেত্রে সেই সব আই সি-তে কেবল মাত্র দুই বা তিনটি ঠ্যাঙই হয়। এই যেমন আমাদের হেডফোন রেডিওর আই সি-র কথাই ধরো না, এতে মোটে তিনটি ঠ্যাঙ আছে। তাই বাইরে থেকে দেখলে এটা আই সি নাকি ট্রানজিস্টার, কেউ বুঝতেই পারবে না।

তাহলে বলছো গোঁফ দেখে যায় চেনার মতো ঠ্যাঙ দেখে যায় চেনা থিওরী অ্যাপ্লাই করে আই সি চেনা ঠিক হবে না?

মোটেই না। মনে রাখবে ঠ্যাঙ বেশি থাকলে সেটি আই সি হলেও হতে পারে কিন্তু ঠ্যাঙ কম হলেই যে সেটি আই সি হবে না এমন কোনো কথা নেই।

ঠিক আছে এই কথাগুলো আমি ডাইরীতে সোম্যদার উপপাদ্য হেডিং এ দিয়ে রাখবো।

এই, এই, ঠিক এই কারণেই আমাদের কিস্সু হচ্ছে না। সবেতেই ঠাট্টা, সব কিছুই লাইট করে নেওয়া। লাইট করতে করতে দেখবে একদিন কেরিয়ারটাই হিলিয়াম হয়ে গেছে।

আরে চটছো কেন, আচ্ছা একটা আই সি-তে কত বড় সার্কিট ঢোকানো যায়?

কত বড় হলে তোমার চলবে?

এই ধর শখানেক ট্রানজিস্টার, শতিনেক রেসিস্টর শচারেক ক্যাপাসিটর ইত্যাদি দিয়ে তৈরি একটা বিরাট সার্কিট?

কি মনে হয়, এত্তো বড় একটা জিনিসকে একটা ট্রানজিস্টারের মাপে ছোট করা যাবে?

না, তা অবশ্য মনে হয় না, আচ্ছা ধরো এর অর্ধেক সাইজের সার্কিট যদি হয়?

এর অর্ধেক কি বলছো? এর একশোগুণ বড় সার্কিট যাতে লাখ দুয়েক কম্পোনেন্ট লাগে, এমন সার্কিটকেও ভি এল এস আই পদ্ধতিতে ওই রকম শোঁয়াপোকা খোলোসে পুরে ফেলা যাচ্ছে।

বুঝলাম তুমি খুব সিরিয়াস। কিন্তু এটা তো শুনে অবধি বিশ্বাস করতে পারছি না!

কি করে পারবে? গোটা কোলকাতার মানচিত্র কেউ যদি বলে একটা আলপিনের ডগায় এঁকে ফেলেছে যাতে কলকাতার প্রতিটা কানাগলিও দেখানো আছে, তাহলে কি কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে? আর আমি যা বললাম, সেই কাজ তো এর থেকে ঢের ঢের বেশি কঠিন। তবে অবিশ্বাস্য হলেও ব্যাপারটা নির্ভেজাল সত্যি। তোমার হাতের ওই পঁচাত্তর টাকা দামের ইলেকট্রনিক ঘড়িটার কথা ভেবেছো? ওতেই তো কম করে দশ থেকে কুড়ি হাজার ট্রানজিস্টার আছে।

ওফ্ শুনেই মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। কি যেন নাম বললে ভি এল টোন না কি?

ভি এল এস আই (V. L. S. 1) বা ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন। এটাই বর্তমানে আই সি তৈরিতে চরম ক্ষুদ্রায়নের পদ্ধতি। তবে এখানেই শেষ নয়, লেসার এবং ইলেকট্রন বিম লিথোগ্রাফির সাহায্যে আরো অনেক বেশি কম্পোনেন্ট ভবিষ্যতে একটা আই সি প্যাকিং এর ভিতরে পুরে ফেলা যাবে।

আর শুনে কাজ নেই। আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে কাজ কি। কখন সোল্ডারিং আয়রন নিয়ে বসবো তার জন্য হাত নিসপিস করছে। তবে তার আগে তুমি বরং আমাদের হেডফোন রেডিওটা কি করে কাজ করছে সেটা বুঝিয়ে দাও।

বেশ, তাহলে প্রথমেই সার্কিটের একদম বাঁ দিকে L এবং G কে দ্যাখো।

দেখেছি। L হলো অ্যানটেনা কয়েল আর G হলো গ্যাং কনডেনসার।

বাহ্, খুব ভালো। তবে Gকে গ্যাং কনডেনসার না বলে ভেরিয়েবল ক্যাপাসিটর বলাটা বেশি বৈজ্ঞানিক হবে। যাই হোক, L এবং G একত্রে তৈরি করেছে আমাদের রেডিওর টিউনার সার্কিট। এর সাহায্যেই আকাশবাণী থেকে এক সঙ্গে বিভিন্ন কম্পাঙ্কের বাহক তরঙ্গে (Carrier Wave) প্রচারিত কলকাতা ক, খ, বিবিধভারতী ইত্যাদি অনুষ্ঠানকে আমরা বেছে নিতে পারি।

ওসব আমার জানা। ট্রান্সমিটার থেকে ইথারে স্পন্দন তৈরি করে—

হায় ভগবান! এ যে ইলেক্ট্রনিক্স চর্চা করে অবৈজ্ঞানিক কথা কয়! এ সব ইথার টিথার কে শিখিয়েছে?

কোন একটা বিজ্ঞান পত্রিকায় পড়েছিলাম মনে হচ্ছে।

থাক-থাক, আর বলতে হবে না। আসল ঘটনা হল ট্রান্সমিটার থেকে বিভিন্ন কম্পাঙ্কের তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ (electromagnetic wave) চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ প্রবাহের জন্য কোনো ইথার লাগে না। কি করে সেটা বিনা মাধ্যমেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যায় তা ম্যাক্সওয়েল সাহেবের সূত্র পড়লেই জানা যাবে। এই তরঙ্গ যখন আমাদের রেডিওর অ্যানটেনা কয়েলে এসে পৌঁছয়, অমনি কয়েলে অবিকল ওই রকম বিদ্যুৎ স্পন্দন আবিষ্ট (induced) হয়। এই বিদ্যুৎ স্পন্দনের মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন কম্পাঙ্কে সম্প্রচারিত সব কটি স্টেশনই থাকে। নিজের পছন্দ মতো স্টেশন বেছে নেওয়ার জন্য আমরা Gকে অর্থাৎ ভেরিয়েবল ক্যাপাসিটরটি ঘোরাই। এতে ভেরিয়েবল ক্যাপাসিটরটির ক্যাপাসিটি বা ক্যাপাসিটেন্সের পরিবর্তন হয়। ক্যাপাসিটি পাল্টে গেলেই সম্পূর্ণ ট্যাঙ্ক সার্কিটের স্বাভাবিক বৈদ্যুতিক স্পন্দন অনুনাদ (Natural

Resonance Frequency) ও বদলে যায়। G এর নব ঘুরিয়ে ট্যাঙ্ক সার্কিটের স্বাভাবিক অনুনাদকে যখন কোনো একটি বিশেষ স্টেশনের সম্প্রচার বাহক তরঙ্গের (Carrier wave) সমান করা হয়, তখন ওই তরঙ্গটি অন্যান্য কম্পাঙ্কের তরঙ্গের থেকে বহু গুণ বেড়ে যায়। ফলে ট্যাঙ্ক সার্কিট থেকে কেবল মাত্র ওই বিশেষ অনুষ্ঠানের তরঙ্গই আউটপুট হিসেবে পাওয়া যায়। এভাবে নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমরা ট্যাঙ্ক সার্কিটের অনুনাদকে যে কোনো অনুষ্ঠান সম্প্রচার তরঙ্গের সঙ্গে সমান করে সেই অনুষ্ঠানকে বেছে নিতে পারি। সাধারণ ভাবে এই কাজকে আমরা স্টেশন ধরা বা টিউন করা বলি, তাই না ?

ঠিক ! এতোক্ষণে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো।

এবার দ্যাখো, ট্যাঙ্ক সার্কিট ও R_1 এর সংযোগস্থল, যেখান থেকে বেছে নেওয়া স্টেশনের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ আউটপুট পাওয়া যাবে, সেই জায়গাটি ফেরাণ্ড কোম্পানির তিন ঠ্যাঙের আই সি ZN414 এর দুনম্বর পিনের সঙ্গে জুড়েছি। এটি হলো IC র ইনপুট পিন। এই পিনের সঙ্গে কেসের ভিতরে চিপের গায়ে তৈরি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুটটি জোড়া আছে। রেসিস্টর R_2 এর সাহায্যে এই আমপ্লিফায়ারকে সঠিক অপারেটিং পয়েন্টে বায়াস (Bias) করেছি। R_1 এর মান কিন্তু আমাকে অঙ্ক কষে বার করতে হয় নি। কোম্পানি থেকেই R_1 এর মান কত হবে সেটা ঠিক করে দেওয়া আছে। R_1 এর মাধ্যমে দেওয়া বায়াস ভোল্টেজ যাতে L এর মাধ্যমে গ্রাউণ্ডের সাথে শর্ট না হয়ে যায় তাই C_1 কে ডি সি ব্লকিং ক্যাপাসিটর হিসেবে ট্যাঙ্ক এবং গ্রাউণ্ডের মাঝে লাগানো হয়েছে।

ICটির গ্রাউণ্ড সাপ্লাই 3 নম্বর পিনে দিতে হয়, তাই 3 নম্বর পিনটি গ্রাউণ্ডের সঙ্গে জুড়েছি। বাকি রইলো মোটেআর একটি পিন, পিন নম্বর 1 এই পিনটি বেশ মজার। এর মাধ্যমে আই সি-তে পজেটিভ সাপ্লাইও যাচ্ছে আর একই সঙ্গে আউটপুটও বের হচ্ছে। এটা অবাক হবার মতো কোনো ব্যাপার নয়। যে কোনো কমন এমিটার ক্লাস A ট্রানজিস্টার অ্যামপ্লিফায়ারে আমরা সচরাচর যে রেসিস্টরের মাধ্যমে কালেক্টারে পজেটিভ ভোল্টেজ দিই, কালেক্টার ও রেসিস্টারের সংযোগ বিন্দু থেকেই আউটপুট টেনে নেই, যেমন এই সার্কিটে হেডফোন চালানোর জন্য ট্রানজিস্টার T এর ক্ষেত্রে করা হয়েছে।

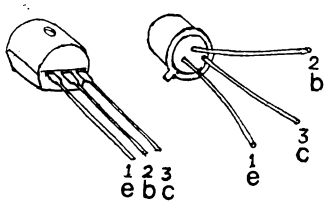

IC এবং Tএর পিন কনফিগারেশন

আউটপুট সিগন্যাল থেকে উচ্চকম্পাঙ্কের শব্দকে ছেঁটে বাদ দেওয়ার জন্য ICর পিন 1 এ C_3 ক্যাপাসিটর লাগানো হয়েছে। এই ক্যাপাসিটর এবং রেসিস্টর R_3 মিলে একটি লো পাশ (Low pass) ফিল্টার সৃষ্টি করেছে। এছাড়া R_2র আর একটি কাজ হলো, ICতে নির্দিষ্ট কারেণ্টে সাপ্লাই ভোল্টেজ পৌঁছে দেওয়া। R_2র মান বাড়িয়ে কমিয়ে ICর গেইন যথাক্রমে কমানো ও বাড়ানো যায় কিন্তু R_2-এর মান যা রেখেছি তার থেকে বেশি কমালে IC টির গেইন এতো বেড়ে যাবে যে সেটি অসিলেট করতে থাকবে। এর থেকে বেশি আরো বাড়ালে আবার হেডফোনের আওয়াজ খুব কমে যাবে। এক কথায় R_2র মানটি গুরুত্বপূর্ণ। তবে তুমি তাকে সামান্য বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিজের ইচ্ছে মতো গেইন পরিবর্তন করতে পারো।

এই জন্য পোটেনশিওমিটার লাগালে কেমন হয় ?

ওটা ঠিক যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে আমরা কোনো ভল্যুম কণ্ট্রোল রাখবো না। যাই হোক IC থেকে বিবর্ধিত ও ডিটেকটেড সিগন্যাল C_3র মাধ্যমে হেডফোন ড্রাইভার ট্রানজিস্টার T এর বেসে যুক্ত করেছি। Tকে বায়াস করেছি R_3র সাহায্যে। Tর এমিটার সরাসরি গ্রাউণ্ডে যুক্ত করে নেগেটিভ ফিডব্যাককে পুরো সরিয়ে দিয়েছি, যাতে T এর গেইন বেশি হয়। IC থেকে পাওয়া সংকেতকে T হেডফোন চালানোর মতো বিবর্ধিত করছে। এই বিবর্ধিত সংকেত T এর কালেক্টর ও R_4 এর সংযোগ বিন্দু থেকে ডি সি ডিকাপ্‌লিং ক্যাপাসিটর C_4 এর মাধ্যমে হেডফোনে দেওয়া হচ্ছে, আর হেডফোন বাজছে।

আচ্ছা এটাকে বড় রেডিও করা যায় না ?

কেন যাবে না ? খুব সহজ। এর জন্য L, G, R_1, R_2, C_1 C_2, C_3 কে এবং ICর সাপ্লাই ভোল্টেজকে অপরিবর্তিত রেখে C_3র পরে যে কোনো উপযুক্ত অ্যামপ্লিফায়ার লাগালেই গাঁক গাঁক করে রেডিও বাজবে।

আচ্ছা এবার কি করে বানাবো বলে দাও।

যে কোনো ভেরো বোর্ডের এক ইঞ্চি বাই এক ইঞ্চি একটা টুকরোতেই সব হয়ে যাবে, দরকার মতো ছুরি দিয়ে ভেরো বোর্ডের ফয়েল লাইন কেটে নিতে পারো। আমি অবশ্য একটা ছোট্ট পি. সি. বি, তৈরি করে নিয়েছিলাম।

ক্যাবিনেট হিসেবে কি পকেট ট্রানজিস্টারের ক্যাবিনেট ব্যবহার করবো ?

তাহলে তো মজাটাই চলে যাবে। এতো ছোটো রেডিওর তুলনায় যে কোনো ছোটো পকেট ট্রানজিস্টারের ক্যাবিনেট তো লিলিপুটের কাছে গ্যালিভার মনে হবে। আমি স্বচ্ছ অ্যাক্রাইলিক শিটকে আগুনের তাপে বেঁকিয়ে ক্যাবিনেট তৈরি করে নিয়েছি, ঠিক যে ভাবে রাস্তার ধারে ঘড়ির প্রোটেকটর তৈরি করে।

ঠিক বলেছো। এটা একটা ভাল আইডিয়া।

কে দিচ্ছে দেখতে হবে তো !

```
Super Cad *(C) Soumya Mitra 1987
06-02-1987     00:45:46

STOP at address 068D:0696

A>
```

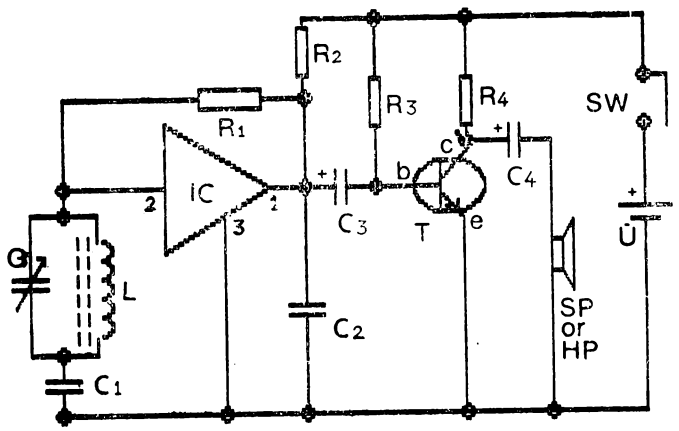

ব্রহ্মতালুতে শক্ খাবো না তো ?

বাজে বোকো না। একটা পেনসিল ব্যাটারি দিয়ে কেবল মাত্র কেঁচোকে শক্ দেওয়া যায়। মনে রাখবে অ্যানটেনা কয়েলে তিনটে টার্মিনাল থাকে। যার মধ্যে দুটি হলো কয়েলের দুই প্রান্ত এবং একটি হলো ট্যাপিং। ওই ট্যাপিংটা আমাদের কোনো কাজে আসবে না। তাছাড়া গ্যাং ক্যাপাসিটরেও তিনটি টার্মিনাল থাকে। তার মধ্যে মাঝেরটি এবং যে কোনো একটি ব্যবহার করবে। অন্যটি কাজে লাগবে না। এদের কিন্তু কোনো সোজা উল্টো নেই। সোজা উল্টো আছে একমাত্র IC, T এবং ইলেক্ট্রোলাইট

Component List

	Semiconductors		Passive Components	
IC	ZN 414 (Ferrant i)	R1	100K	1/4 Watt
T	BC 147B	R2	1K	1/4 Watt
	Others	R3	22K	1/4 Watt
SW	ON/OFF Switch	R4	33E	1/4 Watt
SP or HP	16 ohms imp. Speaker or	C1	10K Pf	
	8 ohms imp. Headphone	C2	0·1 mfd	
U	One AA size (pencil) Battery	C3	4·7 mfd	25 V
	(1·5 Volt)	C4	100 mfd	16V
		G	2X PVC Gang	
		L	2X Antenna Coil	

Vero Board, 10 Watt Soldering Iron, Hook up Wire, Cutter, Knife. Acrylic Sheet or Suitable Cabinet, PVC Tape, Ferrite Rod etc.

অমন আইডিয়া আমিও দিতে পারি। আচ্ছা, এবার বলো ওই ছোটো ক্যাবিনেট অ্যানটেনা কয়েল আর ফ্যারাইট রড কি করে ঢোকাবো।

ক্যাবিনেটে নয়, ওটা থাকবে হেডফোনের সঙ্গে লাগানো। মাথায় পরলে মাথার ওপরে থাকবে অ্যানটেনা কয়েল। ছবিতে দেখো, ঠিক যে ভাবে হয়েছে, সে ভাবে পি. ভি. সি টেপ দিয়ে ফ্যারাইট রড আর অ্যানটেনা কয়েলকে হেডফোনের সঙ্গে আটকে দিতে হবে।

ক্যাপাসিটরগুলিতে। IC এবং Tর পিন কনফিগারেশন এঁকে দেখিয়েছি, ভুল হবে না। তবে ইলেক্ট্রোলাইট ক্যাপাসিটরগুলি বসাবার সময় সার্কিটে দেখানো + চিহ্ন অনুসারে সঠিক পোলারিটিতে বসাবে। সব কিছুই 10 ওয়াটের আয়রন দিয়ে সরাসরি সোল্ডার করবে। সোল্ডার কিনতে কিপটেমো করবে না।

এক গজ বা দু গজ লুজ সোল্ডার কখনো কিনো না। তিনশো বা চারশো টাকা কেজি দরের সোল্ডার প্যাকেট

পঞ্চাশ গ্রাম কিনে রাখলে বহু দিন চলে যাবে। মনে রাখবে খারাপ সোল্ডারই সমস্ত যন্ত্রপাতি একবারে না চলার অন্যতম প্রধান কারণ।

হেডফোন কি ম্যাডান স্ট্রিটের রাস্তায় যে পাঁচ টাকা দামে সাদা সাদা কানে গোঁজার জন্য পাওয়া যায় সেই কিনবো ?

ওতো ইয়ার ফোন। হেডফোন হলো যার ছবি এঁকে দেখিয়েছি সেগুলো। ম্যাডান স্ট্রিটে এমনি স্পঞ্জ লাগানো হেডফোন বেশ সস্তায় পাওয়া যায়। আমি অবশ্য ফিলিপ্সের তৈরি 880/MH-F2 মডেলটি ব্যবহার করেছি। দাম পড়েছিল নব্বই টাকা মতো। এটা কিন্তু কিছুটা দামী তবে জিনিসটা এ ক্লাস।

আচ্ছা হেডফোন কানেকশনের সময় তো জ্যাকটা কেটে ফেলতে হবে ?

সেটা নির্ভর করছে তোমার ওপর। যদি রেডিওর বাক্সে স্টিরিও হেডফোন সকেট লাগিয়ে নাও তবে আর কাটতে হবে না। আমি অবশ্য কেটে কুটে একসা করে ফেলেছি।

তোমার কারবারই ওই। আচ্ছা, আই সিটা ম্যাডান স্ট্রিটে পাবোতো ?

আশা করছি এক্স স্টকই পাবে। যদি কোনো কারণে ফুরিয়ে যায় তাই বোম্বের একটি কম্পোনেন্ট সাপ্লায়ারের ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি। বোম্বেতে ল্যামিংটন রোডে ম্যাডান স্ট্রিটেরই মতো অজস্র কম্পোনেন্টের দোকান আছে। ওখানে ZN414 মুড়ি মুড়কির মতো পাওয়া যায়। দাম তিরিশ টাকা। আমি যে ঠিকানাটা দিচ্ছি এরা ডাকযোগে V .P P করে মাল পাঠায়। অর্ধেক টাকা বোধ হয় আগে পাঠাতে হয়।

S M J Electronics
62 Rajesh Building, 1st floor
339 Lamington Road
Bombay 400 007

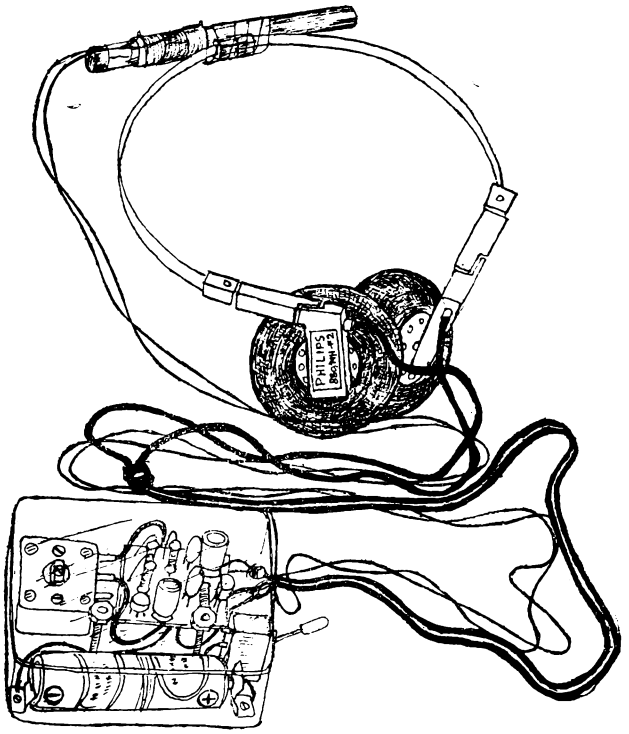

তবে অতকাণ্ড করতে হবে বলে মনে হয় না। যদি অবশ্য দরকার পড়ে তবে আমার পরামর্শ হলো দুতিনজন বন্ধু মিলে একত্রে বেশ কিছু ZN414 এর অর্ডার দিও। এতে পোস্টেজ খরচ অনেক কম পড়বে। এভাবে একত্রে অর্ডার দিলে ম্যাডান স্ট্রিটের নরেশ, রেলট্রন, জেনারাল রেডিও প্রভৃতি বড় বড় দোকানগুলিও তোমাদের আনিয়ে দিতে পারবে। ওকি ! চললে কোথায় ?

ম্যাডান স্ট্রিটে !

ইলেকট্রনিক ওজন যন্ত্র

দিলীপ পাঠক

আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় ও অতি পরিচিত একটি জিনিস হল ওজন যন্ত্র। হাটে, বাজারে, দোকানে, রেল স্টেশনে, বিমান বন্দরে, বিভিন্ন রকম ওজন যন্ত্র দেখতে আমরা অভ্যস্ত। অতি প্রাচীন কাল থেকেই এই যন্ত্রের ব্যবহার চলে আসছে এবং কালের সঙ্গে সঙ্গে ওজন যন্ত্র বা তুলাদণ্ডের বহু পরিবর্তন ও উন্নতি হয়েছে। সাধারণতঃ তুলাদণ্ডে কোনও বস্তু ওজন করতে হলে বস্তুটিকে বাঁদিকের পাল্লায় ও ডানদিকের পাল্লায় বাটখারা দিয়ে ওজন দেখা হয়। বস্তুটিকে পাল্লায় চাপিয়ে সরাসরি ওজন জানবার মত যন্ত্রও আছে যেমন স্প্রিং ব্যালান্স। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে যেখানে বস্তুটিকে ওজন করা হচ্ছে সেখানেই ওজন কত দেখে নিতে হচ্ছে। এমন যদি হয় যে বস্তুটি ওজন কত হচ্ছে এক ঘরে এবং অন্য ঘরে বসে সেই বস্তুর ওজন দেখতে চান তখন আগের কোনও যন্ত্রেই কাজ হবে না। এখন বিভিন্ন শিল্পে এ ধরনের ওজন যন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন। ইলেকট্রনিক্সের সাহায্যে এই কাজ করা এখন খুবই সহজসাধ্য। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা তৈরি করতে পারে এমন একটি ইলেকট্রনিক ওজন যন্ত্রের বিষয় আমরা এখানে আলোচনা করবো।

যে তত্ত্বের ওপর এই যন্ত্রটির নির্মাণ নির্ভর করছে সেটি হচ্ছে ফ্যারাডের তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ তত্ত্ব। পাশাপাশি রাখা তারের কুণ্ডলীর একটির মধ্য দিয়ে এ. সি. প্রবাহ পাঠানো হলে অন্যটির মধ্যেও এ. সি. প্রবাহ তৈরি হবে। কুণ্ডলী দুটি যদি একই নলে পর পর জড়ানো থাকে এবং নলের অক্ষ বরাবর যদি একটি চৌম্বক পদার্থের তৈরি দণ্ড নামিয়ে দেওয়া যায় তবে যে কুণ্ডলীটিতে এ. সি. প্রবাহ দেওয়া হয়নি সেই কুণ্ডলীতে আবিষ্ট প্রবাহ বেশি হতে থাকবে।

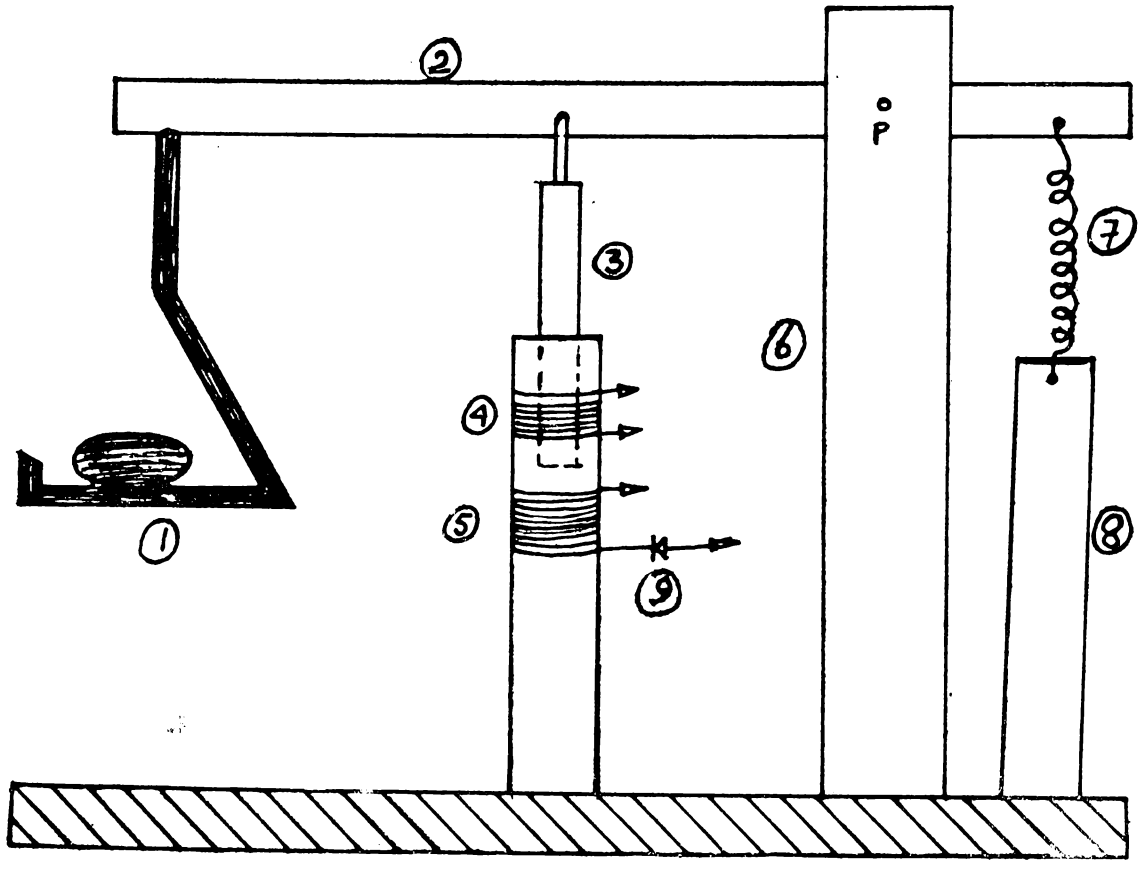

চিত্র—১

কি কি জিনিস লাগবে:

1. প্লাইউডের টুকরো—$1\frac{1}{2}'' \times 1''$
2. অ্যালুমিনিয়াম পাটি—($1''$ চওড়া $\frac{1}{8}''$ মোটা)—$2''$
3. অ্যালুমিনিয়াম পাটি—($1''$ চওড়া $\frac{1}{8}$ মোটা)—$1''$
4. কয়েল (coil) জড়াবার—$4''$ লম্বা চোঙ্গ ($\frac{1}{2}''$ ব্যাস)
5. সুপার এনামেল—100 গ্রাম তামার তার 36 নং
6. অ্যালুমিনিয়ামের চাদর 30 গেজ—$6'' \times 6''$
7. ট্রানজিস্টার AC 128—1টি
8. কার্বন রেজিস্ট্যান্স 5·6 K $\frac{1}{2}$ watt—1টি
9. কার্বন রেজিস্ট্যান্স 10K $\frac{1}{2}$ watt—1টি
10. কণ্ডেনসার 0·1 μF 12V—1টি
    „ 0·05 μF 12V—1টি
11. কার্বন রেসিস্ট্যান্স 22 অহম্—1টি
12. T_2 ট্রান্সফরমার—1টি
13. ফেরাইট রড $\frac{1}{4}''$ ব্যাস—$2''$
14. OA 85 ডায়োড—1টি
15. মিলি এ্যামিটার—1টি

কিভাবে তৈরি করতে হবে :

ক) প্লাইউডের পাটাতনটির ওপর $1''$ চওড়া অ্যালুমিনিয়ামের পাটি দুটি $10''$ লম্বা করে কেটে $\frac{1}{2}''$ তফাতে খাড়াভাবে লাগাতে হবে (চিত্র 1 ও চিত্র 3—6 নং অংশ)। লাগাবার আগে পাটি দুটির ওপরের দিকে (P) একই উচ্চতায় দুটি $\frac{1}{16}''$ ছিদ্র করতে হবে।

(খ) $\frac{1}{2}''$ চওড়া অ্যালুমিনিয়ামের পাটির যে কোনও একদিক থেকে $\frac{1}{4}''$ দূরে ও $2\frac{3}{4}''$ ও $5''$ দূরে তিনটি $\frac{1}{16}''$ ছিদ্র করতে হবে। এবার এই পাটিটিকে খাড়া দুটি পাটির মাঝখানে $2\frac{3}{4}''$ দূরের ছিদ্র এবং খাড়া পাটি দুটির ওপরের দিকে দুটি ছিদ্র বরাবর এক লাইনে রেখে একটি সরু পেরেক বা $\frac{1}{16}''$ সোজা তার ঢুকিয়ে দিতে হবে। এই অবস্থায় $\frac{1}{2}''$ পাটিটি 1নং চিত্রের (2) অংশের মত থাকবে। চিত্র 1 ও 3 দেখলেই বোঝা যাবে কোন অংশগুলি কিভাবে লাগাতে হবে।

গ) অ্যালুমিনিয়ামের চাদর (30 গেজ) দিয়ে (1 অংশটি তৈরি করে (2) এর অন্য প্রান্তে ঝুলিয়ে দিতে হবে।

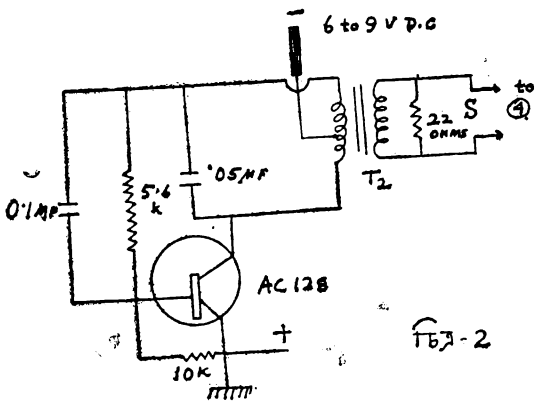

চিত্র - 2

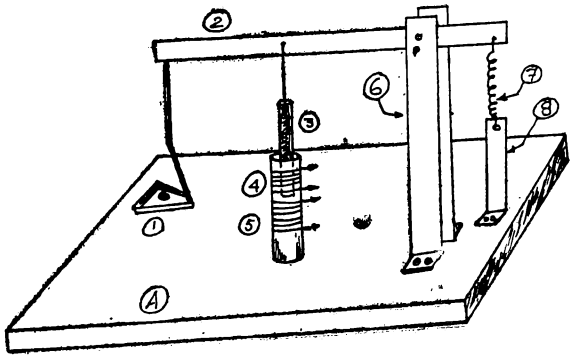

চিত্র - ৩

(ঘ) ফেরাইট রডটি $5''$ দূরের ছিদ্র দিয়ে একটি সুতোর সাহায্যে ঝুলে থাকবে।

(ঙ) এবার 36 নং সুপার এনামেল তার দিয়ে কুণ্ডলী তৈরির চোঙ্গ এর ওপর দুটি কুণ্ডলী পাশাপাশি একটু তফাতে জড়াতে হবে। চিত্র 1 (4) ও (5) / (4) 175টি পাক ও (5) 250 পাক। প্রতিটি কুণ্ডলীর দুটি করে প্রান্ত আলাদা করে রাখতে হবে।

(চ) এবার 2 নং চিত্র অনুযায়ী ইলেকট্রনিক বর্তনীটি তৈরি করতে হবে। এটি একটি **A.C.** প্রবাহ তৈরি করার **circuit**। যে দুটি তার (4) অংশে যুক্ত হবে তা দেখানো আছে।

(ছ) (5) অংশে যে কুণ্ডলী দেখানো হয়েছে সেই কুণ্ডলীর একটি প্রান্ত একটি **OA 85** ডায়োডের (9) এক প্রান্তে যোগ করতে হবে এবং কুণ্ডলীর ও ডায়োডের অপর প্রান্ত দুটি একটি মিলি এ্যামিটারের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

(জ) এবার ইলেকট্রনিক **Oscillator** এর (+) ও (−) প্রান্ত একটি ব্যাটারি এলিমিনেটারের (6—9 ভোল্ট) যথাযথ প্রান্তে যোগ করে দিলেই এ্যামিটারের কাঁটার বিক্ষেপ হবে।

(ঝ) কোনও বস্তু পাল্লার ওপর দিলেই এবার ফেরাইট রডটি নেমে দুটি কুণ্ডলীর মধ্যে তড়িতাবেশ পরিবর্তিত করবে। ফলে কাঁটাটি শূন্যমান থেকে আরো দূরে সরে যাবে।

জানা ওজনের বিভিন্ন বাটখারা চাপিয়ে কাঁটাটি কোথায় যায় সেটি দেখে যন্ত্রটির মান স্থির করা যাবে। প্রতি গ্রাম ওজনে কাঁটাটি কত ঘর সরে সেটা ঠিক জানা হলেই অজানা কোনও বস্তু পাল্লায় রেখে মিলি এ্যামিটারের কাঁটা দেখে বস্তুটির ওজন জানা যাবে। যেখানে ওজন করা হচ্ছে সেখান থেকে অনেক দূরে বসেও মিটার দেখে বস্তুর ওজন জানা সম্ভব।

এই মডেলটি তৈরি করার জন্য যে সব জিনিসের তালিকা দেওয়া হল তার পরিবর্তে অন্য জিনিসও ব্যবহার করা যেতে পারে। এ রকম মডেল তৈরির ব্যাপারে নিজের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিশেষ দরকার। এই ওজনটি তৈরি করার পদ্ধতি নিজের দক্ষতার বলে আরও উন্নত করতে পারবে এই আশা করি।

ইলেকট্রনিক ফ্যান রেগুলেটর

বিপ্লব ব্যানার্জী

আমার কিশোর ভায়েরা হয়ত অনেকেই ভাবছ ইলেকট্রনিক ফ্যান রেগুলেটর আবার এমন একটা নতুন জিনিস কি! আজকাল ত হামেশাই এর নাম শুনতে পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন হল শতকরা কতজন আমরা এই EFR ব্যবহার করি এবং কেনই বা আমরা মান্ধাতার আমলের বিশাল চেহারার (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা = 5 ইঞ্চি × 5 ইঞ্চি × 5 ইঞ্চি = 125 ঘনইঞ্চি) ছেড়ে হঠাৎ Electronic Fan Regulator (EFR) [যার সাইজ হল দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা = 2 ইঞ্চি × 2 ইঞ্চি × $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি = 2 ঘন ইঞ্চি] ব্যবহারের কথা বেশি করে চিন্তা করব।

আমরা সাধারণতঃ বাড়িতে যে Table Fan বা Ceiling Fan ব্যবহার করি সেগুলির পিছনে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যয়িত হয় 34 ওয়াট থেকে 84 ওয়াটের মধ্যে। ON এবং OFF position নিয়ে একটা Resistance Control Electronic Fan Regulator এ মোট 8 (eight) টা position বা অবস্থানের মধ্যে ON position এ Fan এর ব্লেডগুলি খুব জোরে ঘোরে এবং 1 position এ ব্লেডগুলি খুব আস্তে আস্তে ঘোরে আর Fan এর এই আস্তে আস্তে বা জোরে জোরে ঘোরাকেই আমরা সাধারণতঃ Fan এর speed বলে থাকি। সাধারণ ফ্যানের বৈদ্যুতিক বর্তনীর সংগে series এ একটা multiterminal wirewound resistance regulator এর মধ্যে লাগানো থাকে—যার মান 1, 2, 3, 4, 5 ও 6টি বিভিন্ন ভাগে পরিবর্তন করা যায়। ছবি দেখে জিনিসটা বোঝার চেষ্টা কর। এখন Regulator এর knobটা যখন ON বা 6 নম্বর position বা অবস্থানে থাকে তখন Fan এর speed হয় খুব বেশি এবং যখন 1 নম্বর position এ থাকে তখন speed হয় খুব সামান্য। অর্থাৎ ON বা 6 নম্বর স্থানে Fan এর বৈদ্যুতিক বাধা বা Resistance সবচেয়ে কম এবং 1 নম্বর position এ বৈদ্যুতিক বাধা বা Resistance সবচেয়ে বেশি আর এই Regulator এর বৈদ্যুতিক বাধা বা Resistance বিভিন্ন কোম্পানীর ফ্যানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানের হয়ে থাকে। এখন 60 watt, 220V A.C. Ceiling Fanকে সারা বছরে আমরা বহু সময় বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা হ্রাস বা বৃদ্ধির জন্য Regulatorকে তার বিভিন্ন অবস্থানে রেখে চালাতে বাধ্য হই। ফলে একটা Resistive Regulator দিয়ে 60 watt এর Fan কে চালাতে গেলে রেগুলেটারের যে কোন অবস্থানের জন্য (1 থেকে 6 পর্যন্ত যে কোন অবস্থানের জন্যই) একই পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি ব্যয়িত হয়। রেগুলেটারকে 1 নং অবস্থানে রাখলে বেশির ভাগ বিদ্যুৎ শক্তিই Regulator এর পিছনে ব্যয়িত হয়। ফলে ফ্যান খুব আস্তে আস্তে ঘোরে অন্যদিকে Regulator কে 6 নং অবস্থানে রাখলে বেশির ভাগ বিদ্যুৎ শক্তিই Fan এর পিছনে ব্যয়িত হয় এবং খুব কম পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি Regulator এর পিছনে ব্যয়িত হয়, ফলে ফ্যান খুব জোরে ঘোরে। রেগুলেটারের 6 নং অবস্থানের জন্য Regulator খুব সামান্য গরম হয় আর 1 নং অবস্থানের জন্য রেগুলেটর সবচেয়ে বেশি গরম হয়। Regulator কি পরিমাণ গরম হয় তা নির্ভর করে $H = 0{\cdot}24I^2Rt$ সূত্রানুসারে (যেখানে রেগুলেটার উদ্ভূত তাপ H in ক্যালরি, ফ্যানের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ in অ্যাম্পিয়ার, রেগুলেটারকে যে অবস্থানে রেখে ফ্যান চালানো হচ্ছে সেই সময়কার রেগুলেটার মধ্যস্থিত রোধ বা Resistance R in ওহ্‌ম এবং যতক্ষণ ধরে ফ্যান চালানো হচ্ছে সেই সময় t in সেকেণ্ডে প্রকাশ করা হয়)।

এভাবে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে গরমের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য একটা 60 watt ক্ষমতাসম্পন্ন Ceiling Fanকে বছরে মোটামুটি গড় হিসাবে প্রায় 2300 ঘণ্টা চালাবার প্রয়োজন হয় যার জন্য মোট বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন হয় 2300 × 60 = 138000 watt বা 138 kw। এর মধ্যে বছরের বিভিন্ন সময়ে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ার জন্য উক্ত ফ্যানকে রেগুলেটারের 1 থেকে 6 পর্যন্ত বিভিন্ন অবস্থানে রাখার প্রয়োজন হয়। আর ঠিক এই জন্যই Resistive Regulator মোট ব্যয়িত বিদ্যুৎ শক্তির শতকরা প্রায় 40 ভাগ (40%) নিজে খরচ করে যে খরচটা আমাদের ব্যবহারিক কোন কাজে আসে না। এর অর্থ দাঁড়াল যে রেগুলেটার মোট ব্যয়িত 138 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তির শতকরা 40 ভাগ বা 55 কিলোওয়াট নিজে খরচ করে, যার ফলে রেগুলেটার নিজে গরম হয় কিন্তু সেই গরম আমাদের কোন কাজে আসে না আর বাকী 138-55 বা 83 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি ব্যয়িত হয় Fan চালাবার জন্যে। EFR ব্যবহার করলে আমরা এই 55 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় অনায়াসেই বন্ধ করতে পারি। টাকার অঙ্কে এই 55 kw বিদ্যুৎ শক্তির মূল্য দাঁড়ায় = 55 B.O.T. unit × 60 পয়সা (1 kw = 1 B.O.T বা Board of Trade Unit) = 33 টাকা (যদি ধরে নেওয়া হয় 1 B.O.T Unit এর মূল্য = 60 পয়সা)। অতএব প্রতি বছর প্রতিটি 60 watt Ceiling Fan এর পিছনে আমরা খুব সহজেই 33 টাকা বাঁচিয়ে ফেলতে পারছি। এখন কোন বাড়িতে

যদি 6টা 60 watt Ceiling Fan থাকে এবং 60 বছর ধরে এগুলি ব্যবহার করি তবে আমরা উক্ত 60 বছরে $33 \times 6 \times 60 = 11,8\ 0$ টাকা শুধু এক ফ্যানের পিছনেই বাঁচিয়ে ফেলতে পারি। অন্যদিকে ইলেকট্রনিক রেগুলেটর প্রতি 100 watt বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারিক কাজে লাগাবার জন্য নিজে মাত্র শতকরা 1 ভাগ শক্তি খরচ করে। অতএব বর্তমান 83 কিলোওয়াট শুধু ফ্যানের জন্য ব্যয়িত বিদ্যুৎ শক্তির মধ্যে EFR এর জন্য ব্যয়িত বিদ্যুৎ শক্তির পরিমাণ = 83 কিলোওয়াট $\times$ 1% = 0 83 কিলোওয়াট। টাকার অঙ্কে যার মূল্য দাঁড়ায় = 0·83 kw $\times$ 60 পয়সা = প্রায় 50 পয়সার সমান (1টা 60 ওয়াট Ceiling Fan 1 বছরের জন্য)। অতএব 6টা 60 watt Ceiling Fan 60 বছর চালালে EFR এর পিছনে ব্যয়িত বিদ্যুৎ শক্তির পরিমাণ = 0·83 কিলোওয়াট $\times$ $6 \times 60 = 299$ কিলোওয়াট। টাকার অঙ্কে যার মূল্য দাঁড়ায় = 50 পয়সা $\times 6 \times 60 = 180$ টাকা। অন্যদিকে ঐ সময়ে Resistive Regulater এর পিছনে ব্যয়িত বিদ্যুৎ শক্তির পরিমাণ = 55 কিলোওয়াট $\times 6 \times 60 = 19800$ কিলোওয়াট = 19·8 মেগাওয়াট = 11,880 টাকা। তাহলে Net resultটা কি দাঁড়ালো। 6টা 60 watt Ceiling Fan 60 বছর ধরে চালালে মান্ধাতার আমলের বিশাল সাইজের Resistive Regulator দিয়ে বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় ঘটে = 20 Megawatt (প্রায়)। টাকার অঙ্কে যার মূল্য দাঁড়ায় = 11,880 টাকা। অন্যদিকে Electronic Fan Regulator ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় ঘটে প্রায় 300 কিলোওয়াটের মত যা 20 Megawatt বিদ্যুৎ শক্তির 66 ভাগের মাত্র 1 ভাগ। টাকার দিক দিয়ে EFR ব্যবহার করলে 11,880 ÷ 180 = 66 ভাগের মাত্র 1 ভাগ টাকা খরচ হয় (কারণ EFR এর পিছনে ব্যয়িত 299 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তির মূল্য প্রায় 180 টাকা)। এ তো গেল Resistive Regulator ছেড়ে কেন বেশি করে আমরা EFR ব্যবহার করব তার সঠিক মূল্যায়ন। এবার তাহলে Electronic Fan regulator (EFR) এর Electronic sideটার দিকে একটু ফিরে তাকানো যাক।

Electronic Fan Regulator এর প্রধান দুটো জিনিস হল DIAC ও TRIAC। DIAC মানে হল Diod AC Switch, যে switchটার দুটো তড়িৎদ্বারই একই সংগে Alternate Cycle এর + ve side বা —ve side অর্থাৎ উভয় দিকেই কাজ করতে পারে। অনেক সময় Bilateral Trigger বা Bidirectional Thyristerও বলা হয়ে থাকে। TRIAC মানে হল Triod AC Switch যে Switchটার তিনটে তড়িৎদ্বার আছে। এই তিনটে তড়িৎদ্বার হল যথাক্রমে Main terminal I, Main terminal II এবং Gate। SCR বা Silicon Controlled Rectifier দিয়ে যেমন AC Power এর অর্ধেকটা নিয়ন্ত্রণ করা যায় তেমনি Triac দিয়ে AC-র + ve half power এবং —ve half power দুটোই এক সংগে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আবার DIAC এবং TRIAC এক সংগে যুক্ত হয়ে তিন ঠ্যাংওয়ালা (হুবহু SL 100 Transistor এর মত দেখতে) যে জিনিসটা তৈরি হয় তাকে বলে QUADRAC বা Built in Diac। QUADRAC ব্যবহার করলে আলাদাভাবে Circuit এ আর Diac ব্যবহার করতে হয় না অর্থাৎ QUADRAC একই সংগে Diac এবং Triac এর কাজ করে। এখন খুব সোজাভাবে TRIAC এর কার্যকারিতা বোঝাবার চেষ্টা করছি। দেখ বুঝতে পার কিনা।

ধর, তোমাদের বাড়ির প্রধান ফটকের বা Main দরজার বাইরে অনেক লোক তোমার ঘরের মধ্যে ঢোকার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। এখন তুমি যেমন যেমন দরজা ফাঁক করবে তেমনভাবে দরজার বাইরের লোক দরজার ভিতরে ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারবে। দরজা একটা লোক ঢোকার মত ফাঁক করলে একটা লোক ঢুকতে পারবে আবার বেশি লোক ঢোকার মত ফাঁক করলে বেশি লোক ঢুকতে পারবে। এক্ষেত্রে তুমি দরজার ফাঁক নিয়ন্ত্রণ বা Control করে ইচ্ছেমত বেশি বা কম লোক দরজার বাইরের স্থান থেকে দরজার ভিতরে অর্থাৎ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষমহিবে। TRIAC-এর ক্ষেত্রে Gate হল দরজা, Main terminal I হল দরজার বাইরের দিক আর Main terminal II হল দরজার ভিতরের দিক। ফটকের ব্যাপারে ছিল লোকের যাতায়াতের প্রবাহ আর Tric এর ক্ষেত্রে Main terminal I থেকে Main terminal II তে AC বিদ্যুৎ শক্তির প্রবাহ। কাজেই TRIAC হল AC Power Control Device। Triac কে অনেক সময় Two SCRS in reverse parallelও বলা হয়।

Mains এর 220V AC থেকে Resistance এবং Capacitor দিয়ে একটা খোঁচা type এর wave (ΛΛΛ) Diac এর মাধ্যমে Triac এর Gate এ ফেলা হয় এবং ঐ spikes type waveটির Amplitude আমাদের বিভিন্ন সময় প্রয়োজনানুসারে একটা variable potentiometer এর knob ঘোরানোর সাহায্যে variable part এর রোধ পরিবর্তন করে নিয়ন্ত্রণ করি। এভাবে Diac এর সাহায্যে Triac এর Gate voltage বা Gate current নিয়ন্ত্রণ করে Triac এর Main terminal I এবং Main terminal II র series এ লাগানো বৈদ্যুতিক পাখার বিদ্যুৎপ্রবাহ বাড়িয়ে বা কমিয়ে বৈদ্যুতিক পাখাকে বিভিন্ন speed বা গতিতে ঘোরানো সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে Triac ও Diac দিয়ে যে circuit তৈরি করা হয় সেটা আসলে একটা Phase Triggering Circuit যার সাহায্যে Alternate Cycle Current এর 180° পর্যন্ত control বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় একটা নির্দিষ্ট মানের Potentiometer এর knob বিভিন্ন অবস্থানে ঘুরিয়ে। যে কোন Phase

Triggering Circuit যথেষ্ট পরিমাণ Radio Frequency Interference বা RFI তৈরি করে যা Radio Receiver এ properly detected হয়ে Radioর Audio sound এর qualityকে একটু নষ্ট করে দেয়। তাই RFIকে neutralise বা নষ্ট করে দেওয়ার জন্য RFC বা Radio Frequency Choke মূল circuit এর সংগে জুড়ে দেওয়া হয় যা circuit এ উৎপন্ন RFIকে neutralise করে।

RFC ছাড়াও আবার একটা Resistance এবং একটা Capacitor series এ যুক্ত করে একটা $\frac{dv}{dt}$ (অর্থাৎ rate of change of voltage with respect of time) Control circuit তৈরি করা হয়। $\frac{dv}{dt}$ এর মান খুব উচ্চ না হলে বিদ্যুৎ শক্তি নিয়ে কাজ করার সময় Triac খুব স্বল্প সময়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গরম হয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। Diac, Triac এর working condition এবং $\frac{dv}{dt}$, RFI ও RFC সম্বন্ধে এত কিছু জানার আছে যার সবকিছু এই স্বল্প পরিসরে ব্যক্ত করা এই মুহূর্তে সম্ভবপর নয়, যাদের এ সম্বন্ধে অতিরিক্ত কিছু জানার ইচ্ছা বা আগ্রহ আছে তারা আমার বাড়ির ঠিকানায় যোগাযোগ করে জেনে নিও। এবার EFR ঠিকমত গেঁথে ফেলার জন্য নিচের চারটি প্রয়োজনীয় অংশ A. B, C ও D ঠিক মত পড়ে বুঝে নাও, তাহলে আর কোন অসুবিধা থাকবে না।

(A)→RFC তৈরি করার জন্য একটা $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি diameter বিশিষ্ট Ferrite rod থেকে $1\frac{1}{4}$ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের অংশ কেটে নাও এবং Ferrite rod এর উপরে 28 S. W. Genarelled copper তার খুব শক্ত এবং ঘেঁষাঘেঁষি করে 56 পাক জড়িয়ে নাও এবং তারের দুটো দিক কোন Quick Finicing Epoxy Adhisive দিয়ে এমনভাবে আটকিয়ে দাও যেন উভয় দিকে তারের খুব সামান্য অংশ বেরিয়ে থাকে circuit এ connection করার জন্য।

(B)→P_2 (1 Meg Lin Pot) -র shaftটার $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি পরিমাণ দৈর্ঘ্য রেখে বাদবাকীটা কেটে ফেল।

(C)→P_2 (1 Meg Lin Pot) কে higher Ohmic Valueতে রেখে P_1 (1 Meg Preset Pot) কে P_1 এর সবচেয়ে কম value থেকে আস্তে আস্তে বেশি value-র দিকে এমনভাবে adjust করো যাতে Fanটা তোমার পছন্দমত একটা minimum speed-এ ঘোরে।

(D)→Diac এর একটা দিক Triac এর Gate এর সংগে খুব সাবধানে এবং অল্প সময়ে solder করবে।

এই হল ইলেকট্রনিক ফ্যান রেগুলেটর তৈরি করার কলাকৌশল যা তোমরা খুব সহজেই বাড়িতে গেঁথে ফেলতে পারবে।

Electronic Fan Regulalor (EFR) Circuit with Component List নিচে দেওয়া হল।

Components :— $R_1 = 27$ Kilo Ohm, $\frac{1}{4}$w Carbon resister, $R_2 = 120$ Ohm, 2w Carbon resister, P_1 1 Meg ohm preset pot, $P_2 = 1$ Meg Ohm Lin Pot (Miniature), $C_1 = 0{\cdot}1$ microfarad/400V D.C Polyster Capacitor, $C_2 = C_3 = 0{\cdot}15$ microfarad/400V D.C Polyster Capacitor, D = DIAC = SS32D, T = TRIAC = ST024, RFC = Radio Frequency Choke, R_2 and C_2 Combination for $\frac{dv}{dt}$ control, C_3 for residual radiofrequency by pass EFR তৈরি করতে আনুমানিক খরচ = 35 /- টাকা।

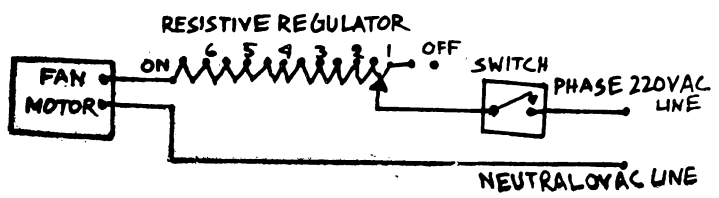

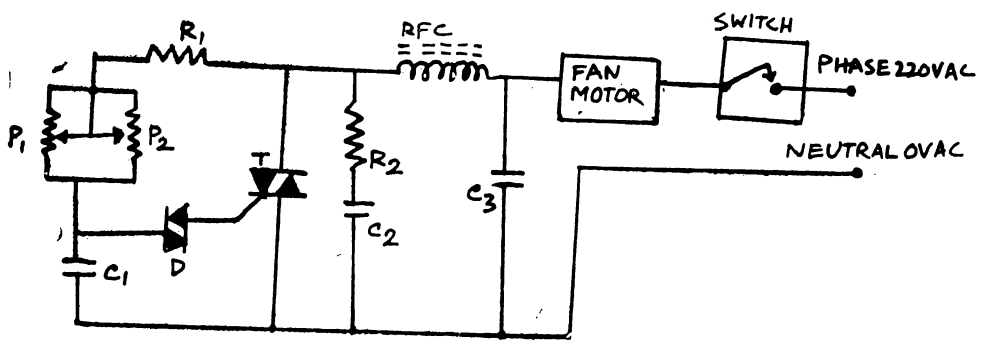

কথা-বলা পাখি

অজয় হোম

ময়না।

কথা বলা পাখিদের মধ্যে ভারতের শ্রেষ্ঠ হচ্ছে—পাহাড়ী ময়না (গ্রাক্যুলা রিলিজিওসা), ইংরেজি—হিল মইনা। এদেরই আমরা ময়না বলে চিনি। লম্বায় 39 সেমি (সাড়ে 11 ইঞ্চি)।

ময়নার দেহের সমস্ত পালক কুচকুচে কালো, তার উপর সবুজ ও বেগুনীর আভা। কেবল ডানার বড়ো পালকগুলির কয়েকটির মাঝামাঝি সাদা। ডানা না মেললে সব সময় দেখাও যায় না। চঞ্চু কমলা-লাল। ডানায় একটু হলুদের ছোঁয়াচ। পা কমলা-হলুদ, নখর কালচে-পাটকিলে। চোখের তলা ও পিছন দিকে ঘুরে ঘাড়ের উপর পালকহীন ত্বক উজ্জ্বল হলুদ। যেগুলির এই ত্বক গাঢ় ও উজ্জ্বল তাদের সোনাকানি এবং যাদের ফিকে তাদের রুপোকানী বলে।

আমাদের দেশে দেখা যায় কুমায়ুন থেকে পুবে নেপাল, সিকিম, ভুটান, অরুণাচল, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড আসামের পর্বত ও পার্বত্য উপত্যকায় এবং বাংলাদেশে 2000 মি উচ্চতার মধ্যে। আর একটি উপজাতিকে দেখা যায় মেদিনীপুর, ওড়িশা, পূর্ব মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশে 800 মি উচ্চতার জঙ্গলের মধ্যে। এদেরও পাহাড়ী ময়না (গ্রা রি পেনিনসুলারিস) বলে। আমাদের দেশ ছাড়া দেখা যায় শ্রীলঙ্কা, বর্মা, মালয়, সুমাত্রা, জাভা এবং বোর্নিওতে।

ঘন অথবা পাতলা জঙ্গলে গাছে গাছেই ময়না বিচরণ করে। চা, কফি ইত্যাদি ক্ষেতের ধারের গাছেও দেখা যায়। প্রজননের সময় ছাড়া অর্থাৎ এপ্রিল থেকে জুলাই বাদে ওরা সাধারণত ছোটো বা বড়ো দলে ঘুরে বেড়ায়। গাছের মগডালই এদের প্রিয়। কোনো কিছুতে আকৃষ্ট হলে তবেই এরা নিচের ডালে নামে অনুসন্ধানের জন্যে। মাঝে মধ্যে মাটিতেও নামে। কিন্তু তাদের হাঁটাটা ময়নার বংশানুযায়ী নয়, ডডাই-এর মতো জোড় পায়ে লাফিয়ে চলে। ওরা ওড়ে দ্রুতগতিতে এবং সোজাসুজি। ওড়ার সময় ওদের ডানার ঝাপটে একটা ধাতব শব্দ নিঃসারিত হয়।

ময়না বাসা বাঁধে মরা ভঙ্গুর গাছে। যে গাছে মানুষের চড়া খুবই বিপজ্জনক। গাছটা একটু ফাঁকা জায়গা বা ক্ষেতের ধারে হলেই পছন্দ। মাটি থেকে 6-31 মিটার উঁচুতে গাছের কাণ্ডে গর্তের ভিতর অল্প ঘাস, পালক, পাতা ও গাছের ছালের নরম টুকরো দিয়ে আস্তরণ বিছায়। গাছের গায়ে গর্তটি ময়না নিজেই বানায়। দেখা যায় একই গাছে চার পাঁচটি পরিবার উপর নিচ করে বাসা বাঁধতে।

এদের সবচেয়ে বড়ো গুণ মানুষের গলার স্বরে কথা বলা যেকোনো টিয়া (রোজরিঙ্গড), চন্দনার (আলেকজাণ্ড্রিন) চেয়ে ভালো। মানুষ একে খাঁচায় পোষে কারণ একে সহজেই পাওয়া যায়। যে কোনো আওয়াজ নকল করতে এবং কথা বলায় খুবই দক্ষ। মানুষের হাসি, কান্না, হাঁচি ও কাশির অবিকল নকল এমন ভাবে করে যে তা অন্য পাখির পক্ষে অসম্ভব। খাঁচার পাখি হিসেবে সকলের কাছেই এর খুব আদর।

মদন গৌর তোতা

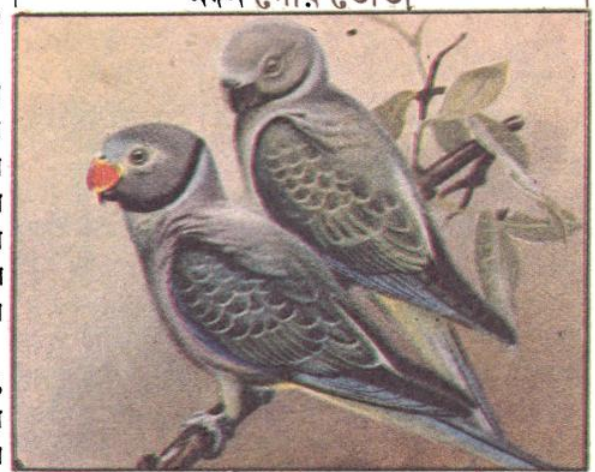

মদন গৌর তোতা।

বাঙ্গালোরে গিয়েছিলাম 1965 সালে। সেখানে ওমর কাশিম বলে অল্প বয়সী দক্ষিণ ভারতীয় মুসলমান ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়। স্বভাবতই কথায় কথায় পাখির কথা উঠল। তার কাছে জানলাম, এই মহীশূর রাজ্যে সান্তাবেরি বলে এক গ্রামে তার বাড়ি। সেই গ্রামের কাছে বাবুদ্দীন বলে এক পীরের আস্তানা আছে। সেখানে এক জাতের জংলি টিয়া পাখি দেখা যায় তারা নাকি পরস্পর জড়তাহীন স্বরে কোরান শরিফের বয়ান বলে। আমি তার কথা হেসেই

উড়িয়ে দিই। টিয়া-চন্দনা জাতীয় প্যারাকীটদের কথায় কিছুটা জড়তা থাকবেই। আর জংলি পাখি আপনা থেকেই কোরান শরিফের বয়ান বলছে, এ অসম্ভব। তর্ক চলল সমানে।

সকাল বেলায় চায়ের টেবিলেই ঝড়টা উঠেছিল। বিকেলে সে নিয়ে গেল এক বয়স্ক মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়িতে। দেখলাম, তাঁর সখ নানা জাতের ক্যানারি পাখির। একটা খাঁচায় রয়েছে কস্তুরা (মালাবার হুইস্টলিং ফ্লাস)। তিনি বললেন, ওমর যা বলেছে তা সত্যি। বাবা বুদান পাহাড়ে বাবুদ্দীন সাহেবের মাজারে এই জংলি তোতার বাস। তিনি নিজে যান নি কিন্তু তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা গেছেন এবং পাখির মুখে বয়ানও শুনেছেন। এই পাখি পোষার জন্যে অনেকে আগ্রহীও। কিন্তু সেখান থেকে এই পাখি কে ধরে আনবে ?

কৌতূহল চরমে উঠল। ওমরকে পাকড়ে তার পরদিনই রওনা হয়ে পৌঁছলাম বাবা বুদান পাহাড়ের কোলে জংলি গ্রাম সান্তাবেরিতে। তার পরদিন হাজির হয়েছিলাম পীর বাবুদ্দীন সাহেবের আস্তানায়।

পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই অভ্যর্থনা জানাল 'সালাম আলায়াকুম' গাছের উপর থেকে পাখিরা একের পর এক। কখনও সমস্বরে 'ইয়ে আল্লাহ'। কখনও 'লা ইলাহ ইল্লালাহ' ইত্যাদি। অনেক বয়ান শুনলাম যা আমি কখনও শুনি নি। আজ আর তা মনেও নেই। স্রেফ তাজ্জব বনে গেলাম। মুখের কথা সরে না। ওমর মিচকি মিচকি হাসতে থাকে।

ওমরের মতে বাবা বুদানের মাহাত্ম্য। আল্লার বাণী যে ঠিক, সেই কথা পাখিরাও জানাচ্ছে।

যুক্তিবাদী মন মানতে চায় না। দেখলাম, একটু দূরে এক অশীতিপর বৃদ্ধ নামাজ পড়ছেন। তাঁর নামাজ পড়া শেষ হলে তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। তিনি হিন্দি উর্দু কিছুই জানেন না। তবে তিনি পাঁচবার নামাজ পড়েন এবং শুনে শুনে শরিয়ত সব মুখস্থ। ওমর দোভাষীর কাজ করল। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর তিনি যা বলছেন তা হল—বহু বছর আগে বাবুদ্দীন বলে এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি মক্কায় যান। সেখান থেকে ফেরার সময় ইয়েমেন থেকে তিনিই দক্ষিণ ভারতে প্রথম কফির চারা নিয়ে আসেন। তাঁর নামেই এই পাহাড়ের নাম বাবাবুদান। তিনি এই জাতের কিছু জংলি তোতা ধরে কোরান শরিফের বাণী শেখান, তারপর ছেড়ে দেন। বংশানুক্রমে সেই পাখিরাই এই বাণী বলে আসছে। শুনে বুকের ভার নেমে গেল।

এই পাখিরা শুক বংশের (প্সিট্টাসিদি) অন্তর্গত ত্রিকেতুগণের এক প্রজাতি। নাম - মদন গৌর তোতা বা বাবাবুদান তোতা (প্সিট্টকুলা কলামবয়ডেস)। ইংরেজি —রুটইংগড্ প্যারাকীট। লম্বায় 38 সেমি (সাড়ে 14 ইঞ্চি)।

টিয়ার (রোজারিংগড্) চেয়ে একটু ছোটো, ফুলটুসীর (রসমহেডেড) চেয়ে অল্প বড়ো। পুরুষ পাখির নীলচে সবুজ দেহে গোলাপী-ধূসর মাথা, পিঠ এবং বুক উজ্জ্বল নীলচে সবুজ ও কালো কণ্ঠী। পিঠের তলার অংশ, বস্তি প্রদেশ ও লেজের মাঝের পালক নীল, লেজের নীল পালকের ধার হলুদ। স্ত্রী-পাখির কালো কণ্ঠী ছাড়া বাকি বুক ও পিঠ ঘুঘু ধূসর। উভয়ের কনীনিকা মলিন সোনালী হলুদ বা উজ্জ্বল হলুদ। পুরুষের উপরের চঞ্চু টকটকে লাল, ডগাটা হলুদ, তলার চঞ্চু শিঙে পাটকিলে, চিবুকের কাছে কমলা, ডগাটা হলুদ। স্ত্রী পাখির উপর ও নিচের চঞ্চু গাঢ় শিঙে পাটকিলের উপর কালচে ভাব, চিবুকের কাছে কমলা। উভয়ের পা ও আঙুল সবজেটে-ধূসর, নখর শিঙে পাটকিলে।

খাদ্য—নানাবিধ খাদ্য শস্য, বীজ ও ফল। ফলের মধ্যে ডুমুর জাতীয় ভলই বেশি প্রিয়। এছাড়া ফুলের কুঁড়ি, পাপড়ি ও মধু। পালতে মাদার জাতীয় গাছ যা দক্ষিণ ভারতে কফি ও চা বাগানে ছায়াগাছরূপে ব্যবহৃত হয়। সেখানে এরা হানা দেবেই। জোয়ার ও অন্য খাদ্যশস্য ও বরবটি ক্ষেতের খুবই অনিষ্টকারী এবং সেই সঙ্গে ফল-বাগানের ভক্ত।

স্বভাব—ডাকে ফুলটুসীর মতো করে 'টুই টুই' কিন্তু অনেক কর্কশ ও তীব্র। বেশির ভাগ ডাক শোনা যায় উড়ন্ত অবস্থায়। এছাড়া শা-বুলবুল বা দুধরাজের কর্কশ 'কে-কিউই' খুব জোরে ডাকে। দল বদ্ধ হয়ে খুবই চেঁচামেচি করে।

মদন গৌর তোতা 4-5 বা তার চেয়ে কিছু বেশি সংখ্যায় পাহাড়ীদের বাসস্থান বা ক্ষেতের ধারে ঘোরাফেরা করে। পরিত্যক্ত কফি বা চা বাগান এদের অতি প্রিয় বিচরণ ভূমি। ওড়া বা অন্যান্য আচার ব্যবহার ফুলটুসীদের মতই।

প্রজননের সময় জানুয়ারি থেকে মার্চ। গভীর জঙ্গল, চা বা কফি বাগানে 6 থেকে 30 মিটার উচ্চতার মধ্যে গাছের গায়ে গর্ত করে বাসা বানায়। নাগেশ্বর বা লোহা কাঠ পছন্দ করে খুব বেশি। যদিও এই সব গাছের কাঠ খুবই শক্ত তা সত্ত্বেও চঞ্চু দিয়ে খুঁড়ে ঠিকই গর্ত করে। অনেক সময় পরিত্যক্ত কাঠঠোকরা বা বসন্ত বউরির বাসা পেলে সেখানেই বাসা বানায়। ডিম পাড়ে 4টি গোলাকার সাদা। স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই বাসা বানানো থেকে ঘরগেরস্থালীর সব কাজই করে, কিন্তু কতদিনে ডিম ফোটে তা আজও নির্ণয় হয় নি। ডিমের গড় মাপ 28·3×54·5 মিমি।

ত্রিকেতু গণের পাখিদের মধ্যে এদের কথা বলার ক্ষমতা খুবই বেশি এবং স্বরও খুব স্পষ্ট। সংগ্রহ করতে পারলে অনেকে পোষেন। মাঝে মাঝে বিক্রির জন্যে হগ সাহেবের বাজারের পিছন দিকে পাখির বাজারে আসে।

ফটো : লেখক

তামা কাহিনী

দিলীপ কুমার বন্দোপাধ্যায়

সভ্যতার ইতিহাসে তামার আবিষ্কার খুবই তাৎপর্যময়। আকস্মিকভাবেই আগুনের চুল্লীতে কাজ করতে করতে একদিন অজানা অচেনা আকরিক গলে বেরিয়ে এসেছিল মাংসের মতো লাল গরম ধাতুর টুকরো যার নাম তামা। আকস্মিকভাবে হলেও তামা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সভ্যতাও এগিয়ে গেল এক ধাপ। নব্য প্রস্তর যুগ থেকে এক লাফে তাম্র যুগ। পাথরের হাতিয়ার ছেড়ে মানুষ হাতে তুলে নিল ধাতব হাতিয়ার। এর তাৎপর্য যে কতখানি তা নিশ্চয়ই নতুন করে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই।

বোঝা যায় নিজেদের জীবনের মান উন্নয়নের তাগিদেই ক্রমান্বয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে সেই যুগের মানুষ আবিষ্কার করেছিল কীভাবে তামার আকরিকের সঙ্গে কাঠকয়লা মিশিয়ে পোড়ালে আকরিক থেকে বেরিয়ে আসে বৃষ্টির ফোঁটার মতো ঈপ্সিত তামার বিন্দু। উত্তর ইরাক থেকে পাওয়া এ ধরনের প্রাচীন আকরিক থেকে তামা নিষ্কাশনের সেই প্রাচীন পদ্ধতি যা এখনও মূলগতভাবে প্রায় একই আছে তা আবিষ্কৃত হয়েছিল আজ থেকে প্রায় হাজার দশেক বছর আগে। অবশ্য এর চেয়ে বেশি হলেও তেমন অবাক হবার কিছু নেই। আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকদের বিশ্বাস, পাঁচ-ছ' হাজার বছর আগে সুমের, মেসোপটেমিয়ার সিন্ধু নদীর উপত্যকা ও প্রাচীন মিশরে তামার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছে।

সে যুগে তামার আকরিক মূলত আহরিত হতো নদীর বালি থেকে। তবে ক্রমে মানুষ তামার আকরিকের খোঁজে ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়ে পর্বতে। ফলে প্রযুক্তিগত কারণেই ক্রমে নিয়ম মাফিক খনন কাজও শুরু হয়। অনেকের ধারণা, পৃথিবীর প্রথম তামার খনির পত্তন হয় প্রাচীন মিশরের মাডি শহরে। খ্রিষ্টপূর্ব 3300 সালে। মাডি শহরের অবস্থান বর্তমান কায়রো শহরের 10 কিলোমিটার দক্ষিণে। একটি হিসেব থেকে অনুমান, 1500 বছরে প্রাচীন মিশরে প্রায় 10,000 টন তামার আকরিক উত্তোলিত হয়েছিল। সেই সমসাময়িক কালেই আরও অনেক নতুন খনির পত্তন হয় এশিয়া মাইনর, সাইপ্রাস, বালুচিস্থান ককেশিয়া, ম্যাসিডোনিয়া (গ্রীস) ও উত্তর আমেরিকার লেক সুপিরিয়র অঞ্চলে।

অবশ্য ভারতবর্ষেও হয়তো সে সময় খনি থেকে তামার আকরিক উত্তোলনের কাজ হয়ে থাকতে পারে, যদিও তেমন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই সে বিষয়ে।

সভ্যতার প্রথম পর্যায়ে মানুষ তামা ব্যবহার করেছে মূলত অস্ত্রশস্ত্র ও বাসনপত্র তৈরির কাজে একথা বললে বোধ হয় ভুল বলা হবে না। তবে আধুনিক যুগে তামার ব্যবহার আরও ব্যাপক হয়েছে সহবোধ্য কারণেই। কে না জানে, তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতায় তামা অন্য ধাতুদের হারিয়ে দেয় অনায়াসেই। গাধাকে পিটিয়ে ঘোড়া করা নয়। আক্ষরিক অর্থেই তামাকে পিটিয়ে লম্বা করা যায় সহজেই। সহজে ভেঙ্গে পড়ে না, রোদ জল হাওয়ার সঙ্গে খুব যুঝতে পারে তামা। মিশ্র ধাতু তৈরির কাজেও তামার খুব চাহিদা। তামার সঙ্গে দস্তা মিশিয়ে পেতল, নিকেল ও দস্তা মিশিয়ে রুপোলী নিকেল, টিন ও অল্প দস্তা মিলিয়ে ব্রোঞ্জ, ব্রোঞ্জের সঙ্গে ফসফরাস মিশিয়ে তৈরী হয় ফসফোর ব্রোঞ্জ। তামার বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা একমাত্র রুপো ছাড়া অন্য যে কোন ধাতুর চেয়ে বেশি। তাই বিদ্যুৎশিল্পে যে তামার কদর বেশি হবে, তাতে অবাক হবার কী আছে। বিদ্যুৎ জেনারেটর মোটর, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতারযন্ত্র, বাল্‌ব, সুইচবোর্ড, মুদ্রা, ট্রাম, বিদ্যুৎ রেলের তার, যুদ্ধাস্ত্র ও নানা রকম কলকব্জা তৈরির কাজে তামা এক কথায় অপরিহার্য। নানা রকম রঙ জীবানুনাশক ওষুধ তৈরি করতেও তামাযুক্ত লবণ প্রয়োজন।

উদার প্রকৃতির মাঝখানে পাহাড়ে পর্বতে মাঝে মাঝে বিশুদ্ধ অবস্থায় তামা পাওয়া যায় বটে তবে তার পরিমাণ অফুরন্ত নয়। প্রকৃতিতে তামার আকরিকই বেশি পাওয়া যায় যার মধ্যে রয়েছে চ্যালকোপাইরাইট (এতে তামার ভাগ শতকরা প্রায় 35 ভাগ), বোরনাইট (তামা শতকরা 63 ভাগ) কভেলাইট (তামা শতকরা 66 ভাগ) ও চ্যালকোসাইট (তামা শতকরা 80 ভাগ)। চ্যালকোপাইরাইটের রঙ পেতলের মতো হলুদ, যদিও মাঝে মাঝে সোনার মতো ঝকমক করে। তাই সোনা ভেবে ভুল করা অসম্ভব নয়। তবে ওজনে সোনার চেয়ে অনেক হালকা, ভঙ্গুর এবং নাইট্রিক অ্যাসিডে সহজেই গলে যায়। এই আকরিকে রোদ বৃষ্টিতে মরচে ধরে সহজেই। তবে এই মরচের রঙ লাল নয়, নীল অথবা সবুজ। এভাবেই সৃষ্টি হয় দ্বিতীয় প্রজন্মের সবুজ রঙের ম্যালাকাইট, নীল রঙের অ্যাজুরাইট কিংবা নীলচে সবুজ রঙের ক্রাইসোকোলা। পাহাড় জঙ্গলের কোন বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এ ধরনের খনিজের (যার বৈজ্ঞানিক নাম গোসান) সন্ধানে পাওয়া গেলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, সেই অঞ্চলে ভূমির নিচেও তামার আকরিক সন্ধান মেলা অসম্ভব নয়।

ভারতবর্ষের তামার আকরিকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় চ্যালকোপাইরাইট। তাই এই আকরিক গলিয়েই দেশের চাহিদা মেটানো হয় খানিকটা। এদেশে তামা আকরিকের খনন এবং তামা নিষ্কাশন, এই দু'টি দায়িত্বই রয়েছে আধা-সরকারি সংস্থা হিন্দুস্থান কপার লিমিটেড-এর ওপর। বেসরকারি মালিকানা সমস্তই এখন রাষ্ট্রায়ত্ত।

ভারতের যে তিনটি জায়গায় খনি থেকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তামার আকরিক উত্তোলিত হচ্ছে, তাদের অবস্থান বিহারের সিংভূম জেলায়, রাজস্থানের ক্ষেত্রী অঞ্চলে ও অন্ধ্র-

প্রদেশের অগ্নিগুনডলায়। বিহারের সিংভূম জেলার 160 কিলোমিটার দীর্ঘ এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছড়ানো ছেটানো রয়েছে পুরনো যুগের তামার খনিখাদ। এই খনি অঞ্চল পূর্বে পুরুলিয়ার জেলার পশ্চিম অংশ থেকে শুরু করে পশ্চিমে গইলকেরা মনোহরপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে তামার আকরিকের আঁকাবাঁকা শিরা উপশিরা সবচেয়ে বেশি দেখতে পাওয়া যায় রাখা, মোসাবনী, ধোবানী, বাদিয়া, কেন্দাডি ও পাথর গোড়া অঞ্চলে। সারা অঞ্চলটি ঘুরে দেখলে মালুম হয় প্রাচীন কালে এখানে খনিখাদ খোঁড়া হয়েছিল তামার আকরিকের সন্ধানে। সাম্প্রতিককালে অবশ্য হিন্দুস্থান কপার লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনায় এসব অঞ্চলে তামার আকরিক খনন চলছে। প্রধান খনির অবস্থান মোসাবনীতে।

রাজস্থানের ক্ষেত্রী তাম্রক্ষেত্র লম্বায় প্রায় 80 কিলোমিটার। উত্তর-উত্তরপূর্বে সিংঘানা থেকে দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিমে রঘুনাথপুর পর্যন্ত প্রসারিত। বয়সের হিসেবে এই তাম্রক্ষেত্র যে বেশ পুরনো, ক্ষেত্রী, বাবাই ও সিংঘানার পরিত্যক্ত পুরনো খনিখাদ থেকেই তার পরিচয় মেলে। এখানকার তামার আকরিকের সঙ্গে মাঝে মাঝে সোনা রুপাও পাওয়া যায়, যা এই আকরিকের মূল্য বাড়িয়েছে। এখানে খনন কাজ চলছে কানাডা ও অন্যান্য দেশের বিশেষজ্ঞদের সহায়তায়।

অন্ধ্রপ্রদেশের অগ্নিগুনডলায় তামার আকরিকের জন্য খনির পত্তন একেবারে হালফিলের ঘটনা। তবে বহু অতীতেও এ অঞ্চলে তামার আকরিক সন্ধানে যে খনন চলেছিল, তার প্রমাণ মিলেছে সাম্প্রতিক কালে।

ভারতের তামার আকরিকের প্রাথমিক বৃত্তান্ত আমরা পাই ইংরেজ ভূবিজ্ঞানী ভ্যালেনটাইন বলের গবেষণাগ্রন্থ থেকে। 1831 সালে। তারপর স্যার টমাস হল্যাণ্ড ভারতের তামা-সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিতে প্রাথমিক সমীক্ষা চালান। এই সমীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতেই 1906-8 সালে ভারতীয় ভূবৈজ্ঞানিক সর্বক্ষণ থেকে এই অঞ্চলগুলিতে বিশদ সমীক্ষা চালানো হয় তামায় আকরিকের সন্ধানে। এরপর সিংভূম অঞ্চলে ইনডিয়ান কপার করপোরেশন যন্ত্র কাজ শুরু করে 1924 সালে। আকরিক বিশুদ্ধিকরণের যন্ত্র স্থাপিত হয় 1927 সালে। সেই গলনযন্ত্র থেকে বিশুদ্ধ তামা বেরিয়ে আসে 1928 সালে, রোলিং মিলে তৈরি হয় 1930 সালে। পরবর্তী সময়ে 1965 সালে বসানো হয় তড়িদ-বিশ্লেষিত শোধনাগার, যাতে শতকরা প্রায় ৭৯·99 বিশুদ্ধতার তামা উৎপাদিত হচ্ছে। এ ধরণের তামা সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরির কাজে অপরিহার্য। ঘাটশীলায় নতুন আকরিক গলন-যন্ত্র বসানো হয়েছে 1971 সালের ডিসেম্বরে। বছরে প্রায় 20,000 মেটরিক টন ধাতব তামা উৎপাদিত হয় এই যন্ত্রে। রাজস্থানের ক্ষেত্রীতেও এই ধরনের আর একটি যন্ত্র বসানো হয়েছে, যার উৎপাদন ক্ষমতা বছরে 31,000 মেটরিক টন। ভারতে এখন প্রতি বছর প্রায় 44 লক্ষ মেটরিক টন তামার আকরিক উৎপাদিত হচ্ছে (1986)।

সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় 35 লক্ষ মেটরিক টন ধাতব তামা উৎপাদিত হচ্ছে। আর ভারতে যতটা তামা উৎপাদিত হয়, তাতে দেশের চাহিদাই মেটে না, তাই হাত পাততে হয় বিদেশের কাছে।

তামার আকরিক মজুত ও উৎপাদনের দিক থেকে পৃথিবীর যে কয়েকটি দেশ এগিয়ে, তাদের মধ্যে রয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চিলি, রোডেশিয়া, কানাডা, রাশিয়া ও মেকসিকো।

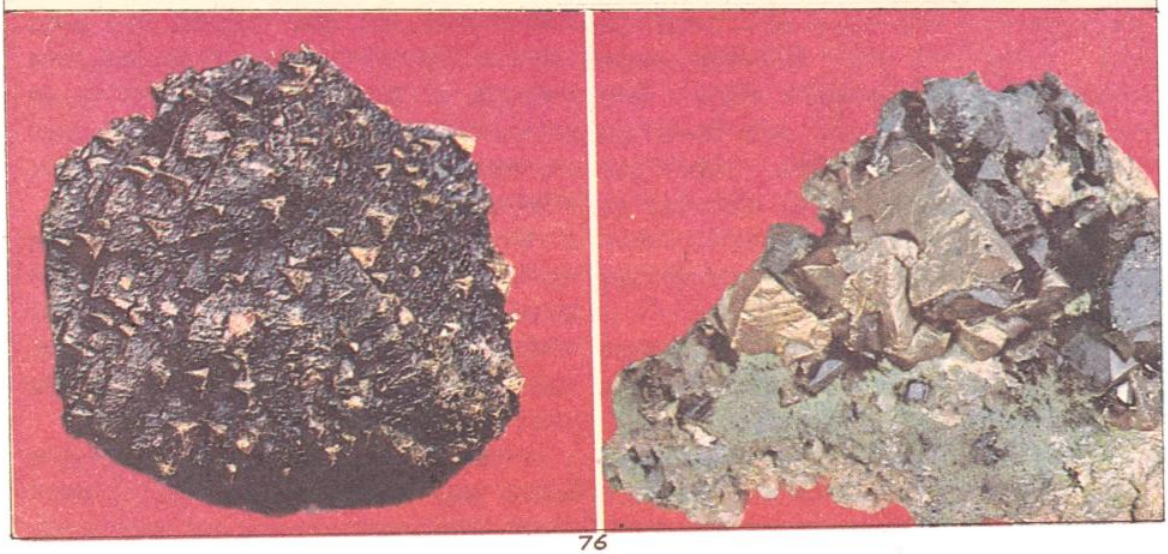

তামার প্রধান আকরিক চ্যালকোপাইরাইট। এই আকরিক থেকেই তামা নিষ্কাশিত হয়। ফটো : লেখক

রূপং দেহি
জয়ং দেহি
যশো দেহি
দেহি দেবি
পরংসুখম
শ্রীশ্রীদুর্গা
দুর্গতিনাশিনী
সম্মিলিত দেবশক্তি লভিলেন কায়া।
তথা হ'তে জন্ম নিলা শক্তি মহামায়া ॥
নিজ নিজ শক্তি দেন সব দেবগণে।
দুর্গতিনাশিনীরে সাজান যতনে ॥
অক্ষমালা, কমণ্ডলু দেন প্রজাপতি।
যম দিলা কালদণ্ড, ভয়ানক অতি ॥
সুদর্শন চক্র দিলা শ্রীমধুসূদন।
হিমালয় দেন সিংহ, দেবীর বাহন ॥
মহা অস্ত্র শূল দিলা দেব কৃত্তিবাস।
বরুণ দিলেন শঙ্খ, আর দেন পাশ ॥
ঋষিদেহজাত বজ্র ইন্দ্র দিলা তাঁরে।
বিশ্বকর্মা সাজাইলা কবচে কুঠারে ॥
শক্তিধর ধনুঃশর দিলেন পবন।
বাসুকি দেবীরে দেন নাগের ভূষণ ॥
সমুদ্র আনি দিলা গন্ধ কুবলয়।
সূর্য দেন ঢাল খড়্গ, দীপ্ত প্রভাময় ॥
আয়ুধ বিবিধ দশ হস্ত পরে শোভে।
মহিষাসুর বধে দেবী চলিলেন এবে ॥
শক্তিরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ
শারদ শুভেচ্ছাসহ
বঙ্গজীবনের অঙ্গ
বোরোলীন

"বুদ্ধিশুদ্ধি" প্রতিযোগিতা

সমীরণ মণ্ডল

25 সেপ্টেম্বর '87-র মধ্যে সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর-দাতাদের আগামী তিন বছরের জন্য বিনামূল্যে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রাহক করে নেওয়া হবে।

এক.

ছেলেটির কোন পায়ে বল ?

দুই.

ছবিতে একটি জায়গার নাম দুবার লেখা আছে জায়গাটির নাম কি ?

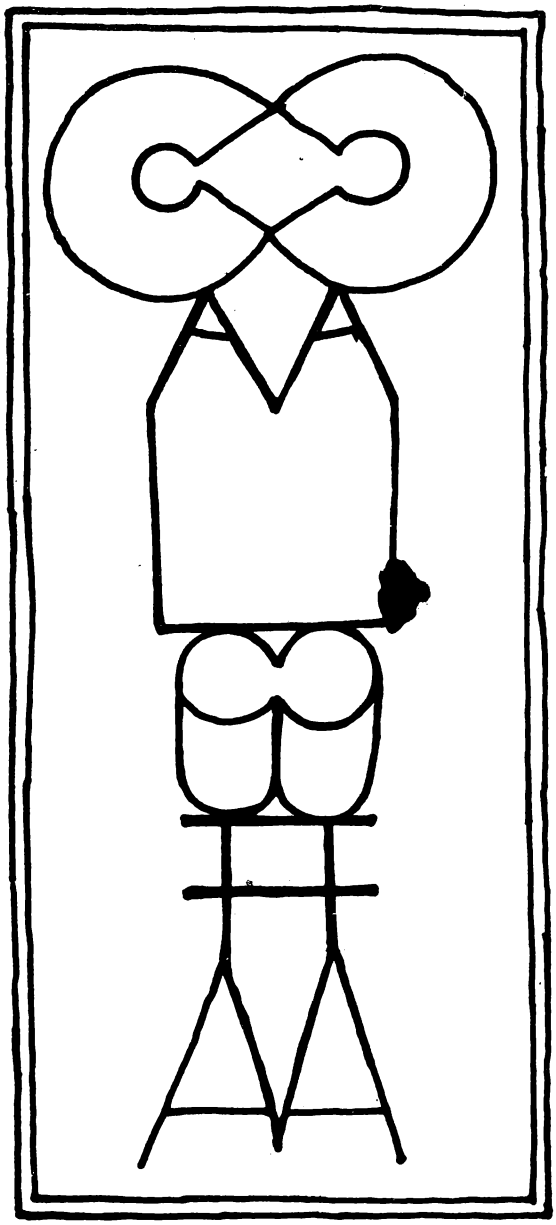

তিন.

চিনতে পারো ?

কারিগরী ও প্রযুক্তি

লিখেছেন : জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ শন্তিময় চট্টোপাধ্যায় ॥ এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ॥ সূর্যেন্দু বিকাশ করমহাপাত্র ॥ বিমান বসু ॥ সুবীর দত্ত আশিষ দাস ও মৃন্ময়ী দাস

বিজ্ঞানের কোন কোন বিষয় আমরা নিজেদের প্রয়োজনে কাজে লাগানোর চেষ্টা করি। এই চেষ্টাই গড়ে তোলে নানা রকম কারিগরী এবং প্রযুক্তিগত কৌশল। গত দুই দশকে জ্যোতির্বিদ্যা, মহাকাশ বিজ্ঞান, জীবতত্ত্ব, চিকিৎসা, পারমাণবিক শক্তি এবং সমুদ্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সব অভিনব অভিনব কারিগরী এবং প্রযুক্তিগত পদ্ধতির চল হয়েছে, তারই কিছু পরিচয় তুলে ধরা হল এ বছর – এই শারদীয় সংখ্যায়। শুধু বিস্ময়ই নয়, তা যেন রোমাঞ্চকর কাহিনীকেও হার মানায়।

বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার

জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মহাকাশ সম্বন্ধে জানবার অধীর আগ্রহের মধ্যেই আদিম মানুষের মনে জ্যোতির্বিদ্যার জন্ম হয়েছিল। শুক্লা প্রতিপদের ক্ষীণ চাঁদটি কি রকম করে ধীরে ধীরে পূর্ণিমার চাঁদে পরিণত হয়, আবার কি করেই বা মিলিয়ে যায়। এ সম্বন্ধে কৌতূহল প্রাচীন মানুষের মনে অনেক আগেই জেগেছিল। তাছাড়া শীতগ্রীষ্মের ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেনই বা সূর্য উত্তর-দক্ষিণে যাতায়াত করে। তার রহস্য উদ্‌ঘাটনের আগ্রহও মানুষের চিন্তা-ধারার অনেকখানি অধিকার করেছিল। তাই তারা চারপাশ থেকে বড় বড় পাথর সংগ্রহ করে বৃত্তাকারে সাজিয়ে যন্ত্রপাতি বানিয়েছিল ; যার বিভিন্ন দিক থেকে দেখলে এই সব পরিবর্তনের মোটামুটি নির্ভুল মাপ সম্ভব হ'ত। ইংলণ্ডের দক্ষিণ কোণে সল্‌স্‌বেরী প্লেনে (Salisbury Plains) স্টোন্‌হেঞ্জ (Stonehenge) নামে যে পুরাকীর্তি রয়েছে, সেটি প্রাচীন মানবজাতির এইরকম একটি প্রচেষ্টারই নিদর্শন।

সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের যে সব উন্নতি হয়েছিল, যুগে যুগে তার নানাপ্রকার প্রয়োগ করা হয়েছিল মহাকাশের রহস্যভেদের উদ্দেশ্যে। পৃথিবীর নানা স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক ভগ্নাবশেষ থেকে সেই সব চেষ্টার কিছু কিছু হদিশ পাওয়া যায়। দেখা যায় যে, বিভিন্ন যুগে যত কিছু সূক্ষ্ম গঠনের ক্ষমতা সেকালের মানুষ আয়ত্ত করতে পেরেছিল, তার সবখানিই প্রয়োগ করেছিল এই রকম আদিম যন্ত্রপাতি গড়বার চেষ্টায়। পাথরের স্তূপ ছেড়ে তারা এগিয়েছিল, মন্দিরপ্রাঙ্গণে পাথরের থামের উপরে নির্ভুল মাপে কাটা দাগগুলির সৃষ্টির দিকে, যা থেকে আকাশের জ্যোতিষ্কগুলির চলাফেরার আরও সূক্ষ্ম মাপ সম্ভব হয়। আরও পরে এসেছিল ধাতুতে গড়া যন্ত্রগুলি, এবং তারপরে টেলিস্কোপ, যার সাহায্যে আরও অনেক ক্ষীণ গ্রহ-তারা-নীহারিকা মানুষের জ্ঞানের নাগালের মধ্যে এসেছিল।

এ পর্যন্ত কিন্তু মাপবার যন্ত্র ছিল একটিই—মানুষের বিধাতাদত্ত নিজের চোখ দুটি ; তারপর একদিন আবিষ্কার হল বিজ্ঞানের নতুন পদ্ধতি—ফোটোগ্রাফি। রাসায়নিক

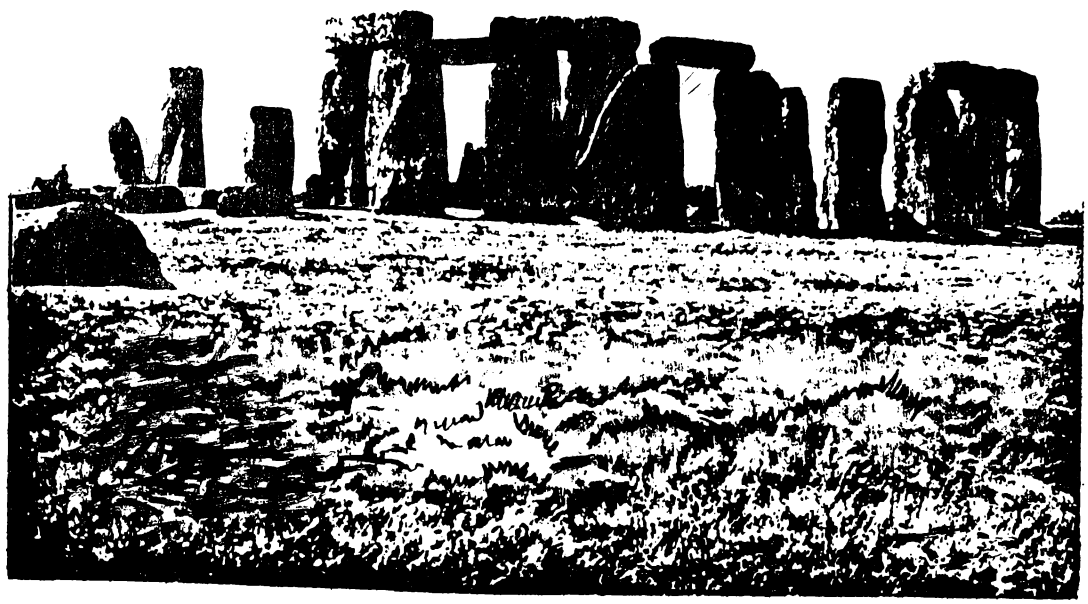

ইংলণ্ডের স্টোনহেঞ্জ

মশলা মাখানো প্লেটগুলির আলো ধরে রাখার অদ্ভুত ক্ষমতা। বড় টেলিস্কোপ আর এই নতুন আবিষ্কারের সহযোগে মহাকাশের আরও অনেক খবর জানা গিয়েছিল।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি এতদিনে আরও অনেক বেড়েছে। জ্যোতির্বিদ্যার কাজে লাগল বর্ণালী বিশ্লেষণের উপায়। জন্ম নিল নতুন জ্যোতির্বিজ্ঞান—অ্যাস্ট্রোফিজিক্স্। গ্রহ-তারা-রবির আলোর মধ্যে আরও গভীর জ্ঞানের হদিশ পাওয়া গেল। এতদিন আকাশে যেগুলি ক্ষীণ আলোক বিন্দুর মত দেখাত, বর্ণালী বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে জানা গেল অনেক খবর—কি উপাদানে সেগুলি গড়া, তাদের গতি, তাপমান, ভর ; এমনকি তাদের ঘিরে যে অকল্পনীয় মানের চৌম্বকক্ষেত্র থাকতে পারে সে সব অবস্থার বিশদ প্রমাণ।

বিংশ শতাব্দীর দরজায় এসে দেখা গেল বিজ্ঞানচর্চার ফলে প্রকৃতির আরও অনেক প্রক্রিয়ার খবর মানুষের জ্ঞানের পরিধির মধ্যে এসে গেছে। আগে জানা ছিল আলো হচ্ছে বিকিরণশক্তির প্রবাহ ; এখন জানা গেল প্রকৃতির বিকিরণ ধারার সামান্যতম অংশ এটি। বিকিরণের আরও অনেক রূপের সঙ্গে পরিচয় হ'ল মানুষের। বিজ্ঞানীদের হাতে গড়া যন্ত্রগুলিতে ধরা পড়েছে নতুন ধরনের আলো। প্রয়োগকলায় সৃষ্টি করা হয়েছে এই সব বিকিরণ তরঙ্গের, যা দিয়ে বহুদূরের যন্ত্রেও সংবাদ পাঠানো সম্ভব। মহাবিশ্বের কোণে কোণে যে এই রকম তরঙ্গের উৎস থাকতে পারে, সে ধারণার উদয়ও হয়েছে বিজ্ঞানীদের মনে।

আলো ছাড়া অন্য উপায়েও যে মহাকাশের খবর আসতে পারে সেটি প্রথম ধরা পড়ল মহাজাগতিক রশ্মির (Cosmic Rays) মধ্য দিয়ে। 1912 খৃস্টাব্দে অস্ট্রিয়ার এক বিজ্ঞানী ভিক্টর হেস্ (Victor Hess) প্রমাণ করলেন যে অতি উচ্চ শক্তির একরকম কণিকাস্রোত মহাকাশ থেকে আসছে। এ বিষয় নিয়ে বহু পরীক্ষা শুরু হয়েছিল, যা এখনও চলছে। প্রথমে পৃথিবীর বুকে বা বেলুন দিয়ে ভাসিয়ে যন্ত্রগুলির মাধ্যমে পরীক্ষা চলত। এখন কৃত্রিম উপগ্রহে সাজানো অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে এর মাপ চলছে। মাত্র দু বছর আগে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের গড়া যন্ত্র "অনুরাধা" স্পেস্ শাট্‌লে (Space Shuttle) চেপে মহাজাগতিক রশ্মির বহু নতুন খবর সংগ্রহ করে এনেছে।

1931 খৃস্টাব্দে অপ্রত্যাশিতভাবে আবিষ্কৃত হ'ল আরও এক নতুন উপায়, জন্ম হ'ল বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানের (Radio Astronomy)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বেল প্রয়োগশালার (Bell Laboratories) এক বিজ্ঞানী প্রথম খোঁজ পেলেন নতুন রকমের এক উৎসের যা থেকে বেতার তরঙ্গের স্রোত বইছে। ইউরোপ আর আমেরিকার মধ্যে তখন বেতার সঞ্চার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। কিন্তু রোজই দেখা যাচ্ছিল যে মাঝে মাঝে অজানা কোনও বেতার তরঙ্গ প্রবাহ এসে সঞ্চার কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। বিজ্ঞানীটির উপর দায়িত্ব ছিল এই প্রবাহের উৎসটি খুঁজে বার করার। তখন অবশ্য সকলেই আশা করেছিল যে পৃথিবীরই কোনও স্থান থেকে প্রবাহটি আসছে ; কিন্তু প্রকাশ পেল যে পৃথিবী কেন, সারা সৌরজগতের মধ্যেও এই উৎসটি নেই, রয়েছে আমাদের ছায়াপথ তারাজগতের কেন্দ্রে।

বিজ্ঞানীটির নাম কার্ল জ্যান্স্কি (Carl Jansky)। তিনি একটি বেতার যন্ত্র সাজিয়েছিলেন যেটি কোনও বিশেষ দিক থেকে আগত তরঙ্গ প্রবাহটি ধরতে পারে। অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে ইউরোপের দিকে মুখ করে যন্ত্রটি বসানো হ'ল, যাতে ওখানকার বিভিন্ন বেতার কেন্দ্রগুলির তরঙ্গ প্রবাহের মান নির্ণয় করা যায়। তিনি লক্ষ্য করলেন যে রোজই প্রায় একই সময়ে ঘণ্টা কয়েকের জন্য প্রবাহের মান বেড়ে যাচ্ছে।

এখন আমাদের পৃথিবীর আয়নমণ্ডলের আহ্নিক পরিবর্তনের জন্যও এইরকম কমাবাড়া দেখা যায় ; কিন্তু জ্যান্স্কি লক্ষ্য করলেন যে এই অতিরিক্ত প্রবাহটি ঠিক একই সময়ে আসছে না ; প্রত্যেক দিনই সময়টি প্রায় চার মিনিট করে এগিয়ে যাচ্ছে। এইরকম ঘটনা জ্যোতির্বিদ্দের কাছে খুবই সুপরিচিত। পৃথিবীর সৌরকেন্দ্রিক বার্ষিক আবর্তনের ফলে সব তারারই উদয়াস্ত দিনে চার মিনিট করে এগিয়ে যায় ; যদি এই বেতার উৎসটি সৌরজগতের বাইরে কোনও তারার মধ্যে হয়, তাহলে এক সময় পরিবর্তনের হিসাব পুরোপুরি মিলে যাবে।

কিন্তু কোন তারার সঙ্গে এই উৎসটিকে মেলানো যায় ? সে সত্যটি অপেক্ষাকৃত সহজেই পাওয়া গেল। ইউরোপের বেতার কেন্দ্রগুলির তরঙ্গ প্রবাহ অ্যামেরিকায় পৌঁছায় প্রায় পূর্ব দিগন্ত ছুঁয়ে। জ্যান্স্কি লক্ষ্য করলেন যে এই অতিরিক্ত প্রবাহটি পৌঁছায় ঠিক যখন ধনুরাশির উদয় হয় ; ছায়াপথ তারাজগতের কেন্দ্রটি এইখানেই অবস্থিত। এ দুটি মিলিয়ে জ্যান্স্কি অনুমান করলেন যে এই প্রবাহের উৎসটি রয়েছে ছায়াপথ তারাজগতের কেন্দ্রে। নভোমণ্ডলের জ্যোতিষ্কগুলি থেকে এই প্রথম বেতার তরঙ্গ বিকিরণের প্রমাণ পাওয়া গেল।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কিন্তু সহজে এটিকে মানতে রাজি হ'ননি। জ্যান্স্কি একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখে অ্যামেরিকার অ্যাস্ট্রোফিজিকাল জার্নালে (Astrophysical Journal) প্রকাশের অনুরোধ করে লিখলেন। বিজ্ঞানীরা অবাক ; এ আবার কি রকম ধারণা ? বেতার তরঙ্গের মাপ থেকে কিই বা নতুন তথ্য জানা যেতে পারে ? সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে তাঁর অনুরোধ নাকচ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। তখন তাঁদের মধ্যে একজন প্রবীণ জ্যোতির্বিজ্ঞানী একটি ঘটনার উল্লেখ করে সাবধান করে দিলেন। বছর দশেক আগে এইরকম একটি প্রবন্ধে এক নতুন ধারণা পরিবেশন করে-

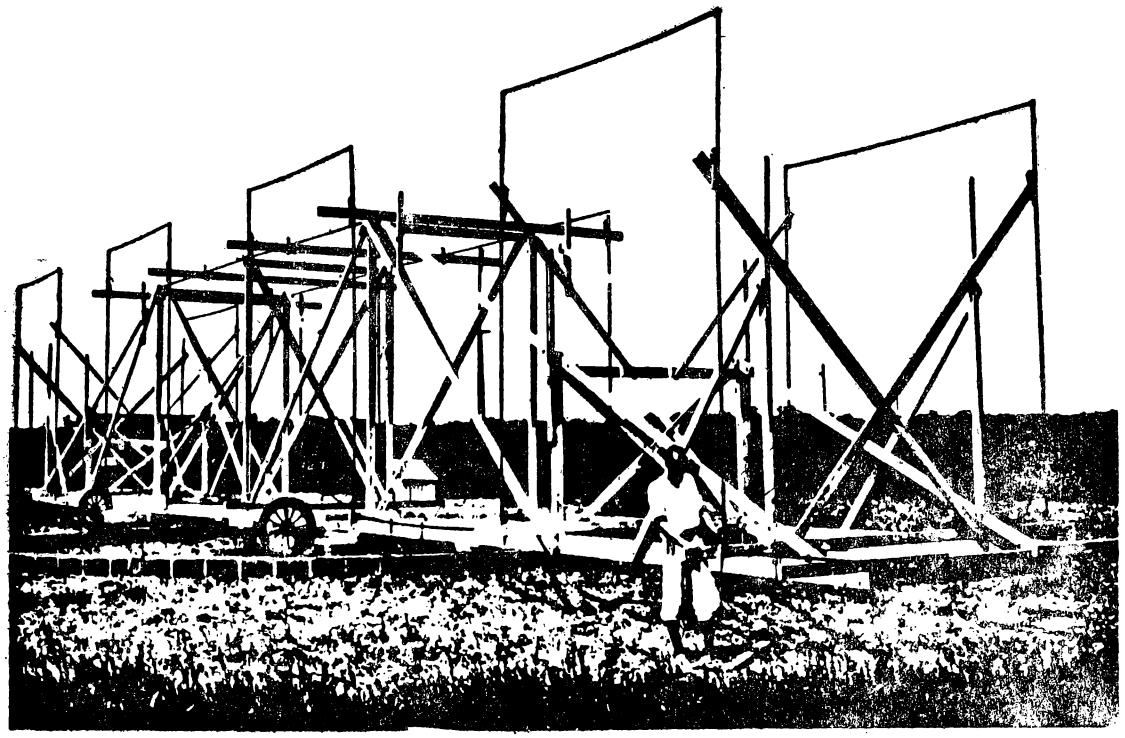

জ্যান্স্কির গ্রাহক যন্ত্র

ছিলেন এক ভারতীয় তরুণ বিজ্ঞানী। সেটি একটু অন্য-রকম হওয়ায় সম্পাদকমণ্ডলী ভাল করে বুঝবার চেষ্টা করেন নি। এবং প্রবন্ধটিকে না ছাপার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কয়েকমাস পরে ইংলণ্ডের একটি প্রখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রবন্ধটি ছাপা হলে জ্যোতির্বিজ্ঞানে যুগান্তর এসেছিল, যার জন্য বিশ্ববিখ্যাত এই পত্রিকাটি কৃতিত্বের অংশ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। সে ত্রুটির জন্য ক্ষোভ তাঁরা ভুলতে পারেন নি। অনেকেই হয়ত বুঝতে পেরেছেন যে সেই বিজ্ঞানীটি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ মেঘনাদ সাহা, আর তাঁর পরিবেশিত ধারণাটি ছিল তারার আলোর বর্ণালী রহস্যের সমাধান, যে "সাহা সমীকরণ" নামে জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিখ্যাত। বিজ্ঞানীটি বোঝালেন যে জ্যান্স্কির প্রবন্ধেও একটি নতুন ধারণার বীজ পরিবেশন করা হয়েছে, সেটি যে কালক্রমে এক মহীরুহতে পরিণত হবে না, কে জানে? তখন কি আবার আমরা হাত কামড়াব? শেষ পর্যন্ত প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল।

তবুও জ্যান্স্কির এই আবিষ্কার বিজ্ঞানীমহলে তখনও বিশেষ সাড়া জাগাতে পারে নি। অনেকেই এ কাজটিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে এক ইন্‌জিনিয়ারের স্থূল হস্তক্ষেপ হিসাবে অবজ্ঞা করেছিলেন। কিন্তু সবাই নয়। কয়েকজন বিজ্ঞানী এই প্রবন্ধটির অন্তর্নিহিত ধারণার গুরুত্ব বুঝতে পেরে-ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন কারুর সাহায্য বা সমর্থনের অপেক্ষা না করেই কাজ শুরু করেছিলেন। বিজ্ঞানীটির নাম গ্রোটে রীবার (Grote Reber)। আমেরিকা যুক্ত-রাষ্ট্রের অধিবাসী। তিনি নিজের পয়সা খরচ করে যন্ত্রপাতি বানিয়ে নিজের বাড়ির উঠানে সাজিয়ে মহাবিশ্বের বেতার উৎসগুলির খোঁজ আরম্ভ করেছিলেন ত্রিশের দশকের মধ্যেই।

তারপর এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ; রেডার (Radar) ও উন্নত ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও ব্যবহার শুরু হ'ল আত্মরক্ষার তাগিদে। ইংলণ্ডের এক বিজ্ঞানী হে (Hey) আবিষ্কার করলেন যে সূর্য থেকে মাইক্রোওয়েভের এক গভীর স্রোত আসছে। যা রেডার যন্ত্রে সহজেই ধরা পড়ছে। যুদ্ধের পরে এই সব উন্নত যন্ত্রপাতি নিয়ে আবার নতুন করে শুরু হল খোঁজ; বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হ'ল পুরোদমে। মহাবিশ্বের যে সব জ্যোতিষ্ক থেকে দৃশ্য আলো এসে পৌঁছত না, সেগুলিও বিজ্ঞানের আয়ত্তের মধ্যে এসে গেল।

মহাবিশ্বের চারদিকে ছড়ানো বস্তুপিণ্ডগুলি থেকে যে সব বিকিরণ আর কণিকার স্রোত দূরের জগতের সংবাদ

বয়ে নিয়ে আসছে তার সামান্য একটু অংশ মাত্র ধরা পড়ল এ তিনটি উপায়ে। বাকি অংশ প্রায় সবই ব্যাহত হয় আমাদের বায়ুমণ্ডলের আবরণে। বিকিরণ বর্ণালীর সামান্য দুটি অংশ বায়ুস্তর ভেদ করে পৃথিবীর মাটি পর্যন্ত পৌঁছয়; একটি হ'ল দৃশ্য আলো, দ্বিতীয়টি বেতার তরঙ্গ। মহাজাগতিক রশ্মির যে কণিকাগুলি ধরা গিয়েছিল সেগুলিও আসলে মৌলিক কণিকার স্রোত নয়; বায়ুমণ্ডলের অণুপরমাণুগুলি এগুলির আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যে গৌণ কণিকাগুলির সৃষ্টি করে, সেগুলিই শুধু পৃথিবী-পৃষ্ঠে পৌঁছয়। বাকি সব কিছুর অস্তিত্ব জানতে গেলে যন্ত্রগুলিকে পৃথিবীর বাতাবরণ ছাড়িয়ে মহাশূন্যে পাঠানোর প্রয়োজন পড়ে।

তার উপায় আগে ছিল না। কিন্তু মহাযুদ্ধের সময় যে সব প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ হয়েছিল, তাই এনে দিল নতুন যন্ত্র। যুদ্ধকালীন জার্মানীর বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছিলেন রকেট। যা বায়ুস্তর ভেদ করে মারণাস্ত্র পৌঁছে দিত দূরের লক্ষ্যে। যুদ্ধের পরে তারই প্রয়োগ হল বিজ্ঞান গবেষণায়। একটি অতিবেগনী আলোর বর্ণালী বিশ্লেষক যন্ত্র (Ultraviolet Spectrograph) একটি V-2 শ্রেণীর রকেটের সাহায্যে পাঠানো হ'ল বায়ুমণ্ডলের ওপারে; ধরা পড়ল সূর্যের আলোয় বিস্তৃত অতিবেগনী অংশের বর্ণলিপি। পরীক্ষাটি হয়েছিল 1946 খ্রীস্টাব্দের 10ই অক্টোবর। মহাকাশ বিজ্ঞানের (Space Science) জন্মদিন হিসাবে এইটিকে ধরা যেতে পারে। অবশ্য এর বহুদিন আগেই বিজ্ঞানীরা এই রকম পরীক্ষার কথা ভাবতেন। এর প্রায় দশ বছর আগে 1937 খ্রীস্টাব্দে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের (Harvard University) একটি বিশেষ সভায় আমাদের ভারতের বিজ্ঞানী অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা প্রকাশ্যে প্রথম ব্যক্ত করেছিলেন বিজ্ঞানীদের এইরকম স্বপ্নের কথা।

এর পর মহাকাশ প্রযুক্তি বিদ্যার দ্রুত বিকাশ হয়েছিল। আরও উচ্চশক্তির রকেট ও উন্নতমানের যন্ত্রপাতির সাহায্যে ধরা পড়েছিল নভোমণ্ডলের এক্স রে, গামা রে ইত্যাদি অংশের বিকিরণ। এই সব আলোয় জ্যোতিষ্কগুলির ছবি নেওয়ার ব্যবস্থাও হয়েছিল। 1957 খ্রীস্টাব্দে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়া হ'ল; সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের সাফল্য খুলে দিল মহাকাশবিদ্যার আর একটি দরজা। প্রথমে উপগ্রহ ও পরে মহাকাশ যান (Space Vehicles) বিজ্ঞানীদের বহুদিনের স্বপ্ন সার্থক করল। চাঁদ ও কাছাকাছি গ্রহগুলির মাটিতে মানুষের গড়া যন্ত্রাংশ নেমে পরীক্ষা চালাল; তারপর 1969 খ্রীস্টাব্দের 20শে জুলাই পৃথিবীর মানুষের প্রথম পায়ের ছাপ পড়ল চাঁদের মাটিতে।

মহাকাশ বিদ্যার দ্রুত এবং অভূতপূর্ব বিকাশে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে বিরাট অধ্যায়ের পাতা খুলে গেছে, তা নিয়ে আলোচনা এই ছোট প্রবন্ধে করা যাবে না। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা শুধু মহাকাশ জ্যোতির্বিজ্ঞানকেই সমৃদ্ধ করেনি, পৃথিবীপৃষ্ঠে বসানো যন্ত্রপাতিগুলিকেও অসাধারণ শক্তিশালী করেছে। তারই দু'একটি উদাহরণ দিয়ে আজকের আলোচনা শেষ করছি।

বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে দৃশ্য আলোর জানালা ত অনাদিকাল থেকেই খোলা ছিল; তারপর বেতার তরঙ্গের জানালাও খুলে গেল। কিন্তু এদের মাঝখানে বিস্তৃত অবলোহিত তরঙ্গগুলির আভাস মাত্র পাওয়া যেত, প্রায় দুই শতাব্দী আগে, ইউরেনাস গ্রহের আবিষ্কর্তা স্যর উইলিয়াম হার্শেল এর অস্তিত্ব প্রমাণ করেছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবে এ বিষয়ে গবেষণা বেশিদূর এগোয় নি। বর্তমান শতাব্দীর চল্লিশের দশকের সময় থেকেই পদার্থবিদ্যার নতুন কয়েকটি আবিষ্কার সেই বাধাগুলি দূর করল। পৃথিবীর টেলিস্কোপ থেকে শুরু হ'ল অবলোহিত তরঙ্গের মাপ। মহাবিশ্বের যে সব বস্তুপিণ্ডগুলি যথেষ্ট গরম হয় নি বা তারাদের জন্মের আগে যে সব পদার্থের মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে, সে সব কিছুর প্রকৃতি জানবার উপায় হা'তে এল। জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞানের যে জায়গায় বিরাট ফাঁক ছিল, সেটিও ভরাবার ব্যবস্থা হ'ল।

অবলোহিত বর্ণালীর এক কোণে যে বিকিরণ তরঙ্গ দেখা যায় তাদের প্রকৃতি প্রায় মাইক্রোওয়েভ বেতার তরঙ্গের সঙ্গে মিলে যায়। এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য প্রায় মিলিমিটার মাপের হয়। একথা হয়ত অনেকেই জানেন না যে এই তরঙ্গ নিয়ে প্রায় এক'শ বছর আগে আমাদের দেশে বেশ গভীর গবেষণা হয়েছিল। করেছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। তাঁর অসমাপ্ত কাজ মাত্র বছর বিশেক আগে দেশ বিদেশের পরীক্ষাগারে নতুন করে শুরু হয়েছে।

মিলিমিটার তরঙ্গের মাধ্যমে মহাবিশ্বের এমন কয়েকটি খবর পাওয়া যায়, যা অন্য উপায়ে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই এর প্রয়োগে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কয়েকটি গবেষণা পৃথিবীর কতকগুলি মানমন্দিরে চলছে। আমাদের দেশে ব্যাঙ্গালোরের রামন্ রিসার্চ ইন্‌স্টিট্যুটে একটি বিশেষ যন্ত্র গড়া হয়েছে যার দ্বারা এই রকম গবেষণা সম্ভব হয়েছে।

বিকিরণ তরঙ্গ ছাড়াও যে অন্যান্য উপায়ের প্রয়োগ হয়েছে মহাবিশ্বের রহস্য উদ্‌ঘাটনের কাজে, তাদের মধ্যে মৌলিক কণিকাগুলির স্রোত অন্যতম। মহাজাগতিক রশ্মি সম্বন্ধে আগেই উল্লেখ করেছি; এখন সবচেয়ে বেশি কৌতূহল রয়েছে আর এক রকমের কণিকাস্রোতের উপর— এগুলির নাম নিউট্রিনো; মহাবিশ্বের যে সব জায়গায় পরমাণু ভাঙ্গাগড়ার প্রক্রিয়া চলছে, সেখান থেকে এর স্রোত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এগুলিকে ধরা বিশেষ কঠিন; কোনও কিছুতেই এদের স্রোত ব্যাহত হয় না। পৃথিবীর উপর যে কণিকাগুলি পড়ে, তার প্রায় সবগুলিই

ভূগোলক ভেদ করে অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। আধুনিক বিজ্ঞানে অবশ্য শেষ পর্যন্ত কয়েকটি উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে যাতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কণিকার মধ্যে দু'একটি করে ধরা পড়ে। পৃথিবীর কয়েক জায়গায় এই রকম যন্ত্র বসানো হয়েছে। সূর্যের অভ্যন্তরে কি রকম পারমাণবিক প্রক্রিয়া চলছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আনতে পারে এই পরীক্ষাগুলি।

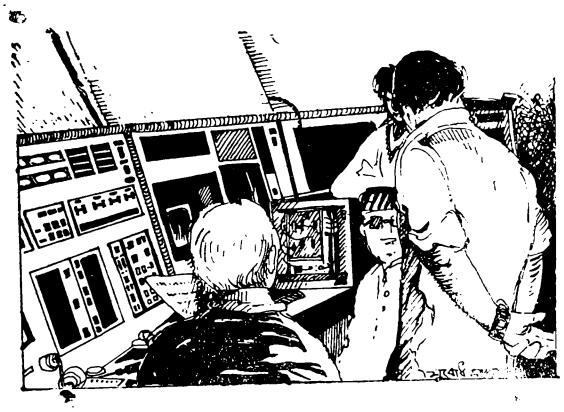

ভেইনু বাপু টেলিস্কোপের কন্ট্রোল সেকসন

বিজ্ঞানীদের দৃঢ় বিশ্বাস যে মহাবিশ্ব সম্বন্ধে আরও অনেক অজানা খবর পাওয়া যাবে এই যন্ত্রের সাহায্যে।

এইরকম নানা প্রকারের যন্ত্রপাতি নিয়ে আজকালকার জ্যোতির্বিজ্ঞানের কাজ। যে টেলিস্কোপ জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় এতদিন বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে দামী সাহায্য করে এসেছে, তারও রূপান্তর ঘটেছে, আজকালকার টেলিস্কোপ ঘেরা থাকে অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে। পুরাকালের জ্যোতির্বিদ্ বলতে মনে হ'ত, কান ঢাকা টুপী পরা লোক অন্ধকার ঘরে টেলিস্কোপের চোঙ্গে চোখ রেখে দেখছে ; আজকালকার জ্যোতির্বিদকে কল্পনা করতে হয় একটা কম্পিউটার সুইচ্-বোর্ডের মত টেবিলে বসে টেলিভিসন স্ক্রীনে নজর রাখছে। আগামী বছর দুয়েকের মধ্যেই হাব্‌ল্ মহাকাশ টেলিস্কোপ (Hubble Space Telescope) পৃথিবীর বাতাবরণ ছাড়িয়ে কক্ষপথে ঘুরবে ; আর পৃথিবীর বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে সেটিকে ঘোরানো ফেরানো হবে, এবং সংগৃহীত তথ্যগুলি কম্পিউটরের মধ্য দিয়ে সংগৃহীত হ'তে থাকবে।

* * *

প্রাগৈতিহাসিক কালের পাথরের যন্ত্রগুলি থেকে বর্তমান মানুষ অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। তবুও প্রশ্ন সেই পুরানোই ; উত্তর খোঁজবার পথটুকুই শুধু আলাদা।

কার্টুন ঃ শৈল চক্রবর্তী

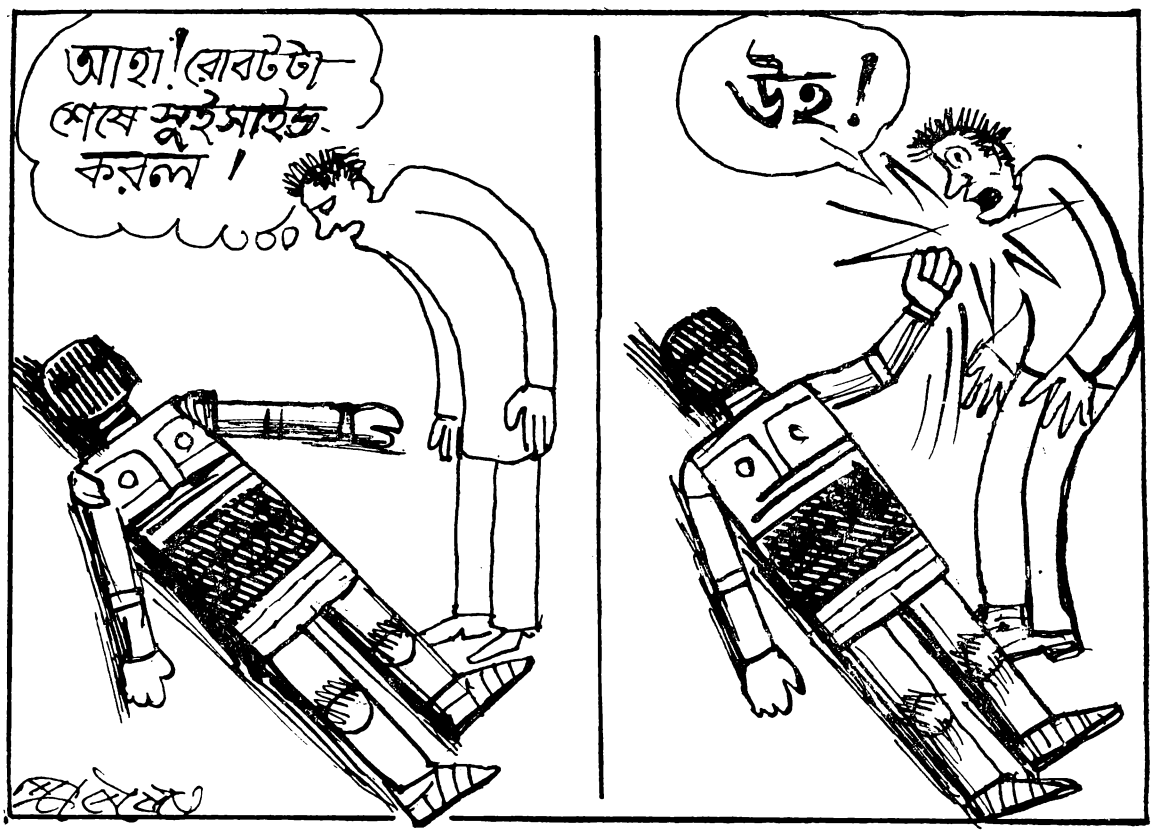

টোকাম্যাক

সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

টোকাম্যাক যন্ত্রটির সূচনা রাশিয়ায়। রাশিয়ান ভাষায় Toroidal Camera (Chamber) এবং magnetic কথাগুলির প্রথম অংশ থেকে যন্ত্রটির এরকম নামকরণ হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞানে হাল্কা পরমাণু কেন্দ্রের ফিউসন বা সংযোজনে যে অমিত শক্তি উৎপাদনের চেষ্টা হচ্ছে, তার সাফল্যের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে টোকাম্যাকের সাহায্যে। ফিউসনের যে প্রযুক্তি মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা যাচ্ছিল, টোকাম্যাক বুঝি তার মোকাবিলায় সক্ষম হবে।

কী এবং কেন এই যন্ত্র তা জানতে হলে শক্তি নিয়ে আমাদের বর্তমান সমস্যা একটু জানতে হবে। তোমরা নিশ্চয়ই জান কয়লা পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি জ্বালানী অফুরন্ত নয়। এসব একদিন ফুরিয়ে যাবে। তখন শক্তির বিকল্প উৎস কী হবে তা নিয়ে খোঁজ চলছে। ইউরেনিয়ামের মত ভারী পরমাণুকেন্দ্রের ফিসন থেকে রিয়্যাক্টর এখন অবশ্যই শক্তির একটি প্রমাণিত উৎস। সবদেশে এমন কি ভারতেও শক্তির উৎস এরকম রিয়্যাক্টর আছে। কিন্তু খনিজ ইউরেনিয়ামও অফুরন্ত নয়। তাছাড়া এসব রিয়্যাক্টরে তেজস্ক্রিয়ার দূষণ এক বড় সমস্যা। কিছুদিন আগে চেরনোবিল রিয়্যাক্টরের দুর্ঘটনায় পৃথিবীতে তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে কী হুলুস্থুলু কাণ্ডই না হয়ে গেল।

তোমরা অবশ্যই বলতে পার সূর্যের আলো, তাপ ও বাতাস এসব উৎস থেকে শক্তি পাওয়ার চেষ্টা তো হ'চ্ছে। হ্যাঁ, শুধু চেষ্টা কেন কিছু কিছু সাফল্য যে না এসেছে তা নয়। সূর্যের আলো থেকে সেমিকণ্ডাক্টরে সৌরকোষ যা তৈরি হয় তা যথেষ্ট ব্যয়বহুল, আর সোজাসুজি সূর্যের তাপ থেকে শক্তি উৎপাদন পদ্ধতি এমন দক্ষ নয় যে এখনই তা কয়লা বা পেট্রোলিয়ামের বিকল্প হতে পারে।

শক্তির সবচেয়ে ভাল উৎস হল সূর্যের কেন্দ্রে হাল্কা পরমাণু কেন্দ্রের ফিউসনে যে শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে পৃথিবীতে তা নকল করা। অর্থাৎ পৃথিবীতে ছোট একটি সূর্য কি তৈরি করা যায়? না, তা যায় না। কারণ সূর্যের কেন্দ্রে লক্ষ লক্ষ ডিগ্রী উষ্ণতায় সব মৌলিক পদার্থই বায়বীয় অবস্থায় আয়ন ও ইলেকট্রনে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। সেখানে হাল্কা হাইড্রোজেন পরমাণুকেন্দ্র অর্থাৎ প্রোটন ঐ উষ্ণতায় বিপুল গতিবেগ পেয়ে পরস্পর জুড়ে গিয়ে হিলিয়ামে পরিণত হচ্ছে। ঐ ফিউসন বা সংযোজন ক্রিয়াই হল সূর্যের শক্তির উৎস। আবার সূর্যের বিপুল বায়বীয় দেহ টিকে আছে মহাকর্ষ শক্তির জোরে। সূর্যের মত বিশাল বপু কোন পদার্থ পৃথিবীতে মহাকর্ষের জোরে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই বিকল্প কিছু ভাবতে হবে।

বায়বীয় পদার্থকে আয়ন ও ইলেকট্রনে বিচ্ছিন্ন করা অবশ্যই সম্ভব। ক্রুকস এই শতকের গোড়াতেই ডিসচার্জ টিউবে এরকম প্লাজমা আবিষ্কার করেছিলেন। কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের বাইরে আয়ন ইলেকট্রনের এই ডিসচার্জকে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা প্লাজমা বলা হয়। কিন্তু সমস্যা হল এরকম প্লাজমা পেতে হবে যা অন্তত এমন উত্তপ্ত হ'বে যে সৌর কেন্দ্রের মত ফিউসন ক্রিয়া ঘটাতে পারে; আবার এই প্লাজমা দীর্ঘ সময় আবদ্ধ রাখতে না পারলে যন্ত্রটি চালাতে যে শক্তি খরচ হচ্ছে তার চেয়ে বেশি শক্তি উৎপন্ন হ'বে না। বেশি শক্তি উৎপন্ন হলেই তাকে রিয়্যাক্টর বলা যাবে ও সেই শক্তি কাজে লাগবে। প্লাজমা কোন আধারে কিছুক্ষণ আবদ্ধ রাখতে 1950 খ্রীস্টাব্দ থেকে চুম্বকীয় আধার দিয়ে নানা চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তাতে প্লাজমার অস্থিরতা কমানো সম্ভব হয় নি।

টোকাম্যাক প্রসঙ্গে আসার আগে দেখা যাক ফিউসন ক্রিয়া কি? ভারী পরমাণু কেন্দ্রের বিভাজনে যে টুকরাগুলি পাওয়া যায় তাদের ভর ভারী পরমাণু কেন্দ্রটির চেয়ে কিছু কম। এই কমতি ভরই আইনস্টাইনের শক্তি ও ভরের তুল্য মূল্যতার সূত্র থেকে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ইউরেনিয়াম বিভাজন নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরে সেই শক্তির উৎস। ফিউসন ক্রিয়ার পরে অবশেষ পদার্থ আগের ভর থেকে কমে যায়—সেই কমতি ভরই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তাপের সাহায্যে এই ফিউসন ঘটে ও শক্তি পাওয়া যায় বলে আমরা এরকম যন্ত্রকে বলি থার্মোনিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর।

সূর্য হল এরকম একটি প্রাকৃতিক থার্মোনিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর। তার কেন্দ্রে চারটি প্রোটন ফিউসন ক্রিয়ায় হিলিয়ামে অনবরত রূপান্তরিত হয়ে বিপুল শক্তি উৎপাদন করে।

এই ক্রিয়া থেকে কম জটিল বেশ কয়েকটি ফিউসন ক্রিয়া আছে—যা থেকে সূর্যের চেয়ে কম উষ্ণতায় ও শক্তি উৎপন্ন হতে পারে। এরকম একটি হল ডয়েটরন ও ট্রাইটনের ফিউসন। এই ক্রিয়ায় প্রযুক্ত শক্তির প্রায় 450 গুণ শক্তি পাওয়া যাবে।

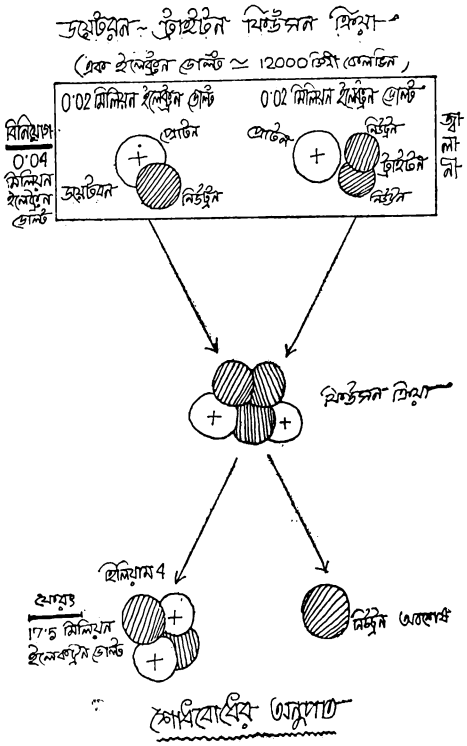

আইনস্টাইনের সূত্র :

শক্তি = ভর × (আলোর গতিবেগ)^2 = mc^2

ডয়েটরন + ট্রাইটন → হিলিয়াম 4 + নিউট্রন

পারমাণবিক ভর এককে

ডয়েটরন → 2·013553	হিলিয়াম → 4·001503
+ ট্রাইটন → 3·01 5501	নিউট্রন → 1·0)8665
5·0 .9054	5·010168

5·029054

−5·010168

ভরক্ষয় → 0·018886

= ·13631 × 10^{-29} কিগ্রা

মুক্ত মোট শক্তি 3·13631 × 10^{-29} × C^2 ≃ 2·8188 × 10^{-12} জুল

= 17·593 মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট

প্রাকৃতিক হাইড্রোজেনে ডয়েটরন থাকে শতকরা 015·3 ভাগ কিন্তু ট্রাইটন হাইড্রোজেনের H^3 আইসোটোপ তেজস্ক্রিয়ও দুর্লভ। তাই লিথিয়ামে নিউট্রন যোগে ট্রাইটন তৈরি করে নিতে হয়। সমুদ্রের জলে দশ লক্ষের 0·17 ভাগ লিথিয়াম পাওয়া যায়।

লিথিয়াম থেকে ট্রাইটন তৈরিতে এই ফিউসন ক্রিয়ার জন্য জ্বালানী পাওয়ায় এক বড় অসুবিধা। অন্য অসুবিধা-গুলি হল নিউট্রনলভ্য শক্তির প্রায় 4/5 অংশ গতীয় শক্তি নিয়ে বেরিয়ে আসে। অথচ সেই গতীয় শক্তির তাপ কাজে লাগিয়ে বয়লার চালান যায় না—বরং নিউট্রনের জন্য রিয়্যাক্টরের আধারের দেয়াল দুমড়ে যেতে পারে। সেই ক্ষয়-ক্ষতি থেকে আধারটিকে রক্ষা করতে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। তাছাড়া ট্রাইটনের তেজস্ক্রিয়া আছে। অবশ্য লভ্যশক্তির বাকি $\frac{1}{5}$ অংশ হিলিয়াম নিয়ে বেরিয়ে আসে—যা তাপ সৃষ্টি করে বয়লার চালাতে পারে ও বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করতে পারে। এটুকুও কম লাভ নয়।

ডয়েটরন ও ট্রাইটন ছাড়া ফিউসন ক্রিয়ার অন্য জ্বালানীও আছে—সেগুলি হল প্রোটন, হিলিয়াম 3, লিথিয়াম 6, বোরন 11 ইত্যাদি।

এখন দেখা যাক জ্বালানী থেকে শক্তি পেতে হলে ফিউসন রিয়্যাক্টর তৈরিতে কী দরকার। প্রথমত জ্বালানীকে এমন উষ্ণতায় উত্তপ্ত করতে হবে যে তার নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রন আলাদা হয়ে যেন প্লাজমা তৈরি করে ও সেই প্লাজমা কিছুক্ষণ আধারে আটকে রেখে ফিউসন ক্রিয়া ঘটার মত উষ্ণ থাকে। এর অর্থ হল সূর্য ও নক্ষত্রের কেন্দ্রের মত অবস্থা তৈরি করা প্রয়োজন।

ফিউসন ক্রিয়ার জন্য অধিক উত্তাপ এই জন্য প্রয়োজন যে প্লাজমার পজিটিভ আয়নগুলির বিকর্ষণ পেরিয়ে তাদের যুক্ত করতে যথেষ্ট আপেক্ষিক গতিবেগ প্রয়োজন। ডয়েটরন ও ট্রাইটনের বেলায় 5×10^{-15} মিটার বা তার কাছাকাছি দুটি আয়ন না এলে বিকর্ষণ এড়িয়ে ফিউসন হবে না। এজন্য আয়নের 290 কিলো ইলেকট্রন ভোল্টের মত আপে-ক্ষিক গতিবেগ দরকার। কিন্তু অধিকাংশ আয়নকে এই আপেক্ষিক গতিবেগ দিতে গড়ে 10^8 কেলভিন উষ্ণতা বা 10 কিলো ইলেকট্রন ভোল্ট আপেক্ষিক গতিবেগ দিলে চলে। কারণ এই গড় মানে অনেক আয়নই অধিকতর গতিবেগ পেয়ে যায়। আর কোয়ান্টাম তত্ত্বের টানেলিং ক্রিয়ায় 290 কিলো ইলেকট্রন ভোল্টের চেয়ে কম গতিবেগের আয়ন ও বিকর্ষণের বাধা পেরিয়ে ফিউসন ঘটাতে পারে।

ফিউসন ক্রিয়া ঘটাতে যে শক্তি দরকার তার চেয়ে বেশি শক্তি পেতে হলে কত আয়নকে কতটা সময় আধারে আবদ্ধ রাখতে হবে লসন (Lowson) তার যে শর্ত দিয়েছেন তা হল প্রতি ঘনমিটারে আয়নের ঘনত্ব ও আবদ্ধ থাকার সময়ের গুণফল অন্তত 10^{20} বা তার বেশি হতে হবে। ধরা যাক ঘনমিটারে 10^{20} টি আয়ন উৎপাদন করা গেল। তাদের এক সেকেণ্ড কাল এক ধরেও রাখতে পারলে রিয়্যাক্টর থেকে শক্তি লাভ করা যাবে।

বিভিন্ন জ্বালানীর জন্য কত উষ্ণতা প্রয়োজন তা ফিউসন ক্রিয়ার হার থেকে গোনা যায়। উষ্ণতা খুশিমত বাড়ানো যায় না কারণ নানা বিকিরণের জন্য ক্ষয়ক্ষতি থাকবেই।

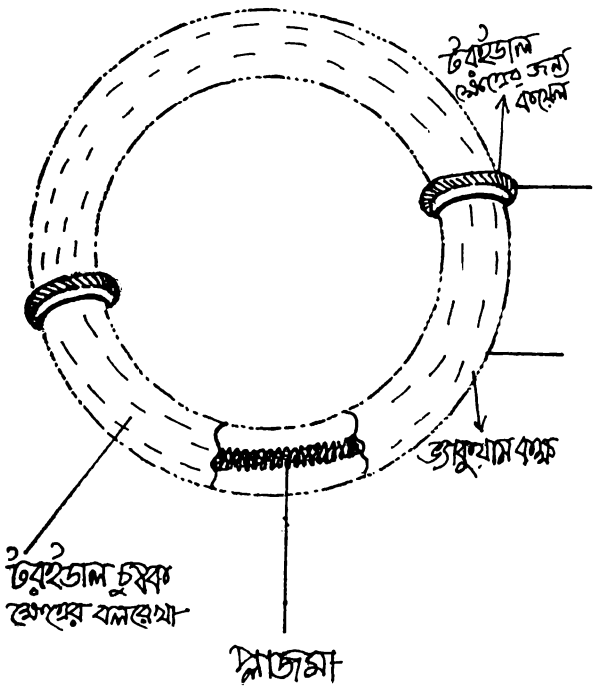

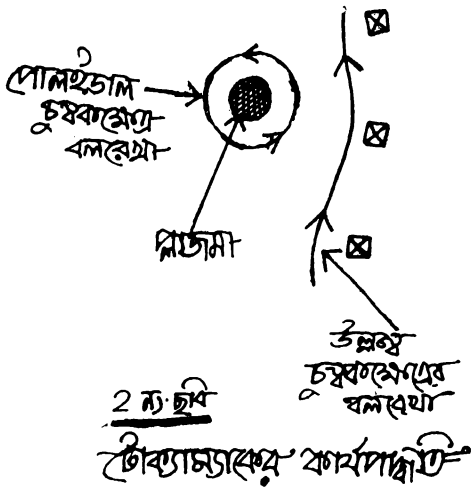

2 নং ছবি
টোক্যামাকের কার্যপদ্ধতি

তাই জ্বালানীর জন্য আবদ্ধ থাকার সময় কতটা হবে তাও গণনা সাপেক্ষ।

এসব হিসেব করা কঠিন নয়—কঠিন হল প্লাজমা স্বভাবতই অস্থির, চুম্বকক্ষেত্রের নানা জ্যামিতি তৈরি করে এই প্লাজমা স্থিরভাবে ধরে রাখার চেষ্টা চলেছে 1950 খ্রীস্টাব্দ থেকে। কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হয়নি। 1970 খ্রীস্টাব্দে সোভিয়েত সাফল্য অনুসরণ করে টোকাম্যাক নিয়ে গবেষণা ফিউসন শক্তির উৎপাদনে প্রায় সফল হতে চলেছে। 2নং ছবিতে এই যন্ত্রের কার্যপদ্ধতি দেখান হল। টোকাম্যাকে প্লাজমার আধার হল বায়ুশূন্য একটি টোরাস আকৃতিতে গাড়ির বিশাল একটি টায়ারের মত। তাতে বৃত্তাকার অনেকগুলি টরইডাল কয়েল আংটির মত লাগান থাকে। এই সব কয়েলে বিদ্যুৎ প্রবাহ দিলে টরইডাল চুম্বকক্ষেত্র উৎপাদন করে। প্রধান আধারে বায়বীয় জ্বালানী ঢুকিয়ে বাইরের কণ্ডেন্সার থেকে ডিসচার্জের সাহায্যে প্লাজমা প্রবাহ আবার তার গতিপথের চারদিকে বৃত্তাকার একটি পোলইডাল চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে। বিদ্যুৎ প্রবাহ থেকে যে চুম্বকক্ষেত্র তৈরি হয় তা আমাদের অজানা নয়। এখন টরইডাল ও পোলইডাল এই দুটি চুম্বকক্ষেত্র টোকাম্যাকে প্লাজমাকে অস্থির হতে দেয় না। কিছু অস্থিরতা দেখা গেলে তা সংশোধনের জন্য বাইরের উল্লম্ব একটি অতিরিক্ত চুম্বকক্ষেত্রের সাহায্যে প্লাজমাকে ঠিক জায়গায় স্থির রাখা যায়। কখনও বা অতিরিক্ত একটি অনুভূমিক চুম্বকক্ষেত্রের সাহায্য নেওয়া হয়।

একটি মাঝারি মাপের টোকাম্যাকের টোরাসের ব্যাস প্রায় 60 সেমি, টোরাসের নলের ব্যাস 15 সেমি। এরকম টোকাম্যাকে প্লাজমা প্রবাহ 75 কিলো অ্যাম্পিয়ার হতে পারে এবং তা সেকেণ্ডের পঞ্চাশ ভাগের একভাগ স্থিতিকালের ঝলকে প্রবাহিত করা হয়। টরইডাল চুম্বকক্ষেত্রে প্রায় দুই টেনসা প্লাজমা প্রবাহ চালিয়ে রাখতে অতিরিক্ত একটি জুল হিটিং কয়েলও থাকে।

যে কয়েকটি কথায় টোকাম্যাকের কথা বলা হল, যন্ত্রটি তার চেয়ে অনেক জটিল। এই যন্ত্রে আশা করা যাচ্ছে যে শক্তি উৎপাদনকারী সফল রিয়্যাক্টর সম্ভব হবে।

টোকাম্যাকের প্লাজমায় গড় উচ্চতা থাকে 2-3 কিলো ইলেকট্রন ভোল্ট। সফল রিয়্যাক্টরের জন্য এই উষ্ণতা বাড়াতে বাইরে থেকে বেতারতরঙ্গ বা বেগবান কণা প্লাজমায় পাঠাতে হয়। এসব চেষ্টাও অনেকাংশে সফল হয়েছে।

সমস্যাটি এখনও গবেষণা স্তরে আছে। চুম্বকক্ষেত্রের সাহায্য না নিয়ে ফিউসন জ্বালানী কঠিন পদার্থ হিসেবে নিয়ে তাতে লেসার রশ্মির সংঘাত ঘটিয়ে ক্ষণকালের জন্য প্লাজমার ঘনত্ব বাড়িয়েও লসনের শর্ত পূরণ করার চেষ্টা হ'চ্ছে। এই পদ্ধতিও সম্ভাবনাপূর্ণ। লেসারের তীব্র রশ্মিতে টোকাম্যাকের চেয়ে আয়নের অধিক ঘনত্ব এভাবে উৎপাদন করা যায়।

ভারতে এখন দুটি টোকাম্যাক যন্ত্র নিয়ে গবেষণা আরম্ভ হচ্ছে, একটি আমেদাবাদে—ফিজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিট্যুটে ও অন্যটি কলকাতার সাহা ইনস্টিট্যুটে।

ব্রিডার রিঅ্যাকটর—দ্বিতীয় প্রজন্ম

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ও শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়

প্রজন্ম কথাটি আজকাল কমপিউটরের ক্ষেত্রে খুব চালু। এক একটি প্রজন্ম উন্নতির এক একটি ধাপ সূচিত করে। পরমাণুশক্তি আত্মপ্রকাশ করার পরে বেশ কিছুকাল কেটে গেছে—তার উত্তরণও ঘটেছে বিচিত্র ভাবে। এখন পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে সব উপায় ও প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হচ্ছে তাদের সম্পর্কেও প্রজন্ম কথাটি ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রথম যুগ ছিল ওয়াটার-কুল্‌ড রিঅ্যাকটর। এই রিঅ্যাকটরে সাধারণ এবং ভারী জলকে মডারেটর ও কুলাণ্ট হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বিভাজন হলে কিছু সংখ্যক নিউট্রন ছিটকে বেরোয়। তাদের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা থাকা চাই। কিছু কিছু জিনিস নিউট্রন গ্রাস না করে তার গতিবেগ কমিয়ে দিতে পারে। এরাই হল মডারেটর। কুলাণ্ট, বা ঠাণ্ডা করার উপকরণ আর একটি প্রয়োজনীয় জিনিস। দুটি কারণে কুলাণ্টের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাপ উৎপাদনের হারকে আয়ত্তের মধ্যে রাখা ও রিঅ্যাকটর থেকে তাপকে স্টিম উৎপাদক ব্যবস্থার মধ্যে চালিত করা। তারপর মডারেটর হিসেবে জল ব্যবহার হচ্ছে।

এখন দ্বিতীয় প্রজন্মের পরমাণু রিঅ্যাকটরগুলি নানা রকমের। এগুলি কোথায় কেমন হবে তা নির্ভর করে অনেকগুলি কারণের উপর। যেমন প্লুটোনিয়ম সম্পর্কে অনীহা ও সতর্কতা একটা কারণ হতে পারে। তবে আসল কথা হল ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ম জ্বালানীর কি ভাবে সবচেয়ে কার্যকর প্রয়োগ করা যায়। রিঅ্যাকটরগুলির ডিজাইনের মূলে সব সময়ই এই চিন্তা কাজ করে।

এখানে সতর্কতা প্রসঙ্গে কিছু বলে নেওয়া যেতে পারে। এখন পৃথিবীতে পঞ্চাশটিরও বেশি দেশে পরমাণু বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হচ্ছে। দেশগুলি হল আর্জেণ্টিনা, বেলজিয়ম, ব্রাজিল, বুলগেরিয়া, কানাডা, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফিনল্যাণ্ড, ফ্রান্স, পূর্ব জার্মানী, পশ্চিম জার্মানী, হাঙ্গেরী, ভারত, ইতালী, জাপান, উত্তর কোরিয়া, নেদারল্যাণ্ড, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুগোশ্লাভিয়া এবং চীন। মোট 374 টি রিঅ্যাকটরের মধ্যে সিংহভাগ হল পাঁচটি দেশের। এরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 93 রাশিয়া 51, ফ্রান্স 43, জাপান 33 এবং যুক্তরাজ্য 38। এ ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় 157টি রিঅ্যাকটর নির্ণীয়মান অবস্থায় আছে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে এতগুলি দেশ নিশ্চয়ই তাদের দেশ-বাসীদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি এবং পরিবেশ নষ্ট করার জন্য এমন কার্যক্রমে হাত দেয়নি। সমস্ত পরমাণু শক্তিকেন্দ্রে যে ধরনের কড়া ও ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে তা অন্য কোন শক্তি কেন্দ্রে চিন্তাও করা যায় না। সব রকম সতর্কতা সত্ত্বেও দু-একটি দুর্ঘটনা ঘটে যায়। কিন্তু সেগুলি নিয়ে এত বেশি হৈ চৈ করা হয় যে বাকি উপকারের কথাটা আড়ালেই থেকে যায়।

পরমাণু শক্তি আজকের পৃথিবীতে কতটা ব্যবহার হয় তার একটা হিসেব এখানে দেওয়া হল—এতে দেখান হচ্ছে কোন দেশে উৎপাদিত মোট বিদ্যুৎ শক্তির কত শতাংশ পরমাণু থেকে আসছে।

পৃথিবীতে পরমাণু শক্তির ব্যবহার

ফ্রান্স	64.8	পশ্চিম জার্মানী	31·2	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	15.5
বেলজিয়াম	59.8	জাপান	23.7	কানাডা	12.7
সুইডেন	38.2	উত্তর কোরিয়া	22.1	পূর্ব জার্মানী	12
সুইজারল্যাণ্ড	42.3	স্পেন	24.00	আর্জেণ্টিনা	11
ফিনল্যাণ্ড	39.8	যুক্তরাজ্য	19.3	চেকোশ্লোভাকিয়া	14.6
বুলগেরিয়া	31.6	হাঙ্গেরী	23.6	সোভিয়েত রাশিয়া	10.3

দেখাই যাচ্ছে এখনও ভারতের নাম এই তালিকাতে ওঠে নি। এর জন্য হতাশ হবার কিছু নেই। আসল কথাটা হল উপরের দেশগুলির অনেকেই বিদেশী সাহায্য নিয়ে শক্তি কেন্দ্রগুলি স্থাপন করিয়েছে। আমরা তা করলে এতদিনে আমাদের নাম এই তালিকায় চলে আসত। কিন্তু সুরু থেকেই আমাদের নীতি ছিল বিদেশী সাহায্য পারতপক্ষে বাদ দিয়ে নিজেদের চেষ্টায় সবটা করা। পরমাণু পরিকল্পনা করার সময় 1945 সালে হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা খুব আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গেই বলেছিলেন "আজ থেকে কয়েক দশকের মধ্যে পরমাণু ক্ষমতা যখন সাফল্যের সঙ্গে শক্তি উৎপাদনের কাজে প্রযুক্ত হবে তখন ভারতকে বাইরের থেকে আনা বিশেষজ্ঞদের দ্বারস্থ হতে হবে না—ততদিনে ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা নিজেরাই উপযুক্ত হয়ে উঠবেন।" কিন্তু মুশকিল হল 1974 সালের পোখরান পরীক্ষার পর ভারতের শক্তিতে আতঙ্কিত হয়ে অন্য কিছু পরমাণু শক্তিধর দেশ সরাসরি বিরোধিতার পথ ধরল। অল্প যেটুকু সাজ-সরঞ্জাম আমদানি না করলেই নয় সেটুকুও তারা বন্ধ করে দিল। এর ফলে আমাদের পরমাণু শক্তি উৎপাদন একটা বড় রকম ধাক্কা খেয়েছিল।

শক্তির চাহিদা এক একদেশে এক এক রকম। কোন দেশে কয়লা ও খনিজ তেলের এখনও যা সঞ্চয় আছে তাতে বেশ কিছুদিন তাদের এই নিয়ে ভাবনা না করলেও চলবে। আবার অনেক দেশ যেমন জাপানে সব জ্বালানীটাই আমদানী করতে হয়। আমাদের অবস্থা মাঝামাঝি, আমাদের কয়লা সঞ্চয় তেমন বেশি নয়, ভবিষ্যতের দ্রুত শিল্পায়নের কথা চিন্তা করলে তা আদৌ পর্যাপ্ত নয়। সুতরাং আমাদের পক্ষে পরমাণু প্রযুক্তিতে আগে থেকেই হাত পাকানো যে কতটা বুদ্ধির কাজ হয়েছিল তা হয়ত 1945 সালে সাধারণ লোকে বুঝতে পারে নি কিন্তু আজ সকলেই বুঝছে। একথা ঠিক যে পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে আজকে আমাদের পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন এতটা পিছিয়ে থাকত না। আমাদের দেশের পটভূমিতে ব্রিডার রিঅ্যাকটর কেন জরুরী সেটাও ভেবে দেখার কথা।

ব্রিডার রিঅ্যাকটর কি করে? সহজ করে বলতে গেলে এর কাজ হল যত জ্বালানী দহন হয় তত অথবা তার চেয়ে বেশি জ্বালানী তৈরি কর। জ্বালানী সাশ্রয়ের কথা মনে রাখলে বোঝা যাবে এর মধ্যেই আছে আগামী দিনের শক্তিচাহিদা মেটাবার ব্যবস্থা। যে কোন তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যে কয়লা একবার পোড়ে তাকে আর একবার ব্যবহার করা যায় না। সে একেবারেই খরচ হয়ে শেষ হয়ে গেল। সেই জন্যই আজ পৃথিবী জুড়ে এত হাহাকার। এমন যদি কোন কৌশল থাকত যাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি একই কয়লায় বছরের পর বছর চালানো যেতে পারত তাহলে সমস্যার চমৎকার সমাধান হত। কিন্তু তা হবার নয়।

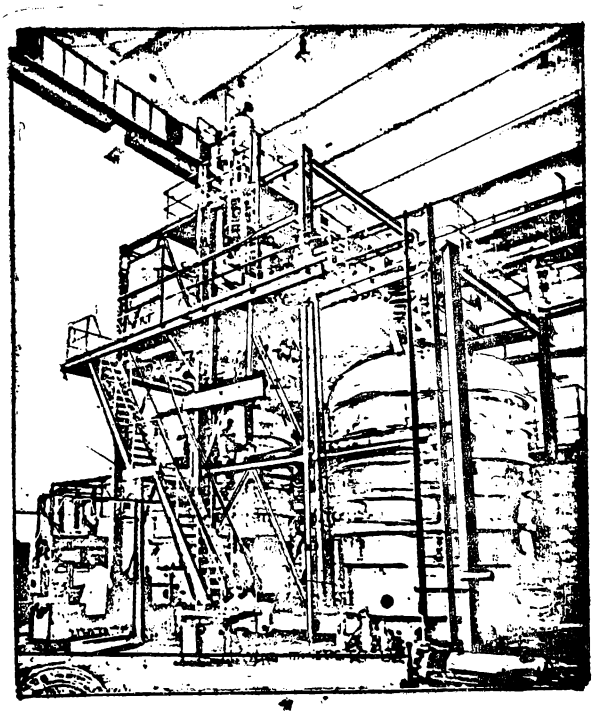

ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাক্টরের সোডিয়াম দিয়ে গরম করা স্টীম

অথচ আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব এই ঘটনাটি অন্যরকম প্রযুক্তি কৌশলে সম্ভব হয়েছে। তফাতের মধ্যে এই যে এখানে জ্বালানীর আকৃতি প্রকৃতি একেবারে আলাদা। জ্বালানী এখানে কয়লা নয় ইউরেনিয়ম।

আমাদের দেশে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়মের সঞ্চয় বেশি না হলেও থোরিয়ম পাওয়া যায় পর্যাপ্ত পরিমাণে। তবে মুশকিল হল এই থোরিয়মে বিভাজন হয় না। থোরিয়মকে যদি পারমাণবিক বিক্রিয়ায় ইউরেনিয়ম 233 করা যায় তবে তা বিভাজনক্ষম হতে পারে। প্রকৃতিতে যে ইউরে-নিয়ম পাওয়া যায় তা হল ইউ 238। তবে এর একটি আইসোটোপ ইউ 235-কে রিঅ্যাকটরে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা অনেক বেশি কার্যকর। এটা অল্প পরিমাণে ইউরেনিয়ম 238 এর সঙ্গেই পাওয়া যায়। জ্বালানীর জন্য প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ম থেকে ইউ 235 আলাদা করতে হয়। বিভাজনের পর দ্রুতগতিসম্পন্ন যে নিউট্রনগুলি বেরোয় মডারেটরের সাহায্যে তাদের গতিবেগ কমানো হয় আরো বিভাজন করার জন্য। এগুলিকে বলে থার্মাল রিঅ্যাকটর। এখানে ধীরগতি নিউট্রন দিয়ে বিভাজন হয়। থার্মাল রিঅ্যাকটরে প্রতি বিভাজনে যে কটি নিউট্রন সৃষ্টি হয় তার একটি খরচ হয় চক্রবৃদ্ধি বিক্রিয়া চালু রাখতে। যে নিউট্রন বাকি থাকে তাকে দিয়ে কেন্দ্রীন বিক্রিয়ার সাহায্যে ইউরে-

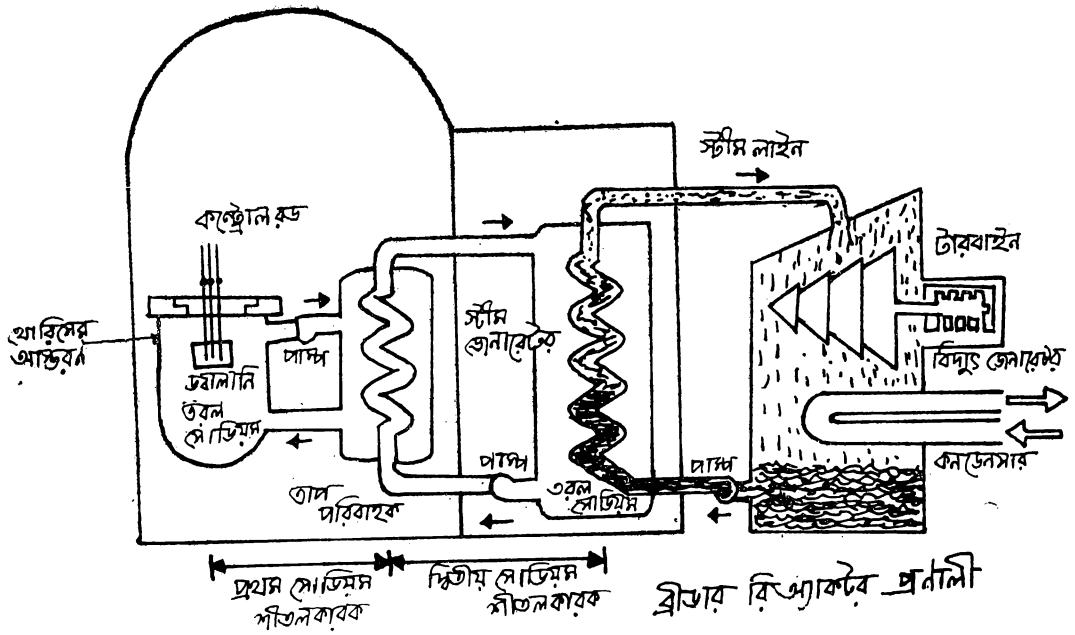

ব্রিডার রিঅ্যাক্টর প্রণালী

নিয়ম 238 কে প্লুটোনিয়ম 239 করা যায় বটে কিন্তু তার সংখ্যা খুব বেশি নয়। তাই থার্মাল রিঅ্যাক্টর দিয়ে ব্রিডার বানানো যায় না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে দ্রুতগতিসম্পন্ন নিউট্রন দিয়ে বিভাজন করতে পারলে প্রতিটি বিভাজনে চার থেকে পাঁচটি নিউট্রন বেরোয়। তার মধ্যে একটিকে চক্রবৃদ্ধি বিক্রিয়ার জন্য রেখে দিলেও বাকি নিউট্রনগুলির মধ্যে কিছু ব্রিডারের জন্য পাওয়া সম্ভব। দ্রুতবেগসম্পন্ন নিউট্রন ব্যবহার করা হয় বলে এদের ফাস্ট রিঅ্যাকটর বলে। এই ধরনের রিঅ্যাকটরে কোন মডারেটর থাকে না। তাই নিউট্রন শোষণও কম হয়। ব্রিডার রিঅ্যাকটর মূলত ফাস্ট রিঅ্যাকটর। আজ অবধি যে সব পদ্ধতিতে ইউরেনিয়ম থেকে ইউরেনিয়ম 235 আলাদা করা হয়েছে তার সবগুলিই খুব জটিল ও ব্যয়সাপেক্ষ। ঠিক ভাবে ডিজাইন করতে পারলে ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাকটরে অনেক কম খরচে জ্বালানী তৈরি করা যায়। রিঅ্যাকটর কোরের চারপাশে যদি থোরিয়মের আস্তরণ দেওয়া যায় তাতে নিউট্রন শোষণ করে থোরিয়ম 232 থোরিয়ম 233 হয় এবং তার থেকে একটি বিটা কণা বেরিয়ে ইউ 233 তে রূপান্তরিত হয়। এটি বিভাজনক্ষম। এইভাবে আমাদের থোরিয়ম সম্পদ কাজে লাগান যেতে পারে এবং তাহলে আমাদের হাতে এসে যাবে পর্যাপ্ত পরমাণু জ্বালানীর উৎস। এই কারণেই আমাদের দেশে ব্রিডার প্রযুক্তি আরও করা খুবই প্রয়োজনীয়। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে সেটা ভবিষ্যতে টিকে থাকার প্রশ্নও বটে। আমাদের প্রথম পরীক্ষামূলক ফাস্ট রিঅ্যাকটরের নাম পূর্ণিমা।

ব্রিডার রিঅ্যাকটরের মূল সমস্যা হল বিভাজনের সময় যে তাপ উৎপন্ন হয় সেটাকে ঠাণ্ডা করা হবে কি দিয়ে। ব্রিডার রিঅ্যাকটরে ঠাণ্ডা করার জন্য তরল সোডিয়ম ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ আমরা যে সোডিয়মের সঙ্গে পরিচিত তাতে অনেক অপবস্তু থাকে। সেই সোডিয়ম রিঅ্যাকটরে দিলে সমস্ত অপবস্তুগুলো তেজস্ক্রিয় হয়ে যাবে। সেইজন্য এই সোডিয়মের শুদ্ধিকরণ করে তাকে রিঅ্যাকটরের উপোযোগী করতে হয়। তরল সোডিয়ম পাইপের মধ্যে প্রবাহিত করতে হলে সোডিয়ম পাম্প চাই।

তরল সোডিয়ম গরম হলে পর সেই তাপ পরিবহণের জন্য আর এক দফা সোডিয়ম লুপ অর্থাৎ তরল সোডিয়ম-বাহী পাইপের বেষ্টনী চাই। সেটি থেকে তাপ পরিবহণ করা হবে আর একটি জলের পাইপের বেষ্টনী দিয়ে। এই জল স্টিমে পরিণত হয়ে স্টিম জেনারেটরে চলে যাবে। তার থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে।

এই প্রক্রিয়াটি যত সহজে বলা গেল তত সহজ ব্যাপারটা মোটেই নয়। এই প্রযুক্তি শুধু জটিল নয়, বেশি মাত্রায় বিপজ্জনক। কারণ তোমরা নিশ্চয়ই জানো সোডিয়ম জলের সংস্পর্শে এলে আগুন ধরে যায়। আজ-কাল যাকে হাই টেকনোলজি বলে এ তারই মধ্যে পড়ে। এইরকম আরও অনেক খুঁটিনাটি সমস্যা এর সঙ্গে জড়িত

আছে যে কারণে এই প্রযুক্তি আয়ত্ত করা খুব সহজসাধ্য নয়। পৃথিবীতে অল্পই কয়েকটি দেশ আছে যেখানে ব্রিডার প্রযুক্তি উন্নত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। ভারতও এর মধ্যে একটি দেশ যদিও আমাদের এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায় চলেছে। তবে যেভাবে কাজ চলছে তাতে আগামী শতাব্দীর আগেই সাফল্য হাতের মুঠোয় এসে যাবে এরকম আশা করা অন্যায় হবে না। ইতিমধ্যেই কল্পক্কমে ইন্দিরা গান্ধী রিসার্চ সেন্টারে এই নিয়ে কাজ চলছে।

সাধারণত শক্তি উৎপাদনের কাজে যে সব রিঅ্যাকটর ব্যবহার হয় তাদের জ্বালানী হয় ইউরেনিয়ম। অনেকদিন চলার পর এই ইউরেনিয়মের কিছু অংশ প্লুটোনিয়মে পরিণত হয়। প্লুটোনিয়মকেও জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা

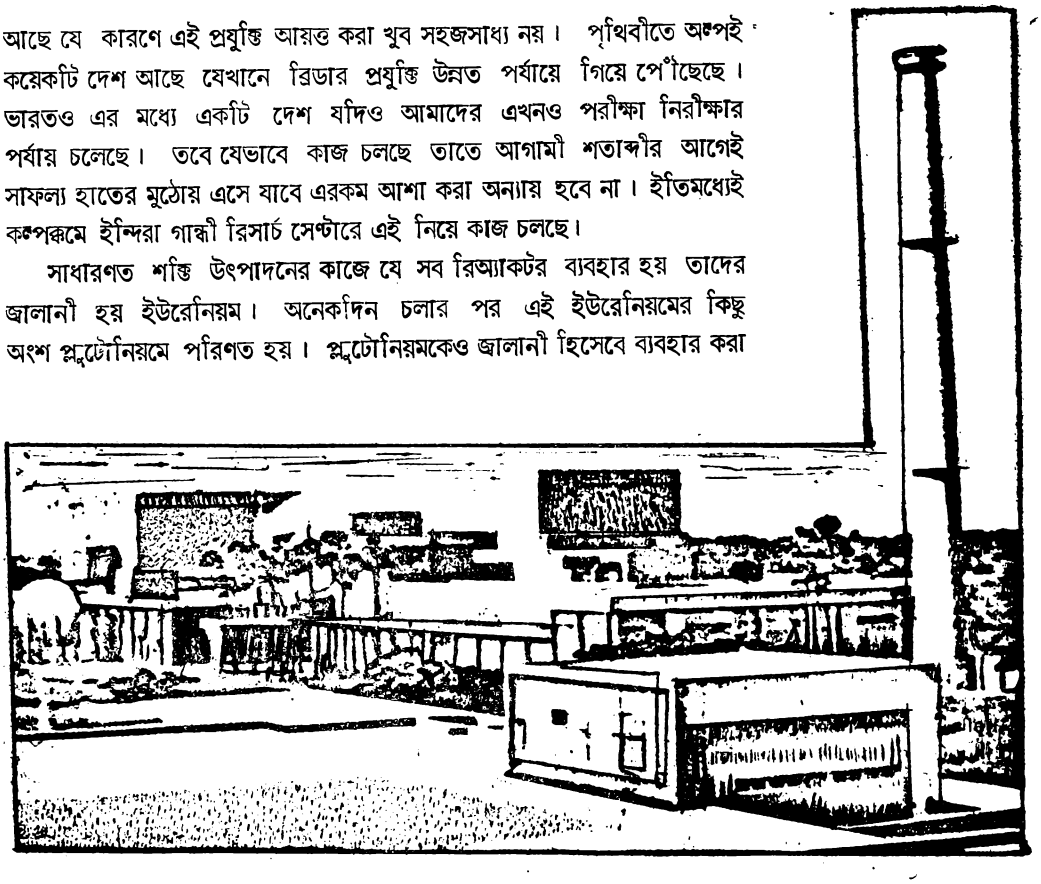

ইন্দিরা গান্ধী রিসার্চ সেন্টারে ফাস্ট ব্রিডার টেস্ট রিঅ্যাক্টর

যায় কারণ এটি বিভাজনক্ষম। কিন্তু এই প্লুটোনিয়মের পরিমাণ খুব কম, যদি এমন ব্যবস্থা করা যায় যে যতটা ইউরেনিয়ম খরচ হবে তার একটা বড় অংশ প্লুটোনিয়মে পরিবর্তিত হয় তাহলে জ্বালানীর সমস্যা অনেকটা মেটে। এই একরকম জ্বালানী খরচ করে অন্য জ্বালানী উৎপাদন করার জন্য এর নাম ব্রিডার রিঅ্যাকটর। সাধারণভাবে যে রিঅ্যাকটর যতগুলো বিভাজনক্ষম পরমাণু ব্যবহার করছে তার থেকে বেশি ঐ রকম পরমাণু তৈরি করলে তাকেই বলে ব্রিডার রিঅ্যাকটর। এই জমা-খরচের টানাপোড়েনের মধ্যে এমনও হতে পারে যে যতটা খরচ হল তৈরি হচ্ছে তার চেয়ে কম। আবার এমনও সম্ভব যে দুটোর পাল্লা হল সমান সমান। তার মানে যত্র আয় তত্র ব্যয়। আর একটা তৃতীয় অবস্থা হল খরচের চেয়ে আমদানী বেশি। সোজা করে বলতে গেলে সেই রিঅ্যাকটর শেষ অবধি (সময়টা হয়ত পাঁচ-ছ বছর এমনকি দশ বছরও হতে পারে) যা খরচ করছে তার চেয়ে বেশি পরিমাণে বিভাজনক্ষম উপাদান তৈরি করছে। এই ক্ষেত্রেই ব্রিডার রিঅ্যাকটরের সার্থকতা, যদিও মানের দিক দিয়ে তিন রকম অবস্থাকেই সাধারণভাবে ব্রিডার রিঅ্যাকটর বলা হবে—জমা খরচের চুলচেরা হিসেবের মধ্যে না গিয়েও।

ব্রিডার রিঅ্যাকটরের কথা আলোচনা করতে গেলে ছোটবেলায় পড়া একটি কবিতার দুটি লাইন মনে আসে—

সেই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে,
যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।

এটা বলা হয়েছে বিদ্যার প্রসঙ্গে। বিদ্যা কখনও দান করলে ফুরিয়ে যায় না, বরং পারস্পরিক আদান-প্রদানে আরও সমৃদ্ধ হয়। ব্রিডার রিঅ্যাকটরেও কি ঠিক এই জিনিস হচ্ছে না? যত খরচ হচ্ছে ততই বাড়ছে। এখন সারা বিশ্বে শক্তির দুর্ভিক্ষের যে কালো ছায়া পড়েছে তাকে সরাতে এই প্রযুক্তি যেন বিধাতার আশীর্বাদের মত।

মহাকাশের হাতছানি

বিমান বসু

মানুষের মহাকাশ জয়ের ইচ্ছা বহুদিনের। কিন্তু আজ থেকে মাত্র পঁচিশ বছর আগে পর্যন্ত উপযুক্ত প্রযুক্তির অভাবে তা কেবল জুল ভার্ন ও এইচ জি ওয়েল্‌স্‌-এর মত কিছু লেখকের কাল্পনিক গল্প কাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আজ আর তা নয়। মহাকাশ প্রযুক্তির দৌলতে মানুষ আজ চাঁদে পাড়ি দিয়েছে, তার যান্ত্রিক প্রতিনিধিরা সৌরমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রহের কাছে পৌঁছে তথ্য সংগ্রহ করে পাঠাচ্ছে।

তবে মহাকাশ প্রযুক্তির বিষয় কিছু বলার আগে মহাকাশ বলতে আমরা কি বুঝি তা নিশ্চয়ই জানা দরকার। আমরা যারা ভূপৃষ্ঠের ওপরে বাস করি সাধারণত দুটি জিনিসকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিই। প্রথমটি আমাদের চারপাশের অক্সিজেন সমৃদ্ধ বায়ুমণ্ডলের আর দ্বিতীয়টি মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বল যার প্রভাবেই আমরা ভূপৃষ্ঠের ওপর টিকে আছি। আমাদের বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়া, যেমন হৃৎপিণ্ডের চলন, রক্তচাপ, শ্বাসক্রিয়া ইত্যাদি সবই এই দুটিকে ভিত্তি করে চলে। যদি এদের দু'টির যে কোনও একটির অভাব বা হেরফের হয় তাহলে আর শারীরিক ক্রিয়াগুলি স্বাভাবিক ভাবে চলতে পারে না।

ভূপৃষ্ঠের 150-200 কিলোমিটার ওপরে বাতাস নেই, আর সেখানে মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বল এত কম যে সেটা না থাকার মতই। এখান থেকেই শুরু হচ্ছে মহাশূন্য বা মহাকাশ। বুঝতেই পারছো, আমাদের পৃথিবীর পরিবেশের তুলনায় মহাশূন্যের পরিবেশ কত আলাদা। সেখানে সাধারণ মানুষের পক্ষে বাঁচা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু মানুষ আজ অসম্ভবকেও সম্ভব করেছে। মহাকাশ প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে আজ সে মহাকাশে দীর্ঘ দিন ধরে বসবাস করতে ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে সক্ষম হয়েছে। সম্প্রতি তিনজন সোভিয়েত মহাকাশ যাত্রী প্রায় ন'মাস এক নাগাড়ে মহাকাশে থাকার পর পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। ভারতের রাকেশ শর্মা গত 1984 সালে প্রায় দশ দিন সোভিয়েত মহাকাশকেন্দ্র 'স্যালিয়ুত' এ কাটিয়ে এসেছে।

মহাকাশ প্রযুক্তিকে আমরা কয়েকটি ধাপে ভাগ করতে পারি। যার প্রথম ধাপটি হলো রকেট প্রযুক্তি। তোমরা নিশ্চয়ই জান যে প্লেনে চেপে আকাশে উড়তে পারলেও, তাতে চেপে কখনোই মহাকাশে পৌঁছানো সম্ভব নয়। কারণ প্লেনে যে ইন্ধন ব্যবহার করা হয় তার জ্বলনের জন্য চাই অক্সিজেন যা মহাশূন্যে নেই। রকেটে ইন্ধন ও জারক দুইই একসঙ্গে থাকে বলে তাতে বাতাসের অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না এবং সেজন্য মহাকাশের শূন্যতার মধ্যেও রকেট অনায়াসে উড়ে যেতে পারে।

ছোটখাট রকেট নিয়ে তোমরা অনেকে হয়ত খেলা করেছ। কালীপুজোর সময় যে হাউইবাজী ওড়াও সেটাও এক ধরনের রকেট। অবশ্য সেগুলি খুবই ছোট আর কম শক্তিশালী হওয়ার দরুন 20-30 মিটারের বেশি ওপরে যেতে পারে না। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে বায়ুমণ্ডল পেরিয়ে মহাকাশে পৌঁছানোর জন্য চাই খুবই শক্তিশালী রকেট। ঐ রকেটের জ্বালানী কঠিন বা তরল দুইই হতে পারে। কিন্তু রকেটটি হওয়া চাই বহুস্তরবিশিষ্ট, কারণ রকেটের সূত্র অনুসারে কোনও একস্তরবিশিষ্ট রকেট—তা সে যত শক্তিশালীই হোক না কেন—কখনোই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে মহাকাশে পৌঁছনোর জন্য প্রয়োজনীয় গতিবেগ লাভ করতে পারে না। 1957 সালে প্রথম স্পুতনিক মহাকাশে ছাড়ার জন্য সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা যে রকেটটি ব্যবহার করেছিলেন সেটা যদিও বহুস্তরবিশিষ্ট ছিল না, তাতে মূল রকেটের সঙ্গে চারটি আলাদা ছোট রকেট জুড়ে দেওয়া হয়েছিল যেগুলি উৎক্ষেপণের কয়েক মিনিট পরেই খুলে পড়ে যায়। অর্থাৎ ব্যাপারটা প্রায় বহুস্তর বিশিষ্ট রকেটের মতই হয়ে দাঁড়ায়।

প্রথম স্পুতনিকের ওজন ছিল মাত্র 83 কিলোগ্রাম। এর পর আরও বেশি ওজনের উপগ্রহ, এমনকি মানুষবাহী মহাকাশযান বয়ে নিয়ে যাবার জন্য উপযুক্ত আরও শক্তিশালী রকেট তৈরি হতে থাকে। অবশেষে 1961 সালের 12 এপ্রিল তারিখে য়ুরি গ্যাগারিন একটি 'ভস্তক' মহাকাশযানে চড়ে প্রথম মহাকাশ যাত্রার গৌরব অর্জন করেন।

গত আড়াই দশকে মহাকাশ প্রযুক্তির বিকাশ শুধুমাত্র যে মানুষকে মহাকাশে পাঠানোর উদ্দেশ্য নিয়েই হয়েছে তা নয়। তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে মানবরহিত মহাকাশযান বিকাশের ক্ষেত্রে। আজ মানুষের পাঠানো মহাকাশযান সৌরমণ্ডলের প্রায় সবকটি গ্রহেই পৌঁচেছে এবং তাদের ওপর বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন চালিয়েছে। এর ফলে গ্রহদের সম্পর্কে বহু প্রাচীন ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং তাদের বিষয় অনেক নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। বহু নতুন উপগ্রহও আবিষ্কৃত হয়েছে। মহাকাশ প্রযুক্তি ছাড়া এ কখনো সম্ভব হতো না।

মহাকাশ প্রযুক্তির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি দূর-সঞ্চারের জন্য উপগ্রহের ব্যবহার। বিষুবরেখার ওপর ভূসমলয় কক্ষে স্থাপিত উপগ্রহের সাহায্যে আজ বিশ্বব্যাপী

দূরসঞ্চার প্রণালী স্থাপিত হয়েছে যার সাহায্যে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের ঘটনা টেলিভিশনের পর্দায় আমরা ঘরে বসেই দেখতে পাচ্ছি। দূরের বন্ধু ও আত্মীয়ের সঙ্গেও টেলিফোনে কথা বলতে পারছি।

উপগ্রহ থেকে ছবি তুলে আজ মাটির নিচে অজানা ভূসম্পদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে এবং দেশের অরণ্যসম্পদের পরিমাপ ও তাদের বার্ষিক ক্ষয়ের হার জানতে পারা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া, উপগ্রহের সাহায্যে আবহাওয়ার অধ্যয়ন ও বর্ষা ও সাইক্লোন ইত্যাদির সময়োচিত পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

এবারে দেখা যাক মহাকাশ প্রযুক্তি মানুষকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছে। আগেই বলেছি যে মহাকাশ বায়ুশূন্য এবং প্রায় মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবহীন। মানুষের শরীরের ওপর বায়ুশূন্যতার প্রভাব দু'ভাবে পড়ে। প্রথমত, অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসক্রিয়া সম্ভব হয় না ; দ্বিতীয়তঃ, চারপাশের বায়ুচাপ না থাকার দরুন শরীরের ভেতরের রক্তনালী ইত্যাদির চাপ প্রচণ্ড বেড়ে গিয়ে ফেটে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এ দুটি প্রভাবের হাত থেকে রক্ষার জন্যই মহাকাশ যাত্রিদের বিশেষ ধরনের "স্পেসস্যুট" পরতে হয়। ঐ স্পেসস্যুটের মধ্যেই কৃত্রিম উপায়ে বায়ুচাপ সৃষ্টি করা হয় এবং শ্বাসক্রিয়ার জন্য অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা থাকে। শরীরে স্বাভাবিক তাপমান বজায় রাখার জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও ঐ স্পেসস্যুটের মধ্যেই থাকে। তবে ঐ বিশাল কিন্তুতকিমাকার স্পেসস্যুট পরে কাজ করা খুবই অসুবিধাজনক বলে আধুনিক মহাকাশযানগুলির ভেতরেই পৃথিবীর মত অক্সিজেন সমৃদ্ধ পরিবেশ ও বায়ুচাপ সৃষ্টি করা হয়। এর ফলে মহাকাশযাত্রি সাধারণ হাল্কা পরিধান পরেই মহাকাশযানের ভেতরে অনায়াসে থাকতে ও কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে মহাকাশে গিয়ে সবকিছুই প্রায় ভারশূন্য হয়ে পড়ে। অনেকের ধারণা এটা হয় সেখানে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব নেই বলে তাই। কিন্তু আসলে তা নয়। ভূপৃষ্ঠের 200-300 কিলোমিটার ওপরে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব কম হলেও একেবারে লোপ পায় না। আসলে পৃথিবীর কক্ষপথে চলমান মহাকাশযান ক্রমাগত পতনশীল অবস্থায়

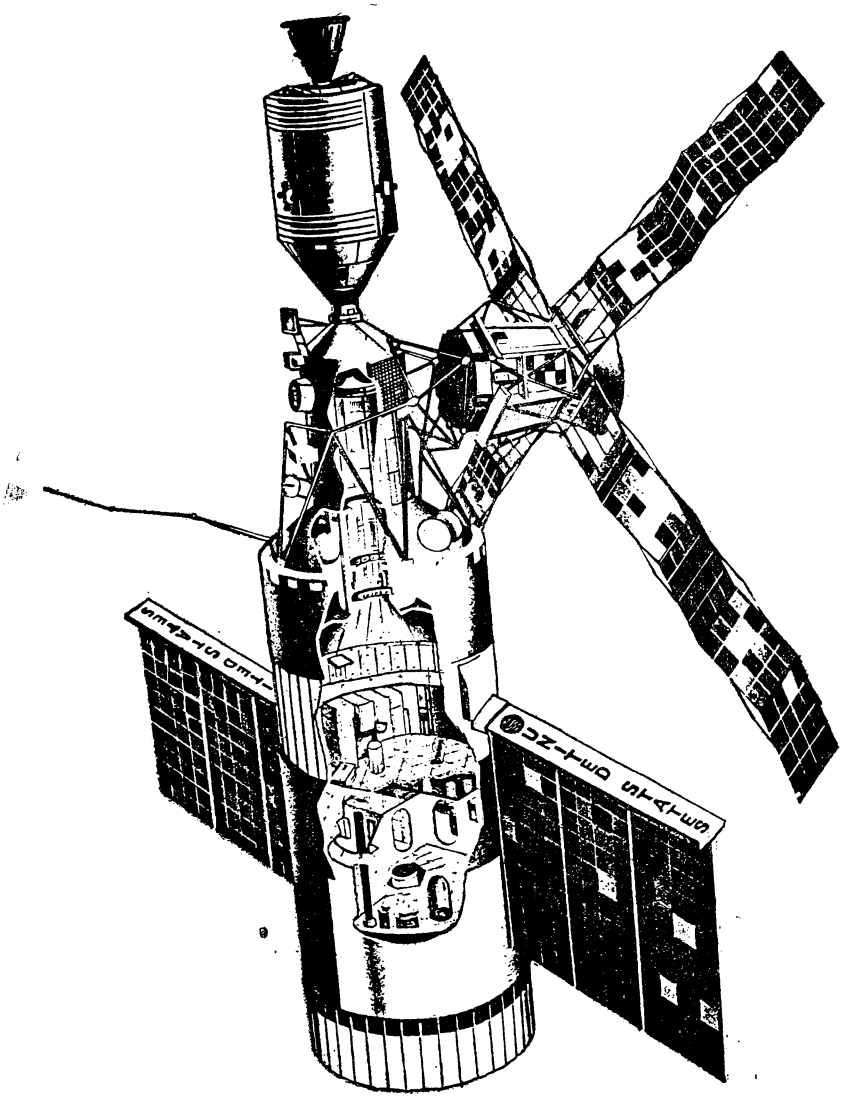

স্কাইল্যাব

থাকে বলেই তার নিজের এবং ভেতরের যাত্রী ও অন্যান্য বস্তুর কোনও ওজন থাকে না, সবই ভারশূন্য হয়ে যায়।

ঐ ভারশূন্য অবস্থায় মানুষের শরীরে নানা পরিবর্তন দেখা যায়। মাংশপেশী শিথিল হয়ে পড়ে, হৃৎপিণ্ডের চলনে হেরফের দেখা দেয়, মাথা ভারী মনে হয়, অনেক সময় মাথা ঘোরে, সাধারণ কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটে। তাছাড়া, যেহেতু সব কিছুই ভারশূন্য অবস্থায় থাকে, সামান্য কোনও কাজ, যেমন স্ক্রু লাগানো বা হাতুড়ি ঠোকা, এমন কি খাওয়া পর্যন্ত বেশ কষ্টকর মনে হয়। চামচে করে খাবার উপায় নেই, কারণ সবই ভেসে বেড়াবে। এক ফোঁটা জলও যদি ছড়িয়ে যায় তো বিপদ, কারণ—তাও ভেসে নাকে চোখে ঢুকে যেতে পারে। সুতরাং ভারশূন্য পরিবেশের জন্য চাই বিশেষ যন্ত্রপাতি, খাবার জন্য বিশেষ ভাবে তৈরি খাদ্য পদার্থ। এ সব সমস্যার প্রতিকারের জন্য মহাকাশ প্রযুক্তি-বিদেরা নানা উপায় বের করেছেন।

মহাকাশের ভারশূন্য অবস্থায় থাকাকালীন শরীরের মাংসপেশীকে সুস্থসবল রাখার জন্য আজকাল ব্যায়ামের জন্য সাইকেলের মত বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। কলকব্জা মেরামতের জন্য বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতিও তৈরি করা হয়েছে যা ভারশূন্য অবস্থায় অনায়াসে ব্যবহার করা যেতে পারে। মহাকাশে খাবার জন্য খাদ্যদ্রব্য পেস্টের মত তৈরি করে টুটুথপেস্টের টিউবের মত প্লাস্টিকের টিউবে পুরে দেওয়া হয় যাতে মুখ লাগিয়ে মহাকাশযাত্রি সহজেই খেতে পারে। জলের জন্যেও বিশেষ প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার করা হয়।

মানুষের শরীরের ওপর ভারশূন্যতার দুষ্প্রভাব থাকলেও কয়েকটি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সুফল পাওয়া গেছে। যেমন ধরো কিছু মিশ্র ধাতু ও কেলাস তৈরির ব্যাপারে। পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে হাল্কা ও ভারী ধাতুর গলন্ত মিশ্রণ সহজেই বিভিন্ন স্তরে ভাগ হয়ে যায়। ভারী অংশ তলায় চলে যায় আর হাল্কা অংশটি ওপরে ভেসে ওঠে। এর ফলে মিশ্র ধাতুর গঠনে তারতম্য দেখা দেয়। মহাকাশের ভারশূন্য অবস্থায় তা হয় না, কারণ সেখানে হাল্কা বা ভারী বলে কিছুই নেই ফলে অভিনব গুণসম্পন্ন মিশ্র ধাতু তৈরি করা সম্ভব হয়েছে যা পৃথিবীতে সম্ভব নয়। কেলাসের বেলায়ও তাই। মহাকাশে ভারশূন্য পরিবেশে নিখুঁত আকারের কেলাস তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

আর একটি বড় লাভ পাওয়া গেছে কিছু বিশেষ ওষুধ তৈরির ব্যাপারে। ইলেকট্রোফোরেসিস্ প্রথায় শোধন চালিয়ে দেখা গেছে যে ভূ-পৃষ্ঠের তুলনায় মহাকাশের ভারশূন্য অবস্থায় ঐ শোধনক্রিয়া অনেক তাড়াতাড়ি হয় এবং ওষুধের শুদ্ধতাও অনেক বেশি হয়।

যদিও মহাকাশে পৌঁছনোর পর সব কিছুই ভারশূন্য হয়ে পড়ে, মাটি থেকে উৎক্ষেপণের সময় আর মহাকাশ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় কিন্তু হয় ঠিক এর বিপরীত। উৎক্ষেপণের সময় রকেটের প্রচণ্ড বেগের ফলে এবং প্রত্যাবর্তনের সময় বায়ুমণ্ডলের ধাক্কার ফলে মনে হয় শরীরের ওজন যেন বহুগুণ বেড়ে গেছে। ঐ অবস্থাতেও শরীরের বিভিন্ন অংগ প্রত্যংগের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে এবং অভ্যস্ত না থাকলে বিপদের সম্ভাবনাও থাকে। সেজন্যই মহাকাশ যাত্রিদের ট্রেনিং এর সময় বিশেষ ধরনের সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রে তাদের ঘোরানো হয় যাতে রকেট উৎক্ষেপণ বা প্রত্যাবর্তনের সময় যে উচ্চ অভিকর্ষ বল সৃষ্টি হয় সেই পরিবেশের সঙ্গে তারা নিজেদের অভ্যস্ত করে নিতে পারে।

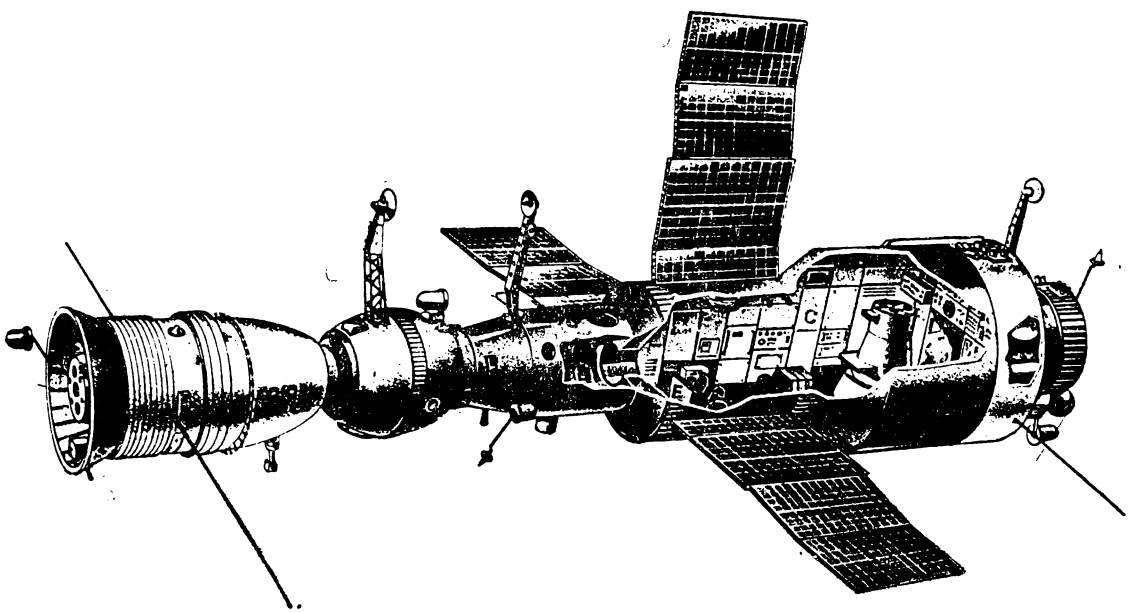

স্যালিয়ুত

1960 'এর দশকে মহাকাশ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ঘটনাটি ছিল মানুষের চাঁদে পদার্পণ। তিনজন যাত্রি-বাহী "অ্যাপোলো 11" যানটিকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল 16 জুলাই একটি চারস্তর বিশিষ্ট প্রচণ্ড শক্তিশালী "স্ট্যাটার্ন-V" রকেটের সাহায্যে। তারপর 21 জুলাই নীল আর্মস্ট্রং ও এডউইন অ্যালড্রিন চাঁদের মাটিতে নামেন। অ্যাপোলো-11'র পর আরও পাঁচটি অ্যাপোলোযান চাঁদে পৌঁছেছে এবং 10 জন মহাকাশচারী চাঁদের মাটিতে নেমে সেখান থেকে আবার নিরাপদে ফিরে এসেছে।

পৃথিবীর কক্ষপথে প্রথম মহাকাশ কেন্দ্র স্থাপন করা হয় 1971 সালের 19 এপ্রিল। "স্যালিয়ুত-1" নামক ঐ প্রথম সোভিয়েত মহাকাশ কেন্দ্রটিতে তিনজন মহাকাশযাত্রির থাকার ও কাজকর্ম চালাবার জন্য সব রকম সুবিধে ছিল। মহাকাশকেন্দ্রটিতে পৃথিবী থেকে যাত্রি নিয়ে যাবার ও সেখান থেকে তাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষ ধরনের মহাকাশযানের ব্যবস্থাও ছিল। তাছাড়া মানবরহিত যানের সাহায্যে রসদ সরবরাহেরও ব্যবস্থা করা হয়।

1971 সাল থেকে একের পর এক মোট-6টি স্যালিয়ুত মহাকাশ কেন্দ্র আজ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করেছে এবং তা থেকে গত ষোল বছর ধরে ভারশূন্য অবস্থায় নানা রকম পরীক্ষা ও পৃথিবীর ওপর পর্য-বেক্ষণ চালানো হয়েছে। সম্প্রতি "মির" নামক আরও বড় একটি মহাকাশকেন্দ্র রাশিয়া পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করেছে। আমেরিকা আজ পর্যন্ত কেবলমাত্র একটাই মহাকাশকেন্দ্র কক্ষপথে পাঠিয়েছে। "স্কাইল্যাব" নামক মহাকাশ কেন্দ্রটিকে ভূপৃষ্ঠের 430 কিলোমিটার ওপরে কক্ষ-পথে স্থাপন করা হয় 1973 সালের 14মে। এর পর 1974 সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ন'মাসের মধ্যে তিন দল বিজ্ঞানী স্কাইল্যাবে গিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে আসেন। তারপর 1979 সালের 12 জুলাই মহাকাশকেন্দ্রটি কক্ষচ্যুত হয়ে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে সমুদ্রে ভেঙে পড়ে।

1981 সালে মহাকাশ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে। সে বছর 12 এপ্রিল তারিখে আমেরিকার প্রথম স্পেস শাট্‌ল্ "কলম্বিয়া" আকাশে ওড়ে। সাধারণত, মহাকাশে উপগ্রহ স্থাপন বা মহাকাশকেন্দ্রে মানুষ পাঠানোর জন্য রকেট ব্যবহার করা হয়। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি রকেট কেবলমাত্র একবারই ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে খরচ পড়ে খুব বেশি। স্পেস শাট্‌লের বেলায় তা নয়। যদিও একে রকেটের মতই মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়, কাজ হয়ে গেলে একে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা যায়। শুধু তাই নয়, উৎক্ষেপণের সময় যে দুটি কঠিন জ্বালানীর রকেট এতে ব্যবহার করা হয় সেদুটিকেও পুনরায় ব্যবহার করা হয়। মহাকাশে কাজ শেষ হলে বিশাল এক জেটবিমানের মতই স্পেস শাটল যাত্রিদের নিয়ে ফিরে আসে পৃথিবীর বুকে।

একই শাট্‌ল্‌যানকে বার বার মহাকাশে পাঠানো যেতে পারে বলে শাট্‌ল্ দ্বারা উপগ্রহ উৎক্ষেপণের খরচও পড়ে অনেক কম। ভারতের "ইনস্যাট-1 বি" উপগ্রহটিকেও এজন্য 1983 সালে "চ্যালেঞ্জার" নামক স্পেস শাট্‌ল্ থেকে মহাকাশে ছাড়া হয়েছিল। স্পেস শাট্‌লের সাহায্যে অকেজো হয়ে যাওয়া উপগ্রহকেও কক্ষপথ থেকে ফিরিয়ে এনে মেরামত করা সম্ভব হয়েছে।

ভবিষ্যতে স্পেস শাট্‌লের সাহায্যেই বিশাল বিশাল মহাকাশ কেন্দ্র তৈরির জন্য মাল ও যন্ত্রপাতি মহাকাশে বয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর ঐ সব মহাকাশকেন্দ্র থেকেই হয়ত অদূর ভবিষ্যতে মানুষ মঙ্গলগ্রহের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাবে। মহাকাশকেন্দ্রের ভারশূন্য পরিবেশ থেকে ঐ যাত্রা অনেক সহজ হবে কারণ সেখানে মহাকর্ষ বল কাটিয়ে যাবার জন্য কোনও শক্তিশালী রকেটের প্রয়োজন হবে না।

ছড়া

লিমেরিক

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

গা ছমছম আঁধার রাতে আটকে গেল দিঠি !
—'কি গো মশাই, পেন্নাম হই, নেবেন
নাকি চিঠি !'
চেহারা তার নয় সাধারণ
তবু চেনা ধরন ধারণ
হেসে বল্লে—ঠিক ধরেছেন, এজ্ঞে অধম E. T.।

লিমেরিক

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

'কোষ'কে ছোট করার সফল সূত্র খুঁজে পাওয়ায় !
ঘোষবাবু কাল সিরাপ্ তৈরি করলো ব'সেই
দাওয়ায় !!
তারপরে তার হলো কি-যে !
সাড়ে-তিন-ডোজ খেয়েই নিজেই.....
ছোট্ট হ'তে হ'তে হ'তেই মিলিয়ে গেলেন হাওয়ায় !!!

সমুদ্র গবেষণায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

সুবীর দত্ত

1985 সালের পয়লা সেপ্টেম্বর। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের 350 মাইল দক্ষিণপূর্বে উত্তর অতলান্ত মহাসাগরের দু'মাইল গভীরে যেন এক অচেনা নির্জন বন্দরে নোঙর ফেলে রয়েছে "আর. এম. এস. টাইটানিক" এর 'ভুতুড়ে' শবদেহ। সাত দশকের মরচে এবং পলি কদর্য করেছে সেকালের সবচেয়ে বড় এবং ঐশ্বর্যময় যাত্রীবাহী জাহাজটিকে। শবদেহের অন্যতম আবিষ্কর্তা আমেরিকার উডস্‌হোল ওসিয়েনোগ্রাফিক ইন্সটিটুট্‌ এর বিজ্ঞানী রবার্ট বালার্ডের মতে এই নির্মম দৃশ্য না দেখাই বরং ভাল ছিল। প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে 15.4.12 তারিখে "টাইটানিক" সমুদ্রের নিচের একটি বরফের পাহাড়ে ধাক্কা খায়। মোট 2227 জন যাত্রীর মধ্যে 1500 জনেরও বেশি যাত্রীর মৃত্যু ঘটে। সমুদ্রের অতল গভীরে তলিয়ে যায় ঐতিহাসিক জাহাজটি। সমুদ্র বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশমান প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে জাহাজটি এবং তার ধ্বংসাবশেষকে খুঁজে বার করতে লেগে গেল সুদীর্ঘ 73 বছর। অবশেষে 1.9.85 তারিখে মার্কিন-ফরাসী যুগ্ম অভিযানে একটি "পাতালের মিউজিয়াম" হিসেবে খোঁজ পাওয়া গেল টাইটানিককে। "আটলাণ্টিস্‌-II" গবেষণা জাহাজ থেকে ANGUS জলযানকে নামিয়ে তোলা হল মোট 53,500 টি ছবি। তারপর যখন বালার্ড সাহেবের পরিচালনায় সাবমারসিব্‌ল্‌ "আলভিন" (ALVIN) রোবট "জেসন জুনিয়ার" (JASON Jr.) কে নিয়ে নেমে পড়ল অতলান্তের গভীরে তখন টাইটানিকের বিভিন্ন ধরনের সম্পদরাশি একে একে এসে হাজির হল চোখের সামনে। সে অঞ্চলের জলের চাপ প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে 6000 পাউণ্ড। বালার্ড সাহেব তাঁর জলযান "আলভিন"-কে নিয়ে মোট 33 ঘণ্টায় 12 বার ডুব দিয়ে প্রতিবার টাইটানিক থেকে সংগ্রহ করেছেন নূতন নূতন তথ্য।

সমুদ্রযাত্রার মতই সমুদ্রবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা প্রাচীন। কিন্তু সমুদ্রগবেষণার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নিয়ে চিন্তাভাবনার সূত্রপাত রেনেশাঁ যুগে। সমুদ্রের গভীরতা মাপার যন্ত্র "ইকো সাউণ্ডার" তার মধ্যে অন্যতম। এরপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সমুদ্র গবেষণার বিভিন্ন যন্ত্রপাতির প্রভূত উন্নতি সাধন হয়েছে। নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আমরা দেখতে পাই মাইক্রোইলেক্ট্রনিক্স এবং কম্পিউটারের প্রয়োগ অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণের মান উন্নততর হয়েছে। সমুদ্রে দিকনির্ণয় এবং অবস্থিতি নির্ধারণে পুরনো দিনের কম্পাস ও দূরবীনের স্থান নিয়েছে এখন রাডার, ইলেকট্রনিক যন্ত্র এবং উন্নতমানের চার্ট। এর মধ্যে অন্যতম

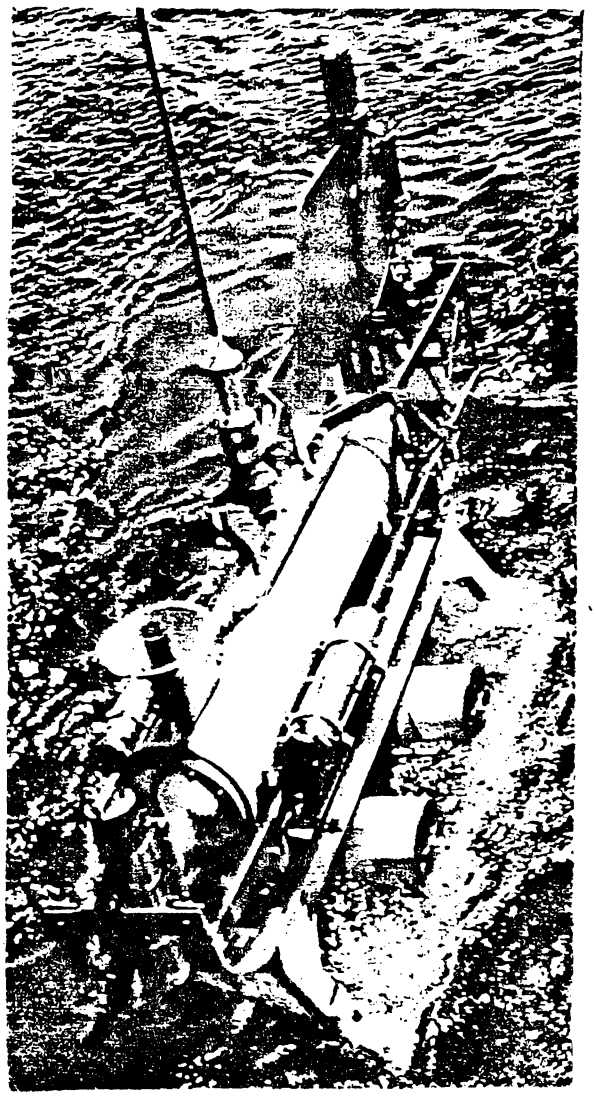

সমুদ্রতলের ম্যাপ তৈরির জন্য ফ্রান্স ইনসটিটিউশনের জলযান

হল "ডেকা নেভিগেটর", "ডেকা ট্রাইস্পণ্ডার সিস্টেম" এবং "মটোরলা মিনি রেঞ্জার III" এরপর এসেছে "স্যাটেলাইট নেভিগেশন" এবং "ইণ্টিগ্রেটেড নেভিগেশন সিস্টেম"। বর্তমানে কোন আধুনিক জাহাজই এই সিস্টেম ছাড়া ভাবা

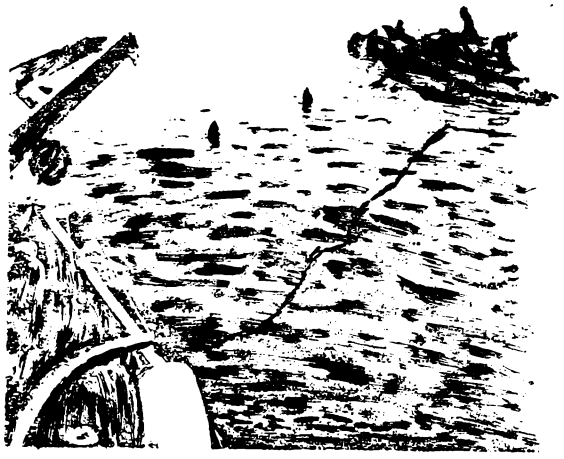

জাহাজ থেকে গ্লোরিয়া নামানো হচ্ছে

যায় না। জাহাজ চালাতে সাহায্য করছে "অটো পাইলট"। এছাড়াও অবস্থিতি নির্ণয়ের জন্য অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় "সীবেড এ্যাকাউস্টিক, পজিশন—ফিক্সিং"।

গভীরতা নির্ণয়ে 1940 সালে স্যার জেমস্ রস প্রথম শব্দের (sounding) ব্যবহার করেন। বর্তমানে সব ক্ষেত্রেই "ইকোসাউণ্ডিং" এর মাধ্যমে গভীরতা নির্ণয় করা হয়। বিভিন্ন ধরনের 'সোনার' যন্ত্রের মধ্যে পড়ে "সাইড স্ক্যান", "সাববটম্ প্রোফাইলার", "ডীপ টো সিস্টেম" ইত্যাদি। কম্প্যুটার প্রযুক্তির প্রয়োগে সমুদ্রতলের গভীরতার নক্সা তৈরির ক্ষেত্রে আধুনিকতম সংযোজন হল "সীবিম সিস্টেম" বা "মাল্টিপিল্ বীম ইকোসাউণ্ডার"। মহীসোপানের গভীরে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে চলেছে উচ্চক্ষমতা সম্পন্না "গ্লোরিয়া" (GLORIA); 30 কি. মি. চওড়া অঞ্চল ধরা পড়ে এই যন্ত্রে। অন্যদিকে "সীমার্ক-I" 5 কি. মি. চওড়া সমুদ্রতলের তথ্য যোগায়।

শুরুতে, ভূকম্পীয় (Saismic) সমীক্ষায় শব্দের সূত্র হিসেবে বিস্ফোরক ব্যবহার করা হত। বর্তমানে জাহাজ থেকে ঝোলানো ইলেকট্রনিক ট্রান্সডিউসার (পিঙ্গার, স্পারকার, বুমার, এয়ারগান ইত্যাদি) এর মাধ্যমে শব্দতরঙ্গ বিকিরণ করা হয় এবং হাইড্রোফোন-এ শব্দের প্রতিধ্বনি ধরা পড়ে।

প্রথম দিকে সমুদ্রে "মাধ্যাকর্ষণ" মাপা হত সাবমেরিন থেকে। বর্তমানে সমস্ত মহাকর্ষ (gravity) সমীক্ষাই জাহাজ থেকে করা হয়।

"মেরিন প্রোটিন প্রিসিসন ম্যাগনেটোমিটার এর বিকাশের ফলে চুম্বকত্ব নির্ণয় খুবই সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এ সমস্ত কার্যকলাপ শুরু হয়েছে 1961 সালে।

একটি গবেষণা জাহাজ থেকে একই সঙ্গে ভূকম্পীয়, চৌম্বকত্ব, মহাকর্ষ এবং গভীরতার সমীক্ষা চালানো সম্ভব। একই সঙ্গে গভীর সমুদ্রতলে তাপ প্রবাহ (Heat Flow)'র পরিমাপের জন্য দুটি অথবা বেশি "প্রোব" ঝুলিয়ে দেওয়া হয় জাহাজ থেকে। সাধারণতঃ "প্রোব"কে কোরারের সঙ্গে নামানো হয়।

সমুদ্রের ঢেউ নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে অ্যারিস্টটল এর যুগ থেকেই। কিন্তু 1972 সালে কেলভিন্ ঢেউ সংক্রান্ত যন্ত্র আবিষ্কার করার পরই এ বিষয়ে গবেষণার বিকাশ ঘটেছে এবং বস্তুত ঢেউ সম্পর্কে আগাম জানান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। ওদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই হ্যানসেন সাহেব লাপ্লাসের ঢেউসংক্রান্ত সূত্রগুলি সমাধানের ক্ষেত্রে কম্প্যুটারের প্রয়োগ শুরু করেন। টেসার সমীক্ষার ফলে গত শতকের শেষের দিকেই পৃথিবীর সমুদ্রগুলির সাধারণ স্রোতপ্রবাহ মোটমুটি সঠিকভাবেই নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি শুরু হয় গভীর সমুদ্রের তাপমান সংগ্রহ। সমুদ্রের তাপমান এবং

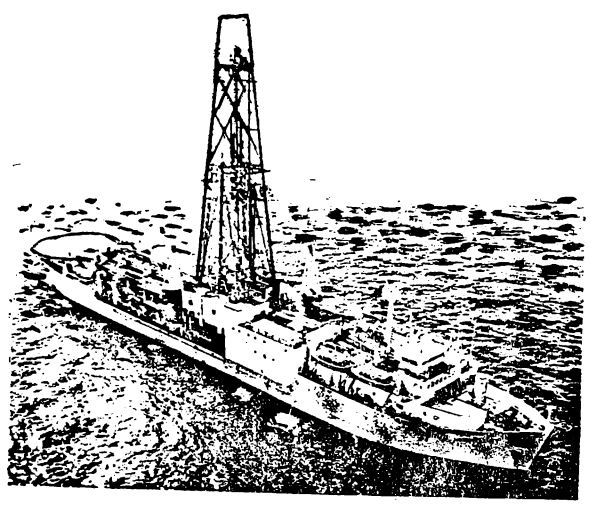

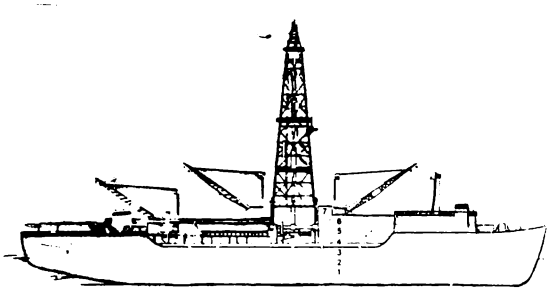

গভীর সমুদ্রে ড্রিলিং করছে এমন আধুনিক জাহাজ জয়েডস্ রেসোলুমন

লবনতা জানার জন্য ব্যবহৃত হয় 'ডেপথ্ প্রোব'। এককালে সমুদ্রবিজ্ঞানীরা জাহাজের "সরে যাওয়া" বা 'Drift'এর রিপোর্ট থেকেই সমুদ্রের উপরিস্তরের স্রোতসঞ্চালন সম্পর্কে ধারণা করে নিতেন। গত দুশতক ধরে এই স্রোত সরাসরি মাপা হচ্ছে। "ডীপ সী মুরিং" প্রযুক্তির পথ বেয়ে এসেছে কাবেল্ট মিটার।

আমেরিকার "স্ক্রিপ্রন্ ইন্সটিটিউট্ অব অসিয়েনোগ্রাফী" প্রাকৃতিক সমুদ্রবিদ্যার গবেষণা চালানোর জন্য এক অসাধারণ ভাসমান যন্ত্রের প্লাটফর্ম তৈরি করেছেন, যার নাম ফ্লিপ্ (FLIP)। সমুদ্রের উপরিস্তরের তাপমানের নকসা তৈরির ক্ষেত্রে আধুনিকতম সংযোজন হল স্যাটেলাইটের ব্যবহার। স্যাটেলাইট থেকে বিভিন্ন ধরনের সেন্সরের মাধ্যমে সমুদ্রের ঢেউ তাপমান ইত্যাদির যথাযথ নকসা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে।

সমুদ্রতল থেকে নমুনা সংগ্রহ শুরু হয় গত শতকে "ড্রেজ" দিয়ে। প্রথমদিকে সামুদ্রিক জীবের নমুনা সংগ্রহই ছিল প্রধান কাজ। এরপর ধীরে ধীরে প্রয়োজন হল সমুদ্রতলের পলি, নুড়ি এবং অন্যান্য নমুনা সংগ্রহের। বিভিন্ন ধরনের ড্রেজ (বক্স, পাইপ, চেন)'এর পর এল গ্রাব (ভ্যান-ভীন- স্মিথ-ম্যাকিন্টান, শিপেক্ এবং ফ্রি ফল্ বুমেরাং), কোরার (গ্রাভিটি, পিস্টন, বক্স, ভাইব্রো, স্পেড, ফ্রি ফল ইত্যাদি) এবং সবশেষে ছেদন (Drilling)। সমুদ্রতলের বিভিন্ন গভীরতায় জলের নমুনা সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হয় তারের সাহায্যে জলে নামানো নানা ধরনের বোতল, যা শক্ত প্লাস্টিক বা স্টেনলেস্ এলয়'এ তৈরি। এই শতাব্দীর শুরুতে মাইকেল সার্স্ এর অভিযানে পাঁচ রকমের বোতল ব্যবহৃত হয়েছে। 1910 সালে ন্যানসেন সাহেব বিখ্যাত "ন্যানসেন বটল" তৈরি করেন, যার সঙ্গে একজোড়া থার্মোমিটারও থাকে।

1950 এর শুরুতেই মৎস্যবিজ্ঞান গবেষণায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন ধরনের জাল এবং নমুনা সংগ্রহকারী যন্ত্র, প্লাঙ্কটন রেকর্ডার ইত্যাদির প্রভূত উন্নতিসাধন হয়। বর্তমানে, এই ব্যাপারে প্রযুক্তি যত দ্রুত এগিয়েছে, সমস্ত তথ্যকে বিশ্লেষণ করে ব্যাখ্যা দেবার ক্ষমতা তত দ্রুত এগোয়নি।

উপরোক্ত সমস্ত যন্ত্রাদিই নানা দিক থেকে গবেষণা জাহাজের সঙ্গে যুক্ত এবং সে জাহাজের অংশবিশেষ। 1986 সালের এক হিসেবে জানা যায় পৃথিবীর মোট 80 টি দেশে রয়েছে সমুদ্র নিয়ে গবেষণারত 700টি জাহাজ।

বড় নির্মাণকার্য বা ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধারকার্য ছাড়া নল লাগিয়ে জলে ঝাঁপ দেবার দিন আর নেই। স্বল্প

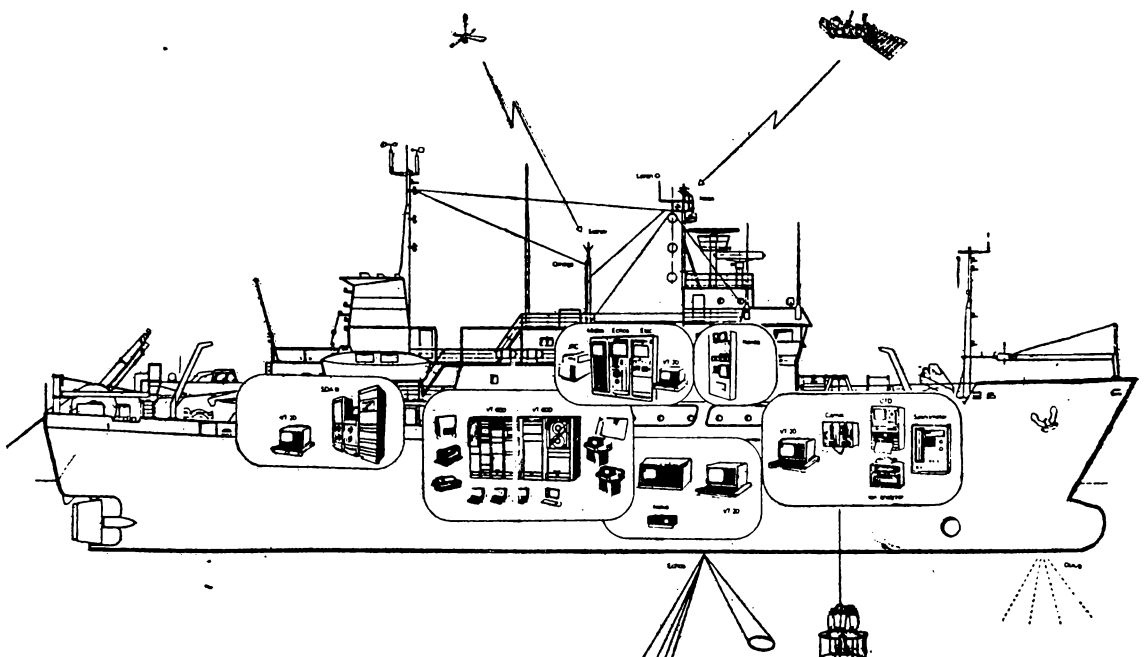

আধুনিক গবেষণা জাহাজে নেভিগেশন এবং বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের জন্য কম্পিউটার সিস্টেম

গভীর অঞ্চলে স্কুবা (Scuba) পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ অনেক বিজ্ঞানসম্মত হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা এখন কম্পাস, হাতুড়ি ইত্যাদি নিয়ে খুব সহজে এবং কম সময়ে সমুদ্রতলের এক বড় অঞ্চল সমীক্ষা করতে পারছেন। ফরাসী সমুদ্রবিদ হ্যাকুয়ে কুস্তো "একুয়ালাভ" আবিষ্কার করার আগে সমুদ্রের ডুবুরীরা এক জবরজং এবং ভারী পোষাক পরতেন।

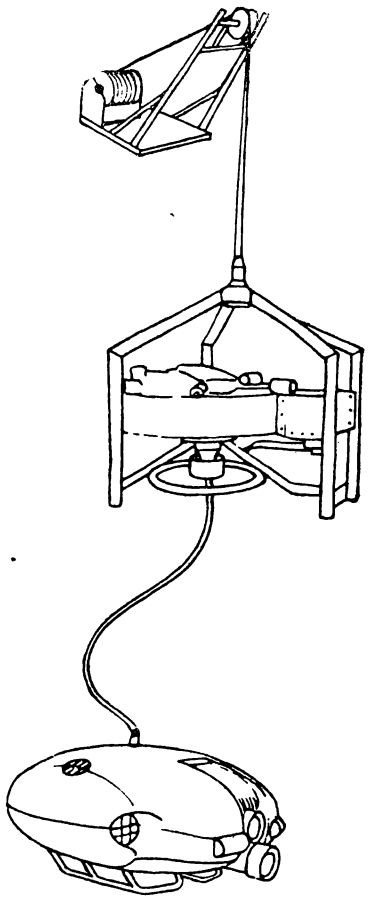

দূর থেকে চালানো জলযান নামানো হচ্ছে

JIM নামের আধুনিক ডুবুরী পোষাক (ADS) পরে জলের গভীরে নামলে তা একটানা 72 ঘণ্টা বাতাস যোগায় এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছেঁকে দেয়। তারপর এসেছে SAM এবং JAM ; JAM পরে বেশ ক'দিন 700 কি. গভীরে কাজ করা সম্ভব।

গভীর সমুদ্রের নিচে চলাফেরা করার গাড়ি "সাবমারসিব্‌ল্‌" অনেকটা ছোট সাবমেরিনের মত। সর্বপ্রথম 1948 এ "ব্যাথিস্কোপ FNRS-I" তৈরি হয়। দ্বিতীয়টি "ট্রিয়েস্টা" 1960 সালে পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর ঘাত মারিয়ানা ট্রেন'এর "চ্যালেঞ্জার ডীপ" (11,515মি.) পর্যন্ত যায়। 1964 সালে আমেরিকা "সীল্যাব—1"সংগঠিত করে। পরের বছর আরও বড় আকারে সীল্যাব—5 সংগঠিত হয়।

1977 সালের তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীর যাত্রীসহ (Manned) সাবমারসিব্‌ল্‌'এর সংখ্যা 694।

1985 সালের হিসেবে যাত্রীহীন (Remotely operated) সাবমারসিব্‌ল্‌'এর সংখ্যা 81।

গভীর এবং ব্যাপক গবেষণার ফসল এইসব সাবমারসিব্‌ল্‌, যা বিজ্ঞানীদের সমুদ্রের অজানা অঞ্চলে পৌঁছে দিচ্ছে। "যাত্রীহীন"গুলিতে ভিডিও ক্যামেরা ছাড়াও বিভিন্ন যান্ত্রিক কাজকর্ম করার জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি রয়েছে। গোলাকার আলভিনের ভেতরের কামরার ব্যাস 2 মিটার। ব্রিটিশ WASP সাবমারসিব্‌ল্‌'এ একজন যাত্রীর সংস্থান রয়েছে। এর হাত দুটিতে হরেকরকম যন্ত্র লাগিয়ে সমুদ্র তলে তেলের রিগ্‌ বা অন্য নির্মাণকার্যের মেরামত করা হয়।

27. 6. 78 তারিখের 01-12 GMT-তে মহাকাশ থেকে সমুদ্র বিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত। সে সময় আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার ভ্যানডেনবার্গ এয়ারফোর্স বেস্‌ থেকে "সীস্যাট্‌-A" আকাশে ছাড়া হয়। 99 দিনের অমূল্য তথ্য (অক্ষাংশ 72°N থেকে 72°S এর মধ্যে) সংগ্রহ করার পর মহাকাশযানটির 10.10.78 তারিখে অপমৃত্যু ঘটে। অবশ্য 2 কোটি মাইল ব্যাপী সমুদ্রকে অতিদ্রুত (জাহাজ থেকে হাজার গুণ), ছবির মাধ্যমে, বিজ্ঞানীদের সামনে হাজির করার পর। যেমন, "জেমিনি" মহাকাশযান থেকে তোলা রেড্‌ সী এবং গাল্ফ অব্‌ এডেনের ছবিতে নূতন সমুদ্রের সৃষ্টি ধরা পড়েছে।

সমুদ্র বিজ্ঞানীরা ধীরে ধীরে বুঝতে পারছেন যে গভীর সমুদ্রে অজানাকে আবিষ্কার করতে হলে অতি আধুনিক উন্নতমানের যন্ত্রপাতি অপরিহার্য। সাবমারসিব্‌ল্‌, গভীর সমুদ্রে সমীক্ষারত বিভিন্ন 'সোনার' ছেদনযন্ত্র সংবলিত আধুনিক গবেষণা জাহাজ এবং সর্বোপরি "সীস্যাট" প্রতিমুহূর্তে নূতন নূতন তথ্য এবং প্রশ্ন এনে হাজির করছে। এ সমস্ত তথ্যকে বিশ্লেষণ করা এবং প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে বার করার জন্য আধুনিকতম প্রয়াস হল একদিকে গবেষণাগারে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং অন্যদিকে তথ্যকেন্দ্রে "মাইক্রোইলেকট্রনিক্স্‌" এবং কম্পুটারের প্রয়োগ।

"টাইটানিক" তার গভীরতম নিদ্রায় শুয়ে থাক। "আলভিন", "জেসন" এবং তাদের প্রজাতিরা দ্রুত বিকাশলাভ করে গভীর সমুদ্রের রহস্যকে উন্মোচিত করুক।

রোগ নির্ণয়ে প্রযুক্তি

আশিস দাশ

অপার সৌন্দর্যে আপ্লুত ল্যুভ মিউজিয়ামের বাগানে একা একা হেঁটে যাচ্ছিলেন লেনেক। আজ থেকে প্রায় 175 বছর আগে। লেনেক দেখলেন বাগান জুড়ে প্রজাপতির মতো কচিকাঁচার দল ছুটে খেলে বেড়াচ্ছে। এদের মধ্যে কেউ বা বাগানে রাখা এক খণ্ড কাঠের টুকরোর একপাশে তাল ঠুকছে, অন্য পাশে বন্ধু কাঠে কান লাগিয়ে তা শুনছে। এইসব দেখতে দেখতে আপন মনে চলে গেলেন লেনেক। পরদিন সকালে হাসপাতালে গিয়ে ডাঃ লেনেক দেখলেন, তার জন্য অপেক্ষা করছেন এক ভীষণ রোগিণী, এঁকে দেখে তো ডাঃ লেনেকের মাথায় হাত। তিনি চিন্তায় পড়লেন, কি করে ওই মোটা ভদ্র মহিলার বুকে পিঠে কান দিয়ে হৃদ্‌যন্ত্রে আওয়াজ শুনবেন? হঠাৎ তার মনে এল গত দিনের বিকেলে ল্যুভ মিউজিয়ামের বাগানে দেখা বাচ্চাদের খেলার কথা, 'দি আইডিয়া'। হাতের কাছে সুবিধা মতো কাঠ নেই, তাতে কুছ পরোয়া নেই। হাসপাতালে রোগী ভর্তি করার মোটা মোটা কাগজের ফর্ম আছে। কয়েকটি ফর্ম এক সঙ্গে গোল করে পাকিয়ে রোগীর বুকে চেপে ধরলেন ডাঃ লেনেক। আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল লেনেকের মুখ। হ্যাঁ, হার্ট বা হৃদযন্ত্রের ধুক ধুক আওয়াজ খুব সুন্দর শোনা যাচ্ছে। বুকে কান দিয়ে যা শোনা যায়, তার থেকে অনেক অনেক ভাল। এভাবে বহু পরীক্ষা করে শেষে যখন নিশ্চিন্ত হলেন ফাঁপা নল বুকে চেপে ধরলে শ্বাসপ্রশ্বাস ও হার্টের আওয়াজ খুব ভাল শোনা যায়, তখন তিনি ছুতোর মিস্ত্রির সাহায্যে নয় ইঞ্চি লম্বা, দেড় ইঞ্চি ব্যাসের তিন খণ্ড প্যাঁচ দেওয়া কাঠের নল তৈরি করালেন। রোগী দেখবার সময় এই তিন খণ্ড জুড়ে একখণ্ড নলে পরিণত করে এক অংশ লাগানো হতো রোগীর বুকে অপর অংশ ডাক্তারের কানে।

এই ভাবেই জন্ম হল রোগ নির্ণয়ের আধুনিক প্রযুক্তি স্টেথোসস্কোপ। এই যন্ত্র আবিষ্কারের আগে রোগ নির্ণয়ের জন্য ডাক্তারদের কোন হাতিয়ার ছিল না। তখন চিকিৎসকেরা রোগ নির্ণয় করতেন তাঁদের প্রখর বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি ব্যবহার করে। রোগীর কাছে বিবরণ জেনে নিজের হাতে রোগীর শরীরে বিভিন্ন অংশ অনুভব করে। চিকিৎসক-বিজ্ঞানী ডাঃ লেনেকের স্টেথোস্কোপ আবিষ্কারের পর থেকে বহু বিজ্ঞানী বছরের পর বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে উদ্ভাবন করে চলেছেন, রোগ নির্ণয়ের বহু যন্ত্র। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেহের ভেতরের সামান্য ত্রুটিও ধরা পড়ছে যন্ত্রের ইলেকট্রনিক চোখে। প্রায় প্রতি বছরেই সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন যন্ত্র।

1895 সালে বিজ্ঞানী রনজেনের এক্স-রে আবিষ্কার এবং 1896 সালে হেনরী বেকরেলের তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার কেবল পদার্থ, রসায়ন বিদ্যায় যে বিপ্লব ঘটিয়েছিল তা নয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তা ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। শুরু হলো রোগ নির্ণয়ে ও চিকিৎসায় রেডিও-আইসোটোপের বিরাট ভূমিকা। ব্রেন, লিভার, লাঙ, হার্ট, কিডনীর কোন গোলযোগে ও রোগ নির্ণয়ে রেডিও আইসোটোপের ব্যবহার বেশ কয়েক দশক ধরেই চলে আসছে।

দু দশক আগেও বিশেষজ্ঞরা মনে করতেন আমাদের শরীরে যে কোন রোগের প্রাদুর্ভাব ধরার ক্ষমতা এক্স-রের নেই। মাত্র কয়েক দশকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতিতে চিকিৎসকদের অনেক সুবিধা হয়েছে। এখন তাঁদের রোগ নির্ণয়ে নিশ্চিত হবার জন্য শত শত যন্ত্রের সাহায্য পাচ্ছেন। যা এই ক্ষুদ্র পরিসরে বিশেষ বলা সম্ভব নয়। এদের মধ্যে কয়েকটি অত্যাধুনিক যন্ত্রের কথা সামান্য জানা যাক।

আমরা জানি, দেহের বাইরে ও ভিতরে কোথাও যদি সংক্রমণ ঘটে, তবে তার প্রভাব রক্তে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে ডাক্তারেরা রক্ত পরীক্ষার নির্দেশ দেন। কিন্তু এই পরীক্ষার মাধ্যমে লিউকোজার' মতো জটিল রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। লিউকোজা হলো মস্তিষ্কের পেশী ও লসিকা তন্ত্রের এক জটিল রোগ। এ রোগ নির্ণয় করতে হয়, রক্তে অপরিণত শ্বেতকণিকা বা লিউকোসাইট দেখে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে একই ধরনের অপরিণত শ্বেত কণিকার রক্তে অনুপ্রবেশ ঘটে, লিভারের এক ধরনের অসুখে। এই উভয় প্রকার রোগের লক্ষণ এক। রোগের ধরনও এক। কিন্তু রোগের কারণ দুটো আলাদা। এক্ষেত্রে চিকিৎসকদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে বিশেষ ধরনের এক্স-রে। এই দু ধরনের রোগে আমাদের দেহের অভ্যন্তরে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরিবর্তনগুলো হয় তা এই যন্ত্রের সাহায্যে খুব সহজেই নির্ণয় করা যায়। শরীরের যে অংশ এক্স-রে দিয়ে পরীক্ষা হবে, দেহের সেই অংশে উপস্থিত ছোট ছোট অভ্যন্তরীণ

যন্ত্র, চিকিৎসকের প্রয়োজনে টিভি পর্দায় স্পষ্ট করে তোলে। এছাড়াও এক্স-রে সঙ্গে লাগানো টি. ভি পর্দায় ছবি সরানো বা বড় করা পজিটিভ্ বা নেগেটিভ হিসেবেও এই যন্ত্রের পর্দায় পরিষ্কার পাওয়া যায়।

রোগ নির্ণয়ে আরেক প্রযুক্তিগত উন্নতির ফসল হচ্ছে স্পেকটোফেটোমিটার। এর সাহায্যে রোগীর শরীরে এনজাইম টেস্ট করা হয়। হার্টের রোগ, বুকের ব্যথা, ইত্যাদির কারণ নির্ণয়ে এনজাইম টেস্টে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে। আমাদের শরীরে এক একটি কোম যেন এক একটি বিরাট কেমিক্যাল ফ্যাক্টরী। এনজাইম মূলত প্রোটিন জাতীয় এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যা আমাদের দেহের বিপাক ও পরিপাকে নিজে অপরিবর্তিত থেকে সাহায্য করে। হৃদপেশীর কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে রোগীর রক্তে ক্রিয়েটিন কাইনেজের উপস্থিতির মাত্রা বেড়ে যাবে। এই এনজাইমগুলি রক্তে উপস্থিতির মাত্রা দেখে রোগ নির্ণয় সম্ভব। যেমন ক্রিয়েটিন কাইনেজ 24 ঘণ্টা পর্যন্ত রক্তে অতিরিক্ত মাত্রায় থাকে। অ্যাসপারেট ট্র্যান্স-অ্যামিনেজ এনজাইমটি রক্তে দুদিন পর্যন্ত অতিরিক্ত মাত্রায় উপস্থিত থেকে দেহের অন্যান্য পেশীকলার ক্ষতিগ্রস্তের কথা নির্দেশ করবে। ল্যাকটিক ডিহাইড্রোজিনেজ দশদিন পর্যন্ত রক্তে অতিরিক্ত মাত্রায় থাকলে বুঝতে হবে হৃদপিণ্ড ও ফুস-ফুসের কোষকলার বেশ ক্ষতি হয়েছে। তেমনি, অ্যালানিন ট্রান্স-অ্যামিনেজ-এর রক্তে উপস্থিতি দেখে বোঝা যায় লিভার কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কয়েক দশক আগে পৃথিবীর বুক থেকে ম্যালেরিয়া প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি রোগটি আবার জাঁকিয়ে ফিরে আসছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে পৃথিবীতে প্রতিবছর 20 কোটি লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছেন। রোগ নির্ধারণের জন্য ডাক্তারেরা সাধারণত রক্তে ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইট আছে কিনা পরীক্ষা করতে বলেন। এই পরীক্ষা আক্রান্ত ব্যক্তির কাঁপুনি ও জ্বরের সময় রক্ত না নিলে বেশির ভাগ সময়ই ব্লাড টেস্টে কিছুই পাওয়া যায় না। কিছুদিন আগে আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের এস-এন-মেডিকেল কলেজের চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাঃ পি. কে. ভাল এবং তাঁর সতীর্থরা ম্যালেরিয়া সনাক্তকরণে এক অদ্ভুত সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এঁরা গবেষণায় লক্ষ্য করেছেন, ম্যালেরিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার 24 ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর প্রস্রাবে ইউরোবিলি-নোজেনের মাত্রা লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পায়। 48 ঘণ্টায় সেটা সর্বোচ্চ মাত্রায় দাঁড়ায়, ফলে ম্যালেরিয়ার লক্ষণ প্রকাশের সময়, যে কেউ আক্রান্ত ব্যক্তির বিছানার পাশে বসেই এই ইউরোবিলিনোজেনের টেস্ট করে বলে দিতে পারেন রোগী সত্যি সত্যি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন কিনা ?

ষাটের দশকের শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফল হার্ট ট্রান্সপ্লানটেশান উন্নত প্রযুক্তির আর এক সফলতার নিদর্শন। ঐ প্রসঙ্গ আর নতুন করে বলার দরকার নেই। ট্রান্সপ্লানটেশন বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বদলে সম্প্রতি এক যুগান্তকারী সংযোজন লিভার বদল। হার্টের কার্যকারিতাকে বিন্দুমাত্র ছোট করে না দেখেও নিঃসন্দেহে বলা যায় লিভারের কার্যকারিতা আরও জটিল। আমরা কি জানি, আমাদের দেহের ঐ লিভার নামক গ্রন্থিটি 500 রকমের কাজ করে। এর প্রধান কাজ শরীরের অভ্যন্তরে ক্ষতিকারক বিষাক্ত পদার্থকে নির্বিষ করা। 500 রকমের কাজ করে এমন একটা কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরি করা আজ প্রায় অসম্ভব। বিশেষত লিভারের আয়তন আর ওজনের মধ্যে। তাই অকেজো লিভারের পরিবর্তে চিকিৎসক বিজ্ঞানীরা দাতার লিভারের কিছু অংশ পুনঃসংস্থাপন করার চেষ্টা করছেন। এ রকম চেষ্টা পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত 400টি হয়েছে। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেলায় যেমন লিভারের বেলায়ও তেমনি প্রধান অন্তরায় হলো আমাদের শরীরের নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা। একটা লিভারের প্রতিকল্প হতে পারে

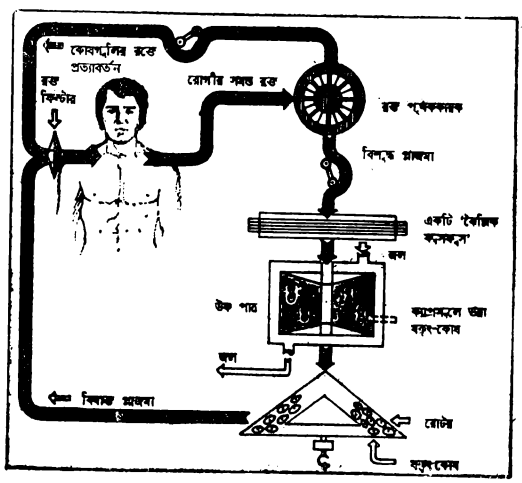

লিভার বদল করার বিভিন্ন পদ্ধতি

শুধু একটা লিভার। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এই জটিল ব্যবস্থার একটা সুরাহা করেছেন। একটি শূয়োরের লিভারের জীবন্ত কোষগুলির একটা অংশ বিশেষ ক্যাপসুলের মধ্যে রাখা হয়। আর রোগীর রক্তরস, প্লাজমা সেগুলির পরোক্ষ সংস্পর্শে আসে বিশেষ পলিমার ঝিল্লীগুলির মারফৎ।

আজকে রোগ নির্ণয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ফসল হচ্ছে এন. এম. আর। অর্থাৎ নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স। এই পদ্ধতিতে রোগীর দেহের অভ্যন্তরের যে কোন অংশের ক্রমিক প্রস্থচ্ছেদীয় ছবি তুলতে সক্ষম। এই ব্যবস্থায় রোগগ্রস্ত কোষকলার প্রকৃতি, রাসায়নিক প্রকৃতি এবং বিভিন্ন অংশের শারীরবৃত্তীয় প্রকৃতি নির্ণয়ে সব রকম তথ্য

দিতে সক্ষম। এতে রোগীর স্বাভাবিক কোষকলার ক্ষতির সম্ভাবনাও কম। আজকে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে সি. টি. স্ক্যান, ইকোকার্ডিওগ্রাম এবং আলট্রা সাউণ্ডের দৌলতে ডাক্তারদের আর আন্দাজে কোন চিকিৎসাই করতে হয় না। বর্তমানে ভারতবর্ষে মাত্র কয়েকটি হাসপাতালে ও কলকাতায় দুটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সি.টি. স্ক্যান আছে। এই পদ্ধতি অবশ্য খুবই ব্যয়বহুল। 500 টাকা থেকে 1500 টাকার নিচে এই ব্যবস্থার সুযোগ পাওয়া যায় না। নিউরো-সার্জেনদের এই যন্ত্রটি বিশেষ প্রয়োজন। সেরিব্রাল ট্রমা, ভাসকুলার স্ট্রোক ইত্যাদিতে বিশেষ কাজে লাগে। তবে সি. টি. স্ক্যান রোগীর কোন হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল তথ্য দিতে পারে না। শুধু অ্যানাটমিক্যাল তথ্য দিতে পারে।

আমরা 20 থেকে 20,000 কম্পাঙ্কের শব্দ শুনতে পাই। কম্পাঙ্ক যদি 20 বারের কম ও 20,000 এর বেশি হয় তবে তা শুনতে পাই না। 20 হাজার কম্পাঙ্কের বেশি শব্দকে আলট্রা-সাউণ্ড বলে। পদার্থের দুটি বিশেষ ধর্মকে কাজে লাগিয়ে আলট্রা সাউণ্ড সৃষ্টি করা হয়। (1) ম্যাগনেটোস্ট্রিকশান (2) পিজো ইলেকট্রিক। যন্ত্রের মধ্যে শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করে পরীক্ষাধীন ব্যক্তির যন্ত্রাংশে পাঠানো হয়। যেমন ব্রেন, লিভার, কিডনী, ইউটেরাস প্রভৃতি অঙ্গে ঐ তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে টি. ভি. র পিকচার টিউবে আসে এবং তা পর্দায় ফুটে ওঠে। মাইক্রোসার্জারী ও আলট্রা সাউণ্ড প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চোখের ছানি, কিডনীর স্টোন ঐ আলট্রা সাউণ্ডের সাহায্যে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলে সাইফন ব্যবস্থায় তা তুলে আনা হচ্ছে। বিদেশে এখন ঐসবে আর অস্ত্রোপচার করার দরকার হয় না।

ক্রায়োআলট্রাসনিক—আরও নতুন ব্যবস্থা। উষ্ণতা কমিয়ে সঙ্গে অতিনাদী শব্দ ব্যবহার করে চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয়ে ডাক্তারদের হাতে এক মস্ত বড় হাতিয়ার এসেছে। অতিনাদী শব্দ জীবন্ত কোষকলায় বিপাককিয়ার মাত্রা ও দেহের অনাক্রম্যতা বাড়ায়। ইকো-কার্ডিওগ্রাফের পদ্ধতিও প্রায় একরকম। এক্ষেত্রে হৃদপিণ্ডের 'বিট', অবস্থা প্রভৃতি জানা যাবে। এখানেও আলট্রাসাউণ্ডকে কাজে লাগানো হয়। এই ব্যবস্থায় দেহের ভেতরের যন্ত্রের ক্রমিক সচল (সঙ্কোচন ও প্রসারণ) ছবি দেখা যায়।

এখন অবশ্য ইকো-কার্ডিওগ্রাফের চেয়েও অনেক উন্নত ধরনের যন্ত্র আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। এর নাম 'কার্ডিওকমপ্লেক্স-05'। এই যন্ত্র টেলিমেট্রিক পদ্ধতি হৃদযন্ত্রের প্রতিটি ছন্দ মুহূর্তের সংকেত কার্ডিওকমপ্লেক্সের গ্রাহক যন্ত্রের বিশেষ এরিয়ালে পাঠায়। এখন এই যন্ত্রে পাঠানো সংকেত যদি পরীক্ষাধীন ব্যক্তির কোথাও কোন ছন্দপতনের সংকেত ধরা পড়ে তবে 'কার্ডিওকমপ্লেক্স-05' যন্ত্র নিজেই প্রয়োজনীয় উদ্দীপক পাঠিয়ে চিকিৎসক না আসা পর্যন্ত রোগীর হৃদচ্ছন্দ ঠিক রাখে।

এম. এইচ—02 সার্জিক্যাল মনিটর যন্ত্রটি অপারেশন থিয়েটরের মাত্র এক বর্গমিটার জায়গা দখল করে। এই যন্ত্র একসঙ্গে ছ'টি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ করতে পারে। যেমন ধমনী ও শিরার রক্তচাপ, তাপমাত্রা, হৃদ-স্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার এ প্রতি মিনিটে শ্বসনের পরিমাণ। ট্রান্সডুসার থেকে পাওয়া তথ্যগুলি ঐ যন্ত্রের টেলিভিসন পর্দায় ফুটে ওঠে। আমাদের শরীরের বিপাকীয় কার্যাবলীর মাপ, মান ও মাত্রা শুধু যে তা পর্দায় দেখা যাবে তা নয়, একটু অস্বাভাবিক হলে হুঁসিয়ারির শব্দও শোনা যাবে। ব্রেন, হার্ট, লিভার প্রভৃতির জটিল অপারেশনে প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান। এমতাবস্থায় এই যন্ত্র সমাহারের বিশ্লেষক অংশ তথ্য প্রসেসিং কম্পিউটার ছাড়া ডাক্তারদের পক্ষে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। রোগী সম্পর্কে উৎসমূলক তথ্যগুলি দুটি কম্পিউটারে প্রসেস করে, সেগুলি সুবিধে মত প্রদর্শিত হয়। হৃদপিণ্ডের নিলয় সহ শরীরের ঘটমান বিবিধ প্রক্রিয়া বর্ণনাচিত্র ও সারণী হিসেবে একটি বড় রঙিন পর্দায় দেখা যায়। রোগ নির্ণয়ে আধুনিক প্রযুক্তির যা কিছু দান—তা অবশ্যই কম্পিউটারের সহ-

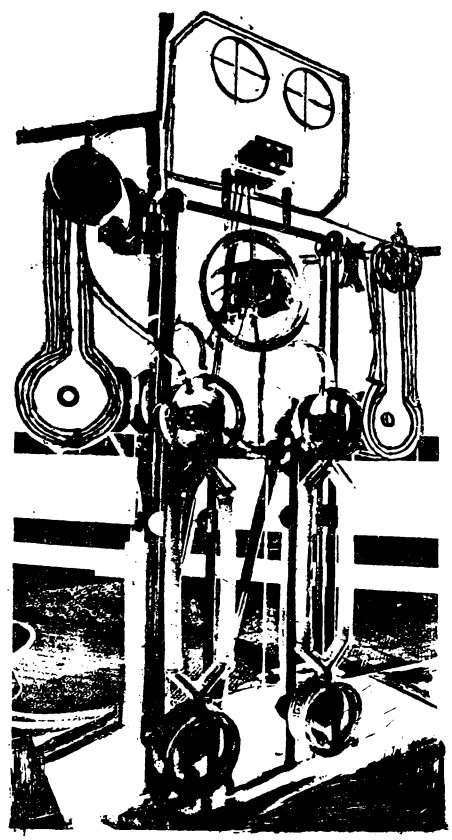

অত্যাধুনিক ব্রঙোস্কোপ

যোগিতায়। ইউক্রেনে মাত্র 25—80 মাইক্রোন চওড়া অতি সূক্ষ্ম মনোফিলামেণ্ট উৎপাদন শুরু হয়েছে। রক্তনালী ও স্নায়ু তন্তু সেলাইয়ের জন্য মাইক্রোসার্জারিতে ব্যবহার হচ্ছে।

হৃদরোগ—ধমনীর কাঠিন্যে কোলেস্টেরলের ভূমিকার কথা আমরা জানি। এটি ধমনীর প্রাচীরে জমে অভ্যন্তরীণ ব্যাস ছোট করে দেয় অথবা ধমনীর স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট করে দেয়। এই অবস্থায় রোগীর শরীর থেকে বাড়তি কোলেস্টেরল সরাতে পারলে ধমনীর কাঠিন্য সমস্যাটি আর থাকে না। যন্ত্রের সাহায্যে তা করা সম্ভব হয়েছে। এই যন্ত্রটি একসঙ্গে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ ও এক্স-রে অণু-বিশ্লেষকের কাজ করে। এতে মাত্র দু'মিনিটের মধ্যেই এক একটি কোষ সনাক্ত করা যায়।

প্রায় দু দশক ধরে সমগ্র পৃথিবীতে প্রচণ্ড গবেষণার পর কার্ডিওভাসকুলার রোগের যুদ্ধে লেসার বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে। শুধু হৃদরোগে নয়, লেসার রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার জগতে এক আলোড়ন তুলেছে। লেসার কথাটি হচ্ছে "লাইট অ্যামপ্লিফিকেশান বাই স্টিমুলেটেড এমিশন অফ রেডিয়েশান"। আসলে এক ধরনের তীব্র আলোর ঝলক।

এণ্ডোস্কোপ আসলে আমাদের পেটের ভেতরের যাবতীয় পরীক্ষার যন্ত্র। এই এণ্ডোস্কোপের সঙ্গে সূঁচ জুড়ে দিয়ে এক অভাবনীয় কাণ্ড করেছেন ডাঃ ড. কিরিয়াকভ। তিনি জানিয়েছেন সাবেকী পদ্ধতির তুলনায় এই তীক্ষ্ণদৃষ্টি সূঁচ সমেত এণ্ডোস্কোপ রোগ নির্ণয়ে ডাক্তারদের ভীষণ সাহায্য করবে। এই সূঁচের সাহায্যে সুষুম্নাকাণ্ডের রস, ঝিল্লী ও রক্ত নালীগুলির কোন পরিবর্তন ঘটেছে কিনা তা মাত্র 5—6 মিনিটির মধ্যেই জানা যাচ্ছে। এর একটি বাড়তি উপাঙ্গের সাহায্যে চিকিৎসকেরা ইচ্ছে মতো যে কোন অংশের ফটো তুলতে পারবেন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে রোগ নির্ণয় আজ অনেক সহজ হয়েছে। এখন যে যার স্বাস্থ্যের খবর হাত ঘড়িতে পেতে পারেন। এই ইলেকট্রনিক ঘড়ির মধ্যে নাড়ীর স্পন্দন মাপার ব্যবস্থা আছে। স্পন্দনের হার জানতে হলে এর সঙ্গে লাগানো একটি অপটো-ইলেকট্রনিক সেন্সর। শুধু ছুঁলেই হলো, সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ির পর্দায় তা দেখা যাবে। এছাড়া স্পন্দনের মাত্রা বেশি হলেই শব্দ সংকেতের মাধ্যমে তা মালিককে জানিয়ে দেবে। দাম মাত্র 38 মার্কিন ডলার। এ রকম একটা ঘড়ি আমাদের থাকলে কি মজাই না হতো, তাই না ?

কার্টুন ঃ শেল চক্রবর্তী

my first friend...

SAMAR®

school box

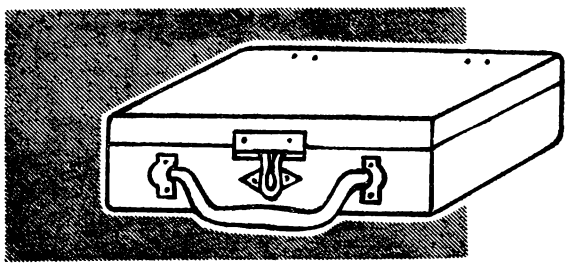

King of Quality

SAMAR ● ASHAK ● RAJKUMAR
JANATA ● INDIA

SCHOOL BOX ● LUNCH BOX ● TIFFIN BOX ● JEWEL BOX ● PUJA BOX
SEWING BOX ● PENCIL BOX ● CIGARETTE CASE ● POWDER CASE
SWEET TRAY ● TEA TRAY ● ASHTRAY ● PRESENTATION SET
SAFE-DEPOSIT BOX AND FANCY UTENSILS.

DASNAGAR, HOWRAH-711 105, WEST BENGAL ● PHONE : 69-2350 ● GRAM : SCHOOL BOX

ডেনড্রাইট সুপারজয়নার...
সব বাড়িতেই একই নাম

ভাঙ্গা অংশগুলোতে ডেনড্রাইট সুপারজয়নার লাগান, একটু সবুর করুন, আর তারপরে একসঙ্গে চেপে ধরুন—ব্যাস!

জোড়া জিনিস মনে হবে যেন নতুন। চিনেমাটি, কাঠ, কাঁচ, সেরামিক, চামড়া...
সে যাই হোক না, ডেনড্রাইট সবকিছুই জুড়ে দেয়, ভাঙ্গা যে ছিল তা আর মনেই থাকেনা।

ডেনড্রাইট
সুপার জয়নার

জুড়তে যার জুড়ি নেই

CC-1 BEN

চক্রস্ কেমিক্যাল্স এণ্টারপ্রাইজেস্ (প্রাঃ) লিঃ
পি-৩৫ সি.আই.টি. রোড, কলিকাতা-৭০০ ০১৪

ডেনড্রাইট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এডেসিভ্ রেঞ্জে পাবেন : ডেনড্রাইট পি.এ.-৬৫, পি.সি.-১৮২, ও.আর.-১০০, এস.আর.-১৯, এস.আর.-৬০, এস.আর.-১২০ এবং হটমেল্ট এডেসিভ্।

মানব কল্যাণে জীন প্রযুক্তি

মৃন্ময়ী দাস

তোমরা যদি মিশরের পিরামিড দেখতে যাও, দেখবে পিরামিডের পাশে অদ্ভুত একটি মূর্তি, স্ফিংক্স্। মূর্তিটির মাথা মানুষের, কিন্তু দেহ সিংহের। ভাস্করের কল্পনায় হয়তো ছিল এমন একটি প্রাণী, যে বুদ্ধি ও জ্ঞানে মানুষ কিন্তু বিক্রমে সিংহ। যার যা ভাল তা নিয়ে এই যে জীব গড়ার কল্পনা, তা আজ বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে জেনেটিক্ ইঞ্জিনীয়ারিং বা জীন প্রযুক্তি বিদ্যার কল্যাণে।

লক্ষ্য করে থাকবে, এখানে দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, জীন ও প্রযুক্তি। মানুষের সন্তান মানুষ হয়, বাঁদরের বাচ্চা বাঁদর; গাব গাছে আম ফলে না, আবার ধানের বীজ রোপণ করলে ধানই হয়, জোয়ার বাজরা হয় না। বংশধারার এই যে রহস্যময় গতি ও বৈশিষ্ট্য তার ধারক ও বাহক হল জীন বংশাণু। মানুষের চুল সাদা হবে কি কাল, তার স্বভাব কেমন হবে, গোলাপ গাছে কখন কি রঙের ফুল ফুটবে বা কতদিন ফুটবে, এ সবই নিয়ন্ত্রণ করে জীন। তাই তেজস্ক্রিয় রশ্মি, বিশেষ ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য, ওষুধ প্রভৃতির সংস্পর্শে জীনের পরিবর্তন ঘটলে সেই 'জেনেটিক্ ডিসঅর্ডার' বা পরিবর্তন বংশ পরম্পরায় ছড়িয়ে পড়ে।

জীন আসলে কি? জীবকোষের নিউক্লিয়াসে থাকে সুতোর মত বস্তু, ক্রোমোজোম। এই ক্রোমোজোমগুলিতে মালার মধ্যে পুঁতির মত জীনগুলি পরপর সাজানো থাকে। অণুজীবরসায়নবিদ্দের সংজ্ঞা অনুযায়ী জীন একটি জৈবযৌগ, 'ডি অক্সি রাইবোনিউক্লেয়িক অ্যাসিড' সংক্ষেপে 'ডি এন. এ'।—1953 সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী জেমস্ ও ফ্রান্সিস ক্রিক্ রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে ডি. এন. এ অণুর গঠন আবিষ্কার করেন। একে বলা হয় 'ডাবল্ হেলিকাল্ স্ট্রাকচার' অর্থাৎ ডি. এন. এ অণু দ্বিতন্ত্রীগঠন বিশিষ্ট, দেখতে ঘোরানো সিঁড়ির মত। সহজ করে বলতে গেলে প্রতিটি ডি এন. এ অণু তৈরি হয়েছে অনেকগুলি নিউক্লিওটাইড্ দিয়ে। প্রতিটি নিউক্লিওটাইডে আছে পাঁচটি কার্বনবিশিষ্ট শর্করা (2-ডি অক্সি ডি রিবোজ), ফসফেট এবং অ্যাডেনিন্, গুয়ানিন্, সাইটোসিন্, ও থাইমিন্, এই চাররকম নাইট্রোজেন ক্ষারকের একটি। ডি. এন. এ'র সিঁড়ির তন্ত্রীদুটির প্রতিটি, শর্করা এবং ফসফেট বন্ধনীর দ্বারা এবং প্রতিটি ধাপ এই চারটি নাইট্রোজন ক্ষারকের একটির দ্বারা তৈরি হয়েছে। বিপরীততন্ত্রীর প্রতিটি ধাপের মধ্যেকার ক্ষারকদুটি হাইড্রোজেন বন্ধনী দ্বারা যুক্ত। ওয়াটসন্ ও ক্রিক্ এই কাজের জন্য 1962 সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

এর ঠিক চার বছর পরে আবিষ্কৃত হয় 'জেনেটিক কোড' বা 'জীন সংকেত' অর্থাৎ জীন কি ধরনের কাজ করবে তার ইঙ্গিত। তাঁরা দেখালেন, ডি. এন. এ'র নিউক্লিওটাইডের চারটি নাইট্রোজেন ক্ষারকের যে কোনও তিনটি, পরপর কিভাবে সাজানো আছে তার উপরই জীনের কর্মধারা নির্ভর করে। কেননা এই নাইট্রোজেন ক্ষারকের পারস্পরিক সজ্জার উপর নির্ভর করে কোন অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হবে—যা আবার স্থির করে কোন বিশেষ এনজাইম বা উৎসেচক জীবকোষে তৈরি হবে। এই উৎসেচকই প্রকৃতপক্ষে জীন সংশ্লেষ নিয়ন্ত্রণ করে।

1955 সালে মার্কিন বিজ্ঞানী আর্থার কর্নবার্গ ডি. এন. এ পলিমারেজ্ নামে একটি নতুন এনজাইম আবিষ্কার করলেন। এরই সাহায্যে 1967 সালে তিনি পাঁচ কি ছয়টি জীন সংবলিত ছোট্ট একটি ভাইরাসের ক্রোমোজোম সংশ্লেষণ করতে সক্ষম হন। এইভাবে মানুষ প্রথম কৃত্রিম উপায়ে জীব তৈরি করল। 1968 সালে ভারতীয় বংশোদ্ভব বিজ্ঞানী হরগোবিন্দ খোরানা রাসায়নিক পদ্ধতিতে পরীক্ষানলের বিভিন্ন নিউক্লিওটাইড অণুগুলি জুড়ে জুড়ে যত রকম শৃঙ্খল গড়া সম্ভব অর্থাৎ 64 রকম জীন সংকেত সশ্লেষণ করতে সক্ষম হন। এর জন্য তাঁকে বিজ্ঞানী নিরেনবার্গ ও হলির সঙ্গে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

জীবকোষে ক্রোমোজোমের পাশাপাশি ছোট গোলাকার জীনের মত এক ধরনের কণা থাকে, যাদের বলা হয় প্লাজমিড্। 1973 সালে বিজ্ঞানীরা একটি ব্যাকটিরিয়া থেকে সংগৃহীত ডি. এন. এ'র কণা। অন্য ক্রোমোজোমের প্লাজমিডের ডি. এন. এ'র মধ্যে সংস্থাপন করে নতুন চরিত্রের প্লাজমিড্ তৈরি করেন। এইভাবে যে জীন তৈরি হল তাকে বলা হয় 'টেইলর মেড্ জীন', যেন দরজীকে ফরমাশ দিয়ে ইচ্ছামত বিভিন্ন ফ্যাশনের তৈরি করা পোশাক। জীবের অন্ত্রে এক রকমের ব্যাকটেরিয়া থাকে, যার নাম এস্কেরিয়া কোলি—সংক্ষেপে ই-কোলি। এই

নতুন সৃষ্ট প্লাজমিড্ এই ই-কোলির ক্রোমোজোমে সন্নিবিষ্ট করা হল। এর ফলে ই-কোলির কর্মক্ষমতা তো কমলো না-ই, উপরন্তু তার নতুন কর্মক্ষমতা তা দেখা গেল। এইভাবে একটি জীনের জেনেটিক কোড অপর একটি জীনে সংস্থাপন করার পদ্ধতিকে সামগ্রিক ভাবে বলা হয় জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং বা জীন প্রযুক্তি। ৬

এ পর্যন্ত দুটি শ্রেণীর এনজাইমের সন্ধান পাওয়া গেছে যারা জীন প্রযুক্তিতে বিশেষ বিশেষ কাজে লাগে। একটির নাম নিউক্লিয়েজ্। এটি যেন কাঁচি, যার সাহায্যে ডি. এন. এ শৃঙ্খল বিশেষ বিশেষ জায়গায় টুকরো টুকরো করে কাটা যায়। অপর এনজাইমটির নাম লাইগেজ্, যার কাজ সুতোর মত। এর সাহায্যে কাটা ডি. এন. এ'র খণ্ডগুলি ইচ্ছামত জুড়ে দেওয়া যায়। এইভাবে প্রয়োজন মত ডি. এন. এ কেটে ছেঁটে, কাটা খণ্ডগুলি আবার জুড়ে দিয়ে নতুন ধরনের ডি. এন. এ অণু তৈরি করার পদ্ধতিকে বলা হয় জীন—স্প্লাইসিং। ডি. এন. এ'র এক একটি উপাদানের এক এক রকমের কর্মক্ষমতা। তাই উপাদান-গুলির হেরফের ঘটিয়ে জীনের কর্মক্ষমতা পরিবর্তন করা সম্ভব। এইভাবে বিভিন্ন ডি. এন. এ কণার সমন্বয়ে তৈরি করা ডি. এন. এ-কে বলা হয় 'রিকমবিনেণ্ট ডি. এন. এ'।

মানবকল্যাণে জীন প্রযুক্তির সম্ভাবনা অফুরন্ত। যেমন ধর, শক্তি উৎপাদন। শক্তি উৎপাদন এখন সব দেশেই কম বেশি সমস্যা। বিজ্ঞানীরা মাইক্রোব্ বা জীবাণুর জীনের হেরফের ঘটিয়ে তাদের জৈবজঞ্জালের উপর ব্যবহার করে জৈবগ্যাস তৈরির চেষ্টা করছেন। এইভাবে প্রচুর পরিমাণে জৈবগ্যাস তৈরি করতে পারলে জ্বালানি সমস্যার সমাধান সম্ভব। এছাড়া এই সব জঞ্জালের উপর বিশেষ বিশেষ জীন সম্পন্ন মাইক্রোব ব্যবহার করে জঞ্জাল থেকে প্রোটিন তৈরির চেষ্টাও চলছে। পরোক্ষভাবে এতে শহর জঞ্জালমুক্তও হবে। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে জীন প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে খুব বেশি। পৃথিবীর লোকসংখ্যা বাড়ছে এবং বাড়বে। এদের জন্য প্রয়োজন প্রচুর খাদ্য। ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি শস্য ও শাকসব্জীর কোষে বিশেষ বিশেষ জীন স্থাপন করে তাদের 'অধিক ফলনশীল' করার চেষ্টা চলছে যাতে কম জমিতে বেশি উৎপাদন হয়। একইভাবে কম প্রোটিন যুক্ত শস্য ও উদ্ভিদে প্রোটিন সৃষ্টিকারী জীন যুক্ত করে তাদের প্রোটিন সমৃদ্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে। শস্য ও উদ্ভিদের নানান রকম রোগ হতে পারে, তারা বিভিন্ন প্রকার কীটপতঙ্গদ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এর জন্য নানানরকম কীটনাশক ও রোগ প্রতিষেধক রাসায়নিক দ্রব্য জমিতে ছড়ান হয়। ফলে পরিবেশ দূষিত হয়। এখন চেষ্টা চলছে বীজের মধ্যে জীনের পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন ধরনের বীজ তৈরি করার। যাতে উদ্ভিদের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং তাদের দেহ থেকে এমন সব বিষাক্ত যৌগ নির্গত হয় যা উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করতে সক্ষম। এই সব যৌগ কিন্তু পশুপাখি বা মানুষের অনিষ্ট করবে না। এর ফলে চাষের সময় জমিতে কীটনাশক দেওয়ার প্রয়োজন হবে না, পরিবেশ দূষণও বন্ধ হবে। খুব বেশি শীত বা গ্রীষ্ম, খুব বেশি জোলো বা শুষ্ক আবহাওয়ায় সবরকম শস্য জন্মায় না। শস্যের বীজে বিশেষগুণ সম্পন্ন জীন সংস্থাপন করে এমন বীজ তৈরির চেষ্টা বিজ্ঞানীরা করেছেন যা যে কোনও প্রতিকূল আবহাওয়াতে সুস্থভাবে বেড়ে উঠতে সক্ষম। কৃষির জন্য প্রয়োজন প্রচুর সারের। বীজের জীনের মধ্যে বিজ্ঞানীরা এমন পরিবর্তন ঘটাবার চেষ্টা করছেন, যাতে গাছ বড় হয়ে বাতাসের নাইট্রোজেন টেনে নিয়ে নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করে নিতে পারবে। এর ফলে নাইট্রেট সারের চাহিদাও কমবে আবার পরিবেশ দূষণও কম হবে।

ধাতু নিষ্কাশনেও জীন প্রযুক্তি কাজে লাগান হচ্ছে। —বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়ার জীনের হেরফের ঘটিয়ে তাদের সাহায্যে বিভিন্ন আকরিক থেকে তামা লোহা প্রভৃতি ধাতু নিষ্কাশনের চেষ্টা চলছে। একই পদ্ধতিতে অন্য চরিত্রের মাইক্রোব ব্যবহার করে কয়লার মধ্যে মিশে থাকা গন্ধক দূর করা হচ্ছে। ফলে অর্থ এবং সময় দুএরই সাশ্রয় হচ্ছে।

চিকিৎসাক্ষেত্রে জীনপ্রযুক্তি যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন। কিছু কিছু প্রোটিন অণু আছে যা শরীরে নানানরকম রোগ সৃষ্টি করে। এদের বলা হয় অ্যান্টিজেনিক প্রোটিন। জীন প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে এই রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসের প্রোটিন সংশ্লেষণ সম্ভব হয়েছে। এই সংশ্লেষিত প্রোটিন এখন ভ্যাকসিন বা টীকা হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রচলিত পদ্ধতিতে ভাইরাসের কালচার থেকে এই ভ্যাক্সিন তৈরি হত। এতে সময় এবং খরচ দুইই বেশি পড়ত। তাছাড়া অনবধানতায় জীবন্ত ভাইরাস পরিবেশে ছড়ালে সংক্রমণের ভয়ও থাকে। বর্তমান পদ্ধতিতে সে ভয় নেই।—একইভাবে কলেরা, জলাতঙ্ক, পোলিও, হেপাটাইটিস্, হারপিস্, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের টীকা তৈরির চেষ্টাও চলেছে। শুধু মানুষ কেন, পশুপাখির জলাতঙ্ক ও বিভিন্ন ভাইরাস ঘটিত রোগের টীকাও এই প্রক্রিয়ায় তৈরির চেষ্টা চলছে। সুস্থ অবস্থায় শরীরের গ্রন্থি-গুলিতে হরমোন নামে একশ্রেণীর রাসায়নিক যৌগ তৈরি হয়, এরা বিপাকীয় ক্রিয়ায় সাহায্য করে। হরমোনের অভাবে নানারকম রোগ হতে পারে।—যেমন, শরীরে 'হিউম্যান গ্রোথ্ হরমোন্' বা বৃদ্ধি হরমোনের অভাবে মানুষ হয় জন্ম-বেঁটে বা বামন। সদ্যমৃত মানুষের পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে এই হরমোন্ আহরণ করে ইনজেকসন্ দিয়ে আগে বামনদের

চিকিৎসা করা হত।—প্রয়োজনের তুলনায় কম পাওয়া যাওয়ায় এই হরমোনের সাহায্যে চিকিৎসা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। একটি শিশুর চিকিৎসায় লক্ষাধিক টাকার প্রয়োজন হত।—বর্তমানে মানুষের বৃদ্ধি হরমোনের জীন জীবাণুর মধ্যে ঢুকিয়ে এই হরমোন তৈরির চেষ্টা চলছে। এর ফলে এই চিকিৎসার খরচ অনেক কমবে। বিশেষ জীনসমন্বিত হরমোনের সাহায্যে মানসিক ভারসাম্য হারানো রোগীদের চিকিৎসাও চলছে। বহুমূত্র (ডায়াবেটিস্) রোগ পৃথিবীর সব দেশেই কমবেশি আছে। এই রোগে রোগীর শরীরে ইনসুলিন হরমোন্ তৈরি হয় না, তাই তাদের নিয়মিত ইনসুলিন ইনজেকসন নিতে হয়। আগে গবাদি পশুর অগ্ন্যাশয় থেকে নিষ্কাশিত ইনসুলিন রোগীদের ইনজেকশান দেওয়া হত। চাহিদার তুলনায় কম ইনসুলিন তৈরি হওয়ায় এই ইনসুলিনের দাম পড়তো অনেক। এখন ই-কোলাই জীবাণুতে বিশেষ ধরনের জীন সন্নিবিষ্ট করিয়ে প্রচুর পরিমাণে সহজলভ্য ইনসুলিন তৈরি হচ্ছে। বিশেষ ধরনের জীবাণুতে জীনের পরিবর্তন ঘটিয়ে টি. পি. এ নামে আর এক রকম হরমোন্ তৈরি করা হচ্ছে যা রক্ততরল করার কাজে লাগে, ফলে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক হবার সম্ভাবনা কমে যায়। এইভাবে জীনের হের ফের ঘটিয়ে এখন আরও অনেক ওষুধ তৈরির চেষ্টা চলছে, যাদের ক্যানসার থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংক্রামক রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা অপরিসীম। জীনপ্রযুক্তির সহায়তায় পশুপাখিদের গ্রোথ্ বা বৃদ্ধি হরমোনও তৈরি হচ্ছে। এই হরমোন্ ইনজেকস্যান দিলে পশুপাখির দৈহিক বৃদ্ধি দ্রুত হবে। গরুর দুধ শতকরা দশভাগ বাড়বে, হাঁস মুরগীর বাচ্ছার অকাল মৃত্যুর হারও কমবে।

জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের সাহায্যে জীনত্রুটিঘটিত বংশগত রোগ অনেকটাই নিরাময় সম্ভব। যেমন ফিনাইল কেটোনুরিয়া, সিক্‌ল সেল অ্যানিমিয়া, হিমোফিলিয়া প্রভৃতি। প্রথমটিতে শিশু মানসিক ভারসাম্যহীন জড়বুদ্ধি হয়। সিক্‌ল সেল অ্যানিমিয়ার রোগী রক্তাল্পতায় ভোগে, অক্সিজেনের পরিমাণ কিছু কম হলে (যেমন প্লেন বা পাহাড়ে চড়লে) ফল মারাত্মক হয়। হিমোফিলিয়ায় রক্ত জমাট বাঁধে না। ডায়াবেটিস্ বা বহুমূত্র রোগের উৎসও জীন। বংশগত রোগের বৃদ্ধি ওষুধ ও খাদ্যের দ্বারা কমানো যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাময়ের জন্য প্রয়োজন বিকৃত জীন বদলে শরীরে সুস্থ জীন স্থাপন করা। এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'জীন থেরাপি' বা 'জৈনেটিক সার্জারি।' এটিও জীনপ্রযুক্তির অন্তর্গত।

জীনপ্রযুক্তির সম্ভাবনা অপরিসীম। একে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা এখন উন্নত উদ্ভিদই শুধু নয়, উন্নত প্রাণী সৃষ্টির কথাও ভাবছেন।—কিন্তু সঠিক জীন যথার্থভাবে প্রয়োগ করতে না পারলে মানুষের বদলে দানব যে সৃষ্টি হবে না, তা কে বলতে পারে? জীবনদায়িনী ওষুধ তৈরি করার সময়ে অনবধানতায় মারাত্মক জীবাণুর সৃষ্টি হওয়াও সম্ভব, যা আমাদের প্রতিরোধ ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে চলে যাবে। তাই এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

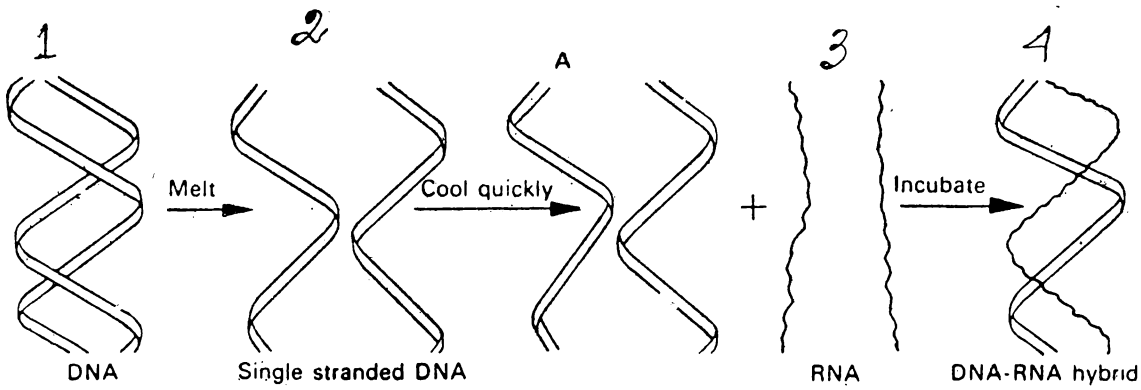

1. DNA। 2. রাসায়নিক পদ্ধতির সাহায্যে DNA দুই অংশে ভেঙ্গে গেল। 3. RNA। 4. DNA এবং RNA-এর একটি করে অংশ মিলিত হয়ে সৃষ্টি করছ DNA-RNA hybrid (সংকর)। এটা জিন প্রযুক্তির একটি উদাহরণ। এ ধরনের সংকর তৈরি করে বিজ্ঞানীরা রোগের চিকিৎসা থেকে শুরু করে নতুন জাতের বীজ এবং প্রাণী উৎপাদন করার চেষ্টা করেছেন।

কমপিউটার

আশাদেবী

কমপিউটার দেখেছ কি,
সে যে এক যন্ত্র।
সব কিছু সমাধার
সে জানে যে মন্ত্র।
পাদুকা সেলাই করা
পাঠ করা চণ্ডী
নিজে কিছু চায় না সে
যেন যে ঋষি দণ্ডী॥

পোকা-মাকড় বিষয়ক

শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়

পোকা ও মাকড় নিয়ে—
গবেষণা করছেন,
তাই, তিনি নিজে গিয়ে
পোকা-টোকা ধরছেন,
বনে আর বাদাড়ে ;
ঝোপে-ঝাড়ে, গাছে-টাছে
ধারে কাছে যত আছে—
ডানে, আর বাঁ-ধারে !

এ খবর কে রাখো না !
তার এই গবেষণা—
আলোড়ন তুলবে !
হৈ-হৈ, হাঁকে-ডাকে—
এর পরে লোকে তাকে
সহজে কী ভুলবে !

পোকা আর মাকড়ের
বিষয়ে কত কী ঢের—
লিখেছেন সদ্য !
যখনই পড়বে চোখে,
পড়লে বুঝবে লোকে,
তা, কী অনবদ্য !!

নতুন উনুন

জ্যোতিভূষণ চাকী

এ কী, মা গো জল ঝরছে
তোমার দু-চোখ দিয়ে !
ধোঁয়ায় বুঝি অমন হল
উনুন জ্বালতে গিয়ে !
সূর্য থেকে তাপ আনব,
জ্বলবে নতুন চুলো ;
ভুলে যাও মা কয়লা-ঘুঁটের
পুরনো দিনগুলো।
সূর্য তাপকে আয়না নিয়ে
একখানেতে এনে,
উনুনেতে আঁচ জমাব
তাপের নিয়ম মেনে।
নিশ্চিন্তে রান্না ক'রে
সেই উনুনের আঁচে—
দেখবে মা গো শরীর সময়
সবই কেমন বাঁচে।

কালিম্পং-কান্দাহার-কাশী

মুস্তাফা নাশাদ

জাভা, সুমাত্রা, ঘানা,
ঠাণ্ডা রাখে শরীর বেলের পানা !
থাইল্যাণ্ড, কোরিয়া, জাপান,
নষ্ট করে ক্ষুধা বেশি চা-পান !
চীন, ইরান, উরুগুয়ে,
সর্দি লাগে শুলে তল ভুঁয়ে !
পাক, ভারত, শ্রীলঙ্কা,
দিলে মন পাঠে, ফেলের
নেই শঙ্কা !
কালিম্পং, কান্দাহার, কাশী,
একজাতি এক প্রাণ সবাই
ভারতবাসী !

অঙ্ক মেশিন

রতনতনু ঘাটী

অঙ্কে মিঠুন এগারো পেয়েছে
সতেরো পেয়েছে টিনা,
বিয়োগ অঙ্ক কেমন করে যে
গুণ হয়ে যায় কিনা !
মামদো ভূতেরা মাথায় চড়ে কি ?
বলে দিদি খুব হাসে,
অঙ্ক কষতে বসলে দেখি তো
ঘুমে চোখ বুজে আসে।
মা বলেন রেগে, টিনা ও মিঠুন
তোমাদের বলি শোনো,
ব্যাটারি, তার ও পুরনো সুইচে
অঙ্ক হয় না কোনো !
বাবাও বলেন, কী করে বা হবে
মাথার বুদ্ধি যত,
গবেষণাতেই সব যে খরচ
হচ্ছে জলের মতো।
শুনে মিটিমিটি হেসে ওরা বলে
যা খুশি ভাবো না আগে,
অঙ্ক কষার আজব যন্ত্র
বানাতে সময় লাগে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত
টার্জান অমনিবাস
চারখণ্ডে সম্পূর্ণ
প্রতি খণ্ড—২৫ টাকা
সন্ধানী
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি-৭৩

অঙ্কুর থেকে **মহীরুহ**

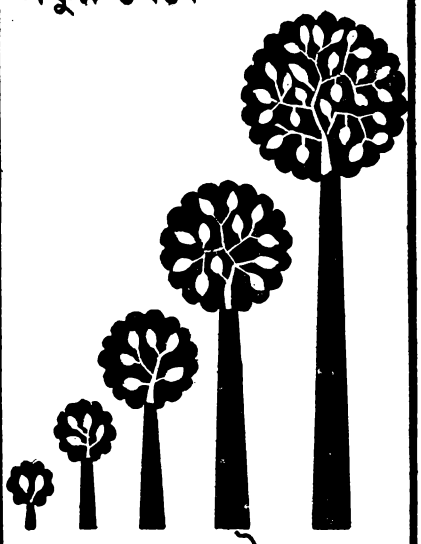

আপনাদেরই
সক্রিয় সহযোগিতায়

উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীদের একেবারে
মনের মত বই
বইটিকে সার্থকতার তীরে নিয়ে যেতে
সাহায্য করেছেন
আপনি
এবং আপনার মত চিন্তাশীল শিক্ষকেরা ।
ডঃ অলক চক্রবর্তী ও ডঃ হরিনারায়ণ কুণ্ডু
রচিত
পদার্থবিদ্যা (১ম ও ২য়) খন্ড
উচ্চ মাধ্যমিক/জয়েন্ট ও আই· আই· টি· এন্ট্রান্স পরীক্ষার
প্রশ্নোত্তর—এছাড়া হাজার খানেক কষা অংক/শ'দুই সংক্ষিপ্ত
প্রশ্নোত্তর সম্বলিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অভিনব সংস্করণ ।

দি নিউ বুক স্টল
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯
পোঃ বক্সঃ 10836• গ্রাম BHALOBOI

***

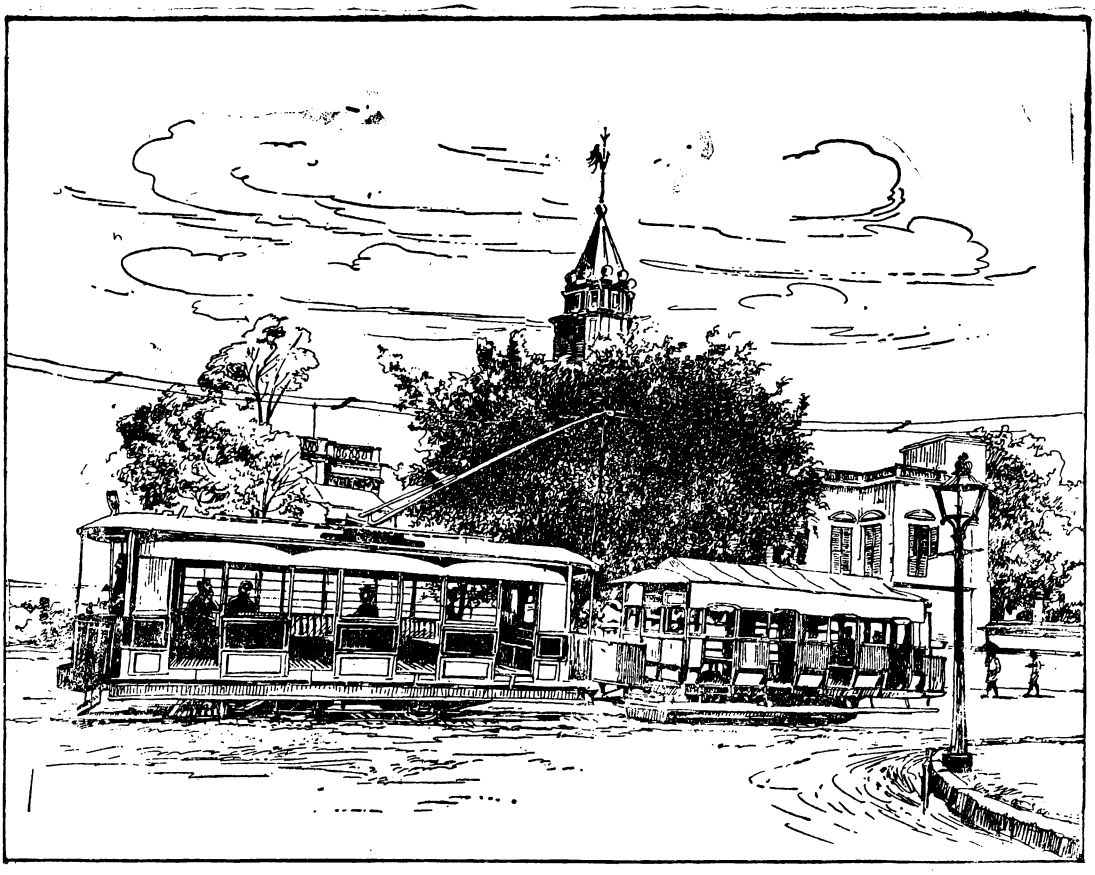

"...কি রকম গাড়ি? তারের ওপর দিয়ে চলে? – একটা ডান্ডা আছে, তারে ঠেকে থাকে, তাতেই চলে। কলকাতায় গেলে দেখবে এখন ছ-সাত বছর হ'ল ইলেকট্রিক ট্রাম হয়েছে, আগে ঘোড়ায় টানতো...।।"

– অপরাজিত
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকের অপুদের কাছে ইলেকট্রিকের ট্রাম নতুন নয়। ঘরে ঘরে আজ বিদ্যুতের আলো, পাখা, টেলিভিসন চলছে।

কিন্তু এসব রাতারাতি হয় নি। ১৮৮৯ সালের ১৭ এপ্রিল কলকাতার ইমামবাগ লেন-এ তৈরী হয়েছিল সি. ই. এস. সি-র প্রথম জেনারেটিং স্টেশন।

শহর বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তার বিদ্যুতের চাহিদাও বাড়তে লাগল। এই চাহিদা মেটাতে সি. ই. এস. সি একের পর এক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করল .... ওল্ড কাশীপুর, সাদার্ন, মুলাজোড় আর নিউ কাশীপুর। ১৯৮৩ সালে স্থাপিত হল আধুনিক টিটাগড় তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র—কলকাতার জন্য আরও বেশি বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে। প্রায় ৬০ বছরের পুরানো সাদার্ন জেনারেটিং স্টেশনটির বদলে ওই একই জায়গায় দুটি ৬৭.৫ মেগাওয়াট শক্তি সম্পন্ন কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। ১৯৯১ সাল থেকে এই ইউনিট থেকেও বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে।

বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড টেকনোলজিকাল মিউজিয়ামের সৌজন্যে প্রাপ্ত ছবির অনুকরণে

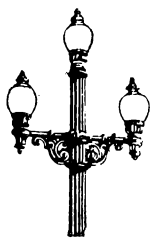

CESC Limited

রাতদিন প্রতিদিন ১৮৯৭ থেকে অবিরাম কর্মরত

ডিস্টোরিয়া হাউস, চৌরঙ্গী স্কোয়ার
কলিকাতা ৭০০ ০০১

Contract-CESC 33-87 B

খরা

অন্নদাশঙ্কর রায়

খরা ! খরা ! খরা !
খরার জ্বালায় জ্বলছে দেশ
বর্ষার মেঘ নিরুদ্দেশ
শুকিয়ে গেল ধরা ।

● ● ●

কেন ? কেন ? কেন ?
বনস্পতি হলে নিপাত
হয় না দেশে বৃষ্টিপাত
খরাই হয়, জেনো ।

● ● ●

স্মরণ রেখো, তুমি
অরণ্যের মৃত্যু যেথা
সাহারা গোবির জন্ম সেথা
ধু ধু মরুভূমি ।

● ● ●

সুন্দরবন যদি
ক্রমে ক্রমে হয় উজাড়
বাড়বে মরুভূমির বাড়
কলকাতা অবধি ।

বিপরীত ভাবনা

অমিতাভ চৌধুরী

একদিকেতে কম্পিউটার
অন্যদিকে তিরুপতি,
দুয়ে মিলে এই ভারতে
হচ্ছে নাকি অগ্রগতি ।

বুকের ভেতর পেস্‌মেকার
হাতে বাঁধা মাদুলি,
এক হাতে রয় হাজার টাকা
অন্য হাতে আধুলি ।

মে দিবসের পরে পরেই
মণ্ডপেতে দশ ভুজা,
নাস্তিকেরা করেন দেখি
স্টেডিয়ামে ভূমি পূজা ।

পঞ্জিকা আর ডাস ক্যাপিটেল
একই সঙ্গে টেনে আনি,
এরোপ্লেনে ওঠার সময়
জ্যোতিষীদের কথা মানি ।

রান্নাঘরে গ্যাস রয়েছে,
আর রয়েছে শিল নোড়া,
প্রস্তর যুগ বিজ্ঞান যুগ
একই সঙ্গে আছে ঘোড়া ।

ভালোবাসা যেমন আছে
তেমন আছে হিংসে,
এক পা রাখি চতুর্দশে
আর এক পা বিংশে ।

নূতন এবং পুরাতনে
পাঁচমিশেলি চিন্তাধারা,
এই দেশেতে বিজ্ঞানীদের
কেমন করে মিলবে সাড়া ?

দেখি আর শিখি

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

চারপাশে দেখবার
দেখে-দেখে শেখবার
কত কিছু ছিল,
তাতে তোর চোখ নেই
শেখবার ঝোঁক নেই
বুঝি একতিলও ।

তোর চোখ দূরে ঘোরে
কোন্‌খানে যাবি ওরে,
সবাইকে ফাঁকি
দিয়ে তারাদের পাশে
নিঃসীম মহাকাশে
যেতে চাস নাকি ?

তা সেটা খারাপ নয়,
আমারও ইচ্ছে হয়
যেতে সেইখানে,
তবে কিনা কাছাকাছি
আপাতত বাঁধা আছি
পৃথিবীর টানে ।

তুই দ্যাখ মহাকাশ,
ফিরে এসে বলে যাস
দেখা হল কী-কী,
আমি ততদিনে এই
পুরনো বিশ্বকেই
দেখি আর শিখি ।

ছড়া

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

এক

গলা অবধি জলের তলায়
পায় না খেতে জল
কোন সে রাজার নামে হল
মজার একটা কল
বলতো দেখি কে ?
ট্যাণ্টেলাস সে ।

দুই

টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে
দূরকে দেখি কাছে
যন্ত্রখানার আবিস্কর্তার
নাম কী জানা আছে ?
সবাই তাকে চিনি
গ্যালিলিও তিনি ।

তিন

লোডশেডিং হচ্ছে হোক
তবু জানতে চাই
বিদ্যুতের আবিষ্কার
কে করেছে ভাই ?
জানি জানি জানি
তিনিই গ্যালভানি ।

চার

দূরের কথা কাছে শোনার
যন্ত্র দূরভাষ
কে প্রথমে বানায় সেটা
নামটা শুনতে চাস ?
বেশ তো শুনে নে
গ্রাহাম বেল সে ।

রাক্ষুসে গাছ

দক্ষিণারঞ্জন বসু

সত্যি এ কথা মজার খবর,
শুনেই বলবে বড়োই জবর !
অবাক হবার, মতোই বটে,
দেশে দেশেই এ রব রটে ।

রাক্ষুসে গাছ এমন আছে,
পোকা-মাকড় গেলেই কাছে—
গপ্-গপা-গপ গিলেই ফেলে,
ভারি তৃপ্তি সে সব খেলে !
এ গাছই ভিনাস ফ্লাইট্রাপ,
দেখেই পোকার মরণ-ঝাঁপ !
এক উৎপাত এইভাবে শেষ,
জন্মে এ গাছ মার্কিন দেশ ।

ইয়োরোপেও এমনি দেখা যায়,
এক রকম গাছ পতঙ্গ খায় ।
সানডিউ নামে তার পরিচয়,
অনেকেরই তা অজানা নয় ।
বঙ্গেও আছে রাক্ষুসে গাছ,
সহজে কেউ বড়ো যায় না কাছ ।
জলায় জন্মে সেই বৃক্ষরাজি,
বাংলায় নাম তার সোজা ঝাঁঝি ।

যতই পড়ি জ্ঞান-বিজ্ঞান,
মহাজনদের বাণী ;
এ বিশ্বে যে কতো বিস্ময়,
কতোটুকুই তার জানি !

চণ্ডীখুড়োর রবোট

অমিত রায়

চণ্ডীগড়ের চণ্ডী খুড়ো
অণ্ডালেতে এসে
গবেষণায় মন বসালো
গত আষাঢ় মাসে ।
বানাবে এক নতুন ধাঁচে

জবর রকেট খুড়ো
চমকে যাবে বিজ্ঞানীরা
তাবৎ ছেলে-বুড়ো ।

বাজার, দোকান, রান্না করা
অফিসেতেও যাবে
করবে রবোট সকল কাজই
কোথায় এমন পাবে ।

একটি বছর দিবা রাত্রি
গবেষণার পরে
তৈরী হলেও রবোট যে হায়
কিছুই করতে নারে ।

মান বাঁচাতে খুড়োর নাতি
বললো, শোন দাদু
ধরে আনো ম্যাজিসিয়ান
করতে বল যাদু ।

ব্যর্থ খুড়ো রেগে বলে
কারণ স্যাবোটাজ
নিলে উচিত সতর্কতা
সফল হতাম আজ ।।

ছড়া

চলো যাই চাঁদ পেরিয়ে

কৃষ্ণ ধর

চাঁদেই যদি যেতে পারো চাঁদ ছাড়িয়ে কেন
যাবে না তা বিজ্ঞানীকেই প্রশ্ন করে দেখো।
চাঁদ তো জানি মরা পাথর কিছুটি নেই বুকে
চাঁদকে নিয়ে কাব্য করা এবার তবে রেখো।

★ ★ ★

তার চেয়ে তো যাওয়াই ভাল ভিনাসে কিংবা জুপি
টারকে ছুঁয়ে অন্য কোনো সৌর লোকে সোজা।
রকেট চড়ে যেতে কী ভয় মাথায় দাওনা টুপি
দস্তানাটা হাতেই রেখো পায়েতে নীল মোজা!

★ ★ ★

পথটা বেজায় লম্বা বটে নেই সুরু নেই শেষ
দূরে কোনো সূর্য আছে হয়তো আরও বড়।
ঝলমলিয়ে উঠবে যখন অন্য আকাশ জুড়ে
বলবে না তো সুষ্যি তোমার মেজাজ খরতর।

★ ★ ★

যেতে যেতেই মিলবে দেখা সুদূর অ্যাণ্ড্রোমিডা
নীহারিকা জ্বলছে কেমন অন্ধকারে একা!
আলোর ছটায় ফর্সা তখন লাগবে চতুর্দিক
অবাক চোখে মিলতে পারে সুপারনোভার দেখা!

★ ★ ★

তাদের কাছে চাঁদ তো শিশু, সুষ্যিটাও তেমন
নয়টি গ্রহ দিয়েই সুখী, ঘর গেরস্তি তার!
তার চেয়ে তো মজার দেখা ছায়াপথের মিছিল
মহাকাশের বুকের ওপর আলোর মোতিহার!

সত্য, নিত্য এবং ডারউইন

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

চমকে উঠে নিত্যবাবু তাঁর নাতিকে শুধোন ডেকে,
'তুই নাকি আজ ভয় পেয়েছিস এইটুকু এক
বিড়াল দেখে?
মনে রাখিস, তুই হলি এক বাঘের নাতি, বাঘের
বাচ্চা,
তোর দাপটে সবাই কাঁপবে, সাত মুলুকে,
এটাই সাচ্চা।'
সত্যবাবুর মেজাজ চড়া, এদিক ওদিক কিছু হলে,
ছেলেকে তাঁর খুব বকে দেন 'গাধা' কিংবা
'বাঁদর' বলে।
তাঁর মুখে কি 'গরু' 'শুয়োর' আপনি দাদা
শুনতে রাজি?
তাহলে যান, শুনে আসুন, চটিয়ে দিয়ে তাঁকে
আজই।
তাঁদের দেখে, কথা শুনে, হামিদ মিঞার ছেলে
আবিদ
নোটবুকে তার লিখে রাখে, সত্য-নিত্য দুই
প্রাণীবিদ
প্রিয়জনকে প্রায়ই ডাকেন জানোয়ারের সম্বোধনে,
এই সুবাদে জন্তু-মানুষ এক হয়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে।
ডারউইন সাহেব বেঁচে থাকলে, এই মুহূর্তে
গবেষণার
আরেকটা ধাপ এগিয়ে যেত, কিন্তু কপাল মন্দ
যে তাঁর।
সব মানুষের পূর্বপুরুষ বাঁদর কিংবা হনুমানই,
তিনি শুধু জেনে গেলেন, বাকির সঙ্গে মিল
খোঁজেননি।

বিশেষ শারদীয় প্রতিযোগিতা—1987

নিয়মাবলী ঃ

প্রতিযোগিতা 1 ঃ সুপার ক্যুইজ কনটেস্ট ॥ প্রতিযোগিতা 2 ঃ অঙ্কের ধাঁধা। প্রতিযোগিতা ॥ 3 ঃ সুপার আই-কিউ টেস্ট ॥ প্রতিযোগিতা ঃ 4 ফটো ক্যুইজ ॥ প্রতিযোগিতা 5 ঃ সংখ্যার ধাঁধা।

এবারে কোন একটি বিশেষ খেলা উপহারের আয়োজন করা হয় নি। তবে আয়োজন করা হয়েছে অনেক প্রতিযোগিতার অনেক উপহারের। প্রতি বছর শুধু সুপার ক্যুইজ কনটেস্ট-এর আয়োজন করা হত। এবারে প্রতিযোগিতার সংখ্যা বেশি এবং উপহারের সংখ্যাও অসংখ্য। প্রতিটি প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী ঠিকমতো পড়ে নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আসর সাজিয়েছেন ঃ অমরনাথ রায়, রতনমোহন খাঁ, জয়ন্ত দত্ত ও সমীর মণ্ডল। সমস্ত প্রতিযোগিতারই উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ 26 সেপ্টেম্বর 1987। পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পাদক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। সমস্ত প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগিদের নাম প্রকাশিত হবে ডিসেম্বর '87 সংখ্যায়। **সম্পাদক।**

প্রতিযোগিতা 1 ঃ সুপার ক্যুইজ কনটেস্ট ॥ সুপার ক্যুইজ কনটেস্টের মোট পুরস্কারের আর্থিক মূল্য 500 টাকা। সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্যে আগে আসার ভিত্তিতে প্রথম তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। প্রথম পুরস্কার 250 টাকা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার যথাক্রমে 150 ও 100 টাকা। একই দিনে প্রাপ্ত একাধিক এবং সর্বাধিক সঠিক উত্তর দাতাদের মধ্যে পুরস্কারের অর্থমূল্য বণ্টন করা হবে। উত্তর বা সমাধানের সঙ্গে বিশেষ প্রতিযোগিতা শারদীয় কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান—1987 নামাঙ্কিত কুপনটি যথাযথ পূরণ করে পাঠাতে হবে।

প্রতিযোগিতা 2 ঃ অঙ্কের ধাঁধা ॥ উপহার ঃ বুক অব নলেজ। অঙ্কের ধাঁধা প্রতিযোগিতায় মোট পুরস্কার তিনটি। পুরস্কারের মূল্যমান সকলেরই সমান। সর্বাধিক ও সঠিক উত্তর আগে আসার ভিত্তিতে প্রথম তিনজনকেই **সমরজিৎ কর সম্পাদিত বুক অব নলেজ** গ্রন্থটি উপহার দেওয়া হবে। উত্তর পত্রের সঙ্গে শারদীয় কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান 1987—বিশেষ প্রতিযোগিতা নামাঙ্কিত কুপনটি অবশ্যই থাকা দরকার।

প্রতিযোগিতা 3 ॥ সুপার আই-কিউ টেস্ট ॥ উপহার ঃ ক্যুইজ সেট ঃ মাসিক কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের পাতায় তোমরা অনেকেই আই-কিউ টেস্ট-এ অংশ গ্রহণ করে থাক। এবারের শারদীয় সংখ্যার বিশেষ প্রতিযোগিতা হিসেবে সুপার আই-কিউ টেস্টের প্রচলন করা হল। মোট তিনটি পুরস্কার। প্রতিটি পুরস্কারের মূল্যমান সমান। অর্থাৎ আগে আসার ভিত্তিতে সর্বাধিক সংখ্যক সঠিক উত্তর দাতাদের প্রথম তিনজনকে **শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ** প্রকাশিত **ক্যুইজসেট** গ্রন্থটি উপহার দেওয়া হবে। এক্ষেত্রেও উত্তর পত্রের সঙ্গে কুপনটি যথাযথ পূরণ করে পাঠাতে হবে।

প্রতিযোগিতা 4 ঃ ফটো ক্যুইজ কনটেস্ট ॥ উপহার ঃ কিশোর গল্প সমগ্র ঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান-এর পাঠক পাঠিকরা ফটো ক্যুইজ প্রতিযোগিতার সঙ্গে পরিচিত। ছবি দেখে বলতে হবে—ছবিটা কিসের। ফটো ক্যুইজ বিভাগেও পুরস্কারের সংখ্যা তিনটি এবং প্রতিটি পুরস্কারের মূল্যমান সমান। আগে আসার ভিত্তিতে সঠিক ও সর্বাধিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনকে **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর গল্প সমগ্র** গ্রন্থটি উপহার দেওয়া হবে। [124 পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

প্রতিযোগিতা 5 ঃ সংখ্যার খেলা ॥ উপহার ঃ স্টুডেণ্টস সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া। সংখ্যার খেলা প্রতিযোগিতাতেও পুরস্কারের সংখ্যা তিনটি। প্রতিটি পুরস্কারের মূল্যমান সমান। সঠিক উত্তর আগে আসার ভিত্তিতে প্রথম তিনজনকে **অমরমাথ রায় সঙ্কলিত 'স্টুডেণ্টস সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া'** গ্রন্থটি উপহার দেওয়া হবে।

- প্রতিটি প্রতিযোগিতার জন্য আলাদা কুপন ব্যবহার করতে হবে।
- উত্তরপত্রের সঙ্গে বাড়ির ঠিকানা থাকা প্রয়োজন
- কুপন যথারীতি পূরণ করে না পাঠালে বাতিল হয়ে যাবে।
- খামের উপরে প্রতিযোগিতার বিভাগ উল্লেখ থাকা চাই।

প্রতিযোগিতা 1

সুপার ক্যুইজ কনটেস্ট

অমরনাথ রায়

1. একটি ব্যাঙ্কের সংক্ষিপ্ত নাম ADB. পুরো নামটি কি ?

2. 1987 সালের বেইটন কাপ (Beighton Cup) বিজেতা দলের নাম কি ?

3. $\sqrt{?} + \sqrt{24} = \sqrt{72}$. এখানে ? চিহ্নের মান কতো হবে ?

4 একটি অস্ত্রনির্মাণকারী বিদেশী কোম্পানীর নাম Bofors—কোম্পানীটি কোন্ দেশের ?

5. কোন্ জার্মান শহর 1987 খ্রীস্টাব্দে তার 750তম জন্মোৎসব পালন করছে ?

6. নিচের মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে কোন্‌টি মানব দেহে সর্বাধিক পরিমাণে আছে ?

(ক) কার্বন (খ) নাইট্রোজেন (গ) অক্সিজেন।

7. হুপিং কাফ (Whooping Cough) রোগ প্রতিষেধক টিকার নাম কি ?

8. ভারতের কোন রাজ্যে 'উর্দু' সরকারী ভাষা হিসাবে গৃহীত হয়েছে ?

9. এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে ?

10. পৃথিবীর গভীরতম হ্রদটির নাম কি ?

11. 'মারুতি উদ্যোগ লিমিটেড' এর কারখানা ভারতের কোন্ রাজ্যের কোথায় অবস্থিত ?

12. 1987 খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় রেলপথের একটি শাখা তাদের শততম জন্মোৎসব পালন করছে।—ঐ রেলপথের নাম কি ?

13. মাদ্রাজ শহরের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

14. 'শাহনামা' রচনা করেছিলেন কে ?

15. ভারতের পঞ্চম পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রটি নির্মিত হচ্ছে কোথায় ?

16. চিকিৎসা বিজ্ঞানে CAT কথার পূর্ণ অর্থ কি ?

17. চিকিৎসা বিজ্ঞানে MRC কথার সম্পূর্ণ অর্থ কি ?

18. বাংলা সাহিত্যে 'সদাশিব' চরিত্রটি কার সৃষ্টি ?

19. কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠা কবে হয় ?

20. গোয়েন্দা সাহিত্যে পরাশর চরিত্রটি কার সৃষ্টি।

প্রতিযোগিতা 2

অঙ্কের ধাঁধা

রতন মোহন খাঁ

ধাঁধা মানে কৌতূহলজনক দুরূহ প্রশ্ন। সোজা কথায় ধোঁকা দেওয়া, অর্থাৎ সাময়িকভাবে বোকা বানান। অঙ্ক কিন্তু যুক্তিশাস্ত্রের চরম উৎকর্ষ রূপ। কঠোর নিয়মের নিগড়ে বাঁধা এ শাস্ত্র। তাই এহেন বিষয়ে ধাঁধা হল বুদ্ধির বা কথার মারপ্যাঁচ, কোন হাত সাফাই নয়। এখন দেখি, তোমাদের একটু প্যাঁচে ফেলতে পারি কি না ?

সমস্যা 1. 1932 সালের কথা। দাদু আর নাতিতে রসিকতা হচ্ছে। দাদু বলেন—দাদুভাই, আমার এখন বয়স আমার জন্মসালের শেষ দুই অঙ্কের সংখ্যা। নাতি অবাক হয়ে বলল—সেকি দাদু, এত আমার বয়স।

তবে কি দাদু ও নাতির বয়স এক ?

সমস্যা 2. দমদম বিমান ঘাঁটিতে কর্তৃপক্ষ একটি বিমান পরীক্ষা করার জন্য এক চালককে নির্দেশ দিলেন। প্রায় সোজা উপরে উঠিয়ে চালক বিমানটিকে 500 কি.মি. উত্তরে তারপর 500 কি.মি. পশ্চিমে, তারপর 500 কি.মি. দক্ষিণে, তারপর 500 কি.মি. পূর্বে চালিয়ে নেমে পড়ল। কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ে ঘাঁটিতে বিমানটিকে দেখতে না পেয়ে চিন্তিত হলেন। বিমানটি কি ভোজবাজি হয়ে গেল ?

সমস্যা 3. রন্টু ও ঝন্টু দূরপাল্লার দূরবীনে চোখ রেখে মহাবিশ্বে কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা খুঁজে বেড়াচ্ছিল কিছুদিন ধরে। একদিন দূরবীনে ধরা পড়ল অদ্ভুত এক বস্তু। বারটি গোল গোল চোখ যেন জ্বল জ্বল করছে। কেন্দ্রগুলি 1, 2,···, 12 সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত। মজার ব্যাপার হল সরলরেখীয় যে কোন চারটি কেন্দ্রের সংখ্যাগুলির যোগফল 26। ছবিটি তোলার আগেই বস্তুটি

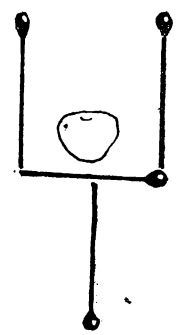

অদৃশ্য হয়ে গেল। রন্টু ও ঝন্টু আজও চেষ্টা করে চলেছে বস্তুটির ছবি আঁকার।

এ আজব ছবি কি আঁকা সম্ভব ?

সমস্যা 4. একদিন রন্টু ঝন্টুর বাড়িতে এসে দেখে ঝন্টু 4টি দেশলাই কাঠি নিয়ে ককটেল গেলাসের মত বানিয়ে পাশের ছবির মত একটি সুপারী তার মধ্যে রেখে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। রন্টুকে দেখে বলল পারিস,—কেবলমাত্র দুটি কাঠি সরিয়ে গেলাসটিকে উল্টে দিতে আর

সুপারীটিকে বাইরে আনতে ? রণ্টুও গালে হাত দিয়ে বসে পড়ল।

ওদের গাল থেকে হাত কি নামবে ?

সমস্যা 5. রাস্তায় খড়ি দিয়ে আটটি পরস্পর সামঞ্জস্য-হীন চিত্র [নিম্নে দেওয়া আছে] এঁকে এক পাগল হা হা করে হাসছে আর বলছে শুধু চলন ও ঘূর্ণনের সাহায্যে চিত্রগুলো দিয়ে এক বর্গ বানাতে পারলে 100 টাকা পুরস্কার। পাগলের কাণ্ড বলে সবাই তাচ্ছিল্যভরে মুখ-বিকৃতি করে চলে যাচ্ছে।

রণ্টু ও ঝণ্টু ছবিগুলি দেখে ভাবতে লাগল—সত্যই কি পাগলের কাণ্ড ?

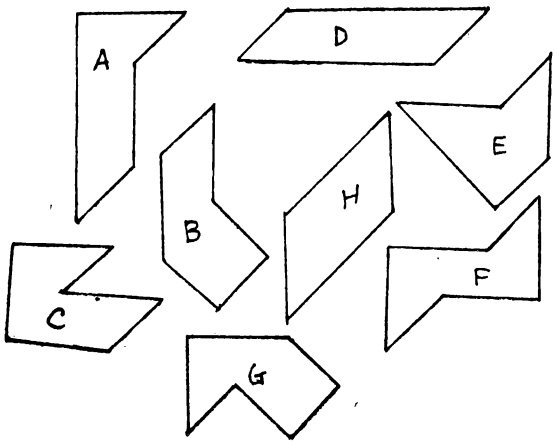

প্রতিযোগিতা 3

সুপার আই-কিউ টেস্ট

জয়ন্ত দত্ত

1. পরবর্তী সংখ্যাটি কত হবে ?

2	24	160
8	64	?

2. দুটি স্তম্ভের প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টি ঠিক ঠিক মেলাও ঃ—

1. আগাখাঁ কাপ	1. এয়ার রেসেস্
2. ডেভিস কাপ	2. গল্ফ
3. ডার্বি	3. হর্স রেসিং
4. ওয়াকার কাপ	4. লন টেনিস
5. কিংগ'স কাপ	5. হকি

3. যদি 4=0, 5=5, 6=12, 7=21 হয়। তাহলে 8=?

4. Maginot Line কী ?

5. যদি DICE শব্দটি দ্বারা 4935 সংখ্যাটি বোঝায় তবে MICE শব্দটি দিয়ে কোন সংখ্যাটি বোঝাবে ?

6. নিচের কোন সক্রিয় ধাতু তার নিজস্ব অক্সাইড দ্বারা আবৃত হয়ে নিজেকে রক্ষা করে ?

(a) সিলভার, (b) আয়রন, (c) অ্যালুমিনিয়াম

7. ফিসাইল অর্থাৎ বিভাজনক্ষম মৌল কোন্‌গুলি ?

8. ধনাত্মক আয়নগুলি ইলেকট্রনের মতো সহজে গতিশীল হতে পারলে আবিষ্ট তড়িচ্চালক বলের মান—

(a) কম হতো, (b) বেশি হতো, (c) অপরিবর্তিত থাকতো, (d) শূন্য হতো।

9. স্থানু তরঙ্গ সৃষ্টির কারণ হলো—(a) অপবর্তন, (b) প্রতিসরণ, (c) অনুনাদ, (d) ব্যতিচার।

10. নিচের পদার্থগুলির মধ্যে কোনটি তড়িতের কুপরিবাহী ? (a) অ্যাসিড, (b) বিশুদ্ধ জল, (c) গন্ধক

শারদীয় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান—1987
বিশেষ প্রতিযোগিতা অঙ্কের ধাঁধার কুপন

আমি .....

বাড়ির ঠিকানা .....

.....

বয়স ..... শ্রেণী .....

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা .....

.....

.....

বিশেষ প্রতিযোগিতার অঙ্কের ধাঁধা-এর উত্তর পাঠালাম। স্বাক্ষর

শারদীয় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান—1987
বিশেষ প্রতিযোগিতা সংখ্যার খেলার কুপন

আমি .....

বাড়ির ঠিকানা .....

.....

বয়স ..... শ্রেণী .....

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা .....

.....

বিশেষ প্রতিযোগিতার সংখ্যার খেলা-এর উত্তর পাঠালাম। স্বাক্ষর

সংখ্যার খেলা

অমরনাথ রায়

সংখ্যার খেলা বড়ই মজাদার। এ খেলা দেখিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের তাক লাগিয়ে দেওয়া যায়, আর সেই সঙ্গে নিজেও আনন্দ পাওয়া যায়। আমি কয়েকটি পদ্ধতির কথা বলছি। সেগুলি প্রয়োগ ক'রে দেখ, থট্-রিডিং এর মতো তোমার বন্ধুর মনে করা অনেক সংখ্যাই তুমি বলে দিতে পারবে। কিন্তু সংখ্যার খেলাও একটি প্রতিযোগিতা। এক ও দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থাকলেও তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তর তোমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

এক. শূন্য বাদে যে কোনও একটি সংখ্যা মনে কর। তাকে 2 (দুই) দিয়ে গুণ কর। গুণফলের সঙ্গে 1 (এক) যোগ কর। যোগফলকে 5 দিয়ে গুণ কর। গুণফলের শেষের সংখ্যাটি রেখে অবশিষ্ট সংখ্যাগুলি বর্জন কর। যে সংখ্যাটি রইলো, তাকে সেই সংখ্যা দিয়েই গুণ কর। এবার যে রাশিমালা পাবে, তার অন্তর্গত সংখ্যাগুলিকে যোগ কর। —যোগফল অবশ্যই 7 হচ্ছে, তাই না ?

দুই. শূন্য বাদে 10 এর কম যে কোনও একটি সংখ্যা মনে কর। তাকে 5 দিয়ে গুণ কর। গুণফলকে 2 দিয়ে গুণ কর। গুণফলের সঙ্গে 14 যোগ কর। যোগফল থেকে 8 (আট) বিয়োগ কর। বিয়োগফলের প্রথম সংখ্যাটি বর্জন কর। অবশিষ্ট সংখ্যাকে 3 (তিন) দিয়ে ভাগ কর। শেষে ভাগফলের সঙ্গে 10 যোগ কর। —যোগফল 12 হয়েছে তো ?

তিন. এবারে একটা সমস্যার কথা উল্লেখ করছি। এর সমাধানটি চট্‌পট্ করবার চেষ্টা কর দেখি।

নিচের ছবিতে তিনটি উল্লম্ব স্তম্ভ I, II এবং III আছে। একটি সমান্তরাল রেখা, যাতে পাঁচটি খোপ আছে। মোট তেরোটি খোপে 1 (এক) থেকে 13 সংখ্যাগুলি এমনভাবে বসাও, যাতে করে সমান্তরাল এবং উল্লম্ব খোপগুলির অন্তর্গত সংখ্যাগুলির যোগফল 25 হয়।

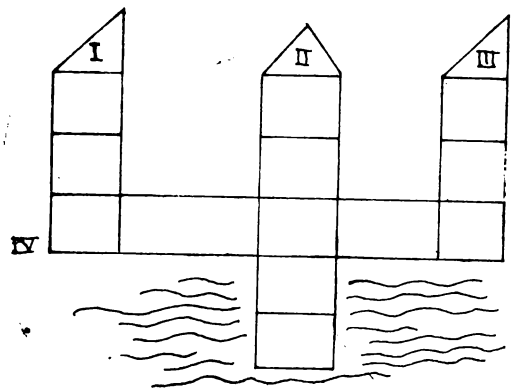

শারদীয় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান—1987

বিশেষ প্রতিযোগিতার ফটো ক্যুইজের কুপন

আমি.....

বাড়ির ঠিকানা.....

.....

বয়স ..... শ্রেণী.....

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা.....

.....

.....

বিশেষ প্রতিযোগিতার ফটো কুইজ-এর উত্তর পাঠালাম। স্বাক্ষর

শারদীয় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান—1987

বিশেষ প্রতিযোগিতা সুপার ক্যুইজ কনটেস্টের কুপন

আমি.....

বাড়ির ঠিকানা .....

.....

বয়স.....শ্রেণী.....

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা.....

.....

.....

বিশেষ প্রতিযোগিতার সুপার ক্যুইজ-এর উত্তর পাঠালাম। স্বাক্ষর

শারদীয় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান—1987

বিশেষ প্রতিযোগিতা সুপার আই-কিউ-টেস্টের কুপন

আমি .....

বাড়ির ঠিকানা .....

.....

বয়স..... শ্রেণী.....

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা .....

.....

.....

বিশেষ প্রতিযোগিতার সুপার আই-কিউ-টেস্ট-এর উত্তর পাঠালাম। স্বাক্ষর

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

কিশোর রচনা সংকলন

রচনা সূচী ঃ আমি ও আমার কাল ● অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ ● চীনে ছাত্র আন্দোলন ● পাঠাগারের ব্যবহার ● পাঠাগার ও প্রকৃত শিক্ষা ● সময়ের সদ্ব্যবহার ● শ্রমের মর্যাদা বোধ প্রভৃতি নির্বাচিত রচনার ছাত্র ও কিশোর পাঠ্য সংকলন। **দাম ১৫ টাকা**

● অপ্রকাশিত পত্রাবলী ● গ্রন্থ ও রচনা পঞ্জী ● দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র ● সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেছেন বিভাবসু ঘোষ।

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগের নতুন বই

জয়ন্ত বসু ॥ পদার্থবিজ্ঞানের বিস্ময়	১৫৲
পার্থসারথি চক্রবর্তী ॥ বুদ্ধি নিয়ে খেলা	১০৲
অমরনাথ রায় ॥ সায়েন্স এক্সপেরিমেণ্টস	১০৲
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ কিশোর গল্পসমগ্র	৩০৲
হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥ প্রেতাত্মার প্রতিশোধ	৮৲
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ॥ হারানো কাকাতুয়া	১৫৲
মনি বাগচি ॥ মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন	১২৲
হেমেন্দ্র কুমার ॥ ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন	১০৲
বিমান বসু ॥ নক্ষত্র পরিচয়	১০৲
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প	১০৲
সমরজিৎ কর ॥ পরমাণু গবেষণায় ভারত	১৫৲
সমরজিৎ কর সম্পাদিত স্টুডেণ্টস বুক অব নলেজ	২৫৲
অমরনাথ রায় সম্পাদিত স্টুডেণ্টস সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া	২৫৲

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, 86/1, **মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-9**

বাঘ নিয়ে গবেষণা

রতনলাল ব্রহ্মচারী

ব্রাঘ্র, ব্যাঘ্র, জ্বলন্ত অঙ্গার
রাত্রির অরণ্যে উলঙ্গ শঙ্কার
মূর্ত প্রতীক, কোন সুদক্ষ স্রষ্টার
অমর্ত্য শিল্পের বিচিত্র সম্ভার।*
আউম্, – আ—উ ম্।

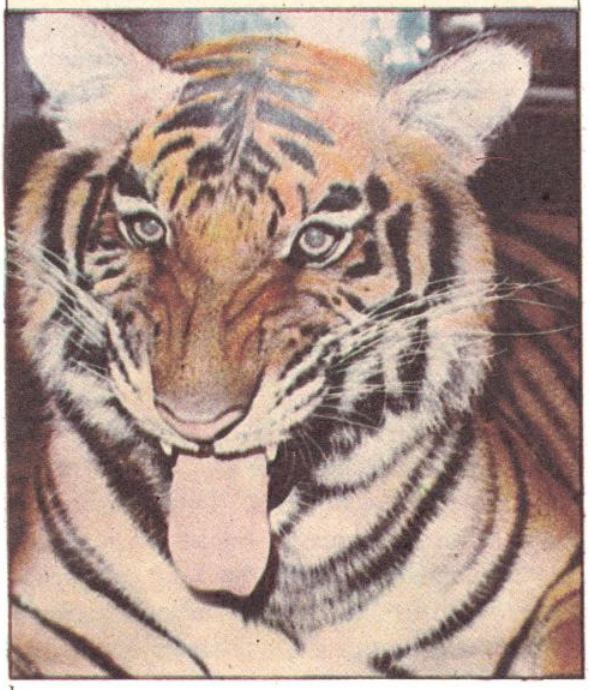

পোষা বাঘিনী খৈরীর ফ্লেমেন (flehmen) গন্ধ পেলে বাঘেরা নাক কুঁচকে জিভ বের করে দেয়। ফটো : সরোজ রায়চৌধুরী

আকাশের অন্তরাগে, দূর দিগন্তে নীলাভ গিরিমালায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো সেই গর্জন।

কুমায়ুনের বনে মাচানে বসে জীবনে প্রথম মুক্ত অরণ্যচারী বাঘের গর্জন শুনেছিলাম, সেই কতদিন আগে। পরে টর্চের আলোয় সেখানেই দেখেছি বাঘের চোখে দুটি জ্বলন্ত অঙ্গার, —যেন দুটি ক্ষুদ্রকায় পূর্ণচন্দ্র।

বাঘের দৃষ্টিশক্তি আর শ্রবণশক্তি দুইই খুব তীক্ষ্ণ। তার জীবনে, চলাফেরায়, চক্ষু-কর্ণের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাঘের ঘ্রাণশক্তি বিতর্কিত বিষয়। আফ্রিকায় সিংহের ঘ্রাণশক্তি নিয়েও অনেক বাদানুবাদ হয়েছে। যাঁরা খুব কাছ থেকে বাঘ-সিংহ পর্যবেক্ষণ করেছেন (যেমন সরোজ রায় চৌধুরী, অর্জন সিং, জর্জ এ্যাডামসন) তাঁদের অনেকেই গন্ধের সাহায্যে শিকার ধরার ক্ষমতা লক্ষ্য করেছেন। তবু এক্ষেত্রে ঘ্রাণ ক্ষমতা সম্ভবতঃ গৌণ ভূমিকা পালন করছে, কিন্তু বাঘের জীবনযাত্রার অন্য নানা ধারায়, নানা কৌশলে গন্ধের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে আগেও নানা লেখায় আলোচনা করেছি, আমাদের সাম্প্রতিকতম গবেষণার কথা বর্ণনা করবার আগে, গন্ধ ও ফেরোমোন (Pheromone)-এর সারাংশ আলোচনা করা যাক।

পুলিশের কুকুর হাজার হাজার মানুষের মধ্যে খুনীকে খুঁজে বের করে তার গায়ের গন্ধ শুঁকে। প্রতিটি মানুষ বা প্রাণীর শরীরের গন্ধে রয়েছে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। কতকটা মানুষেরই মত,—বন্য প্রাণীদের অধিকারে রয়েছে নির্দিষ্ট "এলাকা"—একক বা পারিবারিক বা গোষ্ঠিগত। এই এলাকাগুলি প্রাণীরা চিহ্নিত করে তাদের মলমূত্র ও নানা ধরনের গ্রন্থিনিঃসৃত রস থেকে। এর মধ্যেই থাকে তাদের ফেরোমোন বা সেমায়োক্যেমিক্যাল (Semiochemical)* অর্থাৎ "গন্ধদূত"—যে দূতের মাধ্যমে প্রাণীরা খবর আদান প্রদান করে (অর্থাৎ, শব্দ ও দৃষ্টি ছাড়াও, গন্ধের মাধ্যমে)। বাঘের মূত্র, ও বিশেষ করে মূত্রনালী থেকে উৎক্ষিপ্ত এক প্রকার তীব্র গন্ধী তরল পদার্থের ধারা (মার্কিং ফ্লুইড ; Marking Fluid) ফেরোমোনের বাহক।

বাঘের ফেরোমোন নিয়ে আমি ও বসু বিজ্ঞান মন্দিরের

*Blake -এর বিখ্যাত কবিতা Tiger, Tiger burning bright কবিতার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন প্রণব কুমার তাপস্বী।

*Semion অর্থ Siganl ; সঙ্কেতবাহী রাসায়নিক পদার্থ, এই অর্থে সেমায়োকেমিক্যাল শব্দটি বর্তমানে বহুল প্রচলিত।

বাঘের বাচ্চা ডোরা ফটো : লেখক

অধ্যাপক শ্রীজ্যোতি দত্ত আমাদের গবেষণা শুরু করেছিলাম। উড়িষ্যার বিখ্যাত বাঘিনী খৈরীকে দিয়ে।

সম্প্রতি ভারত-সরকার এ বিষয়ে আমাদের আরও গবেষণা করবার জন্য উদার হস্তে অর্থ মঞ্জুর করেছেন। কিন্তু কিছু সরকারী ব্যক্তির অনীহা ও প্রবল বিরোধিতার ফলে আমাদের অনেক নাজেহাল হতে হয়েছে)। গত বছর থেকে আমি, অধ্যাপক শ্রীজ্যোতি দত্ত, আর আমাদের গবেষিকা ছাত্রী শ্রীমতী অনুরাধা চক্রবর্তী উড়িষ্যার বিখ্যাত চিড়িয়াখানা নন্দন কাননে তিনটি বড় বাঘ ও একটি বাচ্চা বাঘ, ডোরা, নিয়ে গবেষণা শুরু করেছি। (এই প্রকল্পের সব বাঘের বাচ্চার নামই ডোরা। প্রথম ডোরা ছিল মহীশূর চিড়িয়াখানায়, সে ছিল বাঘিনী, স্বভাবটি তার খুবই মিষ্টি। 2নং ডোরা পুরুষ, তার মা-বাবা দুজনেই বদমেজাজী আর সে নিজেও এই গুণটি পেয়েছে। এর ওপর আমরা তাকে নিয়েছি দু মাস বয়সে, অনেকেই দেরীতে,—এক মাসের মধ্যে পোষ মানানো প্রয়োজন)। বড় বাঘগুলি পরিখা ঘেরা বিরাট জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, দিনে রাতে কখনই তাদের ঘরের ভেতরে আটকে রাখা হয় না। পরিখার জলে তারা সাঁতার কাটে। কলকাতা থেকে অনেকেই নন্দন কানন বেড়াতে যান, তাই এখানে বলে রাখছি শেষ পরিখা ঘেরা এলাকাটিতে একটি সাদা বাঘ ও তিনটি লাল বাঘিনী রয়েছে, এরাই আমাদের "গবেষণা-বাঘ"। অনেকটা প্রাকৃতিক পরিবেশে এই বাঘেদের ফেরোমোন নিঃসরণ বিষয়ে প্রচুর পর্যবেক্ষণের সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ উপায়ে তাদের মার্কিং ফ্লুইড সংগ্রহ করা হচ্ছে মাটিতে পড়ে যাওয়ার আগে। এসব আমাদের রাসায়নিক গবেষণার সামগ্রী।

সাড়ে পাঁচ মাস বয়স অবধি বাঘের বাচ্চাটিকে আলাদা করে রেখেছিলাম ওখানকার পশু হাসপাতালে। দু'জন লোক নিযুক্ত ছিল তার দেখাশোনা করার জন্য। প্রথম দিকে সকলের হাত থেকেই সে মাংসের কিমা খেত, ল্যাবরেটরির মধ্যে ঘুরে বেড়াতো, কখনও বা শিকল দিয়ে বাঁধা থাকতো। সে দিনগুলি ছিল খুবই সুন্দর,—আমরা ল্যাবরেটরিতে কাজ করছি, আর পায়ে পায়ে একটা বাঘের বাচ্চা ঘুরে বেড়াচ্ছে—ঐ অপূর্ব দৃশ্যটি মাত্র দু-চারজন দর্শকই দেখতে পেয়েছেন।

যা হোক এখন আমাদের গবেষণা থেকে জানতে পেরেছি :

বয়স্ক বাঘের মূত্রে বা মার্কিং ফ্লুইডে যে গন্ধ থাকে, 2/3 মাস বয়সের বাচ্চার প্রস্রাবে তা থাকে না, আর মূত্রের উদ্বায়ী পদার্থের সংখ্যাও তুলনামূলক ভাবে কম। এ, বয়সে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্বায়ী নদার্থ হল কিছু হাইড্রোকার্বণ। (অপেক্ষাকৃত কম. উদ্বায়ী আরও হাইড্রোকার্বনও থাকছে অবশ্য।) 4 মাস বয়সে পূর্ণবয়স্ক বাঘের গন্ধ কিছুটা বোঝা যায়, আর এ সময় আরও উদ্বায়ী পদার্থের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেল।

5 মাস বয়সের পর ডোরার মূত্রে বড় বাঘের মার্কিং ফ্লুইডের সম্ভাব্য ফেরোমোন সবগুলিই পাওয়া গেল। এগুলি হ'ল হাইড্রোকার্বন, ফ্যাটি এ্যাসিড্ (fatty acids), আরও নানা ধরনের স্নেহজাতীয় পদার্থ, অ্যামিন (amines) ইত্যাদি। এর মধ্যে কতগুলির সঠিক রাসায়নিক গঠন আমরা জানতে পেরেছি। আশা করি অন্য কতগুলি শীঘ্রই জানা যাবে।

এছাড়া আরও একটি সুগন্ধি উদ্বায়ী পদার্থ রয়েছে যার রাসায়নিক প্রকৃতি এখন আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু এটা অ্যাসিডের সাহায্যে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়, আবার ক্ষারের সাহায্যে ফিরিয়ে আনা যায়। আমাদের সুপরিচিত একটি উদ্ভিদেও এ ধরনের একটা সুগন্ধ আছে আর তার ওপরও অম্ল আর ক্ষারের ঠিক একই প্রভাব (অর্থাৎ, অম্লের প্রভাবে গন্ধটি চলে যায়, ক্ষারের সাহায্যে তাকে ফিরিয়ে আনা যায়)। এই দুটি clue বা অর্থবহ ইঙ্গিত নিয়ে আমরা এগোচ্ছি।

কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঐ হাইড্রোকার্বন। পৃথিবীতে নানা ধরনের হাইড্রোকার্বন রয়েছে,—মিথেন (methane) গ্যাস, ভেসেলিন (vaseline), ন্যাপথালিন (napthalene), কেরোসিন ইত্যাদি। নানা প্রক্রিয়ায় বাঘের হাইড্রোকার্বন-গুলি বিশুদ্ধ করে নিয়ে, Gas Chromatography-র সাহায্যে আমরা তার রাসায়নিক গঠন জানতে চেষ্টা করছি। বাচ্চা বাঘটির মূত্রে আর একটি বড় বাঘ ও একটি বড় বাঘিনীর মার্কিং ফ্লুইডে প্রচুর সংখ্যক হাইড্রোকার্বন রয়েছে যার রাসায়নিক গঠন খুবই আশ্চর্যজনক। কোন প্রাণীর দেহে এ রকম পদার্থ তৈরি হয়, এটা প্রায় ভাবাই যায় না। কিন্তু আমরা জানি 11 ও 13 কার্বন যুক্ত এমন হাইড্রোকার্বন রয়েছে দু জাতের পিপড়ের মধ্যে যা বোধহয় পৃথিবীর অভ্যন্তরে খনিজ তেল ছাড়া অন্যত্র আশা করা যায় না।

এখন এর জায়গায় হবে :

হাইড্রোকার্বন নিয়ে Gc করার একটা সমস্যা হল, অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ, যা এ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, তার মধ্যে মিশে থাকা সামান্যতম impurities এই যন্ত্রে ধরা পড়ে। তাই বাঘের হাইড্রোকার্বন-রহস্য ভেদ করা খুবই সময়সাপেক্ষ এবং নানা বাঘের মার্কিং ফ্লুইডের অনেক নমুনা প্রয়োজন হয়।

বাচ্চা বাঘিনীর কল্যাণে এমন এক ধরনের জীবাণু সংগ্রহ

করতে পেরেছি, যা তার শরীরে বাসা বেধেছে, আর সম্ভবত সাহায্য করছে হাইড্রোকার্বন তৈরি করতে এ সব জীবাণু কোন রোগের বাহক নয় বরং ফেরোমোন তৈরির সহায়ক। আমাদেব গায়ের গন্ধেও জীবাণুর অবদান রয়েছে—আমাদের দেহনিঃসৃত পদার্থের ওপর আবার কাজ করছে ঐ সব জীবাণু, তার পর আসছে সেই গন্ধ যা প্রতিটি মানুষকে করে তুলেছে অনন্য। ডোরার মূত্র থেকে সেই জীবাণু নিয়ে ল্যাবরেটরিতে বাঁচিয়ে রেখেছি। তেজস্ক্রিয় কার্বন (radioactive carbon) 14C– acetate এর সাহায্যে প্রাথমিক পরীক্ষা করে দেখেছি, বাঘের দেহের বাইরেও এরা হাইড্রোকার্বন ও অন্ততঃ আর একটি স্নেহজাতীয় পদার্থ তৈরি করতে পারে। এই জীবাণু থেকেও আমরা হাইড্রোকার্বন নিষ্কাশিত করে দেখেছি, সেগুলি বাঘের হাইড্রোকার্বনের সঙ্গে খুব ভালই মিলে যাচ্ছে।

অন্য কয়েকটি জীবাণুর হাইড্রোকার্বন নিয়ে তুলনামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এখন খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

যদি বাঘের জীবাণুতে উল্লেখযোগ্য হাইড্রোকার্বনগুলি তুলনামূলক ভাবে বেশি পরিমাণে থাকে, তবে হয়তো কোন একদিন এর সাহায্যেই জেনেটিক এঞ্জিনীয়ার বা বায়োটেক-নোলজিস্টরা এমন হাইড্রোকার্বন তৈরি করিয়ে নিতে পারবেন যা মানুষের শিল্প ইত্যাদির পক্ষে প্রয়োজনীয়।

এছাড়াও বাঘের জীবাণু আমার কাছে খুবই কৌতূহল-জনক,—আরও দুটি কারণে। হাইড্রোকার্বন যারা উৎপন্ন করে, আর হাইড্রোকার্বন যাদের খাদ্য এ দু ধরনের জীবাণুই অবদান রয়েছে ধরিত্রীর বুকে পেট্রোলিয়াম উৎপাদনে, আর পৃথিবী ও অন্যান্য গৃহে প্রাণের স্পন্দন আনতে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে পেট্রোলিয়াম তেল নানা উদ্ভিদ ও প্রাণীর (এবং জীবাণুর) দেহঃ নিসৃত পদার্থের রূপান্তর,—চাপে, তাপে ও কোন কোন জীবাণুর রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে। পেট্রো-লিয়াম তেলে পরফাইরিন (prophyrin) হোপানয়ডস্ (hopanoids) ইত্যাদি পদার্থের অস্তিত্বই প্রমাণ করে তার জৈবিক উৎপত্তি। আবার আফ্রিকার লেক টার্কানা (Lake Turkana, আগে নাম ছিল Lake Rudolf) অঞ্চলে কিছু ভূমি-জীবাণু পেট্রোলিয়াম উৎপত্তিতে সাহায্য করে। এই জীবাণু আর বাঘের জীবাণুর রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্যে একটা সাদৃশ্য রয়েছে।

আবার পৃথিবী ও অন্য গ্রহে মিথেন রয়েছে। গোল্ড্ (Gold) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বলেন পেট্রোলিয়ামের প্রাথমিক রূপ হ'ল পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ মিথেন গ্যাস যার আবির্ভাব কোন জৈবিক কারণের সঙ্গে যুক্ত নয়।

হাইড্রোকার্বন মহাকাশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, নীহারিকার প্রাচীনতম অংশ Globular Clusters এর মধ্যে সরলতম হাইড্রোকার্বন (CH) আবিষ্কৃত হয়েছে। CH_4 বা মিথেনের ছড়াছড়ি উল্লেখযোগ্য। বৃহস্পতিতে, শনিতে রয়েছে মিথেন। শনির উপগ্রহ টাইটানে আছে ঠাণ্ডায় তরলীকৃত মিথেনের সাগর। সে সাগরের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ টাইটানের বায়ু মণ্ডলের এক শতাংশ সৃষ্টি করেছে।

মহাকাশেও হাইড্রো কার্বনের ছড়াছড়ি

একবার "মিথেন খেকো" জীবাণু সৃষ্টি হলে, মহাকাশে তার খাদ্যাভাব হবে না। আবার মহাকাশে বিশেষ করে কোন কোন উল্কাপিণ্ডে নানা হাইড্রোকার্বনের পেছনে রয়েছে হয়তো পৃথিবীর বাইরেকার কোন আদিম জীবাণুর অবদান।

আমাদের মাটির পৃথিবীখানির মধ্যেই আছে নানা অসাধারণ জীবাণু যারা হয়তো এ সব রহস্য সমাধানে আলোকপাত করতে পারে,—যেমন মিথেনখেকো জীবাণু লেক টার্কানার সেই জীবাণু বা বাঘের জীবাণু।

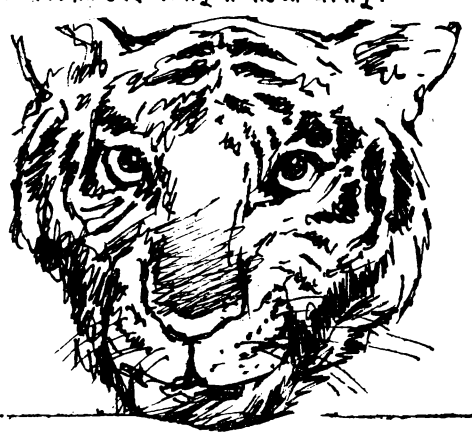

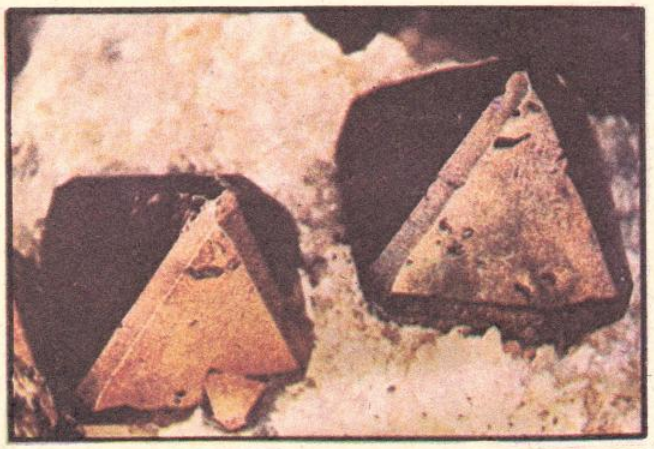

ফটো ক্যুইজ

বিশেষ প্রতিযোগিতা
শারদীয় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান 1987

ছবিটি একটি খনিজ পদার্থের যার ইংরেজী নামের আদ্যক্ষর P এবং শেষ অক্ষরের নাম E। খনিজ পদার্থটির নাম কি ?

পালিতা মা পোষা বাঘটিকে মাংস এবং গুঁড়ো দুধ খাওয়াচ্ছেন। বাঘটির নাম কি ?

উপরের ছবিতে সুন্দর ফুলগুলির নাম কি ?

চেনা অচেনা ফুল

এণাক্ষী বিশ্বাস

বোতল ব্রাশ

ফুল সবার প্রিয়। কোন কোন ফুলের সুরভি চিত্তচাঞ্চল্য ঘটায়। আবার কোন কোন ফুলের রঙের ও রূপের বাহার সহজেই মনকে হরণ করে। একটি ফুল তা সে ছোট্ট বীরুৎ বা বৃক্ষে যে কোন জায়গাতেই প্রস্ফুটিত হোক না কেন মনের গ্লানি দূর করে দিয়ে মনকে করে তোলে শান্ত, স্নিগ্ধ। দুঃখ, শোক, আনন্দ বা দেবতার পূজা সব অনুষ্ঠানেই ফুলের ব্যবহার অপরিহার্য।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ফুল গাছের জনন অঙ্গের পরিণতি। জননের বা ভবিষ্যত বংশ রক্ষার জন্য বীটপের অর্থাৎ কাণ্ড ও পাতার আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে ফুলে পরিণত হয়। সেইজন্য যদি ফুলের পাঁপড়ি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করা যায় দেখা যাবে পাতার মত পাপড়িতেও সূক্ষ্ম শিরা বিন্যাস আছে। আবার মাইক্রোস্কোপের নিচে পরীক্ষা করলে দেখতে পাওয়া যাবে পত্ররন্ধ্র। তবে তা অকেজো।

ফুলের সৌরভ বাতাসের মাধ্যমে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে মাদকতা সৃষ্টি করে আকৃষ্ট করে কীট পতঙ্গকে। আর এই কীট পতঙ্গেরা ফুলের সৌরভে মাতাল হয়ে ফুলের মধু খাওয়ার লোভে আসে, ইত্যবসরে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে লেগে যায় পরাগ। আর সেই পরাগ অন্য ফুলে মধু খাওয়ার সময় ফুলের গর্ভমুণ্ডে পড়ে পরাগযোগ ঘটায়। ফলে ফুল ধীরে ধীরে পরিণত হয়। ফলের মধ্যে থাকে গাছের ভবিষ্যত বংশধর—বীজ।

ফুলের চারিটি স্তবক থাকে। বৃতি, দলমণ্ডল, পুংস্তবক, গর্ভস্তবক। কোন কোন ফুলগুলির মধ্যে থাকে এমনই বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য যা সহজেই মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করে। যেমন—'কাগজ ফুল' বা 'বোগেনভোলিয়া' ফুলে দেখা যায় দলমণ্ডল নগন্য অথচ মঞ্জরীপত্রগুলি উজ্জ্বল, বৃহদাকার সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আবার লতানে ফুল গাছ ,পেটরিয়াতে' দেখা যায় মেঘলা নীল রঙের বৃতিগুলি দলমণ্ডল বলে ভুল হয়। প্রকৃত দলমণ্ডল কুড়ির মত দেখতে। 'অনন্তলতা' তে গোলাপী বা সাদা রঙের পাঁচটি পরিপুষ্প (যখন বৃতি ও দলমণ্ডলের পার্থক্য করা যায় না) দেখতে ভালো লাগে। আবার 'মণিকুন্তলা' ও বোতল ব্রাশ' ফুলগুলির আকর্ষণীয় সৌন্দর্য তার পুংকেশরে। 'সর্বজায়া'য় পুংকেশর পাঁপড়িতে পরিণত হয়ে আকর্ষনীয় সৌন্দর্য চতুর্দিকে আমোদিত করে তোলে।

এবার কয়েকটি ফুল গাছের সম্বন্ধে বলব।

বোতল ব্রাশ

বোতল ব্রাশ নামটা শুনতে খুব অদ্ভুত লাগছে না? সত্যি। খুব আশ্চর্য লাগবে যখন এপ্রিল-মে বা অক্টোবর নভেম্বর মাসে গাছটিতে ফুলে ফুলে ভর্তি হয়ে থাকে। ফুলগুলি লাল টকটকে তার মধ্যে লাল পুংস্তবকগুলি খোঁচা খোঁচা

সর্বজায়া

হয়ে এমন সুন্দর ভাবে বিন্যস্ত থাকে যে দূর থেকে মনে হবে কে যেন গাছের পাতার মধ্যে লাল ব্রাশ বেঁধে রেখেছে। তাইতো ইংরাজীতে বট্‌ল ব্রাশ, স্কারলেট বট্‌ল ব্রাশ বলে। হিন্দিতে লাল বোতল ব্রাশ, বাংলাতে বোতল ব্রাশ বলে। বৈজ্ঞানিক নামকরণ ক্যালিস্টেমন সাইট্রেনাস (Calistemon citrinus (curtis) skeel] ; মিটেসী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এই ক্যালিস্টেমন কথাটি গ্রীক শব্দ। ক্যালোস ও স্টেমন—ক্যালোস কথার অর্থ সুন্দর স্টেমন অর্থাৎ পুংস্তবক। প্রকৃতই এই ফুলের সৌন্দর্য পুংস্তবকের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

এই উদ্ভিদটি আমাদের দেশের উদ্ভিদ নয়। এর আদিনিবাস অস্ট্রেলিয়া। বর্তমানে এই প্রজাতিটি আমাদের দেশের জলবায়ুতে বিশেষ পরিচিত। তাই তো আজকাল এই উদ্ভিদটি সরকারী ও বেসরকারী উদ্যানে শোভা পায়। জাতীয় গ্রন্থাগার, আলিপুর চিড়িয়াখানা, আলিপুর এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগান, রবীন্দ্র সরোবর, কার্জন পার্ক, ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, শিবপুর ইত্যাদি জায়গায় এই উদ্ভিদটি দেখতে পাওয়া যায়।

এই উদ্ভিদটি উচ্চতায় প্রায় 5 থেকে 8 5 মিটার যুক্ত চিরসবুজ এবং ছোট বৃক্ষ প্রচুর শাখা প্রশাখা সমন্বিত হয়। পাতা সরল, একান্তর, পাতা অনেকটা করবী ফুলগাছের পাতার মত দেখতে হয় অর্থাৎ পাতার মধ্যভাগ চওড়া ও দুই প্রান্ত ক্রমশঃ সরু হয়ে আসে। পুষ্পবিন্যাস স্পাইক লম্বায় প্রায় 5-10 সে.মি. হয়। ফুলের বৃতি ও পাঁপড়ির সংখ্যা যথাক্রমে 5 ও 5 হয়। পাঁপড়ি ফুল ফোটার পরেই ঝরে পড়ে। পুংকেশর অসংখ্য হয়। ফুল গুচ্ছ দৃষ্টি আকর্ষক ও মনোরম। বিশেষতঃ এক গুচ্ছ ফুলের পুংস্তবকের বৈশিষ্ট্যের গুণে। ফল শিম্ব হয়।

এই উদ্ভিদটির কাঠ খুব শক্ত হয়। এই কাঠ দিয়ে পুতুল, জুতোর গোড়ালি বা কাঠের সৌখিন ভাস্কর্য্য করা হয়।

এই উদ্ভিদটির পাতা ও ডাল থেকে উদ্বায়ী তেল পাওয়া যায়। এর থেকেই প্রস্তুত হয় কফজমা শাসযন্ত্র থেকে কফ তোলার ঔষধ, দাঁত মাজার মাজন।

এই ফুল গাছটির প্রায় 15টি প্রজাতি আছে। তার মধ্যে ক্যালিস্টেমন প্যালুডোসাস এবং ক্যালিস্টেমন ডিমিন্যালিস প্রজাতিগুলি সাধারণত বাগানে হয়ে থাকে।

এই ফুলগাছটির বৃদ্ধি বীজ দ্বারা হয়।

সর্বজায়া

সর্বজায়া খুবই পরিচিত উদ্ভিদ। ব্যাপকভাবে সর্বত্রই দেখা যায়। বিশেষ করে এর বড় বড় ফুলগুলি খুবই আকর্ষণীয়। আর এই ফুল গাছটির খুব যত্নেরও প্রয়োজন হয় না।

সর্বজায়াকে অনেকে কলাবতীও বলে থাকেন। এই ফুল গাছটি বহুবর্ষজীবি বীরুৎ। উচ্চতায় প্রায় 1·2 মিটার। আমরা ফুল গাছটির মাটির ওপর যে অংশটি দেখতে পাই সেটি মূল কাণ্ড নয়। মূল কাণ্ড মাটির মধ্যে থাকে। মাটির নিচের কাণ্ডকে রাইজোম বলা হয়। রাইজোমের গায়ে শল্ক-পত্র থাকে। শল্কপত্রের কক্ষ থেকে শাখামুকুলের সাহায্যে শাখা বার হয়। এই শাখাকে বেষ্টন করে পর্ণমূল থাকে। এই ধরণের পাতাকে কাণ্ডজ বলা হয়। পাতাগুলি বড় বড় হয়। লম্বায় প্রায় 10-45 সে. মি. চওড়া 10-20 সে. মি. আকৃতিতে কন্তকটা ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু হয়।

পুষ্পবিন্যাস অনিয়ত অর্থাৎ মঞ্জরীদণ্ডের আগায় কখনও ফুল হয় না কারণ এর বৃদ্ধি কখনও বন্ধ হয় না। ফুল অগ্রোন্মুখভাবে ফোটে অর্থাৎ নিচের ফুলটি সবার আগে ফোটে ও উপরের ফুলটি সবচেয়ে শেষে ফোটে। ফুলগুলি বৃন্তহীন ও অসমান হয়। মঞ্জরীপত্র ও বৃতি সবুজ হয়। পাঁপড়ি প্রায় 2·5 সে.মি লম্বা, সোজা, সরু ও সূক্ষ্মাগ্র হয়।

এই ফুলটির সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য পুংকেশর বৃহদাকার পাঁপড়ির মত দেখতে হয়। রঙ লাল হয়। আবার হলুদ বা কমলার মধ্যে হাল্কা লাল ছিটযুক্ত হয়। অনেকেই এগুলিকে পাঁপড়ি মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলি পুংকেশর। পুংকেশরের সংখ্যা মোট ছয়। একটি পুংকেশরের পরাগধানী দুটি খণ্ডে বিভক্ত। তার মধ্যে একটি দলসদৃশ অর্থাৎ পাঁপড়ি মত দেখতে হয়। এই পুংকেশরকে বন্ধ্যা পুংকেশর বলে। পরাগধানীর অপর খণ্ডটি fertile হয়। অন্ধ পরাগধানী এই ফুলটির বৈশিষ্ট্য বহন করে। বাকী 5টির মধ্যে একটি লুক্কায়িত অবস্থায় থাকে। বাকী 4টি পাঁপড়ির আকৃতি বিশিষ্ট এবং সবচেয়ে বড় পুংকেশরকে ল্যাবেলাম বলে।

আবার গর্ভপত্রের গর্ভদণ্ডটি দল সদৃশ অর্থাৎ পাঁপড়ি মত দেখতে হয়। তাই উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত যে পাতাই ফুলের বিভিন্ন প্রকার পুষ্পপত্রে পরিণত হয়। এই ফুলটি থেকে প্রমাণ করা যায় পুংকেশর ও গর্ভকেশর একপ্রকার পাতা এবং বীটপেরই পুষ্পে পরিণতি।

ফলগুলি কাঁটা যুক্ত ক্যাপসিউল। বীজগুলি হয় কাল রঙের। আর এই কাল রঙের বীজ মালা করে গলায় পড়ে।

এই উদ্ভিদটি সংস্কৃতে ও ওড়িয়ায় সর্বজায়া, বাংলায় সর্বজায়া, কলাবতী, হিন্দি—কি আওড়া, অসমীয়াতে পারিজাত ফুল ; পাঞ্জাবী—হাকিক ; গুজরাতি—একালাবেড়া ; মারাঠী ডেভাকেলি ; মালায়াম—কাষ্টুভালা ; তামিল—পুভালাই ; তেলেগু—কৃষ্ণাটামারা ; কানাড়া—কালাহ ; ইংরাজীতে ইণ্ডিয়ান বীড ও ইণ্ডিয়ান রীড নামে পরিচিত। বৈজ্ঞানিক নামকরণ নামে ক্যানা ইণ্ডিকা এবং ক্যানেসী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। সারা পৃথিবীতে 5 টি প্রজাতি আছে।

ফটো ঃ সুবল কৃষ্ণ দে।

পরিবেশের বিষাক্ত উদ্ভিদ

তারক মোহন দাস

আমাদের চারিপাশে যে সমস্ত গাছপালা রয়েছে তারা নানা ভাবে আমাদের উপকার করে থাকে,—একথা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু তাদের মধ্যেই বেশ কিছু গাছ আছে যাদের ফুলে, ফলে, পাতায় বা শেকড়ে,বিচিত্র বিপাক ক্রিয়ার ফলে নানা রকম বিষ জমা হয়। গাছের মধ্যে কিছু গাছ আছে যাদের ফুল, ফল আমরা প্রায় প্রতিদিন ব্যবহার করছি তাই ঐ সব গাছকে চিনে রাখা তাদের কোথায় বিষ আছে জানা এবং কিভাবে সেগুলি সাবধানে ব্যবহার করতে হবে তা জেনে রাখা খুবই দরকার।

ইতিহাস থেকে জানা যায় নিছক হত্যার জন্যই এইসব বিষাক্ত গাছপালা পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই ব্যবহৃত হত। বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিসকে বিষ দিয়ে হত্যা করবার সময় হেমলক বিষ পানে বাধ্য করা হয়েছিল। হেমলক গাছের পাতা ফুল, শেকড় সবটাই বিষাক্ত। এই গাছের সারা দেহে অ্যালকালয়েড কোনিন্ কনিড্রিন ও ফনিসিন সঞ্চিত হয়। পূর্বে গ্রীসদেশে যুদ্ধবন্দীদের এই বিষ দানে হত্যা করা হত। পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে আগাছা হিসাবে এই গাছ প্রচুর হয় হেমলক গাছের একটি ছবি এখানে দেওয়া হল।

রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণকলি ফুলের ওপর একটি সুন্দর কবিতা লিখেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকলির বীজ মোটেই সুন্দর নয়। এতে ট্রাইগোনেলিন নামে বিষাক্ত অ্যালকালয়েড আছে। কৃষ্ণকলির ফুল ও পাতার ছবি এখানে ছাপান হল। এই গাছের বৈজ্ঞানিক নাম মিরাবিলিস জালাপা। এর বীজ যেন কেউ ভুলেও মুখে না দেয়। আপেল ন্যাসপাতি, এপ্রিকট, প্লুম অতি নামী ও উপকারী ফল। আমরা সকলেই যথেষ্ট ব্যবহার করি, কিন্তু এদের বীজে অতি ভয়ঙ্কর সায়ানাইড জাতীয় বিষ জমা থাকে। একটি দুটি বীজ ভুল করে খেলে কোন ক্ষতি হয় না কিন্তু একমুঠো আপেলের বীজ খেলে মৃত্যু অবধারিত। এদের ফলগুলি কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাপদ। কমলা লেবু, বাতাবী লেবু ও পাতি লেবুর বীজও নিরাপদ নয়। সাইট্রাস জাতীয় প্রত্যেক ফলের বীজই বিষাক্ত। পাতি লেবু খাবার সময় বীজগুলি যেন সমস্ত বাদ দেওয়া হয়। টুকটুকে লাল ও কালো রঙে মেশান কুঁচ ফলের বীজগুলি অতি সুন্দর দেখতে, কিন্তু এতে অতি মারাত্মক আব্রিন বিষ সঞ্চিত থাকে। একটি মাত্রবীজই একজন মানুষের মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট। কুঁচ গাছের বৈজ্ঞানিক নাম অ্যাব্রাস প্রেরাটোরিয়াস।

আমাদের দেশের সর্বত্র ল্যানটানা ফ্যামেরা নামে একরকম আগাছা প্রচুর হয়, এর বাংলা নাম জানা নেই, এখানে একটি ছবি ছাপান হল। এই ছবি দেখলে এই গাছটিকে সহজেই চেনা যাবে। এই গাছের বীজে ল্যামটোডিন নামে এক অতি বিষাক্ত পলিসাইক্লিক টারপেনয়েড জমা হয় যা খেলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। এই গাছে লাল, হলদে, সাদা ও গোলাপী রঙের ছোট থোকা থোকা ফুল হয়, দেখতে সুন্দর বলে অনেকে বেড়ার কাজেও আজকাল এই আগাছাটিকে ব্যবহার করছেন। কিন্তু এর ফলগুলি অতি মারাত্মক রকম বিষাক্ত অনেকেরই তা জানা নেই। এছাড়া শিউলি গাছের বীজ, ধুতরা গাছের ফল ও বীজ, কলকে ফুলের বীজ ফল ও গাছের আঠা অতি মারাত্মক রকম বিষাক্ত। করবী ফুলের সমস্ত গাছটাই বিষাক্ত তাদের দেহে ওলিয়ানড্রিন, ওলিয়ান ড্রোসাইড, নেরিওসাইড নামে অতি বিষাক্ত পদার্থ সঞ্চিত থাকে। বিছুটি গাছ স্পর্শ করলেই গা-চুলকয় এদের পাতা ও কাণ্ডের সূচাল রোমের মধ্যে একরকম বিষাক্ত পদার্থ থাকে তা আমাদের গাত্রচর্মে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

ব্যাঙের ছাতা বা মাসরুম আমরা অনেকে খাই, কিন্তু বেশ কিছু প্রজাতির মাসরুম আছে যা অতি বিষাক্ত। চীন, জাপান, ইয়োরোপ ও আমেরিকায় প্রতিবছর বেশ কিছু মানুষের মৃত্যু হয় এই বিষাক্ত মাসরুম খেয়ে এবং অসুস্থ হয়ে পড়ে তার থেকে অনেক বেশী। এটা বলা হয় রঙীন মাসরুমগুলিই সবচেয়ে বিপদ জনক, অথবা রান্না করবার সময় যাদের রঙ বদলায় বা ঝাঁঝাল গন্ধ নির্গত হয় তারা বিষাক্ত। কিন্তু এসব লক্ষণ না থাকলেও মাসরুম বিষাক্ত হতে পারে। তাই যাঁরা মাসরুম চেনেন বা বিশুদ্ধ মাসরুমের চাষ করেন তাদের কাছ থেকেই এটি সংগ্রহ করা উচিত। নিজেরা মাঠ ঘাট থেকে তুলে এনে রান্না করা মোটেই নিরাপদ নয়। এখানে একটি অতি ভয়ঙ্কর রকম বিষাক্ত মাসরুম অ্যানানিটা মৎসকারিয়ার ছবি ছাপা হল। এই মাসরুম রান্না করে খেলে মৃত্যু অবধারিত।

আর একটি বিষাক্ত খাদ্য বস্তু হল খেসারির ডাল। খেসারির ডালে বিটা অ্যামিনো প্রোপিওনাইট্রাইল নামে বিষাক্ত পদার্থ সঞ্চিত থাকে যা নিয়মিত ভাবে খেলে মানুষের পক্ষাঘাত রোগ হয়। এই অসুখের ভয়ে জেনে শুনে কেউ এই ডাল খায় না। তাই দামে খুবই সস্তা, আর সেই জন্যই গরীব মানুষেরা এই ডাল খায়, তাদের মধ্যে অনেকে না জেনেই খায়। এটা বলা হয় খেসারির ডাল ভালকরে সিদ্ধ করে গরম জলটা ফেলে দিলে বিষটা অনেকটা কেটে যায়। কিন্তু এটা একটা গ্রহণ যোগ্য পরামর্শ নয়। অশিক্ষিত দরিদ্র মানুষের জন্যে এই সব নিয়ম মানা খুবই শক্ত।

সবজী হিসাবে টোমাটো, আলু সম্পূর্ণ নিরাপদ, কিন্তু টোমাটো ও আলু গাছের পাতায় ও অন্যান্য সবুজ অংশে,

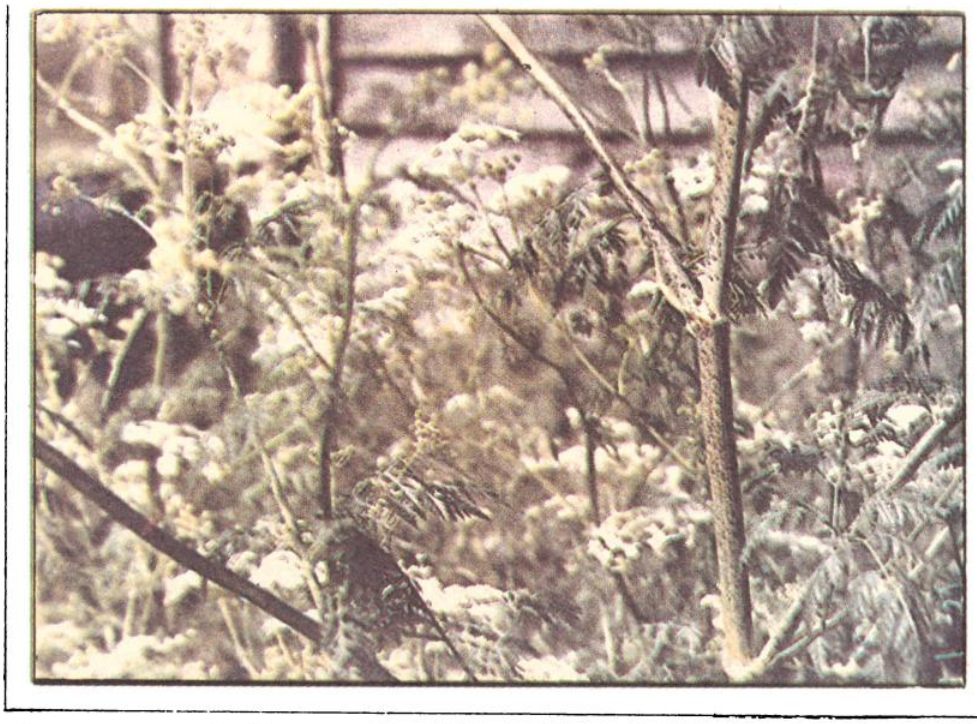

বিষাক্ত হেমলক গাছ (কোনিয়াম ম্যাকুলাটাম)। বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিসকে হত্যা করা হয়েছিল এই গাছের নির্যাস পানে বাধ্য করে।

অতি বিষাক্ত সোলানিন গ্লাইকো অ্যালকালয়েড জমা থাকে। তাই অঙ্কুরিত আলু খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর,। গবাদি পশুর পক্ষেও টোমাটো বা আলু গাছের ডাল-পালা খাওয়া খুবই বিপজ্জনক।

এছাড়া আমাদের দেশে তামাক, আফিং, গাঁজা প্রভৃতি উদ্ভিদের চাষ হয়। তামাকের পাতায় নিকোটিন উৎপন্ন হয়। আফিং গাছের কাঁচা ফলে ও রসে মরফিন, কোডিন, নারকোটিন ও পাপাডারিন প্রভৃতি বিষাক্ত অ্যালকালয়েড উৎপন্ন হয়। গাঁজা গাছের পাতা, ফুল ও ফুলের কুঁড়িতে টেট্রাহাইড্রো ফানাবিনোলস্ সঞ্চিত হয়, গাঁজা, সিদ্ধি বা মারিজুয়ানার নেশা এই থেকে হয়। এই রাসায়নিক পদার্থ-গুলি থেকে বেশ কিছু ঔষধও তৈরী হয়, তাতে মানুষের কিছুটা উপকার হয়। কিন্তু তার থেকে অনেক বেশী মানুষের ক্ষতি হয় এই পদার্থগুলির অপব্যবহারের ফলে। এই তিনটি উদ্ভিদের বিষে সারা পৃথিবীর মানুষ আজ জর্জরিত। মানুষ জেনে শুনেই এই বিষপান করে থাকে। এই বিষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত করা খুব সহজ কাজ নয়, এজন্য পৃথিবীর সকল মানুষেরই সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন।

কৃষ্ণকলি (মিরাবিলিস্ জালাপা)। ফুলটি সুন্দর, কিন্তু এর বীজ অতি বিষাক্ত।

নক্ষত্র যুদ্ধ

সুখেন্দু মজুমদার

একটা আকাশ নীল মাখানো
একটা তারায় ভরা,
একটা আকাশ হাতছানি দেয়
দেয়না তবু ধরা।

একটা আকাশ রুপোর নদী
চললে নাকি ওহে,
একটা আকাশ ভরে আছে
যোদ্ধা উপগ্রহে।

একটা আকাশ কালো মেঘের
সত্যি দারুণ গোঁয়ার,
একটা আকাশ রোদ ঝলমল
হাসি খুশির জোয়ার।

একটা আকাশ বৃষ্টি ছড়ায়
ভরায় খামার শস্যে,
সেই আকাশটা ভরে যদি
পারমাণবিক ভস্মে ?

সেদিন আমরা কোথায় যাব
ভাবতেই লাগে ভয়,
তাই বলি নক্ষত্র যুদ্ধের
প্রস্তুতি আর নয়।

এই ছড়াটা

কার্তিক ঘোষ

একটা রুমাল বেড়াল হল
হাকিম ছিল প্যাঁচাই....
পাগলা দাশুর সঙ্গে এখন
যতই কেন চ্যাঁচাই—
বলবে কে আর, কুমড়োপটাস
ধার ধারে না জানার....
গোঁফ চুরি যাক, হাসতে মানা
রামগরুড়ের ছানার !
হাট্টিমাটিম ছড়ার দেশে
হাসির রাজা একাই,
কি এঁকেছেন লেখার পাশে
আয় না তোকে দেখাই !
ছায়ার সঙ্গে কুস্তি এবং
জলের কত ধরন,
নাকের জলে, চোখের জলে,
খুড়োর কলের গড়ন।
হাঁসজারু না ট্যাঁস গরুঠিক
লাল গানে সুর গজায়,
কুমড়ো নিয়ে রাজার পিসি
ক্রিকেট খেলে মজায় !
এসব লেখা যাঁর, তিনি তো
সবার প্রিয় মানুষ....
তাই ছড়াটা তাঁকেই দিলুম
এর মানে কি জানুস ?

টুকুনের পরীক্ষা

সুধীন্দ্র সরকার

গাছের থেকে পড়বে আপেল
এটাই ধ্রুব সত্য,
অভিকর্ষের নিয়ম-কানুন
নিউটনেরই তথ্য।

যে কোনও ফল এই নিয়মে
মাটির টানে নামে,
কেন ? সেটা পাল্টাতে তাই
দুষ্টু টুকুন ঘামে।

ভাবতে ভাবতে টুকুন দেখি
ফেভিকলের পেস্টটা,
লিচু গাছের গোড়ায় দিয়ে
করলে কঠিন চেষ্টা।

জলের সঙ্গে ফেভিকলের
মিশ্রণটা বোঁটাতে
কাণ্ড বেয়ে পৌঁছে গেলে
ফলকে পারে আটকাতে।

কিন্তু, তবু টুপ-টাপ-টুপ্
পড়ছে অবিরত ;
মিষ্টি মিষ্টি লিচুগুলো
গাছতলাতে কত !

গাছকে যদি ওল্টানো যায়
তাহলে কী হয় ?
ফলরা তখন মাটির বুকে
পড়বে না নিশ্চয় ?

॥ লিমেরিক ॥

রূপক চট্টরাজ

বাজার থেকে বেছেই মামা কিনে আনলেন বেগুন
রান্নাঘরে দিয়ে বলেন, বোঝে এ সবের কে গুণ ?
মামী দেখেন বেগুন কানা
বোঝান মামা, আরে না, না
কীটনাশকতো পড়েনি এতে, তাই
ভিটামিন তে-গুণ ॥

লিমেরিক

লক্ষ্মণ কুমার বিশ্বাস

বৈজ্ঞানিক আর দার্শনিকে চলছে লড়াই দেশ জুড়ে
কে বাঁচাবে এ দেশটাকে ? বোমবাজি আর ভাঙচুরে
থামিয়ে দিয়ে কোন কারিগর
রাখবে অটুট দেশ-বাড়ি-ঘর ?
কেতাবী সব ভাষণ যত ঝোড়ো হাওয়ায় যায় উড়ে।

এক : অমানুষের আবির্ভাব

'আজ্ঞে না, আমি ভূত নই।'

'তবে তুমি কে?'

'অমানুষ।'

'সে তো আরও ভয়ঙ্কর। ভূত নও, প্রেত নও, মানুষ নও,—অমানুষ। দেখতেও তোমাকে

অতি বিকট। বৎস আগন্তুক, তোমার আগমনের অভিপ্রায় ?'

'সেটা বলতেই এসেছি।'

'বলে ফেললেই হয়। এত ধানাই পানাই কেন ?'

'আমার চেহারাটা দেখে আঁৎকে উঠলেন কেন ?'

'মূর্খ! প্রফেসর নাট বল্টু চক্র কাউকে দেখে আঁৎকায় না। আমি অবাক হয়েছিলাম। ঐ তো দীননাথ সব শুনছে। ওকেই জিজ্ঞেস করো না।'

লোকটা এতক্ষণ টুলে বসেছিল। প্রফেসর ওর সামনের চেয়ারে বসে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দন্তহীন মাড়িতে সুড়সুড়ি দিতে দিতে কথা বলছিলেন। আমি চৌকাঠ পেরিয়েই থমকে গেছিলাম তার চকচকে মাথা দেখে। মানুষের মাথায় সচরাচর টাক পড়ে সামনে, পেছন দিকে কিছু না কিছু চুল থাকে। এর পেছনটা বিলকুল চকচকে। গায়ে জামাকাপড়ের বালাই নেই। ইলেকট্রিক বাল্ব-এর আলো ঠিকরে যাচ্ছে তার চকচকে গা থেকে। কারণ, গায়ে সাজানো রয়েছে বড় বড় আঁশ। মাছের গায়ের আঁশের মত। পিঠের দুপাশে ফুলে রয়েছে। দুটো ফুটো দেখা যাচ্ছে সেখানে। সবুজ শ্যাওলা জমেছে সর্বাঙ্গে। তবুও চকচক করছে ধাতু।

তার গা থেকে জল পড়ছে। মেঝে ভিজে গেছে। ঐ জন্যেই নিশ্চয় চেয়ারে বসতে দেননি —টুলে বসিয়েছেন।

প্রফেসর যখন বললেন 'ঐ তো দীননাথ সব শুনছে। ওকেই জিজ্ঞেস করো না।—তখন তার উচিত ছিল সবেগে ঘুরে বসা, অথবা তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠা।

কিন্তু সে এ সবের ধার দিয়েও গেল না। পিঠ খাড়া করে যেমন বসেছিল, ঠিক সেই ভাবেই বসে রইল।

বলল—'আমি দেখেছি।'

প্রফেসর মাড়িতে সুড়সুড়ি দেওয়া বন্ধ করলেন। দেশলাইয়ের কাঠি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। চোখ কুঁচকে আগন্তুকের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন।

তারপর বললেন—'কি করে দেখলে ?'

'আমার মাথার পেছন দিকেও একটা চোখ আছে।'

'তোবা! তোবা! মাথার সামনে একটা চোখ—মাছের চোখের মত। পেছনেও একটা চোখ। তুমি তো ভয়ঙ্কর অমানুষ হে।'

এতক্ষণে আমার নজরে এল চোখটা। ঘরের আলো সামনের দিক থেকে লোকটার মুখে পড়ছিল, ওপরেও একটা আলো জ্বলছিল। কিন্তু টেকো মাথার—পেছন দিকটা ঢিবি হয়ে থাকায় তলার খোঁদলে কি আছে দেখা যাচ্ছিল না।

এবার ঠাহর করতেই দেখতে পেলাম চক্ষু-রত্নটিকে। রত্ন ছাড়া তাকে আর কি বলব ? বিলকুল গোল। যেন একটা কাটাই করা দামী পাথর সেট করা রয়েছে খোঁদলের মধ্যে।

সে চোখে পাতা নেই। মাছের চোখেও পাতা থাকে না।

নির্নিমেষে অমানুষিক চাহনি মেলে রয়েছে সেই চক্ষু—আমার দিকেই।

গা শির শির করে উঠেছিল আমার। নিষ্পলক চোখের দিকে তাকিয়ে সভয়ে দাঁড়িয়েই রইলাম আমি।

প্রফেসরের কিন্তু ভয়ডর নেই। বরং বিলক্ষণ কৌতুকেই আছেন মনে হল। ফিক করে একটু হেসেও ফেললেন।

বললেন—'বাপু হে অমানুষ, এসেছি দীঘায় বেড়াতে—তোমার কেচ্ছা শুনতে নয়। তোমার বদখৎ মুখ আর বপু দেখে আমার গুণধর অ্যাসিস্ট্যান্টটি ভয় পেয়েছে। তোমার সামনে একটা চোখ, পেছনে একটা চোখ। তোমার মাথায় চুল নেই, গায়ে লোম নেই—শুধু আঁশ আর আঁশ। তোমার সারা গা দিয়ে জল ঝরছে, তোমার গা থেকে বিচ্ছিরি গন্ধও বেরোচ্ছে।

কাজেই তুমি চটপট বিদেয় হলে আমি বড়ই খুশি হব।'

লোকটা কথা বলছিল খুব কষ্ট করে। এক-একটা শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে যেন হাঁপিয়ে যাচ্ছিল। হাপর চালালে যেমন সোঁ-সোঁ শব্দ হয়, ঠিক তেমনি শব্দ হচ্ছিল। টুলের ওপর স্ট্যাচুর মত বসে থেকে সে শুধু বললে—'আমার কথা না শুনলে আপনাদের অবস্থা হবে আরও শোচনীয়।'

প্রফেসর একটু নড়েচড়ে বসলেন,—'আসা হচ্ছে কোথা থেকে?'

জবাব দিল না কিম্ভূত লোকটা। কেটে গেল কয়েকটা সেকেণ্ড। পেছন থেকে আমি দেখলাম ঝকঝকে পাথরের মত চোখটায় যেন রঙ বেরঙের আলোর আনাগোনা দেখা গেল। তারপর সব রঙ আবার মিলিয়ে গেল।

প্রফেসরও চেয়েছিলেন সামনের দিকের চোখের পানে। বিস্ফারিত দুই চোখে ঘনীভূত বিস্ময় দেখে বুঝলাম, ওই চোখেও আলোর ঝলক তিনি দেখেছেন।

বললেন—'সংকেত এল মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, এল।'

'এত আলোর খেলা দেখিয়ে কারা সংকেত পাঠাচ্ছে?'

'এখুনি শুনবেন।'

'কি বলবে, তা জানিয়ে দেওয়া হল?'

'হ্যাঁ।'

'এখনো কিন্তু বলোনি নিবাস কোথায় তোমার।'

'নিজের চোখেই দেখবেন, তাই আর বলতে চাই না।'

'তুমি কথা বলছ ঠিক মেশিনের মত গলায়। স্বরের ওঠানামা নেই। যেমনি বিচ্ছিরি তোমার কথা, তেমনি বিটকেল তোমার চেহারা, তেমনি কদাকার তোমার চোখ। হে অমানুষ, তোমার শ্রীনিবাস দেখবার কোনও বাসনা আমার নেই। আমার ঘুম পেয়েছে, আসতে পারো।'

লোকটা এবার টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। রুপোলী অাঁশগুলো ঝকঝক করে উঠলো বিদ্যুৎবাতির আলোয়।

যান্ত্রিক স্বরে সে বলে—'সংকেতেই হুকুম এল, আপনাদের নিয়ে যেতে। যাওয়ার দরকার হত না যদি আমাকে কথা বলতে দিতেন।'

প্রফেসরও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—'যতো সব আপদ! দূর হও এখুনি।'

লোকটার মাথার পেছনে পাথরের মত চোখ থেকে যেন বিদ্যুৎ ঠিকরে এল। চকিতের জন্যে দেখলাম, তার মাথার সামনের দিকের চোখ থেকেও বিদ্যুৎ-রশ্মি ঠিকরে গেছে প্রফেসরকে নিশানা করে। তীব্র ঝলকে উদ্ভাসিত তাঁর মুখমণ্ডল। দুই বিস্ফারিত চোখে সুনিবিড় বিস্ময়বোধ। ভয় নেই, আতঙ্ক নেই—শুধু বিস্ময়।

তারপর আর কিছু মনে নেই।

দুই : মেসিন-সম্রাটের খপ্পরে

এরপর মনে আছে আচ্ছন্নের মত হেঁটে যাচ্ছি দীঘার সমুদ্রের দিকে। ভিজে বালির ওপর দিয়ে পাশাপাশি হাঁটছি আমি আর প্রফেসর। সামনে কিছু দূরে চলেছে সারা গায়ে আঁশঢাকা বিচিত্র সেই অমানুষ। সে পেছন দিকে ঘাড় না ঘুরিয়েও পেছনে আমাদের দুজনকে দেখতে পাচ্ছে পেছনের চোখ দিয়ে।

আমরা হাঁটছি যেন ঘুমের ঘোরে। স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যেন দেখছি ঢেউয়ের মাথায় ফেনার মুকুট, শুনছি চাঁদের মৌন সঙ্গীত। আমার প্রাণে শঙ্কা নেই, মনে কৌতূহল নেই, কোথায় চলেছি তা নিয়েও মাথাব্যথা নেই। কেন যাচ্ছি, তাও জানি না। শুধু যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি।

অমানুষ নেমে গেল জলের মধ্যে। আরও গভীরে। অনেকদূরে তার চকচকে টাক মাথার ওপর দিয়ে ঢেউ চলে যাচ্ছে। সে কিন্তু এখনও ঘাড় ঘোরায়নি।

আমরাও সম্মোহিতের মত জলে নেমেছি। শীতল জল আমাদের মোহভঙ্গ ঘটায়নি। বরং ভালই লাগছে। স্বপ্নের মধ্যে এরকম ভাললাগা অনুভূতি অনেক সময় হয়। আমরাও বুঝি স্বপ্ন দেখছি।

জল কোমর ছাড়িয়ে গলা পর্যন্ত পৌঁছলো। ঢেউ আমাদের টলিয়ে দিচ্ছে। তবুও এগিয়ে যাচ্ছি। কোথায়? কেন? জানি না।

দূরে চাঁদের আলোয় ধোওয়া অমানুষের অমানুষিক মাথা ল্যাম্পপোস্টের মত খাড়া। লাইটহাউসও বলা চলে। কেননা, সামনের পাথরের চোখ থেকে মাঝে মাঝে সার্চ-লাইট ঠিকরে যাচ্ছে গভীর সমুদ্রের দিকে। আলোক সংকেত নিঃসন্দেহ। তার নমুনাও পেলাম সঙ্গে সঙ্গে।

সমুদ্র যেখানে দিগন্তে মিশেছে, সেইখানে অনুরূপ সার্চলাইটের ঝলক দেখলাম একবার···দুবার···তিনবার। তারপরেই তা নিভে গেল।

আমরা জল ঠেলে ঠেলে যখন অমানুষের ঠিক পেছনে পৌঁছেছি, আচমকা ভু-উ-উ-স করে একটা জলযান ভেসে উঠল আমাদের পাশেই।

আমরা দুজনে কেউই অবাক হলাম না।

শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম আজব জলযানকে। স্পীডবোটের মতন দেখতে। মাথায় কিন্তু ছাউনি। সব মিলিয়ে যেন একটা ডাংগুলির গুলি। লম্বায় প্রায় পনেরো ফুট। সারা গায়ে চকচকে ধাতব আঁশ।

নিঃশব্দে একটা প্লেট সরে গেল জলযানের গা থেকে। আমাদের কিছু বলতে হল না। সুবোধ বালকের মত প্রথমে আমি ঢুকলাম ভেতরে। তারপর টেনে নিলাম প্রফেসরকে।

প্লেট সরে এল। এবার আর তা ধাতুর নয়। কাঁচের

স্বচ্ছ পদার্থের। আমরা দেখলাম নিমেষে সমুদ্রের জল ঢেকে দিল সেই জানলাকে। বুঝলাম, জলে ডুব দিল যন্ত্রযান।

জলের তলায় অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে জোরালো আলোয়। এ আলো বেরোচ্ছে ডুবো যানের গা থেকে। তীব্র বেগে ছুটছে যন্ত্রযান। ভয়ানক সেই বেগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অক্লেশে ধেয়ে চলেছে অমানুষ—স্বচ্ছ জানলার ঠিক পাশে পাশে। সাঁতার কাটছে না। দুহাত বুকের ওপর ভাঁজ করে রেখেছে। পিঠের দুটো ফুটোর কাছে শুধু জল তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে।

বুঝলাম, প্রচণ্ড শক্তির প্রবাহ বেরিয়ে আসছে ঐ দুটি ছিদ্র থেকে। তারই ধাক্কায় জীবন্ত জেটযানের মত বেগে ধেয়ে চলেছে অমানুষ।

নিরাসক্ত চোখে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নরম গদীর ওপর।

ঘুম ভাঙল দুজনের একসঙ্গেই।

সামনের প্লেট খোলা। গদীর বিছানা থেকে উঠে বেরিয়ে এসেছিলাম দুজনে।

দেখেছিলাম, ডুবোযান এখন মেঝের ওপর উঠে এসেছে। জল নেই আশেপাশে কোথাও।

মেঝেটাও অদ্ভুত। সিমেণ্টের বা পাথরের নয়—ধাতুর। ধাতুর চাদর জুড়ে জুড়ে তৈরি মসৃণ মেঝে। তার গায়ে অজস্র নকশা। উদ্ভট। হেঁয়ালীপূর্ণ।

আশ্চর্য এই মেঝে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত। শেষ দেখা যাচ্ছে না। অনেক উঁচুতে একটা ছাদ আছে বটে, কিন্তু তা এত উঁচুতে যে, তা কি দিয়ে তৈরি বোঝা যাচ্ছে না।

সীমাহীন প্রান্তরের মাঝে দাঁড়িয়ে আমরা তিনজন। আমি, প্রফেসর আর অমানুষ। আর সেই জলযান।

সমস্ত প্রান্তর ঠাণ্ডা আলোয় আলোকিত। এ আলো কোত্থেকে আসছে, তা বোঝা যাচ্ছে না।

আমার এবং প্রফেসরের আগের ঘুম-ঘুম ভাবটা এখন আর নেই। যেন ঘুম ভাঙল। স্বপ্ন দেখা শেষ হল।

দেখলাম, রুষ্ট নয়নে অমানুষের দিকে তাকিয়ে আছেন প্রফেসর। কথা বলতে গেলেন বেশ কড়াভাবে, তার আগেই সবুজ রশ্মির ঝলক দেখলাম তার একটা পাথরের চোখে।

রশ্মিরেখা জলযানকে স্পর্শ করল। তলার মেঝে নিঃশব্দে সরে গেল। জলযান গহ্বরের মধ্যে তলিয়ে গেল। মেঝে আবার সরে এল। এতটুকু ফাঁক আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

এখন আমরা শুধু তিনজন। অমানুষ ভয়ানক পাথর-চোখ মেলে দেখছে আমাদের।

তিরিক্ষে গলায় প্রফেসর বললেন—'কিডন্যাপিং-এর মজা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেব বাছাধন।'

অমনি আশপাশের বাতাস থর থর করে কেঁপে উঠল একটা ভয়াট গম্ভীর কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য সুরেলা সেই গলার আওয়াজ গুমগুম করতে করতে মাঝের ধাতুর চাদরের ওপর দিয়ে মিলিয়ে গেল দূরে···দূরে···অনেক দূরে।

কণ্ঠস্বর বললে—'প্রফেসর, ওর গায়ে হাড় নেই।'

'কার কণ্ঠস্বর?' আশপাশে চাইতে চাইতে বললেন প্রফেসর—যেন নাটকের সংলাপ বলছেন।

'আমার।'

'তুমি কে হে ছোকরা?'

ছোকরা! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! 'অট্টহাসি যে এরকম বজ্রগর্ভ নিনাদিত হতে পারে, সেদিন তা বুঝলাম। ধাতুর মেঝে পর্যন্ত বুঝি ঝনঝন করে কেঁপে উঠল বিশাল আওয়াজের সেই অট্টহাসিতে। 'প্রফেসার নাট বল্টু চক্র, আমি ছোকরা নই, বৃদ্ধ নই, শিশু নই। আমার বয়স নেই।'

'তবে তুমি পাগল।'

'সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝবেন এখুনি। আপনাদের হাড় আছে বলেই বুঝবেন। ওর কিন্তু নেই।

'মানে ওই অমানুষটার?'

'অমানুষ তো বটেই। প্রায় মানুষের মতই। কিন্তু আদতে একটা মেশিন। আমার নাম্বার ওয়ান সুপার কমপিউটার। সিলিকন-চিপ দিয়ে তৈরি।'

'সেইরকম সন্দেহ ছিল আমার। চোখের পাথরটা যে লেন্স আর বডিটা যে মেট্যালের—তা বুঝেছিলাম প্রথম দর্শনেই।'

'সেটা বোঝবার বুদ্ধি আছে বলেই আপনাকে এখানে আনা হয়েছে। এখন কাজের কথা।'

'কান খাড়া করলাম, মেশিন-সম্রাট।'

মেশিন-সম্রাট? হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ!'

অট্টহাসির দমকেই কিনা জানি না, আওয়াজের ধাক্কায় বাতাসের আলোড়নের জন্যেই কিনা বলতে পারব না—অকস্মাৎ বিকট হুংকারে ভয়াবহ ঝড় তেড়ে এল দৃশ্যমান অদৃশ্যলোক থেকে। মসৃণ মেঝেতে আমরা কিছুই আঁকড়ে ধরে থাকতে পারলাম না।

ঝড় আমাদের উড়িয়ে নিয়ে গেল শূন্য পথে।

পাকসাট খেতে খেতে উড়ে যেতে যেতে দেখলাম, ধাতুর মেঝেতে নিশ্চয় চুম্বকের পা লাগিয়ে স্ট্যাচুর মত খাড়া রয়েছে অমানুষ।

তিন : বরফলোকের বিভীষিকা

কত দিন, কত মাস, কত বছর না জানি শূন্যপথে ডিগবাজি খেতে খেতে এইভাবে উড়ে গেছিলাম। হিসেব? মনে রাখা অসম্ভব। সময় কি হারিয়ে গেছিল। হয়তো

সম্ভব। হুঁশ ছিল কি! কখনো ছিল, কখনো ছিল না। কখনো অনেক অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখেছি। কখনো তাল তাল তমিস্রাপুঞ্জ দৃষ্টিপথকে রোধ করেছে। কখনো অকথ্য যন্ত্রণায় মগজের ষাট মহাপদ্ম স্নায়ুকোষ মৌন আর্তনাদ করেছে। কখনো তারা সুপ্তি আর লুপ্তির টানাপোড়েনে ঘোরের মধ্যে চলেছে।

আমরা দেখেছি হাজার রঙের স্রোত আশপাশ দিয়ে তীব্র বেগে বয়ে চলেছে। আমরা দেখেছি এই স্রোতের টানে ভেসে যেতে যেতে অকস্মাৎ এনার্জির বিস্ফোরণে সব রঙ ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে দিকে দিকে সোনা রুপো হীরেমানিক চুনি পান্নার অজস্র কুচির মত। আমরা দেখেছি কী এক মহাশক্তির অবর্ণনীয় আকর্ষণে অকস্মাৎ আমাদের দেহ মাইলব্যাপী লম্বা হয়ে গেছে—সরু সুতোর মত দেহ নিয়ে আমি আর প্রফেসর পাশাপাশি অনেক ব্ল্যাক হোল-এর মত এনার্জিপুঞ্জকে এঁকেবেঁকে পাশ কাটিয়ে ধেয়ে চলেছি তো চলেইছি। বিস্ময়কর এবং অতীব অবিশ্বাস্য এই মহাযাত্রার শেষ কোথায়, অন্তে কি পরিণতি অপেক্ষা করছে, অদৃষ্টে কি আছে—তা নিয়ে একবারও ভাবিনি··· ভাববার অবকাশ পাইনি।

সবচেয়ে অবাক কথা এবং অসহ্য অবস্থাও বটে, কানের কাছে বিরামহীনভাবে নিনাদিত হয়ে চলেছিল সেই অপার্থিব অট্টহাসি। ভয়ানক গম্ভীর, আশ্চর্য সুরেলা এবং বিকট করাল কণ্ঠস্বরে অনেক কথাও শুনিয়ে গেছে অট্টহাসির ফাঁকে ফাঁকে। সব কথা মনে নেই প্রাণান্তকর ঐ অবস্থায়। কতগুলো কথা একেবারেই গেঁথে গেছে মগজের কোষে কোষে।

'প্রফেসর! মাস্টার দীননাথ! আমার রাজত্বর কিছুটা দেখিয়ে দিচ্ছি।···না, না, এগুলো নিছক রঙের স্রোত নয়—এরা আমারই যন্ত্রপাতির বিকিরণের প্রবাহ। ঐ যে বিস্ফোরণটা দেখে আঁতকে উঠলেন—ওই থেকেই শক্তি ছুটে যাচ্ছে আমার সাম্রাজ্যের দিকে দিকে। ও রকম বিস্ফোরণ মাঝে মধ্যেই দেখবেন। শক্তি! শক্তি! শক্তি! মহাশক্তিদের খেলা চলছে এখানে—আমারই হুকুমে·· আমারই পরিকল্পনায়। আমি কে? যথাসময়ে তা জানবেন। এসে গেল আমার অগুন্তি কারখানার একটা কারখানা—কেল্লায় ঢুকতে হলে আপনাদের শরীরগুলোকে সরু করে নিতে হবে···তাই করে দিচ্ছি·· সুতোর মত সরু··· মাইলখানেক লম্বা· কি রকম লাগছে প্রফেসর মশাই? মাস্টার দীননাথ। এসে গেছে কারখানা···এইবার ফিরিয়ে দিচ্ছি আপনাদের দেহ।'

আচম্বিতে এক ঝটকায় ফিরে এল আমাদের আগেকার অবস্থা। হাড়মাস যেন কঁকিয়ে উঠল সেই ঝটকানিতে।

আমরা দেখেছি হাজার রঙের স্রোত আশপাশ দিয়ে তীব্র বেগে বয়ে চলেছে।

তুলোর মত আমরা ভাসতে লাগলাম শূন্যে। কনকনে ঠাণ্ডায় কাঁপতে লাগলাম ঠক্‌ঠক্‌ করে।

কেননা, পায়ের তলায় দেখলাম ধু-ধু বরফের রাজত্ব। ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে—যেদিকে তাকাই শুধু বরফ আর বরফ। কোথাও তা পাহাড়ের মত উঁচু, কোথাও তা সমতলের পর্যায়ে। দিগন্ত বিস্তৃত এই বরফলোকের ওপর জায়গায় জায়গায় ভাসছে লাল নীল সবুজ হলদে বেগুনী কমলা রঙের মেঘ আর কুয়াশা। নরম আলোর ঝিকিমিকি লক্ষ নক্ষত্র হয়ে যেন ঠিকরে ঠিকরে যাচ্ছে এদের গা থেকে, বরফের বুক থেকে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে যখন এই দৃশ্য আমরা দেখছি, ঠিক তখনি নিচ থেকে দু-দুটো রশ্মি ধেয়ে এলো আমাদের লক্ষ্য করে। কচি কলাপাতা রঙের ঠাণ্ডা রশ্মি জড়িয়ে গেল আমাদের সর্বাঙ্গে। যেন কোমল পরিচ্ছদে আবৃত হল মাথা থেকে পা পর্যন্ত।

তারপর সেই রশ্মি আমাদের একটু একটু করে টেনে নামিয়ে আনল মেঝেতে।

না। এখানকার মেঝে ধাতু দিয়ে তৈরি নয়—বরফে ঢাকা। এবং আমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে সেই অমানুষ—যার সারা গা আঁশে ঢাকা, যার পাথর চোখে এইমাত্র ঢুকে গেল রশ্মি দুটো আমাদের ওপর থেকে নিচে টেনে নামিয়ে আনবার পর।

রশ্মি এখন আর আমাদের জড়িয়ে নেই। আমরা হাত-পা নাড়তে পারছি। চোয়াল নাড়তেও পারছি।

সুতরাং প্রথমেই দাবড়ানি দিলেন প্রফেসর—'বেল্লিক বেকুব কোথাকার! আমরা মানুষ না অমানুষ?'

'মানুষ'—সংক্ষিপ্ত উত্তর অমানুষের।

প্রফেসর তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। একটা তাগড়াই জবাব দিতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে দূরে চোখ পড়তেই বাকরোধ ঘটল।

আমিও তাকালাম সেদিকে। মনে হল যেন লকলকে শিখা চতুর্দিকে ছড়াতে ছড়াতে একটা ভীমকায় নরকপুঞ্জ উল্কাবেগে ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে।

দেখতে দেখতে অনেক কাছে এসে গেল পুঞ্জটা। প্রতিটি শিখা শুঁড়ের মত শূন্যে কিলবিল করে উঠেই আবার ঢুকে যাচ্ছে শরীরের মধ্যে। রঙবেরঙের ফুলকি ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে শুঁড়গুলোর ডগা থেকে।

'চলমান তারাবাজি নাকি?' অস্ফুট কণ্ঠে বলে ফেললেন প্রফেসর।

আশ্চর্য আতশবাজি নিঃসন্দেহে—বললাম আমি।

কানের কাছে আবার ধ্বনিত হল সেই অবর্ণনীয় মেঘ-মন্দ্র কণ্ঠস্বর—"মূর্খ! অপটিক্যাল কমপিউটরের নাম শোনেননি?"

জুল জুল করে তাকালেন প্রফেসর—তা শুনেছি।"

'দেখতে পাচ্ছেন না ওর সারা গায়ে কৃস্ট্যালের মধ্যে দিয়ে লেসার রশ্মি ছুটে ছুটে যাচ্ছে।

তাও তো বটে! আগুনের ফুলকি বলে যাদের ভেবেছিলাম সেগুলো তো ছোট ছোট রশ্মি ছাড়া কিছুই নয়। লক্ষ রশ্মি লক্ষ কৃস্ট্যালের মধ্যে দিয়ে ছুটোছুটি করছে। লক্ষ রামধনু ঝিলিক দিয়ে উঠছে। এ যে কল্পনাও করা যায় না।

লক্ষ অগ্যানি-কণ্ঠে বললে অদৃশ্য সত্তা—"এই হল গিয়ে আমার দোসরা নম্বর সুপার কমপিউটার। এর কাজ শুধু পাহারা দেওয়া— অরগ্যানিক সুপার কমপিউটারকে বাড়তে দেওয়া।"

"অরগ্যানিক সুপার কমপিউটার!" প্রফেসর নাট বল্টু চক্র ঢোঁক গিললেন মনে হল?

দৈববাণীর কণ্ঠস্বরে এবার বুঝি বিদ্রূপ ঝরে পড়ে—জী হ্যাঁ, প্রফেসর। বায়ো-ইঞ্জিনীয়ারিং টেকনিক নিয়েই তো যত খেলা আমার এই সাম্রাজ্যে।"

আমার মাথায় তখন এত কচকচি ঢুকছে না। আমি সভয়ে চেয়ে আছি হাত-চকীবাজির মত কিম্ভূত অপটিক্যাল সুপার কমপিউটারের দিকে। আমি জানি না কথাটির মানে কি, কিন্তু ওই নামের বস্তুটি যে সর্বনাশের সঙ্কেত বহন করে চলেছে প্রতিটি বিদঘুটে আচরণের মধ্যে, সে বিষয়ে নেই কোন সন্দেহ।

অজস্র আকারের এবং অবিশ্বাস্য বর্ণের কৃস্ট্যালগুলো এখন অবিরাম রোশনাই বিকিরণ করে চলেছে লক্ষ রশ্মির আঘাতে। আমাকে আর প্রফেসরকে ঘিরে উদ্দাম নৃত্য করে চলেছে সে শূন্য পথে। তার সারা গা থেকে মনে হচ্ছিল যেন ফুলকিগুলো ছিটকে ছিটকে হারিয়ে যাচ্ছে। এখন দেখলাম তা নয়। বাতাসের বুকে বিশেষ প্যাটার্নের নকশা আঁকছে—পরক্ষণেই মিলিয়ে যাচ্ছে তারই অবয়বের মধ্যে প্রচণ্ড বেগে ঘুরপাক খাচ্ছে এই অপার্থিব অপটিক্যাল সুপার কমপিউটার। চোখে ধাঁধা লাগছিল বলেই কিনা জানি না, আমার কিন্তু স্পষ্ট মনে হল লক্ষ কৃস্ট্যাল-চক্ষু মেলে ভয়ঙ্কর এই বিভীষিকাটা আমাদের নাড়ি নক্ষত্র পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে। আমাদের রক্ত-মেদ-মজ্জার চুল-চেরা হিসেব নিচ্ছে। মাথার মধ্যে একটা রিমঝিম রিমঝিম মৃদু বাজনা শুনতে পাচ্ছিলাম। সেটাও এই উদ্ভট অপটিক্যাল কমপিউটারের কারসাজি কিনা বলতে পারব না।

সহসা উদ্দাম নাচ বন্ধ করে আমাদের ঠিক সামনে সে শূন্যে ভাসতে লাগল। তারপরেই বিশেষ একটা আটকোনা কৃস্ট্যাল থেকে একটা আলপিনের মত সরু টকটকে লাল রঙের রশ্মি সাঁৎ করে ছুটে এসে বলা নেই কওয়া নেই ঢুকে গেল প্রফেসরের খুলির মধ্যে।

আমি আঁৎকে উঠে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছি প্রফেসরের দিকে, তার আগেই অমানুষের চোখ থেকে ঠিকরে এল সেই

বিদ্যুৎ রেখা। আমি কাঠের পুতুল হয়ে গেলাম বললেই চলে। ঠিক যেভাবে তেড়ে যেতে যাচ্ছিলাম সেইভাবেই বেঁকে চুরে দাঁড়িয়ে গেলাম—চোখের পাতাও আর ফেলতে পারলাম না।

তাই অসহায়ের মতই দেখলাম কল্পনাতীত সেই দৃশ্য।

সরু আলপিনের মত লাল রশ্মিটা প্রফেসরের করোটির মধ্যে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কেমন জানি হয়ে গেলেন। শিবনেত্র হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তন্ময় হয়ে কি যেন শুনছেন মনে হল। মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছিলেন দেখলাম। যা শুনছেন, তা কখনও মনে ধরছে না বলে প্রবলবেগে মাথাও ঝাঁকাচ্ছেন। মাঝে মাঝে ফিক ফিক করে হাসছেন। পাগল-টাগল হয়ে গেলেন না কি? লাল রশ্মি কিন্তু তার কপাল ভেদ করে রয়েছে দুই ভুরুর ঠিক মাঝখানে। ছুঁয়ে নেই—ফুঁড়ে রয়েছে। কেননা, মাঝে মাঝে করোটির পেছন দিয়েও লালরশ্মির অগ্রভাগ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে—ফের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে।

কতক্ষণ যে এই দৃশ্য দেখতে হয়েছিল, সে হিসেব আমি বলতে পারব না।

শেষের দিকে আর সইতে পারিনি। চোখে ধোঁয়া দেখেছিলাম। জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

চার : মানুষ না ভূত

জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর দেখেছিলাম প্রফেসর সস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলোচ্ছেন।

আমি শুয়ে আছি প্রফেসরের কোলে মাথা দিয়ে। আমার সামনেই মিনারের মত দেখতে অমানুষটা দাঁড়িয়ে পাথরের এক চোখ মেলে দেখছে আমাকে। উল্টো দিকের চোখটার কীর্তিকলাপ দেখতে পেলাম না।

আমি চোখ মেলতেই সে বললে যান্ত্রিক স্বরে—"চলুন।"

ধড়মড় করে উঠে বসলাম আমি। প্রফেসর বেগতিক বুঝে আমাকে জাপটে ধরতে গেলেন—কিন্তু পারলেন না। আমি ধনুক থেকে ছিটকে যাওয়া তীরের মত গিয়ে পড়লাম অমানুষের গায়ের ওপর। সে বেচারীর যান্ত্রিক ক্ষিপ্রতাকে টেক্কা মেরে দিলাম আমার মানুষিক ক্ষিপ্রতা দিয়ে।

লক্ষ্য এবং মতলব স্থির করাই ছিল। সবলে খামচে ধরলাম তার দু-দুটো পাথরের চোখ। নখসমেত আঙুল বসিয়ে দিয়েছিলাম পাথরের কিনারা দিয়ে। তাই এক হ্যাঁচকাতেই সকেট থেকে তুলে এনেছিলাম চোখ দুটোকে।

সঙ্গে সঙ্গে কানের পর্দা ফাটানো আর্তনাদে কান ঝালাপালা হয়ে গেছিল আমার আর প্রফেসরের দুজনেরই। বিষম ব্যস্ত হয়ে তড়িঘড়ি আমাকে চেপে ধরে বিদিগিচ্ছিরি চেঁচিয়ে গেছিলেন প্রফেসর—দীননাথ! দীননাথ! তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

অন্ধ অমানুষের পরিত্রাহি চিৎকার চাপা পড়ে গেছিল রক্ত জল করা দৈববাণীর মত কণ্ঠস্বরে—মাস্টার দীননাথ! মূর্খ দীননাথ! মাথামোটা দীননাথ! ফিরিয়ে দাও ওর চোখ।

গলার শির তুলে চেঁচিয়ে ছিলাম আমি—চোপরাও ভূত কোথাকার! জানিস ক্ষত্রিয় বংশে আমার জন্ম! তোর হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব আমি।"

'দীননাথ! আমি ভূত নই, প্রেত নই, দত্যি নই, দানব নই—আমি মানুষও না—পিশাচও না—আমি···আমি···।

শশব্যস্তে বললেন প্রফেসর—"থাক, থাক, ওকে বলতে হবে না। ছেলেমানুষ! ভয় পাবে।

পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত জ্বলে গেল এই কথায়। ছেলেমানুষ! ভয় পাবে! মুচিপাড়ার মিঞা আমি। মাথায় একটু গবেট হলে কি হবে, মরতে ভয় পাই না কস্মিনকালেও। খোদ প্রফেসরকে কতবার বাঁচিয়েছি স্রেফ এই গোঁয়ার্তুমি দিয়ে, প্রফেসর কি তা ভুলে গেছেন?

তারস্বরে তাই চেঁচিয়ে উঠেছিলাম—"লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়। রে রে ভূত সম্রাট, চ্যালার চোখের ম্যাজিক আমার এই হাতের মুঠোয়। দ্যাখ তার কি অবস্থা করি।

কাণ্ডজ্ঞান আগেই হারিয়েছিলাম, নইলে এমন একটা সীন ক্রিয়েট করি ঐ রকম একটা পরিস্থিতিতে। চোখ-দুটো উপড়ে এনে ভাল করেছিলাম কি মন্দ করেছিলাম, সেটা ঘটনাগুলোয় জানা যাবে। কিন্তু সেই মুহূর্তে এমন একটা গুখুরির কাজ করে বসলাম, তার জন্যে লজ্জা পাই।

ডান হাতের একটা পাথর আছড়ে ফেলেছিলাম পায়ের কাছে এবং সেটা ছিটকে গড়িয়ে যাওয়ার আগেই জুতো দিয়ে মাড়িয়ে বেশ করে রগড়েছিলাম মেট্যাল মেঝের ওপর।

পরিণামটা এমন ভয়ঙ্কর হবে কে জানত। পাথরের মধ্যে যে এত রশ্মিদের বন্দী করে রাখা হয়েছে, তাই বা কে জানত!

নিমেষে ভলকে ভলকে অগ্নিশিখার মত রোশনাই ছিটকে গেল পায়ের তলা দিয়ে রগড়ানো পাথর-চক্ষু থেকে। মাউন্ট এটনা, ক্রাকাতোয়া, ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাত একযোগে শুরু হয়ে গেলেও এমন আলো আর আগুনের প্রলয়ঙ্কর খেলা দেখা যেতো না। চোখে ধাঁধা লেগে গেল। মাথার মধ্যে মুগুর পড়তে লাগল। ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম।

আর একটা গুর গুর গুম্ গুম্ শব্দ শুনলাম অনেক দূর থেকে বরফলোককে থর থর কম্পিত করে সেই নৃত্যের তালে তালে ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে। চারপাশের বরফমুলুকে আচম্বিতে শুরু হয়ে গেল ভয়ানক ঝড়। তুষার-ঝড় কি ভয়ানক সুন্দর হতে পারে, সেই মুহূর্তে তা প্রত্যক্ষ করলাম। ঠাণ্ডা আলোর পাশাপাশি এসে জুটলো

…সকেট থেকে তুলে এনেছিলাম চোখ দুটোকে।

হিম আবছায়া। সেই লোমহর্ষক আবছায়ার মধ্যে কারা যেন কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে আসছে মনে হল—রক্ত ছলকানো মৃদঙ্গ-ছন্দের তালে তালে।

আমার কানের কাছে নিনাদিত হল একশটা বাজনার মত অদৃশ্য সত্তার অট্টহাসি—ভূত মনে করেছিলে আমাকে? তাই নয়? দেখো তবে আমার ভূতেদের খেলা। কইরে তোরা! আয়…আয়…নেচে নেচে চলে আয়! দেখিয়ে যা তোদের মূর্তিগুলো!"

হুহুঙ্কার তুষার-ঝড়ের আবছায়া ভেদ করে তারা এগিয়ে এল দলে দলে—সুশৃংখল নিয়মানুবর্তিতায় কুচকাওয়াজ করে। তাদের প্রত্যেকের ডান পা একই সঙ্গে পড়ছে মেঝেতে একই সঙ্গে এগিয়ে আসছে বা পা। পদভারে মেদিনী কাঁপছে থর থর করে। কনকনে হাওয়ার ঝাপটার পর ঝাপটায় তাদের হিলহিলে দেহগুলো উড়ে যাওয়ার কথা—তারা কিন্তু টলছে না, কাঁপছে না—শুধু এগিয়ে আসছে আর এগিয়ে আসছে।

ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি আমি। তাদের যে অবয়ব আমি দেখছি তা এতই বিকটাকার যে লোমকূপে লোমকূপে জাগছে বিষম আতঙ্ক। ডাকাবুকো বলে আমার বদনাম আছে—কিন্তু ভূত-কাতর বলেও আমার নামে রটনা আছে। সে রটনা যে মিথ্যে নয়, তা টের পেলাম হাড়ে হাড়ে।

এরা কারা? এদের কারও চোখ গলে খসে গেছে। কারও নাক আধখানা গলে গেছে, কারও কান-চিবুক-গালেরও সেই অবস্থা। চোখের মণিগুলো পাথরের কিনা বলতে পারব না—কিন্তু সেগুলো যে বিষম অগ্নিময়, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

"এরা কারা? এরা কারা? এরা কারা?" উন্মাদের মত চিৎকার করে গেছিলাম তাদের প্রত্যেকের চাহনি আমার দিকে নিবদ্ধ দেখে।

প্রফেসরও আমাকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মত চেঁচিয়ে গেছিলেন—দীননাথ! দীননাথ! দোহাই তোমার! পাথর দুটো ফিরিয়ে দাও।

ত্রিভুবন কাঁপানো আবার সেই অট্টহাসির সঙ্গে অদৃশ্য কণ্ঠের সংলাপ শুনলাম কানের কাছে—"মানুষ! এরাও

তোমারই মত মানুষ, দীননাথ। কিন্তু বন্দী আমার কারাগারে—এক্সপেরিমেন্টের জন্যে মানুষ চাই—আরও মানুষ চাই! হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ!"

এরপর কোনও ভদ্রলোকের ছেলে সজ্ঞানে থাকতে পারে না। আমার মত ভীতুর ডিম তো নয়ই।

পাঁচ: কারাগার কাহিনী

ছোট্ট একটা মেট্যাল চেম্বারে জ্ঞান ফিরেছিল আমার। প্রফেসর কটমট করে তাকিয়েছিলেন আমার দিকে।

ধড়মড় করে উঠে বসতেই বললেন—'গিলে নাও। খাবার পড়ে আছে।'

খিদে সত্যিই পেয়েছিল। বিশেষ করে খাবারের এত আয়োজন থাকলে কার না খেতে ইচ্ছে যায়। এই একটি ব্যাপারের ওপর কখনও রাগ দেখাই না আমি।

প্রফেসরের কটমটে চাহনি উপেক্ষা করে তাই আমি গোগ্রাসে শেষ করলাম বারকোষের সাইজের বিশাল ধাতুর থালায় সাজানো মাছ আর মাংস, পোলাও আর তন্দুরি, দই আর রাবড়ি। কোত্থেকে এল এত খাবার, ভূতেদের পাচকের হাতে ভৌতিক প্রক্রিয়ায় রান্না করা কি না—সে সব বিষয়ে উচ্চবাচ্যও করলাম না। যে বিকট দৃশ্যটা দেখেছি জ্ঞান লোপ পাওয়ার আগে, তার শিরশিরে অনুভূতির রেশ যে যায় নি তখনও মন থেকে।

পাথরের চোখ দুটো যে আর আমার জিম্মায় নেই সেটা আগেই দেখা হয়ে গেছিল।

খেয়ে দেয়ে ঢক ঢক করে জল খেয়ে ঢেকুর তুললাম বেশ আওয়াজ করেই এবং সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলাম প্রফেসরকে—'আমরা এখন কোথায়?'

'গোল্লায়!' বললাম নিরীহ মুখে। 'জন্মে এরকম ঘর দেখিনি। গোল বলের মত ঘর কখনো হয়?'

'তোমার মত স্টুপিডদের জন্যে হয়। হাঁদারাম গাধা কোথাকার! কার সঙ্গে পাল্লা দিতে যাচ্ছ জানো?'

'জানবার অবকাশ পেলে জানতাম বই কি', ইচ্ছে করেই বললাম প্রফেসর যাতে রেগে যান।

রেগে টং হলেন উনি ঠিকই। কিন্তু দাঁত মুখ খিঁচিয়ে জবাবটা দিতে যাওয়ার আগেই আমি ছিটকে গড়িয়ে গেলাম মেঝের ওপর দিয়ে—থালা বাসনের ঝনঝনানি চাপা পড়ে গেল কৌতুকতরল হাসির শব্দে।

তারই হাসি। যাকে দেখা যায় না। কিন্তু সর্বত্র যে বিরাজমান অদৃশ্য অবস্থায়।

'মাস্টার দীননাথ! মাস্টার দীননাথ! ভূতের খেলা লাগল কেমন? খানা পিনা?'

অমনি চণ্ডালের রাগ চেপে বসল মাথায়। দাঁত কিড়মিড় করে ঘুসি পাকিয়ে বললাম বাজখাঁই গলায়—'একবার দেখা দিলেই দেখিয়ে দিতাম লাগল কেমন।'

আবার সেই অস্ফুট হাসি। একই গলায় কত সুরই শোনাতে পারে রহস্যময় এই সত্তা।

বললে—'গোলা কিন্তু ছুটছে—না, না, গোল্লায় নিয়ে যাচ্ছে না—চলেছে গভীর সমুদ্রে।'

খাবি খেলাম আমি। আমরা কি তাহলে ধাবমান গোলার মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছি? প্রফেসরও ছিটকে গেছিলেন আচমকা ধাক্কায়। কোমরে লেগেছে নিশ্চয়। কোমর টিপে ধরে যন্ত্রণাবিকৃত মুখে চেয়ে আছেন আমার দিকে।

জলনির্ঘোষ তাই কি শোনা যাচ্ছে? ছলছলাৎ শব্দ যদি দ্রুত পরম্পরায় অবিরাম হয়ে যেতে থাকে, তাহলেই সম্ভব এমনি নির্ঘোষ। জলপ্রপাতের মত কানে তালা লাগানো।

সহসা গোলা-ঘরের ঠাণ্ডা আলো নিভে গেল দপ করে। ধাতুর দেওয়ালে জেগে উঠল সার বন্দী পোর্ট হোল। দিনের আলো দেখলাম, দেখলাম নীল আকাশ আর ধূ-ধূ সমুদ্র।

আর কি দেখলাম? অগুন্তি ডলফিন সাঁতার কাটছে। ছুটছে···কখনও বিশাল ঢেউ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে···কখনও দুই বিশাল ঢেউয়ের মধ্যবর্তী শূন্যতা পাখির মত পেরিয়ে যাচ্ছে। এ কী জলযান? না, উড়ুক্কু যান? এত ডলফিনই বা এল কোত্থেকে?

শেষ প্রশ্নের জবাবটা পেলাম রহস্যময় সেই কণ্ঠস্বরে—মাস্টার দীননাথ, তুমি কি জানো না, বাচ্চা ছেলেমেয়েরা যেভাবে অ্যাকুয়ারিয়ামে রঙিন মাছ পোষে, সেইভাবে সমুদ্রে বিশাল ওস্যানারিয়াম আর ডলফিনারিয়াম বানিয়ে ডলফিনদের চিড়িয়াখানা বানানো হয়! ওই দ্যাখো সেই ধেড়ে খোকাখুকুদের!

ডাঙার কাছাকাছি গিয়েও মোড় নিয়ে কক্ষচ্যুত উল্কার মত আবার সমুদ্রের দিকেই ফিরে গেল উড়ন্ত গোলক। এবার আরও উঁচু দিয়ে মেঘলোক তছনছ করে অব্যাহত রইল তার প্রভঞ্জন গতি।

কানের কাছে গুঞ্জরিত হল আবার সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বর—কিগো দীননাথবাবু? কি রকম দেখলে?'

বোবা হয়ে থাকাই শ্রেয় মনে করলাম। পড়েছি যবনের হাতে···

খাদে নেমে এল প্রহেলিকা-স্বর—জানো ওরা কি বলছে? ফ্লাইং সসার! ফ্লাইং সসার! হাঃ হাঃ হাঃ! নির্বোধ! উজবুক! অন্যগ্রহের সসার এটা নয়—এই পৃথিবীরই জঠর থেকে এসেছে—ফিরে যাবে সেইখানেই—তার আগে তোমাকে দেখিয়ে দেব আমার ক্ষমতার আরও একটু নমুনা—'

এরপর যে দৃশ্য দেখলাম, তার বর্ণনা দেব কি ভাষায় ভেবে পাচ্ছি না!

ছয় ঃ পৃথিবীর প্রেসার কুকার

কানের কাছে মন্ত্রধ্বনির মত গুঞ্জরণ চলেছিল অবিরাম—প্রফেসর মশাই জানেন, তুমি তাঁর চ্যালা হয়েও যা জানো না—তা হল এই ঃ পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত চারটে শক্তির খবর রেখেছেন বিজ্ঞানীরা। ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক, দুর্বল আর প্রবল পারমাণবিক শক্তি এবং মাধ্যাকর্ষণ। নিউটন, গ্যালিলিও, আইনস্টাইনের তত্ত্ব নতুন করে লেখার দরকার হয়ে পড়েছে। কেননা, ফিফথ ফোর্স বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে পৃথিবীতে। নাম তার অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি। বিপরীত মহাকর্ষ বললে নিশ্চয় ভাল করে বুঝবে, তাই না মাস্টার দীননাথ ?'

আর মাস্টার দীননাথ ! সে তখন হতভম্ব হয়ে দেখছে উড়কু গোলক হঠাৎ পাগলা হয়ে গেল নাকি ? পৃথিবী ছেড়ে পৃথিবীর বাইরে ছুটে যাচ্ছে কেন এমন ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত ? এভাবে তো যায় মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার রকেটগুলো ! সেসব রকেটে থাকে জ্বালানির ধোঁয়া, আর প্রচণ্ড গর্জন।

কিন্তু আজব এই গোলক নিঃশব্দে অথচ অকল্পনীয় বেগে সটান পৃথিবীকে পেছনে ফেলে উঠে যাচ্ছে মহাশূন্যের দিকে। সবুজ গ্রহের পাহাড়-বনানী-সমুদ্র ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। প্রথমটা প্রচণ্ড চাপ অনুভব করেছিলাম সর্বাঙ্গে—কিন্তু ছবিতে যে রকম দেখেছি বা শুনেছি, সেরকম মারাত্মক নয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই হাল্কা তুলোর মত লাগল নিজেকে। ভেসেও উঠলাম শূন্যে। প্রফেসরকেও দেখলাম শূন্যে ভাসতে। পরক্ষণেই দুজনেই ভারি হয়ে গিয়ে চেপে বসলাম মেঝেতে।

গভীর শ্বাস নিয়ে ক্লিষ্ট হেসে প্রফেসর বললেন—'বাতাসে অক্সিজেনেরও অভাব নেই দেখছি।'

অদৃশ্য কণ্ঠস্বর বললে—'এ ধরনের মহাকাশযান আপনার সতীর্থ বৈজ্ঞানিকরা কি এখনও কল্পনা করতে পেরেছেন, প্রফেসর ?'

'না।'

জল-স্থল-অন্তরীক্ষ—সর্বত্র অবাধে যাতায়াত করছে এই গোলক শুধু অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি ফোর্সকে কাজে লাগাতে পারছে বলে। যাক সে কথা। পৃথিবীকে পাক দিচ্ছেন এখন—চব্বিশ ঘণ্টায় একবার। দেখে নিন আপনাদের সাধের পৃথিবীর কি হাল আমি করতে পারি।

এবং দেখলাম সেই গাঁ-কাপানো দৃশ্য। দেখলাম এবং ভয়ে কাঁটা হয়ে রইলাম।

পোর্টহোলগুলোর মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে সুন্দর সবুজ পৃথিবীকে। এত ঝুটঝামেলার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার ফলে পৃথিবীর ম্যাপটাকেও ভুলে মেরে দিয়েছিলাম। মহাদেশ, মহাসমুদ্র গুলিয়ে ফেলেছিলাম। তাই সঠিক বলতে পারব না কোন্ কোন্ অঞ্চলে দেখেছিলাম অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলো।

নীল সমুদ্রের মাঝে হঠাৎ উত্তাল হয়ে উঠেছিল জলরাশি। পর্বতসমান ঢেউয়ের আকারে ধেয়ে গিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছিল দ্বীপের পর দ্বীপ। আচম্বিতে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির ঘুম ভেঙে গিয়েছিল—তুবড়ির মত ধোঁয়া, আগুন আর পাথর ছুঁড়ে দিয়েছিল অনেক উঁচুতে—লাভা গড়িয়ে পড়েছিল গা বেয়ে—ধ্বংস হয়েছিল বিস্তীর্ণ জনপদ। মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু হয়েছিল অকস্মাৎ এবং বিরাট অঞ্চল ভেঙে গিয়ে ধেয়ে গিয়েছিল গভীর সমুদ্রে—অন্য মহাদেশের দিকে।

বিদ্রূপের হাসি হেসে হেসে বলেছিল অদৃশ্য কণ্ঠস্বর—'মাইডিয়ার প্রফেসর, বলুন তো আমার অঙ্গুলি হেলনে কিভাবে পৃথিবীময় এই বিপর্যয় ?'

চোয়াল শক্ত করে বলেছিলেন প্রফেসর—'পৃথিবীর কেন্দ্র সূর্যপৃষ্ঠের চাইতে বেশি গরম বলে।'

বিরাট হাসি হেসে বললে রহস্যময় কণ্ঠস্বর—'অর্থাৎ আপনি জানেন অনেক, বোঝেন অনেক। সেইজন্যেই তো আপনাকে চ্যাংদোলা করে আনবার হুকুম দিয়েছিলাম নাম্বার ওয়ান সুপারকমপিউটারকে।'

পৃথিবীর বুকে বিরামহীন ধ্বংস দৃশ্য দেখতে দেখতে বিহ্বল হয়েছিলাম। কিন্তু 'চ্যাংদোলা' শব্দটা শুনেই জ্বলে উঠলাম তেলেবেগুনে।

'পিণ্ডি চটকে ছাড়তাম চ্যাংদোলা করতে গেলে—'

'পিণ্ডি আমরাই চটকাবো তোমাদের।' কর্কশ হয়ে ওঠে অদৃশ্য কণ্ঠস্বর—'দেখতে পাচ্ছো না অ্যাটম-বুলেট পৃথিবীর প্রেসার কুকারে ঢুকিয়ে কিভাবে অগ্নুৎপাত ঘটাচ্ছি সমুদ্রের তলায় ও ডাঙায় ? জল ঠেলে উঠছে, পাহাড়ের চুড়ো উড়ে যাচ্ছে, বরফ গলে ভেসে যাচ্ছে।'

'পৃথিবীর প্রেসার কুকার !' হাঁ হয়ে গেলাম আমি। প্রফেসর সাততাড়াতাড়ি বললেন—'অত বড় হাঁ করো না দীননাথ। পৃথিবীর একেবারে কেন্দ্রস্থল অর্থাৎ ম্যান্টল আর বাইরের অন্তস্তল অর্থাৎ—outer core-এর মাঝের বাউন্ডারি প্রেসার কুকারের কাজ করছে। মাঝে মাঝে বাড়তি চাপ আর উত্তাপ বেরিয়ে যায় বলেই মহাদেশগুলো পৃথিবীপৃষ্ঠে সরে সরে যাচ্ছে।'

'এবং এই চাপ আর উত্তাপকে নানা ফুটো দিয়ে বার করিয়ে দিয়ে ঘটাচ্ছি এই অগ্নুৎপাত,—নির্মম স্বরে বললে অদৃশ্য সত্তা।

'কেন ?' চড়া গলা আমার।

'প্রফেসর জানেন কেন। অপটিক্যাল সুপার কমপিউটার মাথার মধ্যে লাল রশ্মি দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে জবাবটা। প্রফেসর, আপনিই বলুন না।'

জবাবটা দিতে গিয়ে কি রকম যেন হয়ে গেল প্রফেসরের

মুখটা—'দীননাথ, পৃথিবীর জঠরের টেম্পারেচার এমনিতেই সূর্যপৃষ্ঠের চাইতে বেশি। দিন কয়েক হল জনাকয়েক বৈজ্ঞানিক তা ধরতে পেরেছেন। কিন্তু এই মক্কেল অনেক আগে থেকেই তা জানে। পাওয়ারফুল কামান দিয়ে অ্যাটম-বুলেট সেখানে পাঠায়। ইচ্ছে করলে পৃথিবীটাকে ভেতর থেকে বোমার মত ফাটিয়ে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে।'

'কিন্তু কেন প্রফেসর? কেন?' আকুল স্বরে বলেছিলাম আমি।

ডলফিনদের ওপর অত্যাচার চলছে বলে পৃথিবী উড়িয়ে দেওয়া হবে?'

প্রশ্নের জবাব পেলাম না। ঘুম আসছিল। ঘুমিয়ে পড়লাম।

সাত ঃ ব্যাকটিরিয়া ব্রেন

ঘুম ভাঙবার পর দেখলাম গোলকের মধ্যেই শুয়ে রয়েছি আমি আর প্রফেসর।

আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে এক-চোখ-খসে পড়া একটা পিশাচমূর্তি। তার বাঁ দিকের গালের মাংস নেই। দাঁত দেখা যাচ্ছে মুখের ভেতরে।

আঁৎকে উঠতেই সে বললে ইয়াঙ্কি ইংরেজীতে—'বন্ধু, আমি ভূত নই। মানুষ।'

'কিন্তু এ হাল হল কি করে আপনার?'

'কস্টিক পটাশ দিয়ে অত্যাচার চালানো হয়েছে। আমার ডলফিনারিয়ামে একটা ডলফিনের চোখ নষ্ট হয়ে গেছিল খেলা দেখাতে গিয়ে। তাই এই শাস্তি।'

'আপনাকে পেল কোত্থেকে?'

বিকট দাঁত বার করে হাসল আগন্তুক—নিরর্থক প্রশ্ন। 'আমার মত অনেককেই এরা ধরে এনেছে এই পাতাল-পুরীতে। সারাসোট উপসাগরের লোকই আছে বেশি।'

'কি অপরাধে?'

'ইনটেলিজেন্ট ডলফিনদের বন্ধ জায়গায় রেখে দু-পয়সা রোজগার করছিল বলে।'

'ডলফিনরা ইনটেলিজেন্ট তো এই হেঁড়ে-গলা লোকটার গায়ে ফোস্কা পড়ছে কেন?'

ভৌতিক মূর্তি এক চোখ মেলে নির্নিমেষে চেয়ে রইল আমার দিকে—'লোক নয়—একটা ব্রেন!'

'ব্রেন!'

'ব্যাকটিরিয়া কোষ দিয়ে তৈরি ব্রেন। সুপার কমপিউটার নাম্বার থ্রি।'

'কি বলছেন মাথায় ঢুকছে না। কে তৈরি করল এই ব্রেন?'

'ডলফিনরা।'

'অসম্ভব।'

অসম্ভব বলে পৃথিবীতে এখন আর কিছু নেই। সুপার ডলফিনদের তৈরি করেছি তো আমরাই।'

'সুপার ডলফিন!'

'পারমাণবিক বিস্ফোরণের মহড়া চলেছে পৃথিবী জুড়ে বছরের পর বছর। ফ্লোরিডার দিকে পারমাণবিক ভস্ম এসেছিল বহু বছর আগে—মিউটেসন ঘটেছিল বেশ কিছু ডলফিনের কোষে।'

আবার সরব হল অদৃশ্য সত্তা—'আমিই সেই ব্যাকটিরিয়া ব্রেন। এই পাতালপুরীর মাস্টার ইউনিট আমি। আমিই এই পৃথিবীর এমন এক সুপার কমপিউটার যার চিন্তার গতি মানুষের চিন্তার গতির মত সেকেণ্ডে একশ ফুট নয়। আলোর গতিবেগ ভাবি আমি। সাধারণ কমপিউটার একটার পর একটা সমস্যার সমাধান করে। আমি করি একই সঙ্গে অজস্র—ঠিক মানুষের ব্রেনের মত। কিন্তু মানুষের ব্রেনের কোষগুলো গায়ে গায়ে লাগানো থাকে—নিজেরা নড়াচড়া করতে পারে না—আমার জীবাণু কোষেরা নড়ে চড়ে সমাধানের গতিবেগ এমন বাড়িয়ে দিয়েছে যা অতিমানুষের পক্ষেও সম্ভব নয়। আমিই এখন এই পৃথিবীর চরম শক্তি—আমাকে টেক্কা দিক সামান্য মানুষ—আমি তা চাই না।'

'মানুষের বয়ে গেছে টেক্কা দিতে। তাদের আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—' রেগে মেগে আরও কিছু বলতাম, কিন্তু মুখে হাতচাপা দিলেন প্রফেসর।'

বললেন—"দীননাথ, সেই চেষ্টাই চলছে কিছু গবেষণাগারে। এবং এই গবেষণা যাতে আর না চলে, তাই ধরে আনা হয়েছে আমাদের।"

'আপনি বললেই বন্ধ হবে?'

'চেষ্টা করতে ক্ষতি কী?'

চোখ মুখ লাল হয়ে গেল প্রচণ্ড রাগে—'প্রফেসর, আপনি এত কাওয়ার্ড? প্রাণের ভয়ে গবেষণায় বাগড়া দেবেন?'

প্রফেসর আমতা আমতা করে কি বলতে গেলেন। কিন্তু তার আগেই দপ্ করে নিভে গেল গোলকের আলো। বিকট একটা হাসি শুনলাম এবং পরক্ষণেই অন্ধকারের মধ্যে জাগ্রত হল একটা সবুজাভ মূর্তি।

সেই অমানুষ—যার দুটো চোখ আমি উপড়ে নিয়েছিলাম। এখন তার সারা গা থেকে সবুজ রশ্মি ছিটকে বেরোচ্ছে। চোখ গনগনে। আমি তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। ফের জ্ঞান হারালাম।

আট ঃ ঘামের বিষ

জ্ঞান টনটনে হতেই দেখলাম আমি আর সেই অমানুষ পাশাপাশি সাঁতার কাটছি ঠিক ডুবুরির মত। আমার মুখে ডুবুরির মুখোশ। দূরে দূরে আরও অমানুষদের দেখা

যাচ্ছে। মাছের মত পিঠের জেট চালিয়ে জলের তলদেশে ছুটোছুটি করছে।

দারুণ কর্মব্যস্ত প্রত্যেকেই। জলতল আলোয় আলোময়। বিশাল কয়েকটা ডলফিন রাজকীয় চালে যাতায়াত করছে। আশেপাশে।

আমাদের সামনেই এসে গেল একটা ডলফিন। সাধারণ ডলফিন বড় জোর ন-দশ ফুট লম্বা হয় শুনেছি। এর আকার কিন্তু বিশাল। পঞ্চাশ ফুট তো বটেই। ছোটখাট তিমি বললেও চলে।

আমার মগজে কোনও সাড় নেই। নেই বলেই এতক্ষণ সাঁতরেছি—অথচ নিজেও তা জানি না। বিশালকায় এই ডলফিনের সামনে এসেও নিস্পৃহ দৃষ্টি মেলে শুধু চেয়ে রইলাম।

ডলফিনের দুই চোখে দেখলাম সুগভীর দূরায়ত বুদ্ধি-দীপ্ত চাহনি। যেন ধ্যানস্থ ঋষি।

মস্তিষ্কের মধ্যে ধ্বনিত হল যেন দৈববাণী—'দীননাথ, তুমি যার চোখ খুবলে নিয়েছিলে, তার চোখ বসাতে গিয়েই একটা মহাবিপদ থেকে পরিত্রাণের পথ আবিষ্কার করেছি। তুমি জানো তোমাদের আনা হয়েছে জীবাণু সুপার কমপিউটারের গবেষণা যাতে বন্ধ থাকে পৃথিবীতে—এই জন্যে। তাই না?'

'হ্যাঁ', মুখোশের মধ্যেই বললাম আমি।

'আমাদের হাতে গড়া জীবাণু সুপারকমপিউটারকে এই আদেশ না দিলে তোমাদের এখানে আনাই হত না। আসলে আমরা চাই এর প্রতাপ কমাতে।'

'মানে?'

'ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের হাতে গড়া দানবের মত আমরা এই দানব তৈরি করে ফেলেছি আমাদের অতি মগজ দিয়ে। একে আর বাড়তে দিলে এ পৃথিবীকে ফাটিয়ে উড়িয়ে দেবে—প্রাণের চিহ্ন মুছে দেবে।'

'নিজেও তো শেষ হয়ে যাবে।'

'তার আগে নিজে চলে যাবে অন্য গ্রহে। ক্ষমতা এর অসীম—গতি এর সর্বত্র—শুধু এখানে ছাড়া—আমাদের এই অঞ্চলে তার কোনও জারিজুরি খাটে না—এখানকার কোনও খবর সে পায় না—এখানকার জলে তার শক্তি ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায়—তাই তোমাকে শাস্তি দেওয়ার অছিলায় আনিয়েছি এখানে।'

'কিন্তু কেন? সামান্য মানুষ আমি—'

'অসামান্য ছোট্ট একটা কারণে। অসম্ভব নোংরা তুমি।'

'কী'—

'শোনো। তোমার দেহের রক্ত পরিষ্কার নয়, স্বাস্থ্যনীতি মেনে চলো না বলে। ফলে এমন একটা ভাইরাস আশ্রয় নিয়েছে তোমার রক্তে যে তোমাকে আশ্রয় করে বেঁচে আছে, অথচ তোমার ক্ষতি করছে না—এমন অনুকূল পরিবেশ আর উপাদেয় রক্ত আর কোথাও পাবে না বলে—'

'ননসেন্স!'

'গালাগাল দিও না। তোমার হাতের ঘামেও থাকে সেই ভাইরাস। ভয়ের চোটে ঘেমে গিয়ে তারপর রেগেমেগে চোখ খুবলে নিয়েছিলে। ঘাম লেগেছিল উপড়োনো চোখে। আমাদের টেস্ট রিপোর্ট জানাচ্ছে, এই ঘামেই রয়েছে বিভীষণ ব্যাকটিরিয়া-ব্রেনের মৃত্যুদূত।'

'বিভীষণ কেন?'

'রামায়ণে বিভীষণের যা ভূমিকা, আমাদের ব্যাকটিরিয়া ব্রেনও যে তাই করে চলেছে। ঘরশত্রু বিভীষণ নাম্বার ওয়ান। যন্ত্র যাতে স্রষ্টাকে শাসন-দমন করতে না পারে, তার জন্যে আগে থেকেই হুঁশিয়ার ছিলাম, ব্যবস্থাও নিয়ে ছিলাম—তাই সে আমাদের ঘাঁটাতে পারে না। কিন্তু প্রাণ জিনিসটাকে একদম সইতে পারে না—স্রষ্টাকে ছাড়িয়ে যেতে কে না চায়?'

'বিশ্বাসঘাতক!'

'তা তো বটেই। দীননাথ, তোমার পাশেই যে সুপার কমপিউটার রয়েছে, তারও ব্রেন এখন বিকল রয়েছে—ব্যাকটিরিয়া-ব্রেন তার ব্রেন থেকে কিছুই উদ্ধার করতে পারবে না। তোমাকে আর প্রফেসরকে কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে দীঘায়। তোমার সঙ্গে যে কথা হল, তা এখন চেপে যাও—প্রফেসরও যেন জানতে না পারেন। উনি কথা দিয়েছেন বৈজ্ঞানিকদের বলবেন, ব্যাকটিরিয়া—ব্রেন গবেষণা যেন অচিরে বন্ধ করা হয়—নইলে পৃথিবী ধ্বংস হবে।'

'বেশ!'

'ডাঙায় ফিরে গিয়ে তোমার রক্ত থেকে ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করতে বলবে প্রফেসরকে। এই ভাইরাস থেকেই তৈরি হবে আর একটা সাব-ভাইরাস—আমাদের তৈরি ব্রেনের ব্যাকটিরিয়াদের যম। বুঝেছো?'

'বুঝেছি।'

প্রফেসর আর আমি যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হেঁটে এসে-ছিলাম দীঘার বালি মাড়িয়ে—কিভাবে জল থেকে উঠে এসেছিলাম, তা মনে নেই।

প্রফেসরকে যথাসময়ে বলেছিলাম আমার রক্ত নিয়ে গবেষণা করতে। কিন্তু ভদ্রলোক আমার নোংরামি নিয়ে এমন টিটকিরি দিতে আরম্ভ করেছেন যে আদৌ রক্ত দেব কি না ভাবছি।

তোমরা অনুরোধ করলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু তার আগে বলতে হবে, ভাইরাস শব্দটির মানে কী?*

*'ভাইরাস' একটা ল্যাটিন শব্দ। মানে, বিষ।

গোলকরহস্য

সমরজিৎ কর

॥ এক ॥

ফিনিক্‌স অ্যারিজোনা। রবার্ট ম্যাক্‌কল এখানেই যে ওঁত পেতে আমার জন্যে বসেছিল, ভাবতেই পারি নি।

অ্যারিজোনার প্রায় সবটাই তো মরুভূমি!

তবু মনে হল, ফিনিক্‌স শহরটি সেই মরুভূমির মধ্যে একটি মরুদ্যান। সেই বছর পনের আগে দেখা। এখন তার কত পরিবর্তন। শহর দ্রুত বড় হয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে আকাশ-ছোঁয়া বাড়ি। বিপণন কেন্দ্র। অজস্র পার্ক। পার্কে কমলালেবুর কুঞ্জ। সবুজ ঘন পাতার ফাঁকে পুরুষ্টু লেবু জিভেয় জল আনে। বিশেষ করে এই সময়। এই মে মাসে। যখন মধ্যাহ্নের গরমে পথ চলতে গিয়ে গলা শুখিয়ে যায়।

আজ সারা দিন কাটল আরকোসানতি-তে। বিখ্যাত নগরস্থপতি পাউলো সেলোরির সঙ্গে। সেও এক অভিজ্ঞতা।

সঙ্গে ছিল আমার পুরনো বন্ধু জন কুলিনান। শিকাগোর কোন একটি কলেজে জন এক সময় ইংরেজি সাহিত্য পড়াত। সারাদিন ধরে পাউলো সেলোরি তাঁর স্থাপত্যের নমুনা দেখিয়ে বেড়িয়েছেন। একবিংশ শতাব্দীতে মানুষ কী রকম ঘরবাড়িতে বাস করবে তাই নিয়েই তাঁর গবেষণা। এক একটি মডেলে তাদেরই ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি।

অদ্ভুত পরিকল্পনা!

হাজার পাঁচ একর জায়গায় গড়ে তোলা হবে আবাসন। সেখানে বাস করবে চার হাজার মানুষ। তাদের জন্যে ওই জমিতেই থাকবে চাষবাসের ব্যবস্থা। থাকবে জলাশয়। সেখানে মানুষ সাঁতার কাটবে, মাছ চাষ করবে। ওই জমিতেই গড়ে তোলা হবে নানারকম শিল্প কেন্দ্র। জীবিকার জন্যে সেখানকার মানুষকে আর কোথাও যেতে হবে না। সবই বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন পাউলো সেলোরি। এখন তাঁর বয়েস সত্তরের কাছাকাছি। কিন্তু মেজাজে একবারে টগবগে কিশোর।

এক একটি বাড়ির মডেলের সামনে এসে সেলোরি যখন ব্যাখ্যা করছিলেন, আমি আঁতকে উঠছিলাম। বিরাট একটি বাড়ি। তাতে হাজার দশেক কুঠরি। সেই বাড়ির অন্দরেই মানুষ বাস করবে, সেখানেই জীবিকার জন্যে সে কাজ করবে, অন্য কোথাও যেতে হবে না—না বাবা, এমন জায়গায় থাকলে আমি দুদিনেই পাগল হয়ে যাব।

তা সে কথা কে বোঝাবে, সেলোরিকে!

একবার মনে হল, প্রতিবাদ করি। বলি মুক্ত মানুষকে আপনি বন্দী করার ব্যবস্থা করছেন।

কিন্তু সাহস হয় নি। সেলোরির মধ্যে এমন একটি ব্যক্তিত্ব ছিল যে তাঁর মুখের ওপর সমালোচনা করা সম্ভব হতো না।

তবু একেই বলে ভাগ্য। ভাবতে পারি নি, সেই বন্দীদশা আমার ভাগ্যেও যে ঝুলছে, সত্যিই আমি ভাবতে পারি নি।

আরকোসানতি থেকে ফিনিক্স মিনিট পঁয়তাল্লিশের পথ। আগের দিন হলে এপথটি আধ ঘণ্টাতেই যাওয়া যেত। দিনের দিকে তখন গাড়ি ছুটত ঘণ্টায় পঁচাত্তর মাইল বেগে। এখন সারা মার্কিন দেশে দেখলাম সরকার থেকে গাড়ির গতি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে—ঘণ্টায় কোথাও ষাট, কোথাও পঁয়ষট্টি মাইল। তেলের এখন টান। কমগতিতে গাড়ি চালালে তেল পুড়বে কম। তার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

গাড়ির মধ্যে আগামীকালের প্রোগ্রাম নিয়ে কথা বললাম জনের সঙ্গে।

জন বলল, আগামীকাল আমরা তুসনে যাচ্ছি। সেখান থেকে মাউণ্ট হপ্‌কিন্সের হুইপল মান মন্দিরে।

আমি বললাম, হুইপলে পরশু যাব। তার আগে কোসানতিতে গিয়ে সেলোরির বাস্তব কাজগুলি বরং দেখে নিই। আরকোসানতিতে তো উনি শুধু গবেষণা চালাচ্ছেন। সেই গবেষণার ফলটি কেমন দাঁড়াচ্ছে সেখানে গেলেই আমরা বুঝতে পারব।

সেটা মন্দ নয়। জন বলল।

সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ হোটেলে ফিরলাম।

হেরিটেজ হোটেলে। ফিনিক্স শহরে চল্লিশ নম্বর (ওয়েস্ট) স্ট্রিটের এই হোটেলটির চার-পাশটা অনেক ফাঁকা। ঠিক করলাম, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর স্নান সেরে জনকে নিয়ে কোন মেকসিকান রেস্তোরাঁয় গিয়ে ডিনার খাব। এক ঘেঁয়ে মার্কিন খাবার আর ভাল লাগছে না।

কিন্তু ওই যে—বলছিলাম না, আমার ভাগ্য?

হোটেলে নিজের ঘরে ঢুকতেই চোখ গিয়ে পড়ল টেলিফোনের ওপর। টেলিফোনের ডায়ালের পাশে ছোট্ট একটি লাল আলো। জ্বলছে নিভছে।

যার মানে, আমার নামে একটি মেসেজ পড়ে আছে হোটেলের রিসেপসনে।

সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনের রিসিভারটি তুলে নিয়ে জিরো নাম্বারে ডায়াল করলাম।

ইয়েস, স্যার? ওপার থেকে ভেসে এল অপারেটারের কণ্ঠস্বর।

আমার নামে কোন মেসেজ আছে বলে মনে হচ্ছে?

কিছুক্ষণ আগে মিঃ রবার্ট ম্যাক্‌কল আপনাকে চেয়েছিলেন, ডঃ বাসু? আমি তাঁর সঙ্গে কি যোগাযোগ করব?

প্লিজ।

কয়েক সেকেণ্ড বিরতি।

ম্যাক্‌কল সম্পর্কে কিছু কিছু খবর আমার কানে এসে পৌঁছেছিল। কি যেন সে একটা করতে যাচ্ছে, মাথামুণ্ডু তার কিছুই বুঝি নি। কলকাতায় তার কাছ থেকে কয়েকটি চিঠি পেয়েছিলাম। সেই চিঠিতে ভাসা-ভাসা ভাবে কয়েকটি পরিকল্পনার কথা বলেছিল, এইটুকু। উদ্ভট কল্পনা। ব্যাপারটার আমি খুব একটা গুরুত্ব দিই নি।

টেলিফোনের বাজ বেজে উঠল।

হ্যালো। রিসিভার তুলে নিয়ে প্রশ্ন করলাম।

আমি কি ডঃ বাসুর সঙ্গে কথা বলছি? কণ্ঠস্বরে রীতিমত উৎকণ্ঠা।

বাসু স্পিকিং।

ম্যাক্‌কল হেয়ার, ডঃ বাসু?

শুভ সন্ধ্যা, বব। কি করে জানলে, আমি এখানে?

গুড গড! অনেক কসরৎ করতে হয়েছে। কলকাতায় তোমার ফ্ল্যাটে যোগাযোগ করি। সেখান থেকে জানতে পারি, তুমি এখন স্টেটস-এ। তারপর সেখানকার মার্কিন তথ্যদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ। সেখান থেকে আমাকে ওয়াশিংটনের তথ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হয়। ওয়াশিংটন থেকে বিল টপলস্কি তোমার ঠিকানাটা দিয়েছে, বাদ দাও। এই মুহূর্তেই তোমাকে দরকার, বাসু? উই কান্‌ট জাস্ট ওয়েট।

দেখছি, এখনো তুমি গোলকটির কথা ভুলতে পারনি।

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, বাসু। গোলকটির ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। যাক, সব কথা টেলিফোনে বলা যাবে না। তুমি কাল সকালেই আমার এখানে আসছ। ঠিক সকাল আটটায়। আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব।

পাগলামি করো না,। আলোর গতি কত জান?

জানি। সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। এ কথা একটি বাচ্চাও জানে। তাই বলে পিছু পা হওয়ার কিছু নেই। সমস্যাটি কি ভাবে সমাধান করা যায়, সেটা তোমার জানা আছে।

সে তো কাগজে কলমে। বাস্তবের সঙ্গে তা নাও মিলতে পারে, বিল।

তাও জানি। এটাও জানি, বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনা খাতায় কলমেই জন্ম নেয়। তাই বলে শুধু সেটুকু আঁকড়ে বসে থাকলেই তো চলে না? রকেটের জন্মও তো খাতায় কলমে। মানুষ তাতে চড়ে শেষ পর্যন্ত চাঁদে গেল। সেটা কি বাস্তব নয়?

তা নয়। তবে বেশ কয়েকজন মানুষের জীবন নিয়ে কথা তো?

জানি। ঝুঁকি নিতেই হবে।

তোমার কাজকর্ম পৃথিবীতে একটা বিতর্কের ঝড়ও তুলতে পারে। সেটা কে সামলাবে?

তোমার হিসেবটা ঠিক হলে, সে প্রশ্নই ওঠে না।

আমার উপর এতটা আস্থা রাখাটা কি ঠিক হবে?

সেটা আমি বুঝবো। আসল কথা, কাল আটটার মধ্যে তুমি আসছ। শুধু একটি কথা, আজ রাতে গ্র্যাভিটেশনাল চ্যানেলটা একবার দেখে নিও?

কোথায় যেতে হবে? আরকোসানতিতে?

না। আমার বাড়িতে—প্যারাডাইস ভ্যালি। ওকে? ওপার থেকে টেলিযোগাযোগ কেটেদিল ম্যাক্‌কল।

রিসিভার নামিয়ে রেখে নিশ্চুপ বসে রইলাম কিছুক্ষণ। মাথায় উঠল মেকসিকান রেস্তোরাঁয় খাওয়া। হুইপল্‌ মানমন্দিরে গিয়ে যে সব আলোচনা করব ভেবেছিলাম, বুঝলাম সেটা আর হবে না। কারণ, মুখে যাই বলি না কেন, ম্যাক্‌কলের ব্যাপারে আমারও কৌতূহল কম ছিল না।

আমার মাথায় তখন বিরাট এই সৌরজগৎ, নিজ নিজ কক্ষপথে গ্রহগুলি সূর্যের চারপাশে পরিক্রমণ করছে। দেখলে মনে হয়, প্রত্যেকটি এক একটি পৃথক সত্তা। কিন্তু তাদের মধ্যে যে প্রচণ্ড নাড়ির টান রয়েছে, তত্ত্ব দিয়ে সে সত্য আমিই প্রমাণ করেছি। ম্যাক্‌কল যদি সফল হয়, আমার তত্ত্বটি তা হলে প্রমাণিত হবে। যার মানে, তখন সহজেই আমরা সৌরমণ্ডল পেরিয়ে মহাবিশ্বের দিকে যাত্রা করতে পারব।

কিন্তু প্রশ্নহল, ম্যাক্‌কল যে গোলকের কথা বলছে সেটা তার চোখের ভুল নয় তো? সে রকম কিছু হলে, তা হলে তো আমরা গেছি,।

ঝুঁকি! বিরাট ঝুঁকি।

ঠিক আটটায় এল জন।

জনকে বললাম, খাওয়ার পাটটা তাড়াতাড়ি সেরে হোটেলে ফিরে আসতে হবে। এবং আপাতত আমাদের সব প্রোগ্রাম ক্যানসেল্‌ড।

তার মানে? আমার কথায় জন যে বেশ অবাক হয়েছে, বুঝতে অসুবিধে হল না।

এ ব্যাপারে আমাকে কোন প্রশ্ন করো না, জন। বিষয়টা খুবই জরুরী এবং গোপনীয়। আগামী দুই

সপ্তাহ তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। তারপর সুস্থ শরীরে যদি ফিরে আসি—মানে আদৌ যদি ফিরি—নিশ্চয় সব কথা জানতে পারবে।

আমার মাথায় তখন তিনটি সমস্যা। এক, গ্র্যাভিটেশনাল চ্যালেন; দুই, ভাষা; তিন, প্লাজমা এঞ্জিন অবশ্য, শেষের দুটি ব্যাপার নিয়ে ম্যাক্‌কলই মাথা ঘামাচ্ছে। এবং এটাও অনুমান করলাম, এ ক্ষেত্রে তার একমাত্র সাহায্যকারী সুরেন্দর মেটা।

সুরেন্দর মেটা।

সেত আমার কাছে এক বিস্ময়। বছর তিরিশের এই ভারতীয় যুবক মহাকাশ গতিবিদ্যায় গবেষণা করে যথেষ্ট নাম করেছে। উদ্ভট কল্পনায় তারও কোন জুড়ি নেই।

অনেক কথাই ভাবতে হল আমাকে।

বিছানায় যখন আশ্রয় নিলাম, রাত তখন বারোটা।

মিনিট দশের মধ্যেই গাঢ় নিদ্রায় ডুবে গেলাম।

ঘুম থেকে উঠলাম সকাল ছ'টায়। স্নানটান সেরে মিনিট পঁয়তাল্লিশের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে নিলাম।

হাতে আর মাত্র পনের মিনিট সময়। এর পরই আসবে ম্যাক্‌কলের গাড়ি। এই ফাঁকে গতকাল গ্র্যাভিটেশনাল চ্যানেল নিয়ে যে হিসেবনিকেস করে রেখেছিলাম সেটা আর এক প্রস্থ দেখে নিলাম। কারণ এই ব্যাপারটার উপরই তো নির্ভর করছে ম্যাক্‌কলের সাফল্য।

কাগজপত্র নিয়ে রিসেপসনে যেতেই—আরে? এযে জর্জ লভ্‌ম্যান? তার মানে একেবারে শিরে সংক্রান্তি। বছর পঁচিশের ছোকরা। ক্যালটেকের সেরা এরোনটিক্যাল এঞ্জিনিয়ার। এক সময় আমার ছাত্রও ছিল। এরো-ডায়ানামিক্‌স পড়েছিল আমার কাছে।

সুপ্রভাত, ডঃ বাসু। জর্জ আবেগে করমর্দন করল।

সুপ্রভাত। তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে, আমি ভাবতেই পারি নি জর্জ।

আমিও না, ডঃ বাসু ম্যাক্‌কল আমাকে এতটুকু আভাসও দেন নি। মাত্র গতকাল বিকেলে জানতে পারলাম আমাদের এই মহাযাত্রায় আপনিও সঙ্গী হচ্ছেন।

তার মানে? তোমরা কি সব ঠিকঠাক করে ফেলেছ নাকি?

গতরাতেই ঠিক হয়ে গেছে। এখন সবটা নির্ভর করছে আপনার ওপর। জর্জ বললো।

বলেছ ভাল, মহাযাত্রাই বটে!

সকাল সাতটায় ফিনিক্‌স শহর অনেকটা ফাঁকা থাকে। চওড়া রাস্তায় গাড়িও কম। মরুভূমির উপর গড়ে তোলা এই শহরে কেমন একটা গ্রাম-গ্রাম ভাব। রাস্তায় সারিবদ্ধ মোটেল এদিকটায়। কোন কোন মোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে অ্যারিজোনার সেই বিখ্যাত ক্যাকটাস। পনের কুড়ি ফুট লম্বা, উপরের দুই পাশে দুটি শাখা। তারা এমন ভাবে গুটিয়ে থাকে দূর থেকে দেখলে মনে হয়—যেন এক একটি শক্ত প্রহরী। কোমরে হাত গুঁটিয়ে অ্যাটেনশন হয়ে পাহারা দিচ্ছে।

জর্জ একটা বাঁক ঘুরে এসে পড়ল ডাবল্‌ট্রি র‍্যাঞ্চ রোডে। এই রাস্তাটি ধরে কিছুটা পশ্চিমে এগোতেই—হ্যাঁ, আমরা ম্যাক্‌কলের ডেরায় এসে গেলাম। এদিকটা পাহাড়ে অঞ্চল। নির্জন। আশেপাশে আর কোন বাড়ি নেই।

বাড়ির সামনেই দেখি ম্যাক্‌কল।

মর্নিং। এসো এসো। তোমার অপেক্ষাতেই আছি। বলে কতকটা দৌড়েই এগিয়ে এল ম্যাক্‌কল। কে বলবে, তার পঞ্চান্ন বছর বয়েস হয়েছে?

রবার্ট ম্যাক্‌কল একজন নামকরা জ্যোতির্বিজ্ঞানী—অনেকে এটুকুই শুধু জানে।

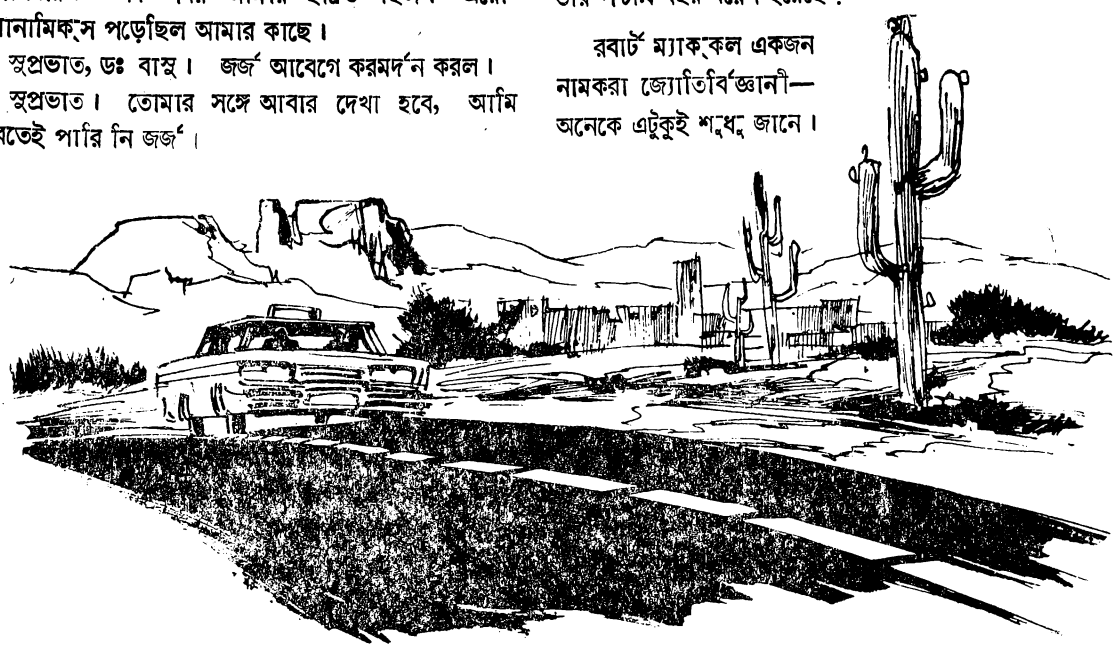

সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই বিখ্যাত ক্যাকটাস।

কিন্তু তার আরো একটা পরিচয় আছে। একজন বিরাট শিল্পীও সে। এ পরিচয়টা আমাদের মত জনাকয়েকেরই শুধু জানা। তার তুলি মহাকাশ বিষয়ক চিন্তাভাবনা নিয়ে আঁক কাটে। চাঁদে মানুষ যদি নগর স্থাপন করে, অথবা মঙ্গল গ্রহে, সেই নগরের চেহারাটা কেমন দাঁড়াবে, নগরবাসীদের জীবন ধারাই বা কেমন দাঁড়াবে। অথবা সুদূর নক্ষত্রলোকে পাড়ি দিতে গেলে যে ধরনের মহাকাশযান দরকার তার কায়দাকানুন—এগুলিই তার ছবি আঁকার বিষয়বস্তু। বলতে কি, তার কিছুকিছু নকসা মার্কিন মহাকাশ সংস্থা 'নাসা'ও কাজে লাগিয়েছে। অত্যন্ত ধীরস্থির মানুষ। দীর্ঘ পনের বছর একসঙ্গে কাজ করেছি নক্ষত্রবিজ্ঞান নিয়ে। কখনো তাকে চঞ্চল হতে দেখি নি। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের চরিত্র অবশ্য এরকমই হয়। বিন্দুকণার মত এই পৃথিবীটা, হাজার লক্ষ আলোকবৎসর দূরে কোটি কোটি গ্যালাকসি। তাদের মধ্যে প্রতিমুহূর্তে কতরকম ঘটনাই না ঘটছে। নক্ষত্রের জন্ম হচ্ছে। সেই সঙ্গে মৃত্যু। নীহারিকা কুণ্ডলী পাকিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটছে, কতকটা কালবৈশাখীর মেঘের মত। সে সব দেখতে দেখতে নিজের সত্তাটাই পৃথিবী থেকে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু আজ, দীর্ঘ পনের বছরে এই প্রথম ম্যাক্‌কলকে অনেকটা অতিরিক্ত রকম চঞ্চল বলেই মনে হল আমার।

মর্নিং। কী ব্যাপার? মৃদু হেসে এবং কৌতূহলী হয়ে তার সঙ্গে করমর্দন করলাম।

গতবছর অক্টোবরে তোমাকে বলেছিলাম না, সেই যে গোলক, এবার তার রহস্য আমি উদ্ধার করবোই ডঃ বাসু। মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ক তোমার তত্ত্বটি আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি। কাজ হবে। যাক, সে সব কথা একটু পরে হচ্ছে। চল আগে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিই। জর্জ, তুমিও এসো।

রবার্ট, সংক্ষেপে বব।

বব আমাদের নিয়ে সরাসরি তার স্টুডিওতে এল। এখানেই ব্রেকফাস্টের আয়োজন করা হয়েছে। তবে কি যে খাচ্ছি, সে দিকে নজর ছিল না। আমার সামনের দেওয়ালে বিচিত্র রঙে আঁকা অদ্ভুত একটি বস্তুর ছবি। বস্তুটির নিচের অংশ দেখলে মনে হয় কয়েকটি মোচা যেন পরপর জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সামনের অংশ পিরিচের মত। পিরিচটির দুপাশে কয়েক ডজন জানলা। পিরিচটির সামনের অংশ ছুঁচলো। পেটের অংশ উপবৃত্তাকার একটি ঢাকনা। মনে হয় যেন কাচের তৈরি। আর সমস্ত পিরিচটি ঘিরে রেখেছে একটি পুরু ধাতব বলয়। কালো রঙ।

খেতে বসে এই ছবিটার উপরই প্রথম চোখ গিয়ে পড়ল আমার। আমি যে অবাক হয়েছি ববের বুঝতে অসুবিধে হল না।

দা কসমিক বোট। মৃদু হেসে কথা বলল বব।

মানে মহাজগতিক নৌকো। তা হলে এটাই তোমার পরিকল্পনা? আমার কণ্ঠে বিস্ময়।

তোমার কি মনে হয় কল্পনাটা খুবই উদ্ভট?

সবুর কর, ব্যাপারটা আগে দেখে নিই, তারপর জবাব দিচ্ছি।

নির্বাক চেয়ে রইলাম ছবিটির দিকে। তা কম করেও তো দশ মিনিট হবে? তারপর কতকটা বিস্ময় জড়িত কণ্ঠেই বললাম, ভাবতে পারছি না। সব কিছুই তো নিখুঁত বলেই মনে হয়।

ওই ছকটার দিকে দেখ। বব বললো।

পেছন দিকে একটি সবুজ বোর্ড। তার উপর বিভিন্ন রঙ দিয়ে আঁকা হয়েছে জ্যামিতিক ছক্। ছক্‌গুলির মধ্যে দিয়ে পৃথিবী থেকে সৌরজগতের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে একটি সুড়ঙ্গ।

তোমার গ্র্যাভিটেশনাল চ্যানেল ঠিকমত আঁকা হয়েছে তো, ডঃ বাসু? সুড়ঙ্গটি দেখিয়ে প্রশ্ন করলো বব।

ঠিকই হয়েছে। তবে গোড়া এবং শেষের দিকটি একটু পালটাতে হবে। গ্রহগুলির অবস্থান পালটেছে, তাই। তা ছাড়া, পিকেরিং গ্রহাণুটির কথাও ভাবতে হবে। বললাম।

সেকি? তা হলে আবার কি ছক্ পালটাতে হবে আমাদের?

বেশি না, যৎসামান্য। তাতে কোন অসুবিধে হবে না।

কোন কোন মানুষের মধ্যে যেন যাদু থাকে। আমার কাছে মনে হল, ববও তেমনই একজন। সে যে আসলে কি করতে চায়, এর আগে সে ব্যাপারে কোন ইঙ্গিতই দেয় নি। মাধ্যাকর্ষণ নিয়ে কিছু তত্ত্ব, কিছু অংক এবং ছক—এই নিয়ে পাঁচ মাসে আগে সে আমাকে কিছু কাজ করতে বলেছিল। বলতে কি, সবই তাত্ত্বিক ব্যাপার। যে যে সমস্যার কথা বলেছিল, আমি তাদের সমাধান নিয়মিত ডাক মারফৎ পাঠিয়ে গেছি। কিন্তু এখানে আসার পর, হ্যাঁ, আজ এই প্রথম, এই ব্রেকফাস্ট টেবিলে সে প্রকাশ করল তার আসল মতলব। তার কথা শুনে বেশ ভড়কেই গেলাম। পাগল, না মাথা খারাপ? নইলে এমন উদ্ভট পরিকল্পনা আর কেউ করতে পারে? তবু ওই যে, বলছিলাম না, কোন কোন মানুষের মধ্যে যাদু থাকে। পছন্দ কর কি না কর, তাকে উপেক্ষা করা যায় না।

মিনিট পনেরর মত কথা বলল বব। তারপর পুরো ব্যাপারটা বুঝে নিতে আমার অসুবিধে হল না।

তার কথা শেষ হলে, আমি বললাম, তা হলে আমাকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে হবে?

অবশ্যই, ভনিতা না করে জবাব দিল সে।

ঝক্কিটা বুঝতে পারছ ?

জানি। তবু পৃথিবীর বড় বড় দেশগুলির কাছ থেকে যেখানে সাহায্য পাচ্ছি, এ সুযোগ ছাড়তে পারি না।

যন্ত্রপাতি, ট্র্যাকিং ব্যবস্থা, যোগাযোগ পদ্ধতি—এবং তার চেয়েও বড় কথা, সেকেণ্ডে এক লক্ষ মাইলের মত গতি আদৌ আমরা সহ্য করতে পারব কিনা—এ সব কথা নিশ্চয় তুমি ভুলে যাও নি, বব।

সব মনে রেখেছি, ডঃ বাসু। বলতে কি, সবই প্রস্তুত। এখন তুমি এলেই কাজ শুরু করা যায়।

তা কবে যাত্রা করবে ভাবছ ?

আজই। এক ঘণ্টার মধ্যে।

বাবাঃ। একেবারে ঘোড়ায় জিন দিয়ে বসে আছ দেখছি। বেশ, যাবার আগে টেলিফোনে জনকে জানিয়ে দিই।

বেশ তো, টেলিফোন কর।

টেলিফোনে হেরিটেজ হোটেলে যোগাযোগ করতে সেখান থেকে রিসেপসানিস্ট জানাল, জন বেরিয়ে গেছে, কখন ফিরবে সে জানে না।

তাকে বললাম, জন কুলিনানকে জানিয়ে দেবেন, আমি জরুরী কাজে আটকে পড়েছি। একটু অন্য জায়গায় যেতে হবে। কখন ফিরবো। যথা সময়ে জানাব।

সকাল সাড়ে ন'টায় রবার্ট ম্যাক্‌কলের বাড়ির সামনে হেলিকপটার এসে নামল।

এ যে খোদ মার্কিন নৌবহরের হেলিকপটার, বব! আমি রীতিমত বিস্মিত।

অবশ্যই। সোভিয়েত, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, ইউ. কে. অনেক দেশের সাহায্যও দেখতে পাবে।

বব, জর্জ এবং আমি হেলিকপটারে গিয়ে উঠলাম।

ঘণ্টা দুই। তারপর খোদ নেভাদার মরুভূমি।

হেলিকপটার থেকে নামতেই—এবার কি সত্যিই আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে ? আমার সামনে প্রায় পাঁচ শ ফুট উঁচু একটি ধাতব কাঠামো। তার সঙ্গে লেগে রয়েছে—এই তো সেই, ববের বাড়িতে শিল্পীর তুলিতে যা দেখেছিলাম। পরপর সাজান কয়েকটি ধাতব মোচা। প্রত্যেকটির রঙ লাল। প্রতিটি মোচার নিচে, পরিধি বরাবর প্রচুর ছিদ্র। মোচাগুলির উপর উপবৃত্তাকার একটি গম্বুজ। গম্বুজটির ডগাটি ছুঁচলো। আর গম্বুজের নিচে প্রায় দু'শ' ইঞ্চি ব্যাসের একটি বলয়। সব মিলিয়ে লম্বায় প্রায় আড়াই শ' ফুট।

কাঠামোটির কিছু দূরে—তা এক কিলোমিটার হবে—পর পর সাজান রয়েছে এক ডজন গামলা। অর্থাৎ রেডিও অ্যাণ্টেনা। অ্যাণ্টেনার অদূরে একটি কংক্রিটের থাম। তারও উপর যন্ত্রপাতি। "ইনফ্রারেড টেলিস্কোপ", বলল বব। কয়েকটি ঘরও দেখলাম। প্রত্যেকটি ঘরের নিচে চাকা। বোঝা গেল ট্রেইলারের সাহায্যে ঘরগুলি এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।

আমরা একটি ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

হায় ভগবান! এ যে দেখছি প্রতিভার একেবারে বাজার। পরমাণু বোমা নিয়ে গবেষণার সময় নিউমেক্সিকোর সান আলমসে সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে এত বেশি তা বড় বিজ্ঞানী বোধহয় একত্রে সমবেত হয় নি। মস্কো এবং কিয়েভ থেকে এসেছেন দুই আকডেমিসিয়ান রুবিন এবং টিটভ। ব্রহ্মাণ্ড বিজ্ঞানে সারা পৃথিবীতে যাঁদের নাম। উপস্থিত প্যাসাডিনার জেট প্রোপালস ল্যাবোরেটরির প্রবীন গ্রহবিজ্ঞানী ডঃ আলেকজাণ্ডার থর্নহিল। মঙ্গল এবং বৃহস্পতি গ্রহের ভূতাত্ত্বিক গঠন সম্পর্কে তাঁর তত্ত্ব সাড়া জাগিয়েছে। কার আর নাম করবো! পরিচিত অপরিচিত মিলিয়ে এ যেন প্রতিভার মেলা।

রবার্ট ম্যাক্‌কল সবার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল।

আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে দারুণ আনন্দিত হলাম, প্রফেসরস্। রবার্ট ম্যাক্‌কলের এই অভিযানে আপনারা যে সাহায্য করেছেন, সবই শুনেছি। খুবই দুঃসাহসিক অভিযান সন্দেহ নেই। যদি আমরা সফল হই, বলতেই হবে, এটাই হবে মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। ধন্যবাদের সঙ্গে কথা বললাম আমি।

এরপর সব কিছুই চলল ছক ধরে।

দুপুর বারোটায় বব আমাকে তালিকা দিল। তালিকায় পাঁচটি নাম। প্রথম নামই সুরেন্দর মেটার। বাকি চারজন রবার্ট ম্যাক্‌কল, জেমস ওয়েলচ, ভ্লাদিমির রোমানেনকো এবং আমি।

বব বলল, এই অভিযানে পাইলট হিসেবে কাজ করবে সুরেন্দর মেটা। জেমস ওয়েলচের উপর দায়িত্ব থাকবে আমাদের নিরাপত্তার ভার। পুরো লাইফ সাপোর্টিং সিসটেমটাই সে দেখাশুনা করবে। ভ্লাদিমির রোমানেনকো কসমোলজিস্ট। তোমার উপর দায়িত্ব থাকবে গাইডিং সিস্টেমের উপর নজর রাখার। আর আমার ব্যাপারটা তো জানাই।

সুরেন্দরের সঙ্গে মিটিং করলাম বিকেল তিনটেয়। ওই সময় গ্র্যাভিটেশনাল চ্যানেলের সংশোধনীটা তাকে বুঝিয়ে দিলাম।

বিকেল চারটেয় ম্যাক্‌কল এসে জানাল, পৃথিবীর সমস্ত ট্র্যাকিং নেটওয়ার্ক প্রস্তুত। ইউ. কে-র জডরেল ব্যাঙ্ক, অ্যারিজোনার কিট পিক এবং হুইপল্ মানমন্দির, ভারতের হাসান, অস্ট্রেলিয়ার ওয়োমারো ছাড়াও আমাদের উপর নজর রাখবে কম করেও দেড়শ'টি ট্র্যাকিং স্টেশন।

সন্ধে ছ'টায় সুরেন্দর জানাল, দ্য কোয়েস্ট'-এর সুপার-কমপিউটারে সমস্ত ডেটাই দেওয়া হয়ে গেছে। কোন কিছু

ভুল হলে কমপিউটারই সংশোধন করে নেবে। সাতটায় সুপারকমপিউটার চালু হয়ে যাবে।

দ্য কোয়েস্ট! ম্যাক্‌কল নামটি দিয়েছে চমৎকার। সেই মোচার মত যানটি—যার লক্ষ্য সৌর জগতের বাইরে একটি গোলকের উপর। যার রহস্য কেউ জানে না যার অস্তিত্বের কথা পৃথিবীর গুটিকয় বিজ্ঞানী ছাড়া আর কেউ রাখে না।

ম্যাক্‌কল অবশ্য আজ সকালেই আমাকে বলেছে এমন গোপনীয়তার কারণ কি।

প্রশ্নটা আমিই করেছিলাম।

দুটি কারণ। এক, পৃথিবীর অনেকগুলি দেশের বিজ্ঞানী এর সঙ্গে জড়িত। কোন কোন দেশের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ। বজ্জাত রাজনৈতিক নেতারা খবরটা জানলে এ ধরনের সহযোগিতা নিয়ে গোলমাল সৃষ্টি করতে পারে। বলতে পারে, অমুক দেশের সঙ্গে আমাদের খারাপ সম্পর্ক। না না, তাদের সঙ্গে আমাদের বিজ্ঞানীরা কাজ করবে না। কিন্তু এটা তো সত্যি, বিজ্ঞানীদের কোন জাত নেই। কে কোন দেশের এ নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামান না। সত্যের অনুসন্ধানই তাঁদের লক্ষ্য। কিন্তু অনেক সময় রাজনীতিবিদদের চক্রান্তে তাঁরা নাস্তানাবুদ হন। তাই ব্যাপারটা আমরা চেপে গেছি। দুই, এই প্রজেক্টে প্রচুর খরচ। বেশির ভাগ খরচ পৃথিবীর শিল্পপতিদের কাছ থেকে আমরা চাঁদা হিসেবে পেয়েছি। এ খবর রাজনৈতিক নেতারা পেলে হইচই বাঁধাতে পারে। তার জন্যেও গোপনীয়তা।

অবাক কাণ্ড! এত টাকা এমন একটি কাজে শিল্পপতিরা দিলেন? সবটাই তো জলে যাবে—মানে বিজ্ঞান হয়ত লাভবান হবে। কিন্তু তাঁদের কি লাভ?

ভুল করছ, ডঃ বাসু! শিল্পপতিদের মধ্যেও সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ থাকেন। জ্ঞানচর্চায় টাকা খরচ করাটাকে তাঁরা অপচয় হিসেবে ভাবেন না।

বহুৎ খুব। শুনে আশাশ্বিত হলাম। আসলে তাঁদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণাটা একটু অন্য রকম কিনা? তাই এই প্রশ্ন। আমি দুঃখিত, বব। যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

দ্য কোয়েস্ট!

মানে বিচিত্র একটি মহাকাশযান। ম্যাক্‌কলের পরিকল্পনায় তৈরি। ব্যাপার স্যাপার দেখে এবার সত্যিই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম।

তা যাত্রাক্ষণটি কখন? প্রশ্ন করলাম আমি।

আগামীকাল, সূর্যের অর্ধেক অংশ দিক বলয়ের উপর উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মেটা তার এঞ্জিনটি চালিয়ে দেবে।

রাত ন'টায় সবাই মিলে ডিনার খেলাম।

রাত এগারটায় আমাদের শরীরে বিশেষ একটি হরমোনের ইনজেকসন করল ওয়েলচ। নিজেও ইংজেকশনটি নিল। ইংজেকশনের প্রভাবে ঘুমিয়ে পড়লাম আমরা।

ওয়েলচ বলল এর প্রভাবে আমাদের মস্তিষ্ক সুস্থিত হবে। মানসিক চাঞ্চল্য থাকবে না।

ভোর চারটেয় ঘুম ভাঙ্গল।

সাড়ে চারটেয় আমরা—মানে 'দ্য কোয়েস্ট'-এর যারা যাত্রী প্রস্তুত হয়ে নিলাম। কোন বিশেষ পোশাক পরতে হল না।

পাঁচটায় ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা গিয়ে উঠলাম 'দ্য কোয়েস্ট'-এর সেই উপবৃত্তাকার খোলের মধ্যে।

এর পর সব কিছুই চলল সেকেণ্ডের কাঁটা ধরে।

খোলের মধ্যে এক একটি ইজিচেয়ার। তার হাতলে নানা রঙের বাল্ব জ্বলছে নিভছে। সুরেন্দর গিয়ে বসল সামনের আসনে। তার মাথায় একটি টুপি। টুপির সঙ্গে লাগান হেড ফোন। এবং নানান গ্যাজেট।

ম্যাক্‌কল আমার পাশেরই ইজিচেয়ারে। সে বলল, আমরা এখন অ্যান্টিগ্র্যাভিটি চেম্বারে শুয়ে। এই কক্ষের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের অবস্থাটি থাকবে পৃথিবী পৃষ্ঠেরই মত। যানটি আকাশে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের সেই ধাতব বলয়টি প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে শুরু করবে। আর তার প্রভাবে এই কক্ষটির ভেতরে মাধ্যাকর্ষণ থাকবে পৃথিবী পৃষ্ঠের মত। তাই, এই কক্ষে চলা ফেরায় কোন অসুবিধে হবে না। শরীরেও দেখা দেবে না কোন অস্বাভাবিকতা।

যার মানে, ভবিষ্যতে এই পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে মহাকাশযাত্রীরা বিমানযাত্রীর মতই যাতায়াত করতে পারবে। আমার মন্তব্য।

পাঁচটা বেজে তেতাল্লিশ মিনিট চার সেকেণ্ড! কথা বলল সুরেন্দর। স্যারস, কাউণ্ট ডাউন শুরু হয়েছে। আর মাত্র এক মিনিট দশ সেকেণ্ড পর আকাশে উঠব।

হরমোন ইংর্জেকসনের প্রভাবে তার ঘোষণায় আমাদের মানসিকতায় কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না।

পাথরের মূর্তির মত আমরা ইজি চেয়ারে শুয়ে রইলাম।

এক মিনিট দশ সেকেণ্ড! আমাদের সামনে কক্ষটির সিলিং এ জ্বলে উঠল লাল আলো।

"লিফট্ অফ মেড, স্যারস।" বলল সুরেন্দর। অর্থাৎ আমরা এখন আকাশে।

॥ তিন ॥

বিচিত্র অভিজ্ঞতা! বিচিত্র! বিচিত্র! অবশ্যই বিচিত্র!

তোমার কোন তুলনা হয় না, বব! তুমি যা করলে, সত্যিই তার কোন তুলনা নেই। ইজিচেয়ার থেকে উঠে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে উঠেছি। আনন্দে দু বাহু বাড়িয়ে আলিঙ্গন করলাম ববকে।

ববের ঠোঁটে তখন তার স্বভাবসুলভ মৃদু হাসি।

মিনিট পনের অতিক্রান্ত হয়েছে।

আমাদের সামনে টেলিভিশনের মত গোটা দশেক যন্ত্র। যন্ত্রগুলির নিচে আট ফুট লম্বা, আট ফুট চওড়া এবং ছয় ফুট উঁচু সুপার কমপিউটার। তার পাশে কত রকমের প্যানেল। প্রতিটি প্যানেলের কাচের পর্দার উপর ছবি। দুটি পর্দার উপর নীল গ্রাফ। তার উপর কখনো লাল আলোর ফুটকি, কখনো সবুজ রেখা। মাঝে মাঝে সেই রেখার উপর আবছা ঢেউ। 'দ্য কোয়েস্ট'-এর গতিবিধি এই সব রেখা দেখেই বুঝতে পারছি।

বাঁ পাশের একটি প্যানেলের পর্দায় চোখ পড়তেই দেখা গেল আমাদের এই মহাকাশযান 'দ্য কোয়েস্ট'-এর ছবি। 'দ্য কোয়েস্ট' ছুটে চলেছে মহাশূন্যের ভেতর দিয়ে।—কিন্তু, তাই তো? যখন মাটিতে ছিল, তখন দেখেছিলাম তার নিচের দিকে ছয়টি মোচা। এখন চার। তাজ্জব ব্যাপার! আসলে এই দলের সঙ্গে আমার যোগ দেওয়ার ব্যাপারটা এতই তড়িঘড়িভাবে ঘটল যে, এই অভিযানের অনেক কিছুই আমার জানা হয় নি। ম্যাক্‌কল যেন সামরিক এক কমাণ্ডার, আমি সাধারণ সৈনিক। সে ডাকল আমি সাধারণ সৈনিকের মতই যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লাম — কোন রকম প্রশ্ন না করে।

সব কিছু তোমাকে বলা হয় নি, ডঃ বাসু। বলল বব। বিভিন্ন গ্রহের অবস্থান হিসেব করতে গিয়ে আমাদের অনেকটা সময় লেগেছে। আসলে তোমার গ্র্যাভিটেশনাল চ্যানেলটি প্রোগ্রাম করতেই আমাদের সময় লেগেছে অনেক। মাত্র তিন দিন আগে এ সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারি। আর তারপরই যাত্রার প্রস্তুতি। এ সময়টি পেরিয়ে গেলে আগামী দশ বছরে এতটা মস্ত সুযোগ আর আমরা পাব না। যাই হোক, ওই মোচার কথা বলছিলে না? ওগুলি আসলে এক একটি প্লাজমা বুস্টার। মার্কিন এবং রাশিয়ান বৈজ্ঞানিকদের সহযোগিতায় তৈরি।

প্লাজমা বুস্টার? তার মানে, জ্বালানি হিসেবে রকেটে তোমরা তেল, হাইড্রোজেন অথবা কঠিন কোন জ্বালানি ব্যবহার করছ না। আমার প্রশ্ন।

ঠিক তাই। ওই মোচার এক একটির মধ্যে রয়েছে একটি করে নিউক্লিয়ার ফিউশন রিঅ্যাকটার। এমন ধরনের রিঅ্যাকটার, যাকে আমরা নিয়ন্ত্রিত করতে পারি, যেমন আমরা নিয়ন্ত্রণ করে থাকি শক্তি উৎপাদনের পারমাণবিক চুল্লি। তার পারমাণবিক সংযোজন বা নিউক্লিয়ার ফিউশনের সময় তৈরি হয় প্রচণ্ড উত্তাপ। চুল্লির মধ্যে আছে অক্সিজেনের বরফ। প্রচণ্ড উত্তাপে সেই বরফ মুহূর্তে প্লাজমায় পরিণত হয়। ওই অবস্থায় অক্সিজেন পরমাণুর ইলেকট্রন কণাগুলি তাদের নিউক্লিয়াসের পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। ফলে যে গ্যাস তৈরি হয় তার মধ্যে থাকে ধনাত্মক অক্সিজেন আয়ন এবং ঋণাত্মক ইলেকট্রন কণা। তারা প্রচণ্ড বেগে জেটের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে। তার ফলে যে ধাক্কা সৃষ্টি হয় তারই প্রভাবে চলছে এই 'দ্য কোয়েস্ট'। তাতে মহাকাশযানটির গতি দারুণভাবে বেড়ে গেছে। নিচের দুটি বুস্টারের কাজ শেষ হওয়ায় তারা খসে পড়ে এখন মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে।

এখন কত গতি?

আমার প্রশ্নটি শুনে বব সুরেন্দরের দিকে চাইলো।

সুরেন্দর তার সামনের মনিটারের বোতাম টিপতেই পর্দার উপর ফুটে উঠল 'দ্য কোয়েস্ট'-এর বেগ—ঘণ্টায় পঞ্চাশ হাজার মাইল।

চমৎকার। আমার মন্তব্য।

কিন্তু এর পরই কিন্তু তোমার দায়িত্ব শুরু হচ্ছে, ডঃ বাসু। এবার তোমাকে হাল ধরতে হবে।

জানি। আমি বললাম।

অদ্ভুত মনে হল আমার। আমরা সবাই মহাকাশযাত্রী। অথচ মহাকাশ যাত্রার জন্যে কোন রকম শারীরিক অনুশীলনই আমাদের করতে হয় নি। যেন সাধারণ কোন বিমানযাত্রী আমরা। কোন অসুবিধে নেই। শরীর এবং মনের উপর কোন চাপ নেই।

সুরেন্দরকে বললাম, চাঁদ এখান থেকে এখন দু লক্ষ মাইলের কিছু বেশি দূরে। দু ঘণ্টার মধ্যেই আমরা তার কাছাকাছি পেঁছে যাব। তারপরই আমরা ধরবো গ্র্যাভিটেশনাল চ্যানেল। মনিটার প্রস্তুত রাখো।

কাজটা খুব কঠিন নয়। যাবতীয় দায়িত্ব সুপার কমপিউটারই পালন করবে। যথা সময়ে সুরেন্দর একটি বোতাম টিপবে। এই যা।

আসলে ব্যাপারটা হল এই ঃ সৌরমণ্ডলে বিচরণ করছে গ্রহ এবং উপগ্রহ। তাদের চারপাশে রয়েছে নিজস্ব মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র। সেই সব ক্ষেত্রের মধ্যে চলে প্রতিক্রিয়া। যার ফলে মহাকাশে এক এক অঞ্চলে তাদের মাধ্যাকর্ষণের ক্ষমতা দাঁড়ায় এক এক রকম। অঙ্ক কষে আমি দেখেছি, 'দ্য কোয়েস্ট'-কে এই ধরনের এক একটি অঞ্চলের ভেতর দিয়ে নিয়ে গেলে গ্রহ-উপগ্রহগুলির অভিকর্ষ বল তার উপর তেমন কোন প্রতিক্রিয়াই করবে না। বরং তাদের প্রতিক্রিয়ায় আরো সোজা পথে আমরা লক্ষ্য স্থলে পেঁছতে পারব। সেই সঙ্গে 'দ্য কোয়েস্ট'-এর গতিও বাড়বে। এই পথটিরই আমি নাম দিয়েছি 'গ্র্যাভিটেশন্যাল চ্যানেল' বা মাধ্যাকর্ষণ পথ। এ যেন বিপুল পৃথিবীর খরস্রোতা খাল পথে ছুটে চলা।

বলতে পারো, হিসেবটি আমার খুবই নিখুঁত। দুই ঘণ্টার মধ্যে আমরা চাঁদের দুই হাজার মাইলের মধ্যে গিয়ে পড়লাম।

সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল সুপারকমপিউটারের সংকেত।

মনিটারের বোতাম টেপ। সুরেন্দরকে বললাম।

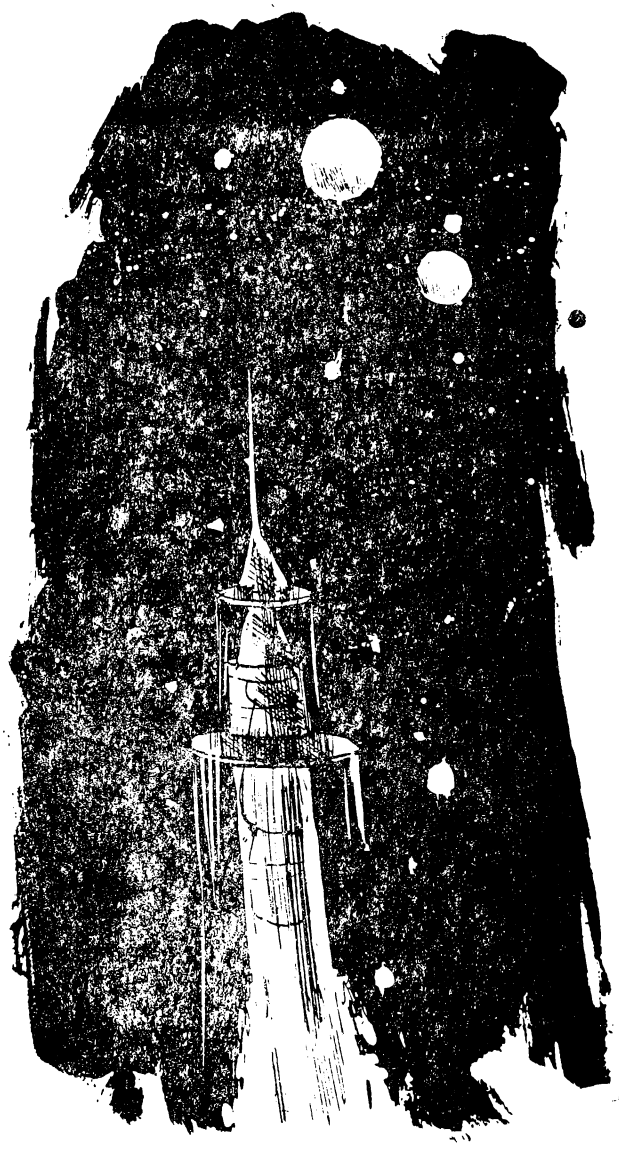

মাথার ওপর গাঢ় কালো আকাশ

সুরেন্দর বোতাম টিপল।

মুহূর্তে চালু হয়ে গেল আর একটি প্লাজমা বুস্টার।

গতি বাড়ছে। রুদ্ধশ্বাসে পেছন থেকে কথা বলল ম্যাককল।—উই আর অন দ্য রাইট ট্রাক, ডঃ বাসু।

নিখুঁত ভাবে। আমি বললাম।

পৃথিবীর ট্র্যাকিং সেণ্টারগুলি থেকে জানিয়ে দেওয়া হল, 'দ্য কোয়েস্ট' ঠিক পথেই চলেছে।

গতি এখন পঞ্চাশ হাজার মাইল প্রতি সেকেণ্ডে!

বাড়ছে, আরো বাড়ছে—সেকেণ্ডে এক লক্ষ মাইল!

মাথার ওপর গাঢ় কালো আকাশ। তার বুকে কোটি কোটি নক্ষত্র! কি উজ্জ্বল! পৃথিবী থেকে আকাশের এমন চেহারা আমরা কল্পনাই করতে পারি না।

ঘণ্টা আড়াই-এর মধ্যে আমরা মঙ্গল গ্রহ পেড়িয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পর অ্যাস্টেরয়েড বেল্ট পড়ল। পিকেরিং নামক গ্রহণুটি এর মধ্যেই বিচরণ করছে। যার ব্যাস তিন'শ মাইল। পিকেরিং-এর মাধ্যাকর্ষণের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যা করার সুপারকমপিউটারই করল।

অ্যাস্টরয়েড বেল্টটি পেরিয়ে যেতেই ওয়েলচ বলল, এখন আপনারা বিশ্রাম করুন। আর আমাদের কিছু করার নেই। তিরিশ ঘণ্টার মধ্যে আমরা প্লুটো গ্রহ অতিক্রম করে সৌরজগতের বাইরে চলে যাব। তারপর আবার শুরু হবে কাজ। বিশ্রাম না করলে ধকল সামলাতে পারবেন না।

খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম আমরা। তারপর আবার এক ধরনের হরমোন ইংজেকশন নিতে হল। তারপরই গাঢ় নিদ্রা। মাঝে কেন গোলযোগ হলে কমপিউটারই আমাদের জাগিয়ে দেবে।

আসলে এ ধরনের অভিযানে সবচেয়ে বড় ব্যাপার মনোবল এবং আত্মবিশ্বাস। আমাদের লক্ষ্য শুধু একটি রহস্যজনক গোলক। যা বিচরণ করছে সৌরমণ্ডল থেকে বহুদূরে। ম্যাক্‌কল মাস ছয় আগে সেখান থেকে অদ্ভুত এক ধরনের বেতার সংকেত পেয়েছিল। তার ধারণা হয়, কোন জীবন্ত প্রাণীই সেই সংকেত পাঠিয়েছে। তার অনুসন্ধানেই এই যাত্রা! কে জানে, সেটা হয়ত প্রহেলিকাই শুধু। তবু প্রচণ্ড আশাবাদী রবার্ট ম্যাক্‌কলের আহ্বানে কেউই সাড়া না দিয়ে পারে নি। ঘুমনোর আগে শুধু একটি কথাই মনে হল, এটা আমাদের মহানিদ্রা নয় তো?

॥ চার ॥

গতি মানুষের মনে অদ্ভুত একটি আবেশ সৃষ্টি করে। যখন কোথাও দাঁড়িয়ে আছ, তোমার চার দিকে দৃষ্টি। যখন দৌড়তে শুরু কর তখন দৃষ্টি তোমার সামনে—লক্ষ্যের দিকে। কিন্তু এই যে 'দ্য কোয়েস্ট'? যার গতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ মাইল—এমন প্রচণ্ড গতির মধ্যে থাকে, বলতে পারো, নিজেদের অস্তিত্বই আমরা ভুলে গেলাম।

ঠিক তিরিশ ঘণ্টা পর আমরা ঘুম থেকে উঠলাম। শোয়ার সময় আমাদের মস্তিষ্কের সঙ্গে সুপারকমপিউটার যুক্ত করা হয় সূক্ষ্ম তারের সাহায্যে। তার বলতে অপটিক্যাল ফাইবার। আমাদের মাথায় এখন হাল্কা একটি টুপি। প্লাস্টিকের তৈরি। সেই টুপির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অপটিক্যাল ফাইবার। সুপারকমপিউটার যখন ঘুম ভাঙিয়ে দিল, আমার মনে হল স্বাভাবিক ভাবে জেগে উঠলাম আমি। যেমন জাগতাম পৃথিবীতে, ভোরের

দিকে—সারারাত মিণ্টি একটি ঘুমের পর। শরীরে কোন অবসাদ নেই। মাথা হাল্কা। নেই কোন দুশ্চিন্তা, নিজের সম্পর্কে কোন দুর্ভাবনা।

ম্যাক্‌কল পৃথিবীর ট্র্যাকিং সেণ্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করল। সেখান থেকে খবর এল, "ভয় নেই আপনারা ঠিক পথেই এগিয়ে চলেছেন।

মনিটারে চোখ পড়তেই দেখলাম, এবার দ্য কোয়েস্ট-এর সঙ্গে রয়েছে মাত্র তিনটি মোচা। তার মানে আরো একটি বুস্টার মাঝ পথে চালু হয়ে মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। বুঝলাম, এটা চালু হয়েছিল সৌর জগতের সীমানা ছাড়ার সময়। সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ উপেক্ষা করার জন্যে অতিরিক্ত শক্তি জুগিয়ে তৃতীয় প্লাজমা বুস্টারটি কাজ করেছে।

শুরু হল পর্যবেক্ষণের পালা। এ দায়িত্ব রোমানেনকোর।

রোমানেনকো অপটিক্যাল, রেডিও এবং ইনফ্রারেড টেলিসকোপে ছবি তুলতে শুরু করেছে।

আরো দশ ঘণ্টা।

এবার আমাদের মহাকাশযানের গতি কমিয়ে নেওয়া হল। এখন গতি ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার মাইল।

মিনিট পনের অপেক্ষা। এই পনের মিনিট আমাদের কাছে মনে হল যেন পনের লক্ষ বছর। কারণ যার জন্যে এত ঝক্কি নিয়ে আমাদের আসা—এবার তার সাক্ষাৎ পাব। সেই রহস্য গোলক।

সুরেন্দরকে বাহাদুরই বলতে হবে। নিশ্চুপ সে বসে রয়েছে মনিটারের সামনে। ঝানু পাইলটের মত। তার পেছনের আসনে ম্যাক্‌কল, আমি, ওয়েলচ এবং রোমানেনকো।

ম্যাক্‌কল তো পাথরের মূর্তি! আর আমি ভাবছি, সত্যিই কি গোলকের আমরা দেখা পাবো?

পনের মিনিট এক সেকেণ্ড!

সংকেত বেজে উঠল। কুঁ কুঁ কুঁ···।

এই তো সেই সংকেত! বুঝতে পারছ, ডঃ বাসু? ম্যাক্‌কলের চোখের তারা আনন্দে ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠল।

হা ভগবান! সত্যিই তো? এ যে একেবারে ইংরেজি ভাষায় টেলিগ্রাফিক কোড? আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম।

কি মালুম হচ্ছে?

সবুর কর। আর একটু ভাল করে শুনে নিই।

রোমানেনকো এরই মধ্যে সংকেত বার্তা রেকর্ড করতে শুরু করেছে। সে কিন্তু নিশ্চুপ!

কুঁ কুঁ·· কুঁকুঁকুঁ·····

এবার সত্যিই আমার মাথা খারাপ হওয়ার মত অবস্থা। সংকেতের অর্থ বুঝতে এতটুকু অসুবিধে হল না আমার। —"আমার বেঁচে আছি। এখানে"! এই হল সংকেতের অর্থ।

ইট ইজ ইন দ্য সাইট, স্যার! কথা বলল সুরেন্দর।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা তার মনিটারের ভিশন প্লেটের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

দেখা গেছে, দেখা গেছে। ওই তো সেই গোলক! মনিটারের প্লেটের উপর স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তার চেহারা।

সরে আসছে। আরো কাছে সরে আসছে! হ্যাঁ, সেই রহস্য জনক গোলক।

শুরু হল তোড়জোড়। ওয়েলচ, উত্তেজনায়, যাতে আমাদের বিপাকীয় কাজকর্ম বিঘ্নিত না হয়, তার জন্যে নতুন এক প্রস্থ ইংজেকসন করল আমাদের উপর।

পরক্ষণেই রোমানেনকো গিয়ে পড়ল কসমোলজিক্যাল ডেটাপ্রসেসর-এর উপর।

তিন মিনিট পর।

উই আর ইন দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড অফ দ্য অবজেক্ট-এক্স, স্যার। কথা বলল সুরেন্দর।

রহস্যময় ওই গোলকটির নাম দিয়েছে ম্যাক্‌কল অবজেক্ট-এক্স। বুঝলাম এবার আমরা তার মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করেছি।

ম্যাক্‌কল সুরেন্দরের কথাটি শোনামাত্র আদেশ ছিল, 'দ্য কোয়েস্ট'-কে আরো কাছে নিয়ে চল।

তার কথামত আমাদের মহাকাশযান গোলকটির দুশ' মাইলের মধ্যে একে পড়ল।

মনিটারের পর্দায় এ বার সুস্পষ্ট ছবি। দেখতে পাচ্ছি। সবই দেখতে পাচ্ছি।

ম্যাক্‌কল বলল, মনে হচ্ছে গোলকটি ব্যাসার্ধ পাঁচ হাজার মাইল।

কিন্তু? এ যে একেবারে ন্যাড়া।

ছবিগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে যাচ্ছি আমরা। 'দ্য কোয়েস্ট' উপগ্রহের মত তার চারপাশে পরিক্রমণ শুরু করেছে এতক্ষণ।

না, কোন গাছপালা নেই। নেই জলের কোন চিহ্ন।

ইনফ্রা রেড ক্যামেরায় তার আবহাওয়ার ছবি তোলা হল। সেখানকার বাতাসে অক্সিজেন নেই বললেই চলে। বেশির ভাগ নাইট্রোজেন, যৎসামান্য কার্বন ডাই-অকসাইড। জলীয় বাষ্পের নামগন্ধ নেই।

ব্যাপার স্যাপার দেখে ম্যাক্‌কল এবং আমি হতাশ হলাম।

এবং যেটা আরো আশ্চর্যের, সেই কুঁ কুঁ সংকেত গোলকটি কোন একটি অঞ্চলের উপর দিয়ে চলার সময়ই শুধু শোনা যাচ্ছে, অন্যত্র নয়।

তা হলে ওই বিশেষ অঞ্চলেই রয়েছে কোন সভ্য সমাজ? ম্যাক্‌কল প্রশ্ন করল।

অঞ্চলটির ছবি তুললাম বারবার। সেই ছবিতে কোন লোকালয় দেখা গেল না। এমনকি সেখানে এমন কোন চিহ্ন দেখা গেল না, যাতে মনে হতে পারে সেখানে জীবজগৎ থাকা সম্ভব। যা দেখলাম—শুধুই পাহাড়। গ্র্যানিট পাথরের সারিবদ্ধ স্তূপ।

আট ঘণ্টা ধরে চলল অনুসন্ধান।

একটা ব্যাপার লক্ষ করছি, এতক্ষণ রোমানেনকো কোন কথাই বলে নি।

কি ব্যাপার, রোমানেনকো, কিছু একটা বলো? প্রশ্ন করলাম আমি।

একটু সবুর করুন। সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটবে এবার। রোমানেনকো বলল।

তার মানে? তার কথা শুনে অজ্ঞাত এক আশঙ্কায় আমরা বিহ্বল হলাম।

আর এক মিনিটের মধ্যেই ঘটবে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ! রোমানেনকোর কথাটি শোনাল হাইকোর্টের জজের মত—যেন মৃত্যু দণ্ডাদেশ দিল সে।

কী ব্যাপারে? আমার প্রশ্ন।

মিঃ মেটা, আপনি এই মুহূর্তে এখান থেকে 'দ্য কোয়েস্ট'কে দূরে নিয়ে চলুন। নইলে কেউ আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। তাড়াতাড়ি—আরো তাড়াতাড়ি করুন। পাগলের মত কথা বললো রোমানেনকো।

কেন? ম্যাক্‌কল বুঝি হতাশায় ভেঙে পড়বে।

প্রশ্ন করবেন না, স্যার। আমাদের নিরাপত্তার জন্যে এছাড়া কোন গতি নেই। আমরা যা ভেবেছিলাম সবই ভুল। মিঃ মেটা, কমপিউটারকে আদেশ করুন—'দ্য কোয়েস্ট' এখন পৃথিবীতে ফিরে যাবে। এখানকার কাজ শেষ।

রোমানেনকোর নির্দেশমত সুরেন্দর তাই করলো।

ফেরৎ যাত্রা। 'দ্য কোয়েস্ট'-এর গতি বাড়তে শুরু করল।

আমরা বিহ্বল হয়ে বসে রইলাম।

তারপর, যখন আমরা প্রায় এক লক্ষ মাইল দূরে সরে এসেছি, শোনাগেল রোমানেনকোর গলা—আমার মনিটারের পর্দাটার উপর চেয়ে দেখুন, স্যারস। দেখলেই মালুম হবে, যা আশংকা করেছিলাম ঠিক কিনা?

আমাদের সবারই চোখ গিয়ে পড়ল মনিটরের ঈষৎ নীল কাচের পর্দার উপর। পরিষ্কার দেখতে পেলাম হ্যাঁ সেই গোলক। আর গোলকের সেই জায়গাটা—যেখান থেকে আসছিল সেই রহস্যজনক সংকেত—কুঁ কুঁ··· কুঁ কুঁ কুঁ·····। জায়গাটার উপর উজ্জ্বল আলোর ছটা। সেই ছটা গোলকের আকাশ পর্যন্ত উঠে এসেছে।

কিন্তু সেটা দেখার মত হাতে সময় নেই।

ওয়েলচ বলল, এবার আমাদের ঘুমতে হবে। কারণ কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই 'দ্য কোয়েস্ট'-এর গতি উঠবে সেকেণ্ডে এক লক্ষ মাইল। আবার দেওয়া হল ঘুম পাড়ানি ওষুধ, তার সঙ্গে হরমোন।

আমরা আমাদের নিজ নিজ শয্যায় শুয়ে পড়লাম।

আর এই ঘটনার পাঁচ দিন পর আমরা নিরাপদে কেপ কন্যাভেরালের স্পেশ-শাটল বেস-এ নিরাপদে অবতরণ করলাম।

দুই দিন বিশ্রাম।

তারপর জন কুড়ি বিজ্ঞানীর সম্মেলন বসল। এই সম্মেলনেই গোলক রহস্য ব্যাখ্যা করলো রোমানেনকো।

ব্যাপারটা এই, স্যারস, শুরু করলো রোমানেনকো ঃ ওই গোলকটি আসলে একটি গ্রহ। এক সময় হয়তো নক্ষত্রের চারপাশে বিচরণ করত। কিন্তু সেখান থেকে কক্ষচ্যুত হয়ে এখন নিঃসঙ্গ অবস্থায় বিচরণ করছে। যে গ্র্যানিট পাথরের পাহাড় দেখেছিলাম—নিচে চাপা রয়েছে অফুরন্ত ইউরেনিয়াম—235। সেখানে চলছে ধীর গতিতে পারমাণবিক বিভাজন। পদ্ধতিটি যা আমিও বুঝতে পারি নি। ওই বিভাজনের দরুন সেখানে সৃষ্টি হচ্ছিল পারমাণবিক কণা। খুবই শক্তিসম্পন্ন। সেই কণার সঙ্গে গোলকটির চৌম্বক ক্ষেত্র বিক্রিয়া করে। সৃষ্টি করে ওই কুঁ কুঁ···বেতার সংকেত। কাকতলীয় ভাবেই সেই সংকেতের সঙ্গে আমাদের ইংরেজি ভাষার মিল—মানে মনে হচ্ছিল কে যেন মোর্স কোডে কথা বলছে। প্রকৃতিতে এমন ঘটনা পৃথিবীতেও দেখা যায়। দেখবেন, পাহাড়ের উপর অনেক শিলার চেহারা আমাদের পরিচিত কারোর মত। প্রকৃতিই তা তৈরি করে। কুঁ কুঁ···সেই ভাবেই ঘটছে। কোন প্রাণী তা করে নি। আর ওই যে আলোক স্ফুলিঙ্গ। আসলে ওই সময় সেখানে বড় রকমের পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটেছে। এ ধরনের ঘটনা আফ্রিকাতেও প্রকৃতিই একদিন ঘটিয়েছিল। এই বিস্ফোরণের দরুন গোলকটির মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে, পাছে গ্র্যাভিটেশনাল চ্যানেল থেকে আমরা বিচ্যুত হই—সেই আশঙ্কার দরুনই, আমি বলেছিলাম, এবার ফিরে চলুন। গোলকটি থেকে সরে পড়লাম। ঠিক সময়ে এটা না করলে কোন দিনই আমরা ঘরে ফিরতে পারতাম না, ডঃ বাসু!

রোমানেনকোর কথা শোনার পর আমরা নিশ্চুপ বসে রইলাম।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! তিনিই আমাদের অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

স্বচ্ছ ইঁট

সন্তোষ মিত্র

ইঁটের মধ্য দিয়ে স্বচ্ছ কাচের মত দেখতে পাওয়া যায়! শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও বিজ্ঞানের এই সহজ পরীক্ষাটা করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেওয়া যায়।

উপকরণ: একটা কার্ডবোর্ড বা প্লাইউডের বাক্স (ছবিতে যেমন), একটা আস্ত ইঁট, চারটে ছোট আয়না, সেলোটেপ।

পরীক্ষা পদ্ধতি: বাক্সটা কেটে ছবিতে যেমন দেখানো আছে তেমন করতে হবে। দুদিকে ছোট ছোট ফুটো একই উচ্চতায় করতে হবে। তারপর বাক্সের ভেতরে চার-কোণে চারটে 45° কোণ করে সেলোটেপ দিয়ে লাগাতে হবে। ওপরের আয়না দুটো নিচের দিকে এবং নিচের দুটো

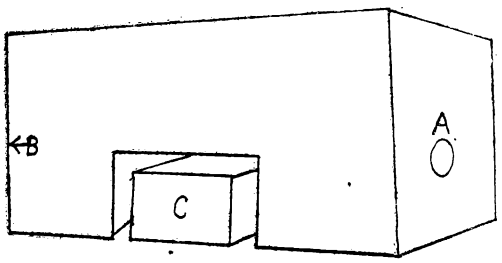

ওপরের দিকে মুখ করে থাকে (ঠিক যেমন ভাবে ছবিতে দেখানো আছে)। ছবিতে নির্ধারিত জায়গায় ইঁটটা রাখতে

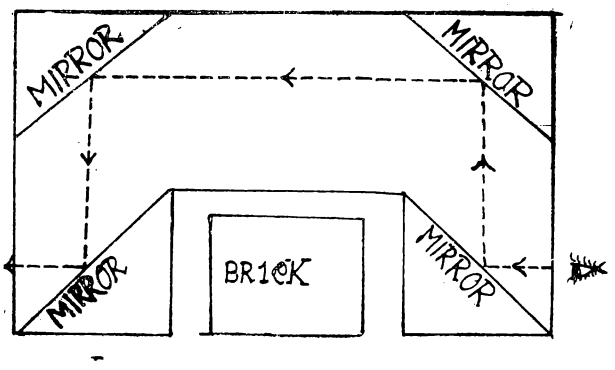

হবে যাতে সেটা বাক্সের দুদিকে দুটো ফুটোর মাঝখানটায় থাকে। এখন বাক্সের একদিকে ফুটোর সামনে নিজের হাতের আঙুল বা যে কোন জিনিস এনে অন্যদিকের ফুটোয় চোখ রাখলে দিব্যি দেখা যাবে! মাঝখানের ইঁটটা কোন বাধাই দেবে না।

ছবিটা দেখলেই বোঝা যাবে কেমন করে এটা সম্ভব হ'ল। বাক্সের এপারে রাখা জিনিসের আলো ফুটোর মধ্যে ঢুকে ডট দেওয়া লাইন বরাবর পরপর চারকোণে চারটে আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে ওপারের ফুটো দিয়ে পৌঁছয় চোখে।

কাজেই মাঝখানে ইঁটটা থাকলেও দেখতে কোন অসুবিধা নেই। মনে হয় সত্যিই যেন ইঁটটা স্বচ্ছ!

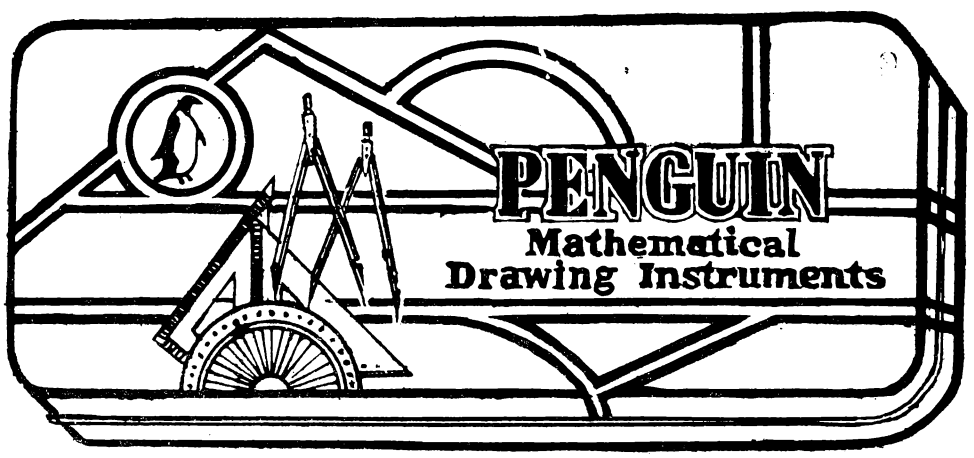

আপনি ঘোরে খুড়োর কল

সন্তোষ মিত্র

কোন জিনিসকে ঘোরাতে হলে দরকার হয় একটা চালিকা শক্তির। আপাতভাবে কোন চালিকাশক্তি ছাড়াই কোন কিছু আপনাআপনি ঘুরে চলেছে এমন ঘটনা বিরল।

সেইরকমই একটা পরীক্ষা অতি সহজেই ঘরে বসে করে দেখা যায়। **উপকরণ ঃ** কয়েকটা কর্ক, কয়েকটা টুথপিক, কর্পূর, এবং একটা পরিষ্কার ট্রেতে পরিষ্কার জল।

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি একটা বড় (এক ইঞ্চি ব্যাসের) কর্কের চাকতি কেটে নিয়ে তার চারদিকে চারটে টুথপিক গেঁথে দিতে হবে। এবার টুথপিকগুলোর বাইরে একটা করে চৌকো কর্ক গেঁথে দিয়ে ঐ প্রত্যেকটার একদিকে (ঠিক যেমন ছবিতে) কর্পূরের একটা করে ডুমো একটু চেপে লাগিয়ে দিতে হবে। ব্যাস্ তারপর ট্রেতে জল নিয়ে মাঝখানে এটাকে ভাসিয়ে দিলেই এটা ঘুরতে শুরু করবে।

কারণটা জলের পৃষ্ঠটান (**Surface Tension**)। জলের যেখানটায় কর্পূর লাগছে সেখানকার পৃষ্ঠটান একটু কমে যাচ্ছে। ফলে অপর প্রান্তের জলের বেশি পৃষ্ঠটান সেইদিকে কর্কটাকে টানছে। এই ভাবে চারটে কর্কের একই দিকে ঘোরাবার মত চালিকা শক্তি তৈরি হয়ে যাচ্ছে। ফলে চাকতিটি বনবন করে ঘুরতে শুরু করছে।

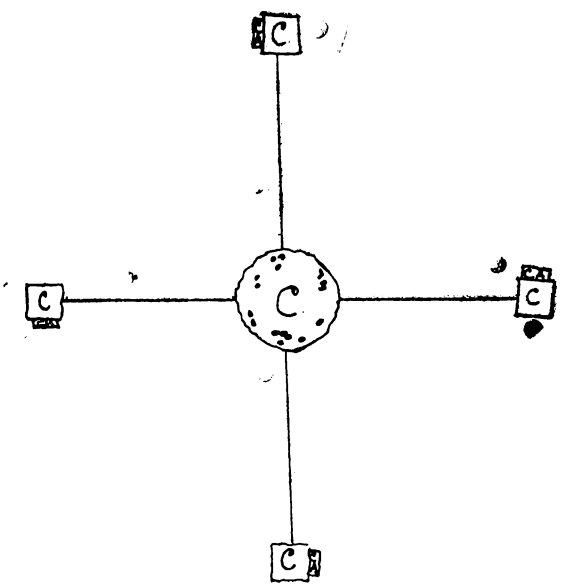

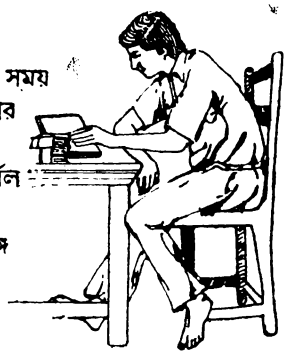

★ এখন পড়াশুনোর সময়
★ এখন এগিয়ে যাবার সময়
★ পড়তে পড়তে দুর্বল হলে চলবে না
★ শরীর ও মন ভেঙ্গে পড়লে চলবে না

স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি, মনের একাগ্রতা বাড়াতে এবং শরীর সুস্থ ও সতেজ রাখতে ব্যবহার করুন ।

ব্রেনোলিয়া

স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্য সতেজ রাখার উৎকৃষ্ট টনিক

ব্রেনোলিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস
১৩ মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৩১
ফোন নং ৪১-০০৬৯

অন্তবিহীন জলপাত্র

সমীরকুমার ঘোষ

আজ দুটি সহজ পরীক্ষার কথা আলোচনা করব— যেগুলি যে কেউ অতি সহজেই নিজহাতে করে দেখতে পারে। পরীক্ষা দুইটির নাম দেওয়া যাক, (ক) অন্তবিহীন জলপাত্র ও (খ) হাত না ভিজিয়ে জল থেকে তোলা। দুটি পরীক্ষাই পদার্থবিদ্যার কোনো না কোনো গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের ভিত্তিতে সম্পন্ন হচ্ছে এবং নিজহাতে পরীক্ষা করে দেখলে এবং সেই তত্ত্বের স্বীকৃতি অনুভব করলে, অবশ্যই অনেক আনন্দ ও তৃপ্তি পাওয়া যাবে।

একটি চওড়ামুখবিশিষ্ট কাচের গ্লাস বা কাপ নিয়ে প্রথমে সেটিকে সম্পূর্ণভাবে কানায় কানায় জলভর্তি করে ফেলতে হবে। এবারে কয়েকটি আলপিন নিয়ে চেষ্টা করে দেখতে হবে যে, পিনগুলিকে ঐ গ্লাস বা কাপের মধ্যে ফেললে, তাদের সেখানে স্থান হবে কিনা। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় যে, যেহেতু পাত্রটি কানায় কানায় জল পরিপূর্ণ অবস্থায় আছে, সেজন্য ঐ পাত্রে কয়েকটি পিন ফেললে, আর্কিমিডিসের সূত্রানুযায়ী, ঐ পিনগুলির আয়তনের সম আয়তন জল অপসারিত হবে এবং সেই পরিমাণ জল পাত্র থেকে উপছে বাইরে পড়ে যাবে। অর্থাৎ ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ভরা যে পাত্র। যুক্তিতর্কের ওপর নির্ভর না করে, হাতে কলমে পরীক্ষাটি সহজেই করে দেখা যেতে পারে।

প্রথমেই একটি একটি করে পিনকে পাত্রটির মধ্যে ফেলা সুরু করা যেতে পারে। কিন্তু বিশেষ ভাবে সাবধান হ'তে হবে যে, পিনগুলি ফেলার সময়ে জলের তল (**Surface**) যেন খুব বেশি আন্দোলিত না হয় পিনগুলির মাথার দিকটি আঙ্গুলে ধরে। খুব সাবধানে সেগুলিকে একটি একটি করে জলের কাছে নিয়ে গিয়ে, আলতোভাবে ছেড়ে দিতে হবে। এবং দেখতে হবে যে, জল পাত্রের কানা বেয়ে বাইরে উপচে পড়ছে কিনা। একটি, দুইটি করে গুণে গুণে পিন ক্রমান্বয়ে জলের মধ্যে ফেলতে থাকলেও দেখা যাবে যে, না জল একটুও বাইরে পড়ছে না। হয়ত দশ, তারপরে কুড়ি এবং এভাবে ক্রমশঃ প্রায় 100টি পিন জলের মধ্যে ফেললেও, একবিন্দু জল পাত্রের বাইরে উপচে পড়ছে না দেখা যাবে। সাধারণ মাপের জল খাওয়ার কাঁচের একটি গ্লাস বা চা খাওয়ার একটি কাপ নিয়ে এই পরীক্ষা করা যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে পাত্রের মধ্যে প্রায় 400/500 পিনও জল বাইরে না ফেলে অনায়াসে পাত্রের মধ্যে ফেলা যেতে পারে। মনে হবে, অন্তবিহীন এক জলপাত্র তার গহ্বরে যেন অনায়াসে পিন-গুলিকে আত্মসাৎ করে নিচ্ছে। ঘটনাটি খুবই আশ্চর্যের এবং রহস্যজনক বলে মনে হ'লেও, এর আসল বৈজ্ঞানিক কারণটি বিশ্লেষণ করলেই রহস্যটি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

খুব সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, যখন যথেষ্ট সংখ্যক পিন পাত্রটির মধ্যে ফেলা হয়েছে তখন পাত্রস্থিত জল মুখের কাছে একটু উপরদিকে ফুলে উঠেছে (**bulging out**)। এইখানেই সমস্ত পরীক্ষাটির রহস্য লুকানো আছে। যখন কাঁচের গায়ে গ্রীস (**grease**) বা তৈলাক্ত জাতীয় কোন জিনিস লেগে থাকে, তখন জল কাঁচের সেই অংশকে ভেজায় না। আমাদের হাতের আঙ্গুলের সংস্পর্শে এসে, এখন সাধারণ গ্লাস বা কাপের কিনারায় সবসময়েই কিছু না কিছু গ্রীস বা তেল লেগে থাকে। ঐ অংশটুকু যেহেতু জলে ভেজে না, সেজন্য পাত্রের কিনারার কাছে জলকণাগুলি একটু বাইরে ওপরের দিকে ফুলে উঠে। এই ফুলে ওঠার পরিমাণ এত সামান্য যে খালি চোখে তা আমাদের সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। এই ফুলে ওঠা জলের পরিমাণটুকু যে কতখানি, তা একটু সহজ হিসাব থেকেই জানা যাবে।

একটি আলপিন যার দৈর্ঘ্য বড়োজোর 2·5 সেমি এবং যার ব্যাস খুব বেশি হলে 0·5 মিলিমিটার মত হবে। সুতরাং একটি পিনের আয়তন হবে 5 ঘনমিলিমিটারের মত। পিনের মাথাটির আয়তন একটু বেশি ধরলে, সমগ্র পিনটির আয়তন 5·5 ঘনমিলিমিটার মনে করা যেতে পারে। এখন ঐ ফুলে ওঠা জলের আয়তন কত হ'তে পারে? যদি পাত্রটির খোলা মুখের ব্যাস 8 সেন্টিমিটার হয় তাহলে পাত্রের খোলা মুখের

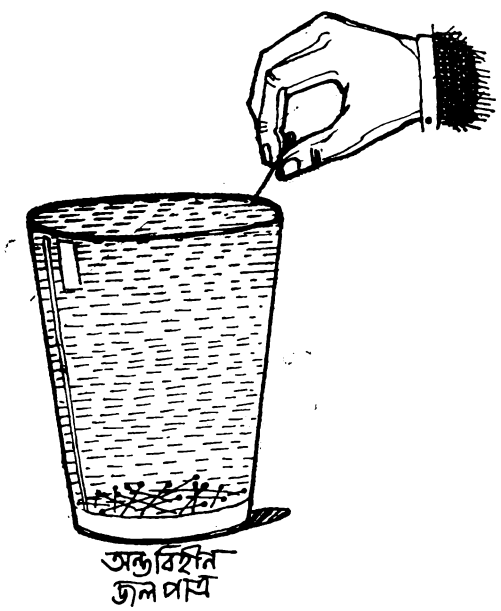

ক্ষেত্রফল হবে প্রায় 5100 বর্গমিলিমিটার এবং যদি ধরা যায় যে, জল পাত্রের কিনারা থেকে বড়জোর 1 মিলিমিটার মত উঁচুতে ওঠে, তাহলে ওপরে ওঠা জলের আয়তন হবে 5100 ঘনমিলিমিটার। এই সংখ্যাটি একটি পিনের আয়তনের প্রায় 910 গুণ অর্থাৎ ঐরূপ একটি পাত্র প্রায় 900টি পিনকে তার গহ্বরে অনায়াসেই গ্রহণ করে নিতে পারে, বাইরে একফোঁটা জল উপচে না ফেলে, এবং বাস্তবিকই যদি অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে একটি একটি করে পিনকে অতি সন্তর্পণে ঐরূপআকারের একটি জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে ফেলা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, জলের তলের কোন আপাত পরিবর্তন না ঘটিয়ে প্রায় 700।800টি পিন অনায়াসেই পাত্রটি তার উদরে গ্রহণ করে নিচ্ছে। পরীক্ষাটি একবার চেষ্টা করে দেখলে হয় না যে, ঠিক কতগুলি পিনকে পাত্রের অভ্যন্তরে পাঠানো যেতে পারে, পাত্রের বাইরে বিন্দুমাত্র জল উপচে না ফেলে?

মজার এক্সপেরিমেন্টস 4

হাত না ভিজিয়ে জল থেকে তোলা

সমীরকুমার ঘোষ

দ্বিতীয় পরীক্ষাটিও পদার্থবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের ভিত্তিতেই ঘটছে। খুব বড় একটি কানা উঁচু থালা বা ঐ জাতীয় একটি ডিস নিয়ে তার মধ্যে (কেন্দ্রস্থলের কাছে) একটি সিকি বা আধুলি জাতীয় মুদ্রা রাখা হ'ল। আস্তে আস্তে থালাটির ওপর জল ঢালা হ'তে লাগল যাতে ঐ মুদ্রাটি সম্পূর্ণ ডুবে যায়। এখন যদি বলা হয় যে, আঙ্গুল না ভিজিয়ে ঐ মুদ্রাটিকে জল থেকে তুলতে হবে, তাহলে সেই কাজটি প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হবে। কিন্তু একটু বুদ্ধির সাহায্যে পদার্থ বিজ্ঞানের একটি তত্ত্বের প্রয়োগে, একটুকরা কাগজ ও একটি গ্লাসের সাহায্যে ঐ কাজটি সম্পন্ন করা যেতে পারে।

কাগজের টুকরাটিকে আগুন ধরিয়ে, জ্বলন্ত অবস্থায় সেটিকে একটি গ্লাসের মধ্যে ফেলে, সেই অবস্থাতেই অতি দ্রুত গ্লাসটিকে উল্টে পাত্রটির উপর রাখা হল। মুদ্রাটি যেন গ্লাসের তলায় কিন্তু চাপা না পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাগজটি গ্লাসের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যাবে এবং ওল্টানো

ঐ গ্লাসের মধ্যে সাদা ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে যাবে। দেখা যাবে যে আস্তে আস্তে ডিসের জলটুকু সরে গিয়ে ঐ গ্লাসের ওল্টানো মুখের নিচে জমবে এবং ঐ মুদ্রাটি পাত্রের ওপর এক জলশূন্য স্থানে একা পড়ে থাকবে, তখন অনায়াসেই হাত না ভিজিয়ে ঐ মুদ্রাটিকে পাত্র থেকে তুলে ফেলা সম্ভব। হয়ে গেল সম্পন্ন করণীয় কাজটুকু।

এখন মনে হতে পারে যে, কোন্ শক্তি ডিসের সমস্ত জলটুকুকে গ্লাসের মুখের কাছে টেনে নিয়ে গেল? হ্যাঁ, সেই শক্তি আর কেউ নয় স্বয়ং বায়ুর চাপ। জ্বলন্ত কাগজ গ্লাসের মধ্যে উত্তাপ বৃদ্ধি করায় গ্লাসের ভিতরের বাতাসের চাপবৃদ্ধিও ঘটল এবং সেই অতিরিক্ত চাপের বায়ুর কিছু অংশ গ্লাসের মুখের ফাঁক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। এরপর কাগজটি যখন সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়ে গেল, তখন গ্লাসের ভিতরের উত্তাপ কমে যাওয়ার ফলে তার ভিতরের বায়ুর চাপও ক্রমশঃ কমে এল ও আগেকার মত হ'ল। কিন্তু বেশি চাপে গ্লাসের ভিতর থেকে খানিকটা বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার ফলে, যখন গ্লাসের পূর্ব উষ্ণতা ও চাপ ফিরে এল, তখন তার ভিতরে আংশিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। ফলে বাইরের স্বাভাবিক চাপের ফলে, বাইরের জল বাইরের বায়ুর চাপে, গ্লাসের মুখের কাছে গিয়ে জমা হ'ল এবং আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হলেও, এই ঘটনাটি ঘটানো সম্ভব হ'ল। কাগজের বদলে একটি কর্কের ছিপিতে কয়েকটি দেশলাইয়ের কাঠি আটকে সেগুলিকে একত্রে জ্বালিয়েও এই পরীক্ষাটি করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা অবশ্যই জানা দরকার যে অনেকের মতে এই ঘটনাটি ঘটার কারণ নাকি জ্বলন্ত কাগজ দ্বারা গ্লাসের মধ্যকার অক্সিজেন 'জ্বলন' বা 'শোষণ'। কিন্তু যুক্তিটি কোনক্রমেই গ্রহণ যোগ্য নয়। উত্তাপ বৃদ্ধি ও তার জন্য বায়ুর চাপবৃদ্ধি এবং পরবর্তী কালে উত্তাপহ্রাস ও বায়ুর চাপহ্রাসই এই ঘটনাটি ঘটানোর জন্য কেবলমাত্র দায়ী।

এই পরীক্ষাটিও অতি সহজে বাড়িতে করে দেখা যেতে পারে নয়কি?

গরমে সাদা ও শীতে গাঢ় রঙিন পোশাক

শাহজাহান তপন

আমরা সাধারণত শীতের দিনে রঙিন পোশাক এবং গরমের দিনে সাদা পোশাক পরে থাকি, কিন্তু কেন? শীতকালে গাঢ় রঙের পোশাক এবং গ্রীষ্মকালে হাল্কা রঙের পোশাক আরামদায়ক কেন? রোদে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাফিক পুলিশ সাধারণত সাদা পোশাক পরেন কেন, তার মাথায় সাদা ছাতা থাকে কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর তোমরা অনেকেই দিতে পারবে। সাদা জিনিসের তুলনায় রঙিন জিনিস তাপ শোষণ করে বেশি তাই সাদা জিনিসের তুলনায় রঙিন জিনিস তাড়াতাড়ি গরম হয় এবং বেশি গরম হয়। এসব কথা আমরা বিজ্ঞান বইতে পড়ি। তোমরা কেউ কেউ হয়ত তোমাদের অভিজ্ঞতা থেকেও বল। কিন্তু কখনও তোমরা পরীক্ষা করে দেখেছ কি? আসলেই কি রঙিন বা গাঢ় রঙের বস্তু সাদা বা হালকা রঙের বস্তুর চেয়ে বেশি গরম হয়? আজ এরকম পরীক্ষার কথা বলব।

এই পরীক্ষাটির জন্য তোমার দরকার হবে একই রকম দুটি টেস্টটিউব (পরীক্ষা নল), কিছু ঠাণ্ডা জল; একটি থার্মোমিটার, দুটি পাতা কাগজ। এদের এক পাতা কালো রঙের, আরেক পাতা সাদা।

টেস্টটিউব দুটিতে সমান পরিমাণ জল নাও। টেস্টটিউব দুটি কানায় কানায় ভরেও নিতে পার। টেস্ট-টিউব দুটি অভিন্ন সুতরাং জলের পরিমাণও সমান হবে। থার্মোমিটারের সাহায্যে টেস্টটিউব দুটির জলের তাপমাত্রা মেপে নাও। দুটি তাপমাত্রাই সমান হবে। এই তাপমাত্রা তোমার খাতায় লিখে রাখ। টেস্টটিউব দুটির একটিকে কালো কাগজ এবং অপরটিকে সাদা কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে নাও। একটি ধারকের সাহায্যে টেস্টটিউব দুটিকে পাশা-পাশি রোদে রেখে দাও। কমপক্ষে এক থেকে দেড় ঘণ্টা রোদে রাখতে হবে।

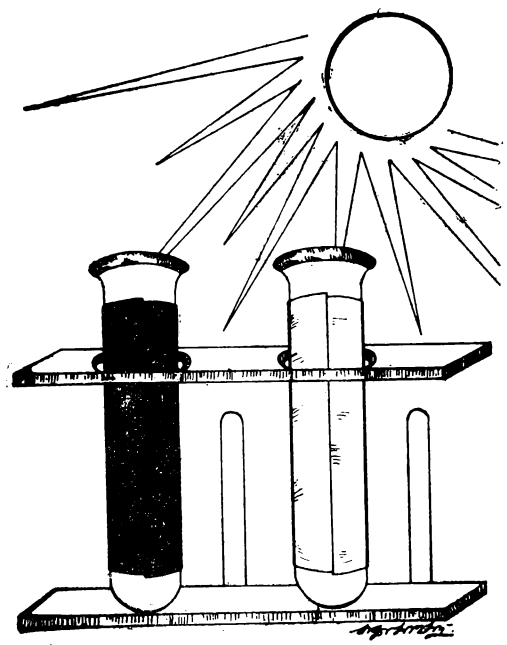

এবার থার্মোমিটারের সাহায্যে টেস্টটিউব দুটির তাপমাত্রা আবার পরিমাপ কর এবং পূর্বে লিখে রাখা তাপমাত্রার সাথে তুলনা কর। রোদে রাখার পূর্বে টেস্টটিউব দুটির তাপমাত্রা সমান ছিল, এখন দেখা যাচ্ছে দুটো টেস্টটিউবের তাপমাত্রায় যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কালো কাগজে মোড়ানো টেস্ট-টিউবের তাপমাত্রার বৃদ্ধি সাদা কাগজে মোড়ানো টেস্ট-টিউবের তাপমাত্রা বৃদ্ধির চেয়ে অনেক বেশি।

টেস্টটিউব দুটি অভিন্ন, এদের মধ্যে জলের পরিমাণ সমান, প্রাথমিক অবস্থায় এদের তাপমাত্রাও সমান ছিল, এদেরকে সমান সময় ধরে রোদে রাখা হয়েছে তবু এদের মধ্যে তাপমাত্রার এত পার্থক্য হলো কেন?

নিশ্চয়ই এদেরকে কালো ও সাদা কাগজে মোড়ানোর ফলেই এ ঘটনা ঘটেছে। আবার কালো কাগজে মোড়ানো টেস্টটিউবে তাপমাত্রা বেড়েছে অনেক বেশি। সুতরাং তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে কাগজের রঙের নিশ্চয়ই প্রভাব রয়েছে। আসলে কি জান, কালো কাগজের ওপর পতিত সূর্যের তাপের বেশির ভাগই শোষিত হয়েছে কিন্তু সাদা কাগজে পতিত সূর্য-তাপের বেশির ভাগই প্রতিফলিত হয়েছে। যেহেতু কালো কাগজ দ্বারা অধিক তাপ শোষিত হয়েছে তাই কালো কাগজে মোড়ানো টেস্টটিউব অধিক তাপ পেয়েছে এবং গ্রহণ করেছে এবং সাদা কাগজে মোড়ানো টেস্টটিউবের তুলনায় অধিকতর উত্তপ্ত হয়েছে।

শুধু রঙিন কাগজ নয়, রঙিন জামাকাপড় এবং যে কোন রঙিন বস্তু বর্ণহীন বস্তুর চেয়ে অধিক তাপ শোষন করে এবং অধিক উত্তপ্ত হয়। গরমের দিনে অধিক গরম থেকে রক্ষা পাবার জন্য অথবা আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধের জন্য আমরা সাদা বা হালকা রঙের পোশাক পরে থাকি— শীতকালে সূর্য থেকে যাতে আমাদের পোশাক তাপ গ্রহণ করতে পারে এবং এই তাপ গ্রহণের জন্য যাতে আমাদের কম শীত লাগে সেজন্যেই আমরা পরে থাকি গাঢ় রঙের কাপড়।

অভিকর্ষজ বল অগ্রাহ্যকারী ফানেল

শাহজাহান তপন

তোমাদের যদি জিগ্যেস করি, গাছ থেকে ফল মাটিতে পড়ে কেন? উপরের দিকে ঢিল ছুড়লে তা আবার মাটিতে নেমে আসে কেন? কোন ঢালু জায়গায় কোন বস্তু রাখলে তা নিচের দিকে গড়িয়ে যায় কেন? তোমরা সবাই একবাক্যে বলবে যে, পৃথিবীর অভিকর্ষজ বলের জন্য। হ্যাঁ পৃথিবীর অভিকর্ষজ বলের জন্যই এসব ঘটনা ঘটে। পৃথিবী যে বল দিয়ে কোন বস্তুকে তার নিজের দিকে টানে তাই অভিকর্ষজ বল। তোমরা কি এমন কোন ঘটনা বলতে পারবে যেখানে বস্তু ঢালু জায়গায় রাখলেও নিচের দিকে না নেমে আপনা আপনি ওপরের দিকে ওঠে অথবা আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় বস্তুটির ওপর অভিকর্ষ বলের কোন প্রভাব নেই। এখানে এমন একটি পরীক্ষার কথা বলব যেখানে অভিকর্ষ বলের প্রভাবকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করা হচ্ছে বলে মনে হয়।

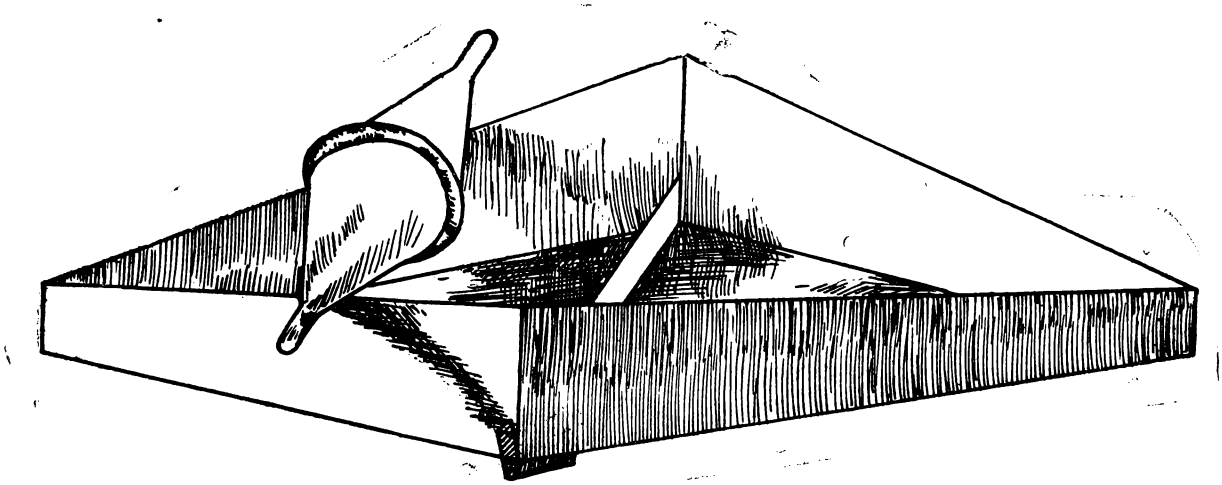

এই পরীক্ষার জন্য তোমার প্রয়োজন হবে অভিন্ন দুটি কাচের বা টিনের ফানেল (মসৃন গা বিশিষ্ট যে কোন ফানেল হলেই চলবে)। কিছু স্কচ টেপ এবং ফানেলটি গড়িয়ে দেয়ার জন্য একটি ট্রাক। চিত্রের মত করে ট্র্যাকটি তৈরি করতে হবে অর্থাৎ ট্র্যাকটির মাঝখানটা খানিকটা উঁচু এবং দুইদিক ঢালু। ট্র্যাকের মাঝখানে দুটি কাঠের বলয়ের মাঝে বিস্তৃতি বা ফাঁক বেশি, প্রান্তগুলোতে এই ফাঁক বা বিস্তৃতি কম।

মনে রাখতে হবে মাঝখানটার বিস্তৃতি ফানেলের ব্যাসার্ধের চেয়ে যেন বেশি না হয়। ফানেল দুটিকে মুখোমুখি করে স্কচ টেপ দিয়ে জোড়া দাও (চিত্রে দেখ)। ট্র্যাকটিকে একটি সমান্তরাল জায়গায় আনুভূমিক করে রেখে ফানেলটি ট্র্যাকে ছবির মত করে স্থাপন কর এবং আস্তে গড়িয়ে দাও। অবাক ব্যাপার এই যে, ফানেলটি ট্র্যাকের ঢালু প্রান্তের দিকে গড়িয়ে দিলেও এটি বার বার ফানেলের সব চেয়ে উঁচু স্থান মাঝখানটায় চলে আসে। অর্থাৎ ফানেলটি ঢালু জায়গায় রাখা সত্ত্বেও গড়িয়ে নিচের দিকে না গিয়ে ওপরের দিকে উঠে আসছে। মনে হচ্ছে যেন, এর ওপর কোন অভিকর্ষজ বল কাজ করছে না বা অভিকর্ষজ বল একে নিচের দিকে নামিয়ে নিচ্ছে না। এর ওপর পৃথিবীর যেন কোন আকর্ষণ নেই।

তোমাদের সত্যিই মনে হচ্ছে কি ফানেলের ওপর অভিকর্ষজ বল কাজ করছে না? ফানেলটি নিচে না নেমে অভিকর্ষ বলকে অগ্রাহ্য করে গড়িয়ে ওপরে উঠেছে?

আসলে ব্যাপারটি সত্য নয়, এটি এক ধরনের বৈজ্ঞানিক কূটাভ্যাস বা প্যারাডক্স। ভুল ব্যাখ্যার মধ্যেই আসল সত্যটি হারিয়ে গেছে। তোমরা ছবিটি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে ট্র্যাকটির দুই প্রান্ত সরু, মাঝখানটা বিস্তৃত। ট্র্যাকটির মাঝখানটা বিস্তৃত বলে, ফানেলটি উঁচু দিকে গড়িয়ে গেলেও এর ভার কেন্দ্র (centre & gravity) নিচে নেমে যাচ্ছে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে ফানেলটি উঁচুতে উঠছে বলে মনে হলেও ফানেলটি আসলে নিচেই নামছে। অর্থাৎ অভিকর্ষজ বল কাজ করছে।

আগুন নেভানো যন্ত্র

অপরাজিত বসু

আগুন নেভানোর যন্ত্র দেখেছো কি? সিনেমা হলে, কারখানায়, ব্যাঙ্কে, পরীক্ষাগারের দেয়ালে শঙ্কু-আকৃতির 'ফায়ার-এক্সটিংগুইসার'কে ঝুলতে নিশ্চয়ই দেখে থাকবে। আগুন লাগলে চট্‌পট্ তা নেভানোর জন্য এদের তলব করা হয়। পেছনের গোল 'নব'কে ধাক্কা মারলে যন্ত্রের মুখ দিয়ে ভস্‌ভস্ করে কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়, গ্যাসের তোড়ে আগুন যায় নিভে। এর কারণ তোমরা জানো—কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস দহনে সহায়ক নয়।

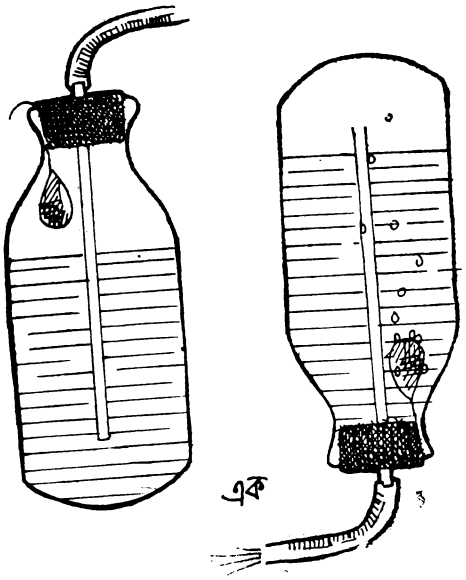

এসো, আমরাও একটা আগুন-নেভানো যন্ত্র বানাই। তবে এটা হবে নেহাতই খেলাঘরের ফায়ার-এক্সটিংগুইসার—মোমবাতির শিখা, দেশলাইয়ের আগুন কিংবা ঐরকমের ছোটখাটো আগুন তোমার খেলাঘরের যন্ত্র নেভাতে পারবে।

উপকরণ ঃ প্রথমে, কি কি চাই বলি। (১) একটা খালি দুধের বোতল, (2) একটা কাচের নল, (3) রবার বা পলিথিনের ছোট্ট নল, (4) বোতলের মুখের মাপের ছিপি, (5) ভিনিগার, (6) খাবার সোডা।

ভিনিগারের সঙ্গে আধা-আধি জল মিশিয়ে পাতলা করে নাও। পাতলা ভিনিগার ঢেলে বোতলের তিন-চতুর্থাংশ ভর্ত্তি করো। একটা ছোট্ট কাপড়ের থলের মধ্যে বেশ খানিকটা খাবার সোডা (সোডিয়াম বাই-কার্বনেট) ভরে সুতোয় বেঁধে বোতলের মধ্যে ঝুলিয়ে দাও এবং ছিপিটা এঁটে দাও। দেখো, থলেটা যেন ভিনিগারে পড়ে না যায়। এবার ছিপির মধ্য দিয়ে কাচের নলটা চালিয়ে দাও, নল যেন বোতলের তলদেশ পর্যন্ত থাকে। কাচের নলের প্রান্তে ছোট্ট রবারের নলটা জুড়ে দাও। তারপর মোম দিয়ে চারপাশটা এমনভাবে সিল করো যেন বোতলের মধ্যের বাতাস বাইরে আসতে না পারে। ব্যাস, তোমার কাজ হয়ে গেলো—খেলাঘরের 'ফায়ার-এক্সটিংগুইসার' হয়ে গেল। ছোট্ট মাপের আগুন লাগলেই তোমার ছোট্ট যন্ত্রটি নিয়ে ছোট।

এখন কথা হচ্ছে- কি করে আগুন নেভাবে? রবারের টিউবটা টিপে ধরে বোতলটা উল্টে ধর এবং রবার-টিউব থেকে আঙ্গুল সরিয়ে নাও। দেখ, ভিনিগার উল্টে এসে খাবার সোডার ব্যাগটা ডুবিয়ে দিয়েছে—ব্যাগ থেকে ভস্‌ভস্ করে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস বের হচ্ছে, গ্যাসটা প্রথমে বোতলের উপরের দিকে উঠছে, তারপর কাচনল দিয়ে বের হয়ে রবারনলের প্রান্ত থেকে সজোরে বেরিয়ে আসছে। প্রয়োজনমতো রবার-নলটা ঘুরিয়ে অগ্নি-শিখার দিকে ধরো। দেখো, মুহূর্তেই আগুন নিভে গেলো!

সংক্ষেপে রসায়নটা বলি। ভিনিগারের মধ্যে আছে অ্যাসেটিক অ্যাসিড। অ্যাসেটিক অ্যাসিড যখন সোডিয়াম বাই-কার্বনেটের সংস্পর্শে আসে তখন কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস তৈরি হয়। ঐ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নল-পথে বাইরে বেরিয়ে আগুন নেভানোতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বোতলটা সোজা করে রাখলে অ্যাসিড ও সোডিয়াম বাই-কার্বনেট বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং গ্যাসের উৎপাদন বন্ধ হয়ে পড়ে।

জয়ন্ত দত্ত সংকলিত

নিজে নিজে কর

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে
দাম—১০·০০

প্রায় অর্ধশত মডেলের সহজ ও সচিত্র ব্যাখ্যা

মেঘ বৃষ্টি জল অপরাজিত বসু

সমুদ্রের জল অপেয়, কারণ তা লবণাক্ত। কেবলমাত্র সোডিয়াম ক্লোরাইডের মতো সাধারণ লবণ নয়, তার সঙ্গে আরো হাজারো রকমের লবণ কম-বেশি সমুদ্র-জলে দ্রবীভূত থাকে। যুগ যুগ ধরে নদী স্রোতস্বিনী ইত্যাদি মাটি ধুয়ে লবণ নিয়ে সমুদ্রে এসে পড়ছে। সূর্যের তাপে সাগরের জল বাষ্পীভূত হলেও লবণ পড়ে থাকছে জলে – থাকতে বাধ্য হচ্ছে। বাষ্প মেঘ হয়ে—বৃষ্টি হয়ে—নদীপথে নতুন নতুন লবণ টেনে আনছে সমুদ্র। এভাবে সাগরের জলে লবণ বেড়েছে।

আজ তোমাদের এমন একটা মডেল দেখাবো, যেখানে সাগরের নোনা জল থেকে জলের বাষ্পায়ন, বাষ্প থেকে জল-কণার ঘনীভবন—সবই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। মডেলের জন্য কি কি চাই ?

উপকরণ ঃ (1) বড় চিনামাটির ডিস, ( ) বড় কাচের গ্লাস, (3) ব্লটিং কাগজ এবং (4) ছোট একটা বাটি।

প্রথমে ছোট বাটিতে লবণাক্ত সমুদ্রের জল নাও। বাটিটা বড় চীনামাটির ডিসের মধ্যখানে বসিয়ে দাও। তারপর ব্লটিং কাগজটা গোল করে মুড়ে একটা গার্ডার দিয়ে বাঁধ এবং নোনা জলের মধ্যে ডুবিয়ে দাঁড় করিয়ে দাও। এবার বড় কাচের গ্লাসটা দিয়ে বাটির জল সমেত ব্লটিং কাগজের রোলটাকে ঢেকে দাও। দেখো, যেন উপুর করা গ্লাস ঠিক ঠিক চীনামাটির ডিসের ওপর বসে থাকে—মাঝে যেন কোন ফাঁক-ফোকর না থাকে। তারপর সব জিনিসটা বাইরের কড়া রোদে এনে রাখ। ঘণ্টাখানেক পরে দেখবে গ্লাসের ভেতরের দিকে বিন্দু বিন্দু জলকণা জমছে, তারা জড়ো হয়ে নিচের ডিসে গড়িয়ে পড়ছে। ঐ জলের এক ফোঁটা মুখে দিয়ে দেখ। কি, কোন নোন্‌তা স্বাদ নেই তো ? একেবারে

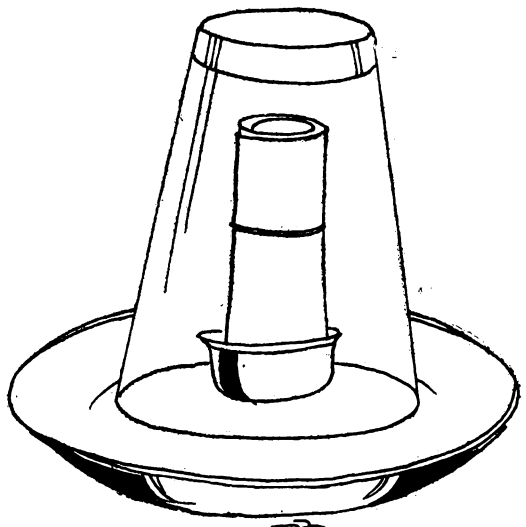

দুই

পরিষ্কার পানযোগ্য জল পাওয়া যাচ্ছে !

কিভাবে লবণাক্ত জল থেকে পরিষ্কার জল পেলাম ? নোনা জল থেকে জলীয় কণাগুলি প্রথমে ব্লটিং কাগজকে চুঁইয়ে উপরে উঠে আসে। ভেজা ব্লটিং কাগজ থেকে জল সূর্যের তাপে বাষ্পীভূত হচ্ছে এবং গ্লাসে ঢাকা ভেতরের বাতাসকে আর্দ্র করে তুলছে। ক্রমে আর্দ্রতা বাড়তে বাড়তে একসময় জলকণাগুলি গ্লাসের গায়ে জমে যাচ্ছে এবং একসময় ডিসে গড়িয়ে পড়ছে। আর নূন ? নূন প্রথম থেকেই সেই যে বাটিতে আছে, সেখানেই আছে। বাটির জলকে আরো লবণাক্ত করে তুলছে।

সূর্যের তাপে সমুদ্রের জলের বাষ্পায়ন, ঘনীভবন— সবই এই মডেলের মধ্য দিয়ে দেখানো যায়। তোমরাও চেষ্টা করে দেখ। নিশ্চয়ই পারবে।

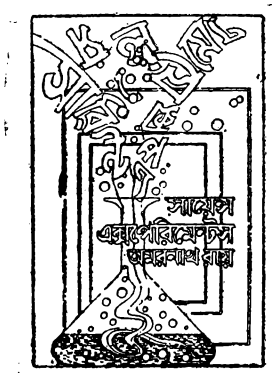

বিজ্ঞানের পঞ্চাশটি অভিনব খেলা নিয়ে লেখা

আশ্চর্য বই

অমরনাথ রায়ের

সায়েন্স এক্সপেরিমেন্টস্ ১০.০০

যা তোমরা স্কুলের ল্যাবরেটারিতে বা বাড়তে বসেই পরীক্ষা করতে পারো

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● 86/ মহাত্মা গান্ধী রোড কল-9

পরাভূত জলযান

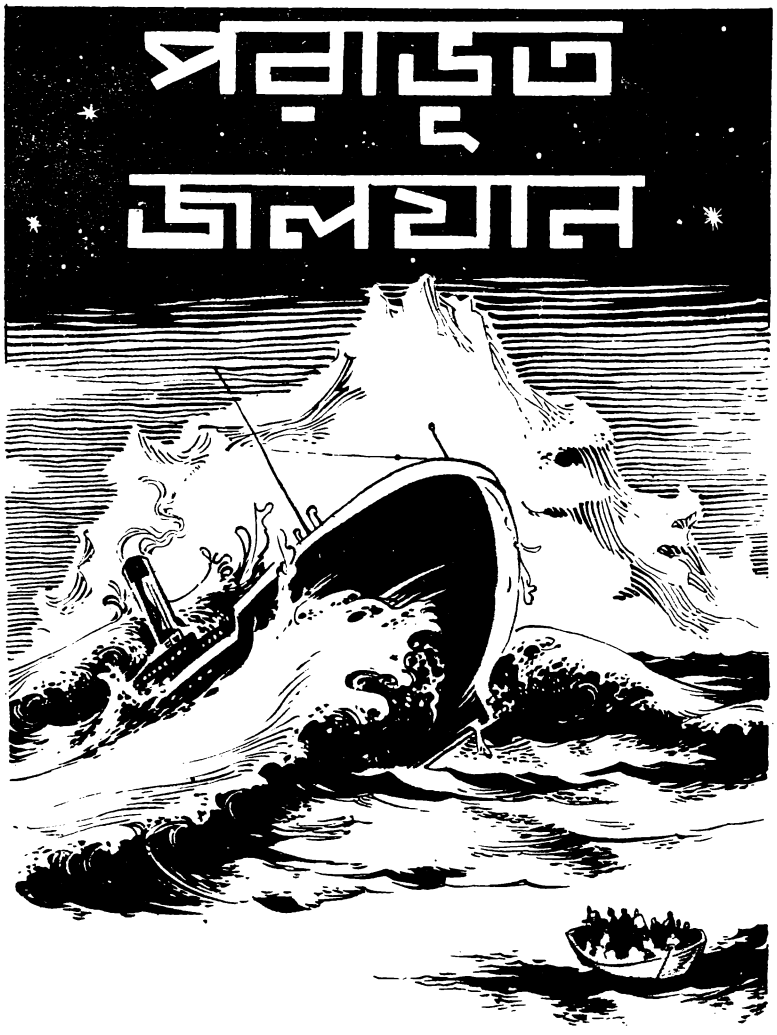

লেখা
অনিল ভৌমিক

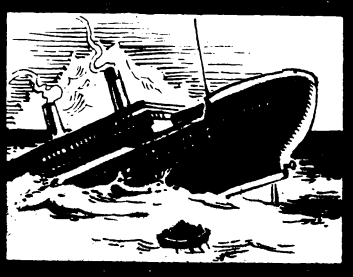

রেখা
গৌতম বর্মণ

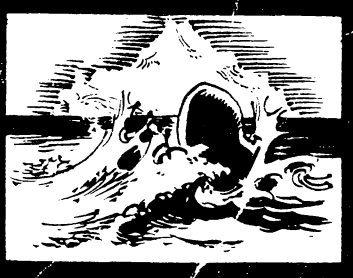

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের 15 এপ্রিল। রাত দুটো বেজে কুড়ি মিনিট। আটলান্টিক মহাসমুদ্রের হিমশীতল জলরাশি যেন গর্জন করে ফুঁসে উঠলো দারুণ রোষে। পৃথিবীর বৃহত্তম জলযানটি এবার তলিয়ে গেল অতল সমুদ্রে। তার সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করবার জন্যে ছুটে এলো বিক্ষুব্ধ সমুদ্র। যেন বিশাল একটা দানবের শতসহস্র লেলিহান জিভ ছুটে এলো লক লক করে মানুষের স্পর্ধাকে অবলীলায় গ্রাস করে নিতে। চারপাশের জলমগ্ন যাত্রীদের মৃত্যু-চিৎকারে রাতের আকাশ যেন ধানধান হয়ে ভেঙে পড়লো।

লন্ডন। মিঃ ইসমের স্মিথের বাসভবন--

সুইটি, শোন, শোন-- একটা দারুণ খবর।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, এই দেখো, ছবি বেরিয়েছে।

কী দারুণ একটা জাহাজ -টাইটানিক। পৃথিবীর বৃহত্তম জলযান।

কে তৈরী করলো?

কে জানে? কে পারে এমন একটা জলযান তৈরী করতে?

Daily M

A Gigantic Vessel To Conquer The Atlantic

ব্রিটেন, আমাদের ব্রিটেন।

গুড। ঠিক বলেছো ডিয়ার। আমাদেরই 'হোয়াইট স্টার লাইনার' কোম্পানী এটি তৈরী করেছে।

কোনও অবস্থাতেই এটি ডুববে না। অমুদ্রজয়ী জলযান এই টাইটানিক।

হ্যাঁ। জাহাজের খোল দুটো। আঘাত লেগে ফেটে যাবার বা ফুটো হবার আশঙ্কা নেই। ডাবল গ্যারান্টি।

বলো কী!

হ্যাঁ, এই যে-- আরো লিখেছে- টাইটানিকের পুরো কাঠামোটিকে ষোলটি জলনিরোধক কামরায় ভাগ করা হয়েছে। হোটেল, নাচঘর, সুইমিং পুল, বসবাস, গ্রন্থাগার, খেলার মাঠ - কী নেই এতে?

2

এমন আশ্চর্য জলযানের কথা কেউ স্বপ্নেও কখনো ভাবেনি। রাজার প্রাসাদের মতো সুন্দর এর এক একটি কামরা।

ইঁ্যাগো, এমন একটা জাহাজে আমরা যেতে পারি না কোথাও?

কেন পারি না? টাকা থাকলে সব হয়।

যাই। রিজার্ভেশনের চেষ্টা করে দেখি।

ফিরে আসার পর...

করে জাহাজ ছাড়বে?

10 এপ্রিল। সাউদাম্পটন বন্দর থেকে আটলান্টিক মহাসমুদ্র তোলপাড় করে গর্বিত রাজহাঁসের মতো অবনীলায় সে ভাসতে ভাসতে চলে যাবে।

বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ফ্রানসিস মিলেটের স্টুডিও।

কী খবর টম?

একটা জাহাজ স্যার – টাইটানিক। 10 এপ্রিল ছাড়বে। নিউইয়র্ক।

চলুন না স্যার। আপনি বলেছিলেন- নিউইয়র্ক দেখাবেন।

বেশতো, টিকিট নিয়ে আয়।

বুদ্ধিজীবি বেঞ্জামিন গুগেনহাইমের উইং কমান্ড---

খবর শুনেছো?

হ্যাঁ মিঃ বেঞ্জামিন, অনেকেই যাচ্ছেন।

মেজর বাট, কর্নেল জন জ্যাকব অ্যাস্টর, মঞ্চের বিখ্যাত প্রযোজক এইচ.বি.হ্যারিস, জাহাজ কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জে.বি.ইসমে---

আরও অনেকেই। সবচেয়ে আশ্চর্যের খবর - তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে 706 জন চলেছেন ইউরোপ ছেড়ে। চিরকালের জন্যে। আমেরিকাতেই তাঁরা স্থায়ী ভাবে বসবাস করবেন।

10 এপ্রিল, 1912, সাউদাম্পটন বন্দর -

ঐ ক্যাপ্টেন ই.জি. স্মিথ। টাইটানিকের এই ঐতিহাসিক যাত্রার গৌরবময় দায়িত্ব ওঁকেই দেওয়া হয়েছে।

সমাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর আমাদের দেশ। টাইটানিকের এই অভিযান তাকে নতুন গৌরবে ভূষিত করবে।

গুড মর্নিং মিঃ গুগেনহাইম। আপনিও তাহলে যাচ্ছেন?

ওয়েলকাম মিঃ হ্যারিস।

জাহাজের উপর কোনও নাটকের আয়োজন করেছেন নাকি?

অবশ্যই। যথাসময়ে দেখতে পাবেন।

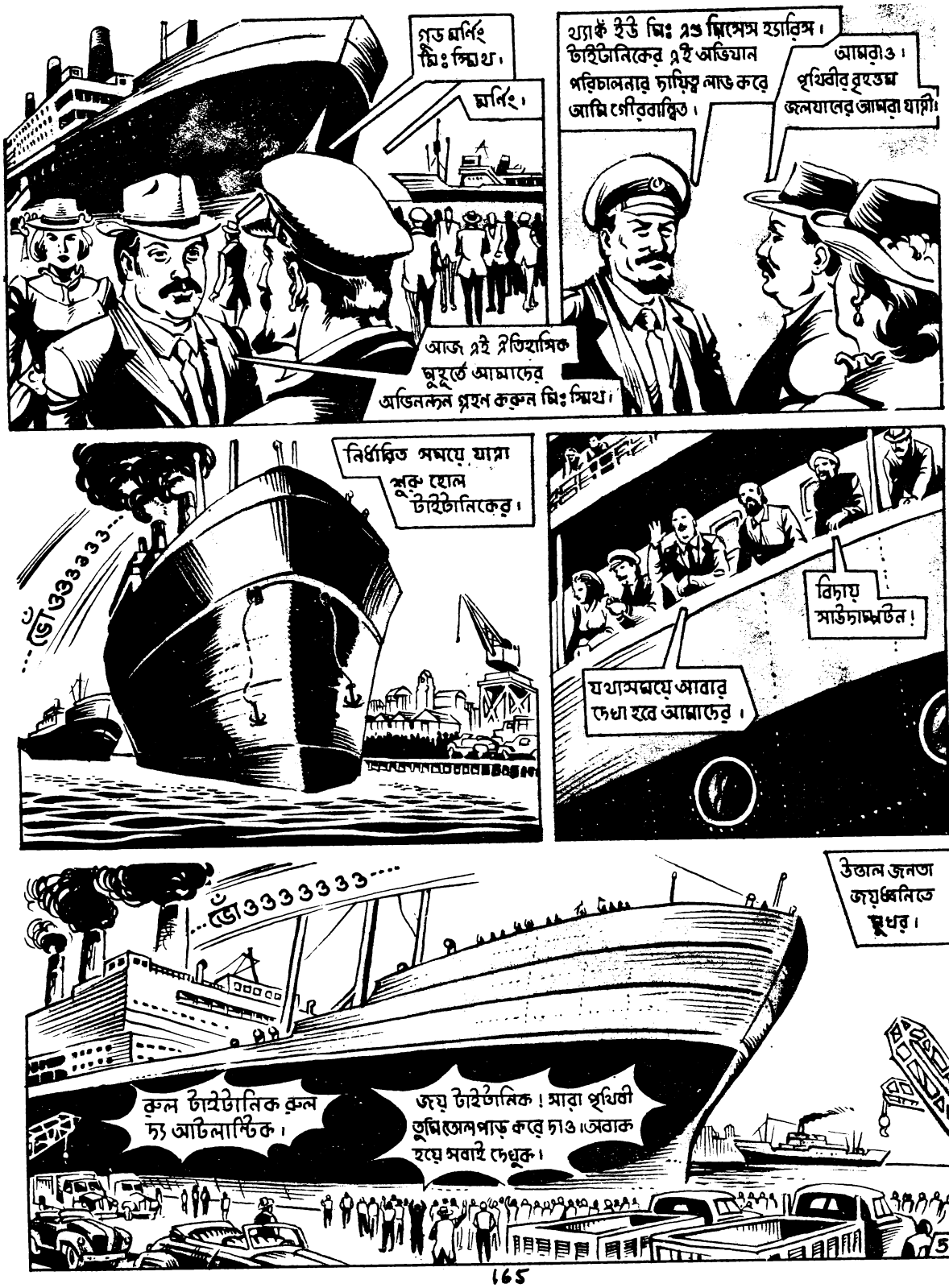
গুড মর্নিং মিঃ স্মিথ।
মর্নিং।
আজ এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন মিঃ স্মিথ।
থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ এন্ড মিসেস্ হ্যারিস্। টাইটানিকের এই অভিযান পরিচালনার চ্যান্সিস্ লাভ করে আমি গৌরবান্বিত।
আমরাও। পৃথিবীর বৃহত্তম জলযানের আমরা যাত্রী।
নির্ধারিত সময়ে যাত্রা শুরু হোল টাইটানিকের।
ভোওওও

উঃ, কতো মানুষ! হাত নেড়ে আমাদের বিদায় জানাচ্ছে।
আমার কিন্তু মনে হচ্ছে- ওরা আমাদের অভিশাপ দিচ্ছে।
কারন?
ওরা তো কেউ টিকিট পায়নি।
আমাদের কোনও বিপদ হবে না তো স্যার? —
যাহ, তোর এখনো কুসংস্কার কাটেনি।
চুপ কর। ঐ দেখ -সাউদাম্পটনের তটভূমি কেমন ছবির মতো দেখা যাচ্ছে। তরতর করে এগিয়ে চলেছে টাইটানিক।
দুর্বার বেগে এগিয়ে চলেছে টাইটানিক। আর দিনকয়েক পরেই এসে যাবে নিউ ইয়র্ক। 15 এপ্রিল, সকাল...
কী হে ছোকরা, কেমন লাগছে?
দারুন স্যার। ব্রিটিশ প্রযুক্তি- বিচার এ এক বিস্ময়।
6

আমরা সত্যিই ভাগ্যবান। এমন একটা জাহাজের প্রথম অভিযানের আমরা যাত্রী।

রুল ব্রিটানিয়া রুল দ্য ওয়েভস।

বেলা নটা। ওয়ারলেস রুমে বার্তা গ্রহণ করলেন অপারেটর ব্রাইড।

ক্যাপ্টেন টাইটানিক, সাবধান। আপনাদের যাত্রাপথে বিশাল বিশাল আইসবার্গ ভাসছে। অক্ষাংশ 42° উত্তর, দ্রাঘিমাংশ 49° থেকে 51° পশ্চিম এলাকাটা খুবই বিপজ্জনক মনে হচ্ছে। অভিনন্দন।

বার।
ক্যারোনিয়া স্টিমার।

আইসবার্গ! বরফের পাহাড়! স্টিমারের এক ক্যাপ্টেনের বুদ্ধি এর বেশী আর কী হবে? আইসবার্গকে ভয় করবে এই টাইটানিক- পৃথিবীর বৃহত্তম জলযান?

বেলা দুপুর। হিসাবপত্রে মগ্ন হয়ে আছেন ব্রাইড। মাথায় লাগানো ইয়ারফোন।

হ্যালো টাইটানিক! 'ক্যালিফোর্নিয়ান' জাহাজ থেকে বলছি। আপনাদের গতিপথে ভেসে সুবিশাল আইসবার্গ। সাবধানে এগোন।

বেলা একটা বিয়াল্লিশ--

'বালটিক' জাহাজ থেকে বলছি। টাইটানিকের সামনে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আইসবার্গ ভাসছে। সাবধান।

নাহ্, খবরটা তো ক্যাপ্টেনকে দিতে হয়।

হ্যালো ক্যাপ্টেন, ওয়ারলেস অপারেটর স্পিকিং- আমাদের সামনে অজস্র আইসবার্গ ভাসছে।
হুঁঃ, ভীতু কোথাকার!
এই, শোন, এই স্লিপটা নিয়ে যাও। আইসবার্গের খবরটা লিখে দিলাম।
ও.কে. স্যার।
ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে এটা দিয়ো।
সঙ্গীনী দুজন মহিলার সঙ্গে হাসি-মশকরা করছিলেন মিঃ ইসমে।
যতোসব ক্যাপ্টেন এখন কোথায়?
জাহাজের ছাদে, ও ভারব্রিজের উপরে।
ঠিক আছে, তুমি যাও।
দিনের আলোয় টাইটানিক তখন বিপুল বেগে এগিয়ে চলেছে।
GOUTAM KARMAKAR
কী হয়েছে মিঃ ইসমে? কোনও খারাপ খবর?
না না, আইসবার্গ।
আইসবার্গ! হাউ লাভলি!
রাত প্রথম প্রহর...
কই, কোথায়?
দূরে যেন একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছে?
হ্যাঁ স্যার।

দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা সব মাতাল হয়ে গান গাইছে। ওই... শুনুন...

দিও আড়া প্রভু মোদের আত্মরা যারা হারিয়ে যাবো এই সাগরের অতল জলে...

রাত দশটা...

ব্রিজের চার্যিত্বে এলেন ফার্স্ট অফিসার মারডোক...

সন্ধ্যা থেকে নাকি পাঁচ-সাতটা বেতারবার্তা এসেছে?

হ্যাঁ লাইটোল। সবাই বলছে- সাবধান, আইসবার্গ।

কিন্তু কই, কোনও আইসবার্গ তো দেখা যায়নি?

না, তা যায়নি, তবে যাবে নিশ্চয়।

কৃষ্ণপক্ষের আটলান্টিক তোলপাড় করে টাইটানিক চলেছে। ইতিহাসের বৃহত্তম জনযান।

ঘন্টায় বাইশ মাইল বেগে ছুটে চলেছে টাইটানিক। খানিক পরেই সব দেখা যাবে।

গেলেই বা, টাইটানিক তো আনসিংকেবল।

চালকের কেবিন। পাশাপাশি বসে ফ্লিট এবং নেই। চালক আর তাঁর সহকারী।

উঃ, কী অন্ধকার!

আইসবার্গগুলো সব গেল কোথায়?

কোথায় আবার? টাইটানিকের ভয়ে সব পালিয়েছে।

9

KJB/PUJA/87/22

রাত এগারোটার পর-- ওয়্যারলেস রুমের দায়িত্বে এলেন সিনিয়ার অপারেটর ফিলিপস।

'ক্যালিফোর্নিয়ান' জাহাজ থেকে বলছি। সর্বনাশ হয়েছে। আমরা আইসবার্গের ম্যাসধানে বন্দী হয়ে পড়েছি ক্যাপ্টেন। বরফের পাহাড়গুলো চারপাশ থেকে ঘিরে আসছে।

CALIFORNIAN

আহ, চুপ করুন। আমি এখন কেপ রেস-এর সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছি। আপনি এসব ফালতু কথা বলে রেডিও সিগন্যাল ব্লক করবেন না।

যতো সব দায়িত্বজ্ঞানহীনের কাণ্ড!

রাত এগারোটা বেজে চল্লিশ মিনিট...

ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন, ওটা কী?

কই, কোথায়?

ঐ-সামনে-- মাইলখানেক দূরে...

নক্ষত্রের আলোয় একটা বিরাট সাদা পাহাড় দেখা গেল সামনেই। মনে হোল যেন হুড়মুড় করে ছুটে আসছে বিপুল বেগে।

সর্বনাশ! ধাক্কা লাগলো বলে! থামাও-- থা-মা-ও!

টং টং টং--

কী হয়েছে? বিপদ-ঘন্টা বাজছে।

সর্বনাশ হয়েছে। সামনেই একটা সুবিশাল আইসবার্গ।

টং টং টং--

থামাও-থামাও, ব্রেক কষো। উল্টোদিকে চালাও-- পুরোদমে-- পিছোও--পিছিয়ে যাও--

10

আহ!...
...গুউউউম...
গর্বিত টাইটানিক সভয়ে পিছু হটলো, কিন্তু শেষরক্ষা করা গেল না।
...ঘড়ড়ড়ড়ড়ড়...
...চম-চাম-
...ঝপ-
...ঝপাং...
সর্বনাশ হয়েছে! আইসবার্গের গায়ে ধাক্কা লেগেছে
একি! কী হোল? ভূমিকম্প নাকি মিঃ মারডোক?
না স্যার, ভূমিকম্প নয়-ধাক্কা। টাইটানিক আইসবার্গের গায়ে ধাক্কা মেরেছে। শুনতে পাচ্ছেন- ডেকের উপর ভেঙে পড়ছে বরফের চাঙড়?
...চম-চাম-
...ঘড়াৎ...
...বাঁচাও...
পিছোও - পিছোও - ওয়াটার প্রুফ কেবিনগুলোর দরজা সব বন্ধ করে দাও। বী কুইক!
...টং টং টং টং টং...
টাইটানিক থেমে গেছে। একটা ইঞ্জিনও আর কাজ করছে না ক্যাপ্টেন।
ঘুমন্ত যাত্রীরা ততক্ষণে জেগে উঠেছে সবাই..
কী হয়েছে ভাই?
জাহাজ হঠাৎ থেমে গেল কেন?
দেখো দেখো আইসবার্গটার কান্ড! যেন একটা বাইসন-শিশু দিয়ে গুঁতোচ্ছে। সরে যাও হে.
ভুলে যেওনা - তুমি পাথরের পাহাড় নও।
11

ওদিকে নিচে, বয়লারকক্ষে--

সর্বনাশ! এ কী অঘটন! পর পর চারখানা জল-নিরোধক কামরা যেন কাগজের বোর্ডের মতো ফালফাল করে ঢুকে পড়েছে একটা অতিকায় বরফের ফলা। এই দরজাটাও এবার ভাঙল!

GOUTAM / 87

এ কী ঘটে গেল! এ যে কল্পনারও বাইরে।

টাইটানিকের হৃৎপিণ্ডও কি শেষ পর্যন্ত ফুটো হয়ে গেল!

ফায়ারম্যানদের ঘরে--

এ কি! জল, হু হু করে জল ঢুকে পড়ছে কামরায়।

সর্বনাশ হয়ে গেল। আর বোধহয় রক্ষা করা যাবে না। পাম্পগুলো চালু করতে বলো-- কুইক!

কে কোথায় আছো, আমাদের বাঁচাও। টাইটানিকের 2210 জন যাত্রী ডুবতে বসেছে। বাঁচাও!

বার্তার পর বার্তা পাঠিয়ে চললেন মিনিয়ার অপারেটর ফিনিপস।

অনেক জাহাজেরই সাড়া মিলেছে স্যার। তারা পূর্ণবেগে ছুটে আসছে। কিন্তু ওরা যতক্ষণে পৌঁছবে, ততক্ষণ পর্যন্ত টাইটানিক কি ভেসে থাকতে পারবে?

কেন, ক্যালিফোর্নিয়ান তো কাছেই রয়েছে। আধঘন্টার বেশী সময় তো ওর লাগবে না।

ক্যালিফোর্নিয়ানের কোন সাড়া পাচ্ছি না স্যার।

সেকি!!

আরো খানিক পর--

স্যার, শুনলাম, এই জাহাজে নাকি একটা মমি আছে? এক মহিলা জ্যোতিষীর?

এ তারই কোন অভিশাপ নয়তো স্যার?

কী যে বলেন! এ একটা দুর্ঘটনা।

12

জল ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে ক্যাপ্টেন। পাম্পে কিছুই হচ্ছে না।

লাইফবোটগুলো নামাও। মহিলাদের আগে জায়গা করে দাও।

বন্যার তোড়ের মতো জল বাড়ছে।

দূরের জাহাজগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে হুইসিলগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আশা করি - সাহায্য এসে যাবে।

ধানিক দূরেই ক্যালিফোর্নিয়ান জাহাজ--

ক্যাপ্টেন, আমরা মুক্ত। টাইটানিকের সাহায্য ছাড়াই-।

অপারেটরকে বলো - খবরটা জানিয়ে দিক।

CALIFORNIAN

অসম্ভব স্যার, টাইটানিক থেকে ধমক খাওয়ার পর ও ইয়ারফোন আর কানেই তুলছে না। খবরও পাঠাচ্ছে না।

ব্যাপার কী স্যার, হুইসিল? টাইটানিকের কোনও বিপদ ঘটলো না তো?

দূর! টাইটানিক আনসিংকেবল। ওরা বোধহয় উৎসব শুরু করেছে।

পরাজিত টাইটানিক থেকে লাইফবোটগুলি নামানো হচ্ছে। চারপাশে মৃত্যুর আতঙ্ক।

উঃ, কী অন্ধকার! শেষ পর্যন্ত আমরা বাঁচবো তো?

উম্ম, চারপাশে এতো শোরগোল কেন?

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা সব লাইফবোটে উঠতে চায় স্যার।

তাড়াহুড়োর কিছু নেই। একটা-না-একটা জাহাজ আমাদের সাহায্যের জন্যে এসে যাবে।

13

বোটগুলো কিন্তু ফাঁকা যাচ্ছে স্যার। 65 জনের জায়গায় 25 কি বড়জোর তিরিশ জন। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা এখনো ভাবছেন-টাইটানিক ডুববে না। ডুবতে পারে না।
সামান্য একটু অসাবধানতার কী শোচনীয় পরিণাম!
দোহাই আপনাদের! আমাদেরও বোটে যেতে দিন।
অসম্ভব! এখন যাবে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা।
শুরু হোল ধ্বস্তাধ্বস্তি। কয়েকজন হতভাগ্য যাত্রী পড়ে গেল সমুদ্রে।
আঁউক!
আহ্হহ্হহ্...
মিলিয়নেয়ার্স স্পেশাল কিছুতেই ছাড়া যাচ্ছে না স্যার। থার্ড ক্লাসের যাত্রীরা ভীষণ ক্ষেপিয়া হয়ে উঠেছে।
দয়া করুন স্যার। বোটটা তো প্রায় খালি চলে যাবে।
তা যাক, ওটা আমাদের জন্যে নয়।
কেন আমাদের যেতে দেবে না? আমরা কি মানুষ নই?
টু-দ! ফিরে যাও, নইলে গুলী করতে বাধ্য হবো।
ওদিকে মিঃ এবং মিসেস স্ট্রস--
সুইটি, প্লিজ! তুমি যাও, আর সময় পাবে না।
না গো, তা হয় না। একসাথে এতোকাল কাটালাম, যদি মরতে হয় তবে একসাথেই মরবো।
14

এক পাশে বেঞ্জামিন গুগেনহাইম···
আমি আমার সেরা পোষাকটি পরে নিয়েছি।
এবার ভদ্রলোকের মতো বিশ্রাম নেবো আটলান্টিকের উষ্ণায়।
লাইফ জ্যাকেট যাদের ছিল তারা লাফ দিয়ে পড়লো সমুদ্রে···
ঝাঁপ!
সাঁতার কেটে পালাও। টাইটানিক ডুবে যেতে আর দেরী নেই।
গান শুরু হয়ে গেল আবার···
দিও সাড়া প্রভু মোদের আমরা যারা হারিয়ে যাবো এই সাগরের অতল জলে···
দয়া করো-আমাদের উঠতে দাও··· নইলে ডুবে যাবো।
যাঃ - সরে যা বলছি। এটা মিলিয়নেয়ার্স স্পেশাল। থার্ড ক্লাসের জায়গা এতে হবে না।
কে কোথায় আছো··· আমাদের বাঁচাও!
ওয়্যারলেস অপারেটর ফিলিপস এখনো সংকেত পাঠিয়ে চলেছেন।
15

আসন্ন সমাপ্তির কান ঘুরে চলেছেন ক্যাপ্টেন স্মিথ...
উহ, তখন সামান্য একটু সাবধান হলে...
স্যার, এই লাইফ জ্যাকেটটা আপনি নিন।
আর তুমি... তুমি কী করবে বৃাইড?
জানিনা স্যার।
ইতিমধ্যে এক ফায়ারম্যান...
ওহ, ব্যাটা জ্যাকেটটা কেড়ে নিয়ে পালাচ্ছে! স্পর্ধা কম নয়।
ওহ্...
আহ!
মর্... মর ব্যাটা। একজন সাধারন ফায়ারম্যান... তোর জীবনের কী দাম?
রাত দুটো বেজে কুড়ি...
...হুউউউস...
ইতিহাসের বৃহত্তম জলযান - আনসিংকেবল টাইটানিক হারিয়ে গেল আটলান্টিকের অতলে...
রাত দুটো বেজে চল্লিশ... কার্পেথিয়া জাহাজ...
হ্যাঁ - হ্যাঁ তা একটা লাইফবোট ... প্যাসেন্জার জাহাজে ঘোরাও... কিন্তু টাইটানিক কোথায়? সত্যিই হারিয়ে গেল নাকি!
এও কি সম্ভব?
শেষ লাইফবোটটি যখন সমুদ্র থেকে তোলা হোল তখন 2210 জন যাত্রীর মধ্যে পাওয়া গেল মোট 711 জন।
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, শেষ পর্যন্ত আমরা বেঁচেছি।
সৌভিক কর্মকার
৭৭

With compliments from :

Chowdhury Printing Works

P-21, Sahitya Parishad Street
Calcutta-6

With Best wishes from :

Union Block Service

63/1 Surya Sen Street
Calcutta-9

For Quality Papers

Sooryodaya Enterprise

14/2, Old China Bazar Street
Calcutta-1

With Best Wishes From :

New Joykali Press

8A, DINABANDHU LANE
CALCUTTA-700 006

Laxmi Narayan Process

Block Makers of Disitnction

19, Goabagan Street
Calcutta-6

For Quality Binding

Uuited Binding Works

29/B, Chuterpara Lane
Calcutta-12

Wite Best wishes from :

M/s. T. Sarkar

140 Lake Town, Block-A
Calcutta-55

With best compliments from :

Tapasi Printing Works

9, SIBU BISWAS LANE
CALCUTTA-9

With Best compliments from :

Calcutta Art Studio

(Private Limited)
Offset Printers

185/1A, B. B. Gangully Street
Calcutta-12

With best compliments from :

SAMAR CHATTERJEE

C. I. T. Buildings
Block—3 Flat—39
Christopher Road
Calcutta-700014

Karunamoyee Trading Co.

Paper, Board Merchants and
General Order Suppliers

14, Ramnath Biswas Lane
Calcutta-700 009

Wish best compliments from :

Book Binding Works

4, Ramananda Sen Lane
Calcutta-5

সাগরিকা

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

এক

আমাদের শতানীক এমনি দেখতে বেশ ভালো মানুষ, ছোট্টখাট্ট ছেলেটি, কিন্তু ওর মধ্যে যে বেদুইনদের মত একটা দুরন্ত ভাব আছে তা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। অবশ্য বেদুইনদের মত মরুভূমির প্রতি ওর কোনও আকর্ষণ নেই, ওর প্রচণ্ড আকর্ষণ সমুদ্রের ওপর। আর এটা শুরু হয়েছে সেই ছেলেবেলা থেকেই।

গরমের বা পূজোর ছুটি শুরু হলেই ওর বাবাকে গিয়ে ধরত—পুরী চল। বাবা একটু তা-না-না-না করে শেষ পর্যন্ত আদুরে ছেলের কথা ফেলতে পারতেন না। তা ছাড়া ওর মা-ও জগন্নাথদর্শনের নামে মেতে উঠতেন। শতানীক কিন্তু পুরী গিয়ে মন্দিরে যাবার কোন আগ্রহ দেখাত না, তার সারা

দিনটা কাটত সমুদ্রের তীরে। আর স্নানের সময়? অমন মজা কি আছে? বড় বড় ঢেউ এসে ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ছে। একটু সতর্ক না হলে ডিগবাজী খেতে খেতে প্রাণ যাবে, তার স্রোতের টানে টেনে নিয়ে চলবে মাঝ সমুদ্রের দিকে। কিন্তু শতানীক জানে ওতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কেন না প্রায় পরমুহূর্তেই আর একটা বড় ঢেউ এসে ওকে ফের আছড়ে ফেলে দেবে ডাঙ্গার দিকে। তখন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারাটাই মজা। দু-ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা সমুদ্রের জলে কাটিয়ে মায়ের ধমকে ওকে যখন উঠে আসতে হ'ত তখন মনে হ'ত বুঝি কোনও জলজীবকে শুকনো ডাঙ্গায় এনে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

শুধু কি সমুদ্রে স্নান? সূর্য ওঠবার আগেই ও বাবার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ত 'ওজোন' সেবনের নাম করে। ওর বাবার একটু হাঁপানীর দোষ ছিল, ডাক্তাররা বলেছিলেন ভোরবেলা সূর্যোদয়ের ঠিক আগে সমুদ্রের ধারে বেড়ালে ওটা কমে যাবে। কারণ সে সময় ওখানকার বাতাসে থাকে প্রচুর ওজোন—যা নাকি অক্সিজেনে টুইটম্বুর। নাক দিয়ে টানলে ফুস্‌ফুস্ পরিষ্কার হয়ে যায়। তা বাবা যখন ওজোন সেবনে ব্যস্ত ও তখন খুঁজে বেড়াত সমুদ্রে ভেসে আসা কোন নতুন জিনিস চোখে পড়ে কিনা!

তা পড়তও। রঙবেরঙের শামুক-ঝিনুকের কথা বাদ দিলেও মজার মজার জিনিসও চোখে পড়ত। একবার চোখে পড়ল একটা আস্ত সাপ। কী লম্বা! গায়ে কী অদ্ভুত চিকড়িবিকড়ি! সমুদ্রের ঢেউ-এ ভেসে এসে কি করে ডাঙ্গায় আছড়ে পড়েছে, তার পর নিশ্বাস নিতে না পেরে ধুঁকছে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওর আয়ু শেষ হয়ে যাবে। শতানীক ভালো করে দেখবার জন্য কাছে এগিয়ে যাচ্ছিল, বাবা হাত ধরে টেনে আনলেন।

আর একদিন দেখল একতাল কাদা কাদা কি একটা জিনিস পড়ে আছে। দেখতে খোলা ছাতার সঙ্গে বেশ একটু মিল আছে। চারদিক্ দিয়ে কতকগুলি শেকলের মত কি ঝুলছে। বাবা বললেন, ওটা নাকি জেলিফিশ্। নামে ফিশ্ কিন্তু আসলে ফিশ্ অর্থাৎ মাছ নয়, আরও নীচু-স্তরের জীব। আর শেকলের মত জিনিসগুলি হচ্ছে ওদের শিকার ধরার অস্ত্র। সামনে শিকার এলেই ওগুলো বেঁকে গিয়ে আংটার মত আঁকড়ে ধরে শিকারকে, তখন কার সাধ্য তাকে ছাড়ায়? ব্যস্, একটু পরেই শেষ হয় ওর আহার-পর্ব। শতানীক অবাক্ হয়ে দেখতে লাগল এই কিম্ভূত-কিমাকার জীবটিকে। তারপর বেড়িয়ে ফিরবার সময় এসে দেখে কোথায় গেল জেলিফিশ্‌টা! কুঁকড়েমুকড়ে কতটুকু হয়ে গেছে তার চেহারা! চেনাই যায় না। বাবা বললেন চিনবি কি করে, ওর শরীরের বেশীর ভাগই যে জল! রোদে পড়ে থেকে সে জল শুকিয়ে গেছে। একটু পরেই হয়তো দেখবি সমস্ত জলটাই প্রায় উবে গেছে।

এসব শতানীকের ছেলেবেলার ঘটনা। আরও বড় হয়ে সমুদ্রের প্রতি এই আকর্ষণ আরও বেড়ে যায়। ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে সমুদ্র আছে, আছে সী-বীচ্, সেখানেই তার একবার যাওয়া চাই। এইভাবে গোপালপুর, ওয়ালটেয়ার, মাদ্রাজ, ত্রিবান্দ্রাম সব জায়গায় সে ঘুরে এসেছে। মাদ্রাজে সী-বীচ্ থেকে সমুদ্রে যেতে অনেকটা বালি ভাঙ্গতে হয়, কিন্তু তাতেও তার আপত্তি দেখা যায় নি। মহাবলীপুরম্ দেখে সে মুগ্ধ হয়েছে। এমন কি ভারতের শেষ সীমান্ত কন্যা-কুমারী যেতেও সে ছাড়েনি। সেখানে তেমন সী-বীচ্ না পেলেও তিন সমুদ্রের সঙ্গম তাকে মুগ্ধ করেছে, মুগ্ধ করেছে সেই ডুবো পাহাড়গুলো যার একটায় স্বামী বিবেকানন্দ সাঁতরে গিয়ে বসে থাকতেন, মগ্ন হয়ে যেতেন ধ্যানে। সেখান থেকে রামেশ্বরম্ যেতেও সে ছাড়ে নি। জলের ওপর পাতা রেল লাইন, তার ওপর দিয়ে ট্রেনে করে যাওয়া—সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। দুধার থেকে সমুদ্রের জল ছিটকে আসছে ট্রেনের জানলা দিয়ে গায়ে। এক মারোয়াড়ী ভদ্রলোক তাড়াতড়ি জানালার শাটার বন্ধ করতে গেলে সে রীতিমত ধমকেই উঠেছিল।

কলেজে উঠে সে ঠিক করল সমুদ্র-বিজ্ঞান নিয়ে পড়বে। কিন্তু এদেশে কলেজে ও বিষয়ে পড়াবার ব্যবস্থা নেই। তখন সে ঠিক করল জিওলজী অর্থাৎ ভূতত্ত্ব নিয়ে পড়বে। তাতে সমুদ্রবিজ্ঞান অন্ততঃ খানিকটা জানতে পারবে।

প্রথমে বি. এস্-সি, তার পর এম্. এস্-সি পড়া শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তাতে আর কতটুকু জানা যায়? আজকাল সমুদ্রকে নিয়েই নতুন বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে—যার নাম ওশানোগ্রাফি। 'ওশান'কে বাংলায় আমরা বলি মহাসাগর, আর এমনি সমুদ্রকে ইংরেজিতে বলে সী। শতানীক তো সেই কতটুকু বয়স থেকেই এ সব জানত। সমুদ্র নিয়ে ইংরেজি কবিতাও তার মুখস্থ ছিল অনেক। যেমন—

"দি সী, দি সী, দি ওপ্‌ন্ সী—
দি ব্লু, দি ফ্রেশ্ অ্যাণ্ড এভার ফ্রী।"

দি উচ্চারণ করতে হবে না দ্য উচ্চারণ করতে হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাত না কখনও। আবার "রোল্ অন্ দাউ ডীপ্ অ্যাণ্ড ডার্ক ব্লু ওশান, রোল্।" ওঃ, কী ভালোই না লাগত এগুলো আওড়াতে।

একবার আমেরিকার এমন কোন একটা ইউনিভার্সিটিতে চলে যেতে ইচ্ছে হ'ত যেখানে ওশানোগ্রাফি আলাদা বিষয় হিসেবে পড়ানো হয়। কিন্তু সে সুযোগ আর হ'ল কই?

দুই

কিন্তু-সংস্কৃতে সেই যে একটা কথা আছে--"স্ত্রীয়াশ্চরিত্রাঃ পুরুষস্য ভাগ্যম্ দেবাঃ না জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ"—মেয়েদের চরিত্র আর পুরুষের ভাগ্য, এ তো দেবতারাই জানেন না, মানুষ কি করে জানবে? কথাটা যে শতানীকের বেলাও এমন ঘটে যাবে কে জানত?

এম্. এস্-সি পাশ করে যখন সে কি করবে না করবে ঠিক করে উঠতে পারছে না, তখন খবর এল এবার ওয়াল-টেয়ারে সায়েন্স কংগ্রেস হচ্ছে। বিদেশ থেকে নামী-দামী বিজ্ঞানীও যোগ দিচ্ছেন ওতে। তাঁদের মধ্যে আছেন ডক্টর মেইন্, সমুদ্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যিনি এখন প্রায় একজন প্রবাদ-পুরুষ হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

আর দ্বিতীয় কথা নয়, শতানীক নিজেকে একজন ডেলিগেট করিয়ে নেবার ব্যবস্থা পাকা করে এল।

তা ওয়ালটেয়ারের কংগ্রেস বেশ ভালোই জমে উঠেছিল। আলাপ হ'ল অনেকের সঙ্গেই। সম্মেলন শেষ হবার আগের দিন ওখানকার অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সেলার সকলকে একটা টি-পার্টি দিলেন। অবশ্য নামেই টি-পার্টি, আয়োজন হয়েছিল প্রায় চর্বচুষ্যলেহ্যপেয়ের। বিরাট লনের মধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়ায় পার্টি যখন বেশ জমে উঠেছে তখন শতানীক হঠাৎ লক্ষ্য করল একটা টেবিলে ডক্টর মেইন্ কার সঙ্গে একা একা কথা বলছেন। তাঁর পাশের চেয়ার দুটো খালি। শতানীক বরাবরই বেশ সপ্রতিভ। সে গুটি গুটি এসে হাসিমুখে ডক্টর মেইন্‌কে শুভেচ্ছা জানাল। ডক্টর মেইন্ জিজ্ঞাসু মুখে তাকালেন তার দিকে।

"আপনার কথা অনেক শুনেছি, তাই একটু আলাপ করতে এলাম ওশানোগ্রাফি সম্বন্ধে।"

"ও, তাই বুঝি? বেশ বেশ!" ডক্টর মেইন্ পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন ওকে। যে ভদ্রলোক এতক্ষণ ওঁর সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিলেন, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি একবার ওদিক্‌টা দেখে আসি।"

ভালোই হ'ল। ডক্টর মেইন্‌কে একা পেয়ে শতানীক তার মনের যত প্রশ্ন ঢেলে দিল একসঙ্গে।

মনে হয় ডক্টর মেইন্ ওর কথাবার্তা শুনে খুশি হয়েছেন। বললেন, "ওশানোগ্রাফির ওপর তোমার তো খুব আগ্রহ দেখছি। তবে হাতেকলমে তেমন অভিজ্ঞতা হয় তো হয়নি, তাই না?"

শতানীক সবিনয়ে জানাল কথাটা ঠিক। তাদের পাঠ্য-তালিকায় এ বিষয়ে খুব একটা কিছু ছিল না, আর হাতে-কলমে কিছু শেখাবার ব্যবস্থা তো ছিলই না।

ডক্টর মেইন্ ঠোঁট দু'টো চেপে একটু কি ভেবে নিলেন। তারপর বললেন, "তা হলে তোমাকে একটা কথা বলেই ফেলি। তোমার মত একজন উৎসাহী ইয়ং ম্যান্‌কেই আমি খুঁজছিলাম। আমরা শীগগিরই একটা এক্সকার্শনে যাচ্ছি, এক্সকার্শন না বলে অভিযানও বলতে পার। কাজ খানিকটা এগিয়েছেও। একটা ছোট জাহাজ চার্টার করে ফেলেছি। ছোট বলতে খুবই ছোট। ক্রু বাদে দশ বারো জনের জায়গা হতে পারে তাতে। আমার ছাত্র-ছাত্রী মিলে জনাআষ্টেক ইতিমধ্যেই যাবে ঠিক হয়েছে। আরও তিন-চার জন হলে ভালো হয়। আমরা এ সাগর থেকে ও সাগর ঘুরে বেড়াব - পরীক্ষা-নিরীক্ষা করব। ফিরতে হয়তো মাস পাঁচ ছ লেগে যাবে। তা যাক, তুমি যদি তুমি ফ্রী থাক, তোমাকেও সঙ্গে নিতে পারি।

পরমুহূর্তেই শতানীকের মুখের দিকে চেয়ে কিছু একটা অনুমান করে নিয়ে বললেন, "না না, খরচ-টরচা তোমাকে কিছু দিতে হবে না। সে সব ভার আমাদের। ইণ্টার-ন্যাশনাল ও. জি. সোসাইটি থেকেই আমাদের খরচের যাবতীয় টাকা দেওয়া হয়েছে। কাজেই তোমার সঙ্কোচের কোনও কারণ নেই।"

শুনে শতানীক তো এক পায়ে খাড়া। তার এতদিনের এত বড় একটা শখ হঠাৎ এভাবে সফল হতে যাবে এ সে ভাবতেও পারে নি।

"কবে আপনারা রওনা হচ্ছেন?" জিজ্ঞেস করল শতানীক। "কোথা থেকে?"

"মরিশাসে আমাদের জাহাজ ভেড়ানো আছে। সবাই সেখানে একত্র হবে। আমি তো এখান থেকেই সম্মেলনের শেষে প্লেনে সোজা মরিশাসে গিয়ে ওদের সঙ্গে যোগ দেব।

তুমিও চল না আমার সঙ্গে একই প্লেনে। তোমার টিকিটের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

সম্মেলনের শেষে? তার মানে আগামী কাল? বাড়িতে তো কিছু বলে আসা হয় নি, একবার মনে মনে ভাবল শতানীক। তারপর ভাবল, এ একরকম ভালোই হ'ল। মা হয়তো শুনলে যেতে বাধা দেবেন। বাঙ্গালী মায়েরা সব ঐ রকম। বড্ড অবুঝ। স্নেহটা, ভাবনাটা ওঁদের বড্ড বেশি। আগে না ঘাঁটিয়ে একটা তার করে দিলেই হবে। তখন তো আর আটকাবার সময় থাকবে না।

তিন

সত্যি সত্যি শতানীকের এত দিনের সাধ যে পূর্ণ হবে তা সে ভাবতে পারে নি। টের পেল যখন সত্যিসত্যি মরিশাসের বন্দর থেকে তাদের ছোট্ট জাহাজ "অ্যাজিওর মেইন্ জলে ভাসল। মেইন্ সাহেবের নাম দিয়েই তাঁর এক ভক্ত জাহাজটার নামকরণ করেছিল। "অ্যাজিওর" কথাটা মেইন্ই ওর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন—বোধ হয় নিজের নামে জাহাজের নাম রাখায় তাঁর একটু সঙ্কোচ হচ্ছিল, তাই সেই বিখ্যাত ইংরেজি কবিতা থেকে অ্যাজিওর কথাটি যোগ করে নিয়েছিলেন। মেইন্ মানে তো উত্তাল সাগর আর অ্যাজিওর হচ্ছে নীল। "নীল সাগর" কথাটা তো শুনতে ভালোই, বিশেষ করে যখন নীল সাগরের বুকেই তাঁদের এই জাহাজ ভেসে যাবার জন্য তৈরি হয়েছে।

এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা শতানীকের। সারা দিন ধরে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তার যেন আর আশ মেটে না। সমুদ্রের বুকে যে এত রঙের খেলা হয় তাই কি সে আগে জানত? কখনও রক্তাভ, কখনও সবুজাভ, কখনও ঘন কালো। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই নীল। সে নীলের মধ্যেও কত প্রভেদ! কখনও গাঢ় নীল, কখনও হাল্কা। আর রাত্রে তো কথাই নেই। কখনও মনে হয় কে যেন সারা সমুদ্রে আলকাৎরা মিশিয়ে দিয়েছে। আবার চাঁদনী রাতে সেই কালো রূপ বদলে যায়, মনে হয় চাঁদে আলোয় সারা সমুদ্রটা যেন হাসছে। তার মধ্যে ঝক্‌মক্ করছে নক্ষত্রের ছায়া। স্থির নয়, ক্রমাগত দুলছে, যেন বলতে চায়—কি, কি দেখছ? সব জানি আমরা, কিন্তু বলব না, বলব না, বলব না।

ছেলেবেলায় সে বিশ্বকবির একটা বিখ্যাত কবিতায় পড়েছিল "জল শুধু জল, দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।" না, জল দেখে, তার অন্ততঃ চিত্ত বিকল হয় নি।

ইতিমধ্যে জাহাজের অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গেও তার বেশ আলাপ পরিচয় হয়ে গেছে। সকলেই সমুদ্র-বিজ্ঞানী এবং ডক্টর মেইনের ছাত্রছাত্রী। এদের মধ্যে ফিলিপ্ আয় জন্ প্রায় তারই সমবয়সী। দলের মধ্যে সবচেয়ে বয়সে যিনি বড় তিনি একজন মহিলা—মিসেস্ মেরী মানলোভা। এক সময়ে তিনিও ডক্টর মেইনের ছাত্রী ছিলেন। এখন একটা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা। শতানীকের চাইতে তিনি বোধ হয় বছর দশেকের বড়। তাই শতানীক প্রথম আলাপেই তাঁকে বলল, "আমরা বোনকে নাম ধরে ডাকি না.—দিদি বলি। আপনাকেও মেরীদি বলে ডাকব কেমন?

"মেরী দি? কুব বালো, কুব বালো।"—হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন মিসেস্ মানলোভা। উচ্চারণে ত্রুটি থাকলেও তাঁর মুখে বাংলা শুনে শতানীক চমকে উঠেছিল। মিসেস্ মনোলোভাই ফের বললেন, "বাংলা আমি একটুকুটুকু শিখেছি আমার বেঙ্গলী ফেণ্ড পোয়েট। টেগোরের অরিজিনাল রাইটিংস পোড়ার তাই সাধ হইল, ব্যস্ শিখতে লাগলুম বাংলা। বারী সুইট ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যাই দি সেম টাইম্ কোয়াইট্ রিচ্।"

এইভাবে এই বিদেশী ছোট্ট দলের সঙ্গে সহজেই মিশে গেল শতানীক। ডক্টর মেইন্ বেশির ভাগই নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতেন নিজের কেবিনে। তবে মাঝে মাঝে যখন ডেকে এসে বসতেন। তিনিও সমানে আড্ডা দিতেন বয়ঃ কনিষ্ঠদের সঙ্গে।

এমনি করে চলল কয়েকদিন। তার পর একদিন যন্ত্র পাতি ঘেঁটে মেইন্ বললেন, "এখন আমরা ভারত মহা-সাগরের মাঝামাঝি এসে পৌঁছেছি। এখন দিন কতক ভাসতে হবে অকূল সমুদ্রে আর এই সময়টাই সমুদ্রকে সার্ভে করার সবচেয়ে ভালো সময়। ফিলিপ্, জলটা মাপো তো! মাটি এখান থেকে কত নীচে দেখা যাক।"

সমুদ্রের গভীরতা মাপা হয় শব্দ আর তার প্রতিধ্বনির সাহায্যে। একটা ভারী জিনিস লম্বা তারে নামিয়ে দেওয়া হয় জলে, সঙ্গে সঙ্গে একটা স্টপওয়াচ্ও চাপিয়ে দেওয়া হয়। ভারী জিনিসটা জলের তলায় পড়ে একটা শব্দ হয়। তার পর সে শব্দ দিয়ে আসে প্রতিধ্বনিত হয়। প্রতিধ্বনি শোনামাত্র-ফের স্টপওয়াচটা টিপে দেওয়া হর। ফলে ঠিক কতটুকু সময় লাগল বা ধরা পড়ে। জলের তলায় শব্দ তরঙ্গ কত বেগে যাচ্ছে তা আগেই ঠিক করা থাকে। তাই শুরু থেকে প্রতিধ্বনি ফিরে আসবার সময় টুকুকে দুই দিয়ে ভাগ করলেই সমুদ্রের গভীরতা সেখানে কতখানি তা ধরা পড়ে।

অবশ্য এজন্য ওঁদের জাহাজের নীচে একটা ফ্যাকমিটার যন্ত্রও বসানো ছিল, তাতে জাহাজ চলবার সময় বিভিন্ন জায়-গায় জলের গভীরতা আপনা-আপনি লেখা হয়ে যাচ্ছিল একটা গ্র্যাফ কাগজে। তবু ডক্টর মেইন্ আর একবার ভালো করে মিলিয়ে নিলেন। দেখা গেল এখানে সমুদ্র প্রায় চার মাইল গভীর।

ডঃ মেইন্ বললেন, "এখন ফ্যাকমিটারের ওপর ভালো করে লক্ষ্য করে রাখ। দেখবে মাঝে মাঝে গভীরতা অনেক কমে গেছে—হাজার ফুটেরও কম। তখন চট্‌পট্ একদলকে নেমে যেতে হবে জলের নীচে ডুবুরীর পোশাক পরে। পোশাক যেন হাতের কাছে তৈরি থাকে।"

জন্ বলল, "আমি আগে নামব।" বলেই সেই কিম্ভূত-কিমাকার ডুবুরীর পোশাকটা পরে নিল সে। কী অদ্ভুতই না দেখাছিল তাকে! পা দুটো আবার হাঁসের না ব্যাঙের পায়ের মত জোড়া-লাগানো পাতা—যাতে জলের তলায় সাঁতার দিতে সুবিধা হয়। ডক্টর মেইন্ বললেন, "ওর পোশাকের মধ্যে আরও অনেক কারিকুরি আছে। জলের ঠিক ওপরে চাপ হচ্ছে এক বায়ুচাপ অর্থাৎ এক অ্যাটমস্ফারিক প্রেশারের সমান, অর্থাৎ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে 14·7 পাউণ্ড। তার পর যত নীচে নামতে থাকবে চাপও ততই বাড়তে থাকবে —প্রতি 33 ফুটে ঐ 14·7 পাউণ্ড করে। তার মানে হাজার ফুট জলের নীচে নেমে গেলে ওপরের চাপ হবে জলের ওপরকার চাপের প্রায় তিরিশগুণ। মাথার ওপর ঐ চাপ সহ্য করা তো সাধারণ অবস্থায় সম্ভব নয়, একেবারে থেৎলে যেতে হবে। তাই ডুবুরীর পোশাকের মধ্যেই সে চাপ সহ্য করার ব্যবস্থা আছে।

মিসেস্ মানালোভা বললেন, "ওকে অক্সিজেনও নিতে হবে ওপরের বাতাস থেকেই। দেখছ না লম্বা নল। সমুদ্রের জলে অবশ্য অক্সিজেনের পরিমাণ বাতাসের চেয়ে বেশিই। শতকরা 34 ভাগ, যেখানে বাতাসে শতকরা মাত্র 21 ভাগ। তবুও আমরা তো ফুস্‌ফুস্ দিয়ে সে অক্সিজেন টেনে নিতে পারি না—যেমন পারে জলের জীবেরা তাদের কানকো বা ঐ রকমের প্রত্যঙ্গ দিয়ে। যারা পারে না তাদের থেকে থেকে ওপরে ভেসে উঠতে হয় অক্সিজেন নেবার জন্য।"

শতানীক অবশ্য এ সবই জানে। তিমিও তো ঐ জাতের প্রাণী যাকে নিঃশ্বাস নেবার জন্য জলের ওপরে উঠে আসতে হয়। তবে ওরা জলের নীচে প্রায় আধ ঘণ্টা নতুন করে নিঃশ্বাস না নিয়েও থাকতে পারে। ওপরে উঠে এলে ফিন্‌কি দিয়ে ফোয়ারার মত জল ছিটকে বেরোয় আর তাই দেখেই তো বোঝা যায় ঐখানে রয়েছে তিমি।

একটু পরেই ফ্যাক্‌মিটার দেখে জন্ জলে নেমে পড়ল। ওপর থেকে তীব্র সার্চ লাইট ফেলে আর সবাই দেখতে লাগল। প্রায় পনেরো মিনিট ধরে জল উথালপাথাল করে জন্ উঠে এল। শতানীক বলল, "এর পরে কিন্তু আমি নামব?"

মিসেস্ মানালোভা বললেন, "তুমি কি একা নামতে পারবে? তোমার তো অভ্যাস নেই। আমিও বরঞ্চ তোমার সঙ্গে নেমে যাব। তারপর বাংলায় বললেন, দরকার হইলে ডিডি ভাইকে প্রটেক্ট—কি বলে বাংলায়?—হ্যাঁ রক্ষা করবে।

শতানীক হেসে বলল, "ওটা হিন্দী উচ্চারণ হয়ে গেল। বাংলায় বলতে হলে বলুন রক্ষা করবে।"

খিল খিল করে হেসে উঠলেন মিসেস্ মানালোভা। "বেশ বেশ, টাই হোবে। রোক্ষা-রোক্ষা-রোক্ষা। ঠিক বললাম টো?"

"একদম ঠিক!" তেমনি হেসে জবাব দিল শতানীক।

চার

শতানীকের এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। বইএ সে পড়েছে সিনেমাতেও কিছু কিছু দেখেছে কিন্তু নিজে সশরীরে এই আশ্চর্য রাজ্যে যে কখনও এসে হাজির হতে পারবে তা কখনও স্বপ্নেও ভাবে নি।

জাহাজের ওপর থেকে তীব্র সার্চ লাইট নেমে আসছে জলে, ফলে এদিক্ ওদিক্ দেহতে একটুও অসুবিধা হচ্ছে না। হাঁসের মত পা নাড়তে নাড়তে শতানীক সাঁতরে বেড়াচ্ছে জলজীবের মতই, পাশেপাশে তারই মত অদ্ভুত পোশাক প'রে সাঁতরাচ্ছেন শতানীকের মেরীদি—মিসেস্ মানালোভা। এ যেন এক অপূর্ব রঙিন বাগান। এদিকে ঝোপঝাপ, তার ভিতর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে রঙবেরঙের মাছ। কী অদ্ভুত কারিকুরি ওদের গায়ে! মাছ ছাড়া আরও কত অদ্ভুত অদ্ভুত প্রাণী রয়েছে—চেহারা দেখে কে বলবে ওগুলি জ্যান্ত প্রাণী! কোনটা দেখতে ফুলের মত, কোনটা সর্বাঙ্গে কাঁটাবসানো বলের মত, আবার কতকগুলোর চেহারা কী কিম্ভূত কিমাকার! শতানীক এদের বর্ণনা শুনেছে ছবিও দেখেছে কিন্তু এরকম সামনা সামনি ওদের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে তা কোনদিন ভাবতেও পারি না।

আরও নীচে নেমে এল ওরা। এবার তলায় যেন মাটি মাটি ঠেকছে। কিন্তু না, পা বসে যাচ্ছে সে নরম মিহি ধুলোর মত মাটিতে। এগুলিই তা হলে 'উজ্'—সমুদ্রের তলানি। শতানীক জানে আসলে বিভিন্ন খুদে খুদে সামুদ্রিক প্রাণীর দেহাবশেষ থেকে এদের জন্ম। কিসে থেকে জন্মেছে তাই থেকে এদের নামকরণও করেছেন বিজ্ঞানীরা। যেমন ডায়াটম্ গ্লোবিজেরিগ, রেডিওলারিয়ান, টেরোপড উজ ইত্যাদি, শতানীক শুনেছিল আরও এক রকম লালচে ধুলোর মত তলানি দেখা যায় সমুদ্রের নীচে যাকে বলা হয় 'রেড ক্লে' যার বাংলা করলে বলতে হয় লাল কাদা। কিন্তু এখানে সে রকম কিছু নজরে এল না ওর।

পরে, ওপরে উঠে আসার পর ওর 'মেরীদি' অবশ্য বলেছিলেন, দূর বোকা, ওগুলো এখানে আসবে কি করে? ওগুলির দেখা পাওয়া যায় আরও অনেক গভীর সমুদ্রে নামলে। আমরা তো অত নীচে নামি নি।

হঠাৎ আচমকা হাতে টান পড়তে চমকে উঠে সরে এল শতানীক। মানালোভা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন একটু দূরের দিকে। তারপর এক রকম ওর হাত ধরেই টেনে নিয়ে এলেন অনেকটা তফাতে। শতানীক তাকিয়ে যা দেখল তার গল্পই সে শুনেছে, চোখে দেখবে কোন দিন তা ভাবতেই পারি নি।

একটা আট দশ ফুট গোল মত জানোয়ার। তার গায়ে আটটা বড় বড় শুঁড়। তাই দিয়ে সে একটা বিরাট মাছকে পিষে মেরে ফেলবার চেষ্টা করছে মাছটাও দশ বারো ফুটের

সমুদ্র তোলপাড় করে চলেছে লড়াই—অক্টোপাস আর হাঙ্গরে

কম লম্বা হবে না। তারও গায়ে মনে হ'ল ভীষণ জোর। কাৎ হয়ে সে ঐ শুঁড়ওলা জানোয়ারটাকে কামড়ে ধরার চেষ্টা করছে। হাঁ টা কিন্তু ওর মুখের দিকে নয়, একটু নীচে গলায় দিকে। তবে কি এটা সাধারণ মাছ নয়? হাঙ্গর? - হ্যাঁ, ঠিক তাই।

শুঁড়ওলা জানোয়ারটা যে অক্টোপাস্ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অক্টোপাসের মরা বাচ্চা শতানীক মিউজিয়ামে দেখেছে,। জ্যান্ত ছোট্ট মাপের অক্টোপাসও দেখেছে বম্বের অ্যাকোয়া-রিয়ামে। অত্যন্ত নীচু জাতের প্রাণী। এরা শামুকটামুকেরই জাতভাই, কিন্তু কী সাংঘাতিক শক্তি ওর গায়ে! ঐ আটটা শুঁড় ভর্তি রয়েছে অসংখ্য চোষক। তাই দিয়ে শিকারকে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরে সাঁড়াশীর মত। কার সাধ্য সেই মরণ কামড় ছাড়িয়ে নেয়। আবার হাঙ্গরও তো হিংস্রতায় কম নয়! গলার নীচে ঐ যে মস্ত মুখ তাতে সারি সারি বসানো অসম্ভব ধারাল বড় বড় দাঁত—যা দিয়ে এক কামড়ে ওরা একটা মানুষকে দু'টুকরো করে ফেলতে পারে।

সমুদ্র তোলপাড় করে চলেছে লড়াই - অক্টোপাসে আর হাঙ্গরে। কেউ কারোর চাইতে কম যায় না। মিসেস্ মানালোভা যতই শতানীককে সাবধান করে দূরে টেনে আনতে চান ততই বেঁকে বসে। ওরা তো লোহার বর্মটর্ম পরে যতটা সতর্ক হওয়া সম্ভব ততটা সতর্ক হয়ে জলে নেমেছে। এমন একটা আশ্চর্য লড়াই দেখার সুযোগ যখন পেয়েছে তখন কেউ কি সে সুযোগ ছাড়ে।

প্রায় দশ মিনিট ধরে লড়াই চলল। তারপর হঠাৎ আশপাশের জলটা কেমন কালো হয়ে উঠল। অক্টোপাস রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছে, যাবার সময় শরীর থেকে একটা কালো রঙ ছড়িয়ে দিচ্ছে জলে, যাতে অন্ধকারে কেউ তার হদিস না পায়।

হাঙ্গরটাও যে প্রচণ্ড রকম ঘায়েল হয়েছে তা তার নিস্তেজ চেহারা, যা একটু পরে চোখে পড়ল,—দেখেই অনুমান করা গেল। ও কি আর বাঁচবে? ওর সারা শরীর যেন অবশ হয়ে গেছে, দরদর করে রক্ত ঝরছে জলে। কোন একটা নিরাপদ আশ্রয় পেলে যেন বেঁচে যায়। তবে ওর মুখে তখনও অক্টো-পাসের শুঁড় ঝুলছে। শুঁড়টা যে লড়াইয়ের সময় কোন এক ফাঁকে কেটে নিয়েছিল অক্টোপাসের গা থেকে। শুধু ঐ একটা নয়, শতানীকরা লক্ষ্য করেছিল অক্টোপাসের আরও একটা

কাটা শুঁড় জলে ভাসছে। এবার ওর রণে ভঙ্গ দেবার কারণ বোঝা গেল। দু' দু'টো শুঁড় খুইয়ে কতক্ষণ আর যুঝতে পারা যায়?

শতানীক মনে মনে ভাবতে লাগল—এই ভাবেই তো চলছে পৃথিবী তার শুরু থেকে! বেঁচে থাকতে হলে—টিকে থাকতে হলে এই ভাবেই তো প্রতি পদে লড়াই করে বাঁচতে হবে—টিকে থাকতে হবে ইংরেজিতে একেই বলে 'স্ট্রাগ্‌ল্ ফর এক্সিস্টেন্স'। শুধু জলে কেন, ডাঙ্গায়ও কি এই ব্যাপার চলছে না প্রতিনিয়ত। বনে জঙ্গলে শক্তিমানরা দুর্বলদের ধরে খাচ্ছে, তারা আবার খাচ্ছে তাদের থেকেও দুর্বলতর জীবদের ধরে। সেই দুর্বলতর জীবরাও ঐ একই কাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে দুর্বলতম জীবদের ওপর। আর, শুধু বনেজঙ্গলে কেন, আমরা সভ্য মানুষরাও কি ঐ একই কাণ্ড করে চলেছি না দিবারাত্র? তবে তার ধরনটা হয়তো অন্যরকম, অমন প্রত্যক্ষ নয়। বেঁচে থাকার তাগিদে কি না করছি আমরা?

কিন্তু জলের তলায় এ-সব দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে সময় নষ্ট করা যে উচিত নয় তা মনে পড়ল যখন মিসেস্ মানালোভা জানিয়ে দিলেন যে এবার ওপরে উঠবার সময় হয়ে এসেছে। পাতালপুরী ভ্রমণ এখনকার মত বন্ধ করতে হবে, ওপর থেকে দলকর্তা ডক্টর মেইন্ সেই রকম সংকেত পাঠাচ্ছেন। অগত্যা কিছুটা অনিচ্ছায়ই ওকে উঠে আসতে হ'ল অ্যাড়িওর মেইনের ডেকে।

পাঁচ

একটু বিশ্রাম নেবার পর সবাই একত্র লাঞ্চ খেতে বসে গেল। মিসেস্ মানালোভা আজকের অভিজ্ঞতার গল্প করতে করতে শতানীকের দিকে তাকিয়ে তাঁর কষ্টার্জিত বাংলায় বললেন, "সোটনীক, কেমোন এক্সপিরিয়েন্স হ'ল আজ। বালো, বালো, কুব বালো, টাই না?"

শতানীক তাঁকে অনুসরণ করে বলল, "হ্যাঁ মেরী ডি – কুব বালো।"

"আমাদের অভিযান তো সবে শুরু। কয়েক মাসের প্রোগ্রাম নিয়ে আমরা বেরিয়েছি। কত কি আমাদের দেখা বাকি। পৃথিবীর প্রায় সত্তর ভাগই তো সমুদ্র। উত্তর গোলার্ধের চার ভাগের তিন ভাগ, দক্ষিণ গোলার্ধের পাঁচ ভাগের চার ভাগ। মোট আয়তন প্রায় চৌদ্দ কোটি বর্গ মাইল। জানি না এর কতটা আমরা ঘুরতে পারব।"

শতানীকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাদের হিমালয় কত ফুট উঁচু?"

"উনত্রিশ হাজারের সামান্য একটু বেশি"—শতানীক জবাব দিল।

"জলের নীচে ওর চেয়ে উঁচু পাহাড়ও ডুবে আছে। কোন কোন জায়গায় সমুদ্র পৌনে সাত মাইল গভীর। ঐ অতখানি নীচে নামতে পারলে না জানি কি দেখতে পেতাম! কিন্তু তা তো সম্ভব নয়! সে রকম সরঞ্জাম কোথায় আমাদের? সমুদ্রের তলায় শুধু পাহাড়ই তো ডুবে নেই, আছে গভীর জঙ্গল, আছে টেবল ল্যাণ্ড—মালভূমি, আছে গভীর খাত—যা নাকি ডাঙ্গার তুলনায় অনেক অনেক বেশি গভীর। এমনিতেই তো সারা পৃথিবীর সমুদ্রের গভীরতা গড়পড়তা তেরো হাজার ফুটের কম হবে না—যেখানে পৃথিবীর ডাঙ্গা বড় জোর 2800 ফুটের বেশি উঁচু হবে না, তফাৎটা ভাব একবার।"

শতানীক এসব কথা আগেই ভেবেছে এবং ভেবেছে বলেই তো এই বিপদ্‌সঙ্কুল অভিযানে বেরিয়েছে। বিপদ্‌-সঙ্কুল নানা দিক্ দিয়ে। অনেক কিছুই তো এর এখনও অজানা। এর ওপর আছে ঝড়, বৃষ্টি, টাইফুন, সমুদ্রতলের ভূমিকম্প—কত কি বিপদ্!

ডক্টর মেইন্ কতকগুলি ম্যাপ নিয়ে দেখছিলেন। উঠে কয়েকটা যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে বললেন, "মনে হয় আমরা দক্ষিণ দিকে অনেকটা চলে এসেছি। এ দিক্‌টা ভালো করে সার্ভে করা হয় নি এখনও। দেখি আমরা কতটা করতে পারি।"

জাহাজের গতি হঠাৎ কেমন মন্থর হয়ে আসছিল। একজন সারেং এসে ডক্টর মেইন্‌কে জানাল, মনে হচ্ছে জাহাজের তলায় কিছু আটকে যাচ্ছে; জাহাজ ঠিক স্বাভাবিক ভাবে চলতে পারছে না।

ডক্টর মেইন্ তাড়াতাড়ি ডেকের ওপর রেলিং-এর ধারে চলে এলেন এবং একটু পরেই চেঁচিয়ে উঠলেন, "আরে বাবা, এ যে একটা সী-উইডের জঙ্গলে এসে পড়েছি!"

সবাই রেলিং-এর ওপর এসে ঝুঁকে পড়ল। সমস্ত সমুদ্র জুড়ে আগাছা ছড়িয়ে রয়েছে জালের মত। নামেই আগাছা আসলে এক একটা বটগাছের মত মোটা। বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে এই আগাছার জঙ্গল। যেন ফুরোতেই চায় না। ডক্টর মেইন্ সারেংদের হুঁশিয়ার করে দিলেন খুব সাবধানে ধীরে ধীরে চালাতে—জাহাজ যেন জখম না হয়। কিন্তু চালাতে বললেই তো চালানো যায় না। একটু পরেই আগাছা-গুলো প্রায় আষ্টেপৃষ্ঠে আটকে রাখল জাহাজের পথ। জল যত না দেখা যায় আগাছা দেখা যায় তার চেয়ে বেশি। শতানীক ব্যাপার দেখে হকচকিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। গাছগুলোকে পুড়িয়ে দিতে পারলে হয়তো পথ খানিকটা খোলসা হয়ে যেত কিন্তু জলের মধ্যে তো আর তা সম্ভব নয়। শতানীক বলল, "আমাদের সঙ্গে তো বেশ খানিকটা কড়া অ্যাসিড আছে, সেগুলো স্প্রে করে দিলে কেমন হয়?"

"বোধ হয় কাজ হতে পারে খানিকটা" বললেন মিসেস মানালোভা। ফিলিপ একটা পলিথিনের নল নিয়ে এসে তা থেকে সামনে আগাছাগুলোর ওপর কড়া অ্যাসিড ছিটিয়ে দিতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে না হলেও দেখা গেল একটু পরে

কতকগুলো আগাছা যেন নিস্তেজ হয়ে জলে ডুবে যাচ্ছে, কোন কোনটা গলে গলে যাচ্ছে। ডক্টর মেইন্ বললেন, সবগুলোকে এভাবে শেষ করতে হলে যে প্রচুর পরিমাণ অ্যাসিড দরকার তা তো আমাদের সঙ্গে নেই, তবে আমাদের পথ আগলে রয়েছে যেগুলি সেগুলিকে নষ্ট করে দিতে পারলেই চলে যাবে। তবে সাবধান, জাহাজের তলায় যেন অ্যাসিড না এসে জমে, তা হলে জাহাজ ফুটো হয়ে যেতে পারে। সময় যা লাগে লাগুক, তাড়াহুড়োর দরকার নেই, ধীরে সুস্থে যতটা সময় লাগে সেটুকু সময় দিতেই হবে।

তাই করা হ'ল। আধ ঘণ্টা পরে দেখা গেল আগাছা ধীরে ধীরে কমে এসেছে এবং আরও মিনিট দশেকের মধ্যে তাদের বন্ধন থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়ে জাহাজ এগিয়ে চলল।

ছয়

বিকেলের দিকে সবাই একটু নিশ্চিন্ত মনে খানাপিনার জন্য তৈরি হ'ল। মিসেস্ মানালোভা বললেন, "শুধু খানাপিনা নয়, একটু গান-বাজনা করলে কেমন হয়? বলে তিনি নিজেই একটা গীটার বার করে নিয়ে এলেন। তিনি যে এত সুন্দর বাজাতে পারেন তা কেউ জানত না। দেখতে দেখতে তারের ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে সুরের ধ্বনি আশপাশের বাতাসটাকে যেন মোহময় করে তুলল।

অনেকক্ষণ বাজিয়ে যখন তিনি বাজানো বন্ধ করলেন তখনও তার রেশ কাটে নি। স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন তিনিই। বললেন, এবার গান হবে। ফিলিপ্, তুমি তো গান জান, একটা ধর না। ফিলিপ্ গান ধরল। কিন্তু সবাই যেমন আশা করেছিল তেমন জমল না সে গান। ফিলিপ্ নিজেই বোধ হয় তা বুঝতে পারছিল। সে নিজেই গান থামিয়ে দিল।

মিসেস্ মানালোভা ভদ্রতার খাতিরে একবার শুধু বললেন, "থামলে কেন, গাইতে ইচ্ছে করছে না বুঝি? আচ্ছা এবার কে গাইবে? হঠাৎ শতানীকের দিকে চোখ পড়ায় তিনি বললেন, "হয়েছে। এবার আমরা একেবারে নতুন ঢঙের একটা গান শুনব যা এর আগে কেউই শোন নি। টেগোরের গান। শতানীক আমাদের শোনাবে। ও ভাষাটা আমাদের কারোরই বোধ হয় জানা নেই, তাই মানেটা ঐ বলে দেবে, কিন্তু গান যে কত সুইট্ হতে পারে তার নমুনা আমরা নিশ্চয়ই পাব। ধর শতানীক, শুরু কর।"

শতানীক সলজ্জভাবে বলল, "আমি অল্প-স্বল্প গাইতে পারি; আপনাদের যদি ভালো না লাগে আমাকে দোষ দেবেন না যেন।"

"ভনিতা রেখে শুরু কর। কি বলে যেন তোমাদের ভাষায়?" এই বলে তিনি বাকিটুকু শেষ করলেন "ল্যাজে খেলাইও না।" বলেই হো-হো করে হাসি।

শতানীক শুরু করল ঃ

"যাবই আমি যাবই ওগো বাণিজ্যেতে যাবই···।
নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা,
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে সাগর-বিহঙ্গেরা।
নারিকেলের শাখে শাখে ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে,
ঘনবনের ফাঁকে ফাঁকে বইছে ননদী,
সোনার রেণু আনব ভরে সেথায় নামি যদি।"

মুখে যাই বলুক, শতানীকের গলা ভারি মিষ্টি। সেই নিস্তব্ধ সমুদ্রের বুকে তার সেই কণ্ঠস্বর কাঁপতে কাঁপতে যেন চারধারের আবহাওয়ায় গম্‌গম্ করতে লাগল।

বিদেশী অজানা ভাষার গান, তবু যেন কেন সবাইকার ভালো লাগছিল শুনতে। তারপর শতানীক যখন গানটার অর্থ বুঝিয়ে দিল তখন প্রায় সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, বাঃ এই পরিবেশে এই তো শোনাবার মত আসল গান!

সাত

সে রাত্রিটা ভালোভাবেই কাটল। কিন্তু অভিযাত্রীদের ভাগ্যে পরদিনই যে কি বিপদ আসবে তা কি কেউ জানত?

আকাশটা সকাল থেকেই কেমন গোমড়া মুখ করে ছিল সেদিন। বাতাসে একটা ঝাঁঝাল গন্ধও টের পাচ্ছিল কেউ কেউ। সারেংদের একজন ডেক ধোবার জন্য দড়ি দিয়ে সমুদ্রে বালতি করে জল তুলছিল, হঠাৎ সে চমকে উঠে বলল, জলটা এত গরম কেন? পরীক্ষা করবার জন্য আরও দু'তিনজন এগিয়ে এল। হ্যাঁ, সত্যিই তো! সমুদ্রের জল তো এত গরম হবার কথা নয়!

কিন্তু হবার কথা নয় বললেই তো জল ঠাণ্ডা হয়ে যায় না, আর তা গেলও না। একটু পরেই দেখা গেল জাহাজ যত এগুচ্ছে জল ততই গরম হচ্ছে। শেষে মনে হ'ল এইবার বুঝি সে জল টগ্‌বগ্ করে ফুটতে শুরু করবে!

ডক্টর মেইন্ চিন্তিত মুখে বেরিয়ে এলেন। থার্মোমিটার দিয়ে জলের উষ্ণতা মাপলেন। হ্যাঁ, জলের উষ্ণতা প্রায় 95 ডিগ্রী সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গেছে। আর পাঁচ ডিগ্রী বাড়তেই তো সত্যি সত্যি সে জল ফুটতে শুরু করবে।

ইতিমধ্যে বাইরে দেখা গেল আর এক দৃশ্য। সমুদ্রের জলে সার বেঁধে ভেসে আসছে অসংখ্য মাছ। কিন্তু তার কোনটার মধ্যেই প্রাণ নেই। যেন কেউ সেগুলোকে জলে সিদ্ধ করে সমুদ্রে ছেড়ে দিয়েছে।

জাহাজের বাবুর্চিকে ডাকা হ'ল। কাল কি খানাপিনার জন্য দরকারের চাইতে অনেক বেশি মাছ ধরা হয়েছিল সমুদ্র থেকে? এ রকম মাঝে মাঝে জাল ফেলে মাছ ধরার রেওয়াজ তো ওদের আছেই। মাছ বেশি হয়ে যাওয়ায় কি জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে সেগুলো?

বাবুর্চি তো শুনে অবাক্। তার কি দায় পড়েছে? সে মাছ ধরায়ওনি, জলে ফেলেও দেয় নি।

তবে?

সমুদ্রের জলে তখন ক্রমাগত বুড়বুড়ি উঠছে। ঝাঁঝাল গন্ধটা যেন আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। এ কি অদ্ভুত কাণ্ড!

শতানীকের ঘুম ভাঙ্গতে বরাবরই একটু দেরী হয়। আজও সে অনেকক্ষণ ধরে ঘুমোচ্ছিল। জাহাজে হৈচৈ শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল।

খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ কি মনে করে সে দৌড়ে এসে সামনের সারেংকে বলল, শীগ্‌গির আর এক বালতি জল তুলে দাও। আর একটুও দেরী করা চলবে না।"

জল তুলতেই সেই ফুটন্ত জলের বালতি নিয়ে সে ঢুকে গেল জাহাজের ল্যাবরেটরীতে।

যখন বেরিয়ে এল তখন তার মুখে-চোখে দুশ্চিন্তার যে ছায়া দেখা গেল তাতে বুঝতে অসুসিধা হ'ল না সামনে একটা বিরাট বিপদের ভয়ে সে যেন থরথর করে কাঁপছে।

"ডক্টর মেইন্! ডক্টর মেইন্! মেরী দি, ফিলিপ্, জন্! কে আছেন? কে আছ? জাহাজের মুখ এক্ষুণি ফিরিয়ে নিন, ফিরিয়ে নাও, নইলে আমরা কেউ প্রাণে বাঁচব না।"

তার সেই মূর্তি দেখে সারেং কাউকে না জিজ্ঞেস করেই খটাং করে থামিয়ে দিল জাহাজ।

"না না, শুধু থামালে হবে না, এক্ষুণি পিছু হটতে হবে; যেদিক্ থেকে আসছিলাম সেই দিকেই চালিয়ে দাও জাহাজ। আর এক মুহূর্ত দেরী নয়!"—পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠল শতানীক।

সামনের সমুদ্রে তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। গল্‌গল্ করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে জলের ওপর থেকে। কী তীব্র দম্ বন্ধ করা গন্ধ সেই ধোঁয়ার! পরক্ষণেই গুম্‌গুম্ আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। জলে কি বিস্ফোরণ ঘটল? হ্যাঁ, তাই। জলের তলা থেকে আগুন ছিট্‌কে উঠে আসছে! জলে আগুন নিভে যায়, কিন্তু এই ফুটন্ত জলে আগুন নিভবার কোন লক্ষণ নেই। শুধু আগুন না, সঙ্গে সঙ্গে ছিট্‌কে বেরুচ্ছে কাদাগোলা জল, মাঝে মাঝে দু'চারটে পাথরও। সমুদ্রেও দাবানল জ্বলে উঠল।

প্রাণপণে চেষ্টা করে জাহাজ ঘুরিয়ে নেওয়া হ'ল। জাহাজের গতিবেগ যতটা সম্ভব বাড়ানো যায় ততটা বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। দুরন্ত বেগে ছুটে চলল সেই পলায়নপর জাহাজ।

আস্তে আস্তে আবার ঠাণ্ডা স্বাভাবিক জলে এসে দাঁড়াল।

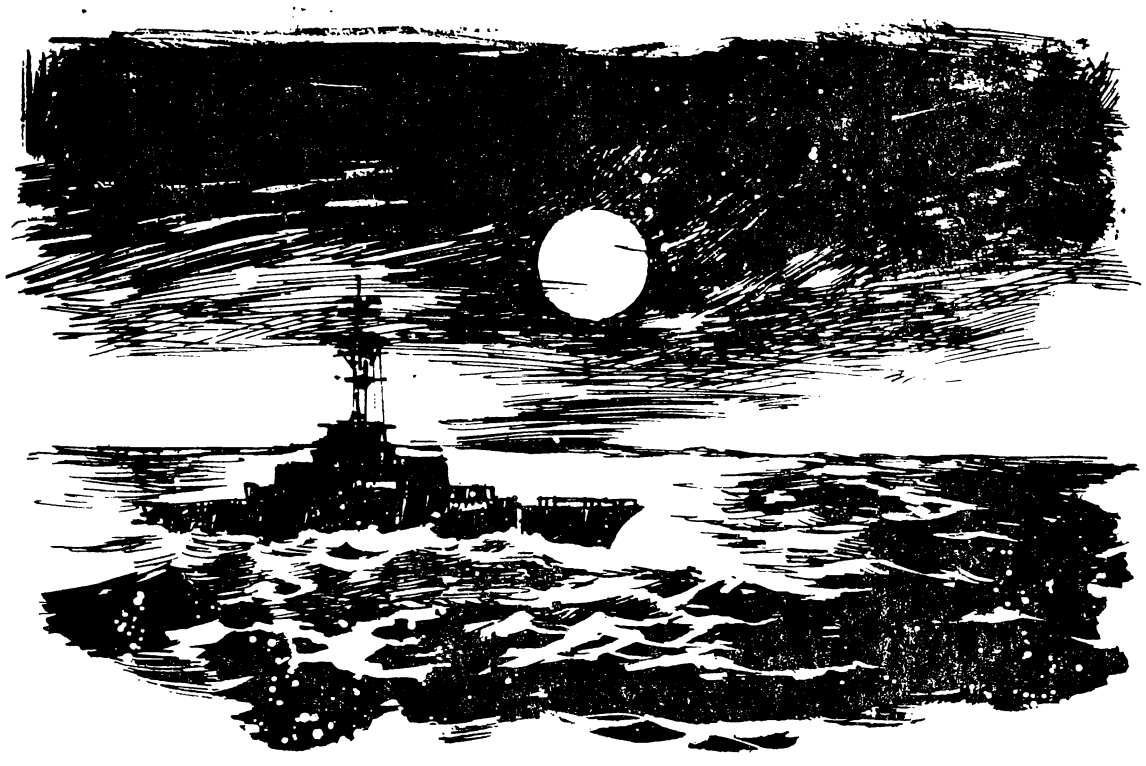

সামনের সমুদ্রে তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে।

জাহাজ। যাত্রীরা সকলেই এতক্ষণ দুরুদুরু বক্ষে ডেকে অপেক্ষা করছিলেন, এবার একটু হাঁপ নেবার অবসর পেলেন তাঁরা।

ডক্টর মেইন্ শতানীকের পিঠ চাপড়ে বললেন, "তোমার যে আশঙ্কা আমিও তাই অনুমান করছিলাম। কিন্তু আমার এত দিনের অভিজ্ঞতায় এমন ঘটনা আর কখনও ঘটেনি, দেখিনিও কোনদিন, তাই সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে সময় লাগছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হয়েও তুমি যে আশ্চর্যভাবে কারণটা এত সহজে ধরে ফেলবে তা আমারও মাথায় আসে নি। ল্যাবরেটরীতে কি পরীক্ষা তুমি করেছিলে তা আমি ঠিক জানি না, তবে ওটা যে তোমার জিওলজী পড়ার ফল তা বুঝতে কষ্ট হয় নি, আর তাইতেই আমরা আজ সদলবলে রক্ষা পেয়ে গেছি। আর দু-পাঁচ মিনিট দেরী হলেই বোধ হয় জাহাজশুদ্ধু কোথায় চলে যেতাম কে জানে!"

শতানীক বলল, হ্যাঁ। সমুদ্রের জল গরম হয়ে আসছে আর তাতে রাশি রাশি মরা মাছ আর কিছু কিছু সামুদ্রিক জন্তুর মৃতদেহ ভেসে আসছে শুনেই আমি ব্যাপারটা আন্দাজ করে ফেলেছিলাম। সমুদ্রে অসংখ্য পাহাড় ডুবে আছে তা তো আপনিই সেদিন বলছিলেন। বিরাট বিরাট পাহাড়, কোনটা বা হিমালয়ের চেয়েও উঁচু। ঐ সব পাহাড়গুলির মধ্যে সবই যে সাধারণ পাহাড় এমন তো হতে পারে না—কিছু কিছু আগুনের পাহাড়ও আছে। সেগুলি বেশির ভাগই হয়তো এখন মৃত কিন্তু কিছু কিছু সজীব থাকাও তো বিচিত্র নয়। বরঞ্চ খুবই স্বাভাবিক। সব সময় হয়তো তা থেকে অগ্নি উদ্‌গীরণ হয় না কিন্তু মাঝে-সাঝে যে তাতে বিস্ফোরণ ঘটবে না এমন তো নয়। এখানেও তাই হয়েছিল। আমাদের সামনেই ছিল ঐ রকম একটা আগুনের পাহাড় যা জলের নীচে বহুদিন নিভন্ত অবস্থায় থেকে হঠাৎ জেগে ওঠে, তারপর শুরু হয় তার ভয়াবহ কাণ্ড। আমরা ভিসুভিয়াস, এট্‌না ক্রাকাটোয়া—এ সবের গল্প শুনেছি। হঠাৎ জেগে উঠে এরা কী ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়েছিল সে কথা কে কে না জানে? জিওলজীর ছাত্র হিসাবে আগুনে পাহাড় নিয়ে আমাদের অনেক পড়াশোনা করতে হয়েছিল, জানতে হয়েছিল ওদের হালচাল, যদিও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ঘটেনি কোন দিন। যাই হোক, আমারই ঐ অল্প পুঁথিগত বিদ্যা থেকেই আমি চট্ করে বিপদ্‌টা আঁচ করতে পেরেছিলাম। ল্যাবরেটরীর পরীক্ষাটা সামান্য একটা পরীক্ষা। জলে সালফিউরিক বা সালফিউরাস অ্যাসিড আছে কিনা সেটা পরীক্ষা করেই আমি বুঝতে পারি আমার সিদ্ধান্ত সঠিক। কারণ আগুনে পাহাড় থেকে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক বেরিয়ে আসে আর তা থেকে ঐগুলিই আগে তৈরি হয়। যাই হোক আমরা যে প্রাণে বেঁচে গেছি সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তবে আমাদের অভিযান যেন এ জন্য বন্ধ না হয় এই আমার অনুরোধ।"

"না না, তা হতে যাবে কেন? অভিযান না হলে অভিজ্ঞতা আসবে কি করে?" মৃদু হেসে ডক্টর মেইন্ আর একবার হেসে শতানীকের পিঠটা চাপড়ে দিলেন।

কার্টুনঃ রেবতীভূষণ

রেক্স মোরান কাজতে লাগানো টিভি-ফোন ডায়াল করে সময় জানতে চাইল। টিভি ফোনের পর্দায় একটা ঘড়ির মুখ ফুটে উঠ্‌ল। একটা যান্ত্রিক গলা বলে উঠল, "এক্ষুনি একটা ঘণ্টা বাজবে। তখন ঠিক আটটা বাজতে দু'মিনিট বাকী থাকবে। একটা ছোট্ট ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল।

রেক্স গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করল। ছোট্ট ঘরটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিতে নিতে ভাবল তার এতক্ষণ বেরিয়ে পড়া উচিত ছিল।

প্রথমে জামার ভেতরের পকেট থেকে তার ইউনিভারসাল ক্রেডিট কার্ড বের করল। তারপর সেটাকে শোওয়ায় ঘরে টেবিলে রাখা বড় 'টিভি-ফোনে'র খাঁজের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। এবারে পর্দার দিকে তাকিয়ে বলল, "তহবিলে আর কত ডলার পাওয়া যাবে একটু জানাবেন দয়া করে?"

মুহূর্তের মধ্যে একটা যান্ত্রিক স্বর জানালো, "হস্তান্তর-অযোগ্য মূলের দশটি শেয়ার; পরিবর্তনশীল মূল্যের কোন শেয়ার অবশিষ্ট নেই। আর নগদ তহবিলে মাত্র এক ডলার এবং তেইশ সেণ্ট পড়ে আছে।"

"মোটে, এক ডলার আর তেইশ সেণ্ট", সে গজ গজ করতে থাকল। "ভগবানের দিব্যি, এত কম পুঁজি নিয়ে দিন শুরু করতে হবে ভাবতেই পারিনি।"

রেক্স বিনিয়োগ দপ্তরে ফোন করল। ধীরে ধীরে পর্দায় একটা মুখ ফুটে উঠল। একটা গোমড়া মুখো, অসহিষ্ণু এবং কিছুটা ব্যবসাদারী চেহারা।

"আমার নাম জ্যাসন মে। সহকারী ক্রেডিট ম্যানেজার। হস্তান্তর-অযোগ্য মূলের লভ্যাংশ দেখাশোনার দায়িত্ব আমার" — তিনি জানালেন।

রেক্স মোরান নিজের 'ইউনি-ক্রেডিট কার্ড'-টা পর্দার উপর

ধরে অনুরোধ করল, "আমার শেয়ারের উপর লভ্যাংশ থেকে কিছুটা আগাম-প্রাপ্য নিতে চাই।"

পর্দার লোকটি একটি টেবিলের সামনে বসে ছিল, "এক মিনিট অপেক্ষা করুন", বলে সে একটা বোতাম টিপল। টেবিলে রাখা একটা ফোনে কান পেতে কিছু কথা শুনে মোরানের দিকে তাকাল, "আপনি এর মধ্যেই দু'মাসের লভ্যাংশের টাকা আগাম নিয়েছেন।"

নিরুপায় রেক্স মোরান বলল, "আমি সেটা জানি ; কিন্তু আজকের প্রয়োজনটা এত জরুরি যে কি বলব।"

"আপনার প্রয়োজন সব সময়ই জরুরী, মিঃ মোরান", অপরপক্ষ নিরুত্তাপ কণ্ঠে মন্তব্য করল। "এখনকার প্রয়োজনটা কি ? আপনার রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে প্রতি মাসের লভ্যাংশ তুলে নেওয়ার বেলায় আপনি সকলের আগে থাকেন। এই ধরনের অগ্রিমের ক্ষেত্রে সরকার সুদ কেটে নেন, ভবিষ্যতে আপনি পস্তাবেন।

"আমি তাও জানি", রেক্স মোরানের গলার স্বরে ক্ষোভ প্রকাশ পেল ! "বেশ কিছুদিন ধরে পর পর আমার কতকগুলো দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটছে। একটার পর একটা।"

"সে যাই হোক ! এখনকার প্রয়োজনটা জানতে পারি কি ?"

রেক্স মোরানের মনে হ'ল ফোন করার আগে গল্পটা বিস্তারিত ভাবে সাজিয়ে নিতে পারলে ভাল হ'ত। অগত্যা সে জানাল, "আমার এক ভাই অসুস্থ। তাকে সাহায্য না করলেই নয়।"

"আপনার এই ভাইটি থাকে কোথায় ?"

"পানামা-সিটিতে।"

"এক মিনিট দাঁড়ান"—ভদ্রলোক তার টেবিলে রাখা টিভি-পর্দার দিকে ঝুঁকে কিছু একটা করলেন। তারপরেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তাকিয়ে বললেন, "মিঃ মোরান, পানামা সিটি কিংবা অন্য কোনোখানেই আপনার কোনো ভাই থাকার তথ্য কম্প্যুটার ব্যাংকে নেই। আর মিঃ মোরান·····

"বলুন, কি বলতে চান ?" বিরক্ত হয়ে মোরান প্রশ্ন করে। লভ্যাংশ থেকে অগ্রিম নেওয়ার জন্য ক্রেডিট-ম্যানেজারের কাছে মিথ্যে কথা বলার অপরাধটা তেমন বড় কিছু নয়। তাই এ যাত্রা কোনো শাস্তি দিচ্ছি না। কিন্তু ব্যাপারটা কম্প্যুটার ব্যাংকে আপনার নথিতে রেকর্ড করা থাকবে।"

"খুব ভাল কথা !" রেক্স বিরক্ত হয়ে টিভি বন্ধ করে বলে, "আমি জানতাম এতে কাজ হবে না। "আপনমনে গজ গজ করতে থাকে মোরান।

এরপর কিছুক্ষণ সে পরবর্তী পদক্ষেপ কি হওয়া উচিত তাই নিয়ে ভাবতে বসল। তারপর সোজা হয়ে বসে আলট্রা মার্কেটের স্থানীয় শাখায় ফোন করল। মোরানের বয়স কেবল ত্রিশ ছাড়িয়েছে। শক্ত সমর্থ। দেখলে মনে হয় কোনোদিন যুদ্ধে গিয়েছিল, না হলে মুষ্টিযোদ্ধা। পোড় খাওয়া চেহারা খুব খারাপ লাগে না।

পর্দায় আলট্রা-মার্কেট ফুটে উঠতেই সে বাচ্চাদের খেলনার দোকানে ফোন করল। সেখান থেকে সে পঁচাত্তর সেন্ট দামের সামরিক বন্দুকের মতো দেখতে একটা খেলনা-বন্দুক পছন্দ করল। তারপর সে তার ইউনি-ক্রেডিট কার্ড টিভির খাঁজে ঢুকিয়ে, বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ পর্দার উপর রেখে বন্দুকটা তার কাছে পাঠানোর নির্দেশ দিল। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই স্বয়ংক্রিয়-সরবরাহ বাক্সের মাধ্যমে খেলনা বন্দুক তার কাছে এসে পৌঁছে গেল।

জিনিসটা ছোটখাট এবং কালো রঙের। যে কোন দূরত্বেই আসল বলে ভুল হবে এবং তার কাজ চলে যাবে। সেটাকে মোরান জামার পাশের পকেটে ঢোকাল।

এবারে সে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নির্দিষ্ট টিভি চালু করে দু'সপ্তাহ আগেকার খবরের কাগজ এবং শোকপ্রস্তাবগুলো দেখতে চাইল। অনেকগুলো কাগজপত্র দেখে একটা ঠিকানা পাওয়া গেল যা কিনা তার কাজে লাগতে পারে। মোরান পিনের মত কলম দিয়ে কিছু তথ্য টুকে নিল।

অবশেষে নতুন পাওয়া ঠিকানায় ফোন করল। ফোনের পর্দায় একটা মুখ ফুটে উঠ্‌ল।

লোকটা ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে রইল। ঠিক চিনতে পারছে না।

রেক্স মোরান জানাল, "আমি কি মিঃ ভ্যাসিলির সঙ্গে কথা বলছি ? আমার নাম রয় ম্যাককর্ড।" পর্দার ভদ্রলোককে দেখলে মনে হয় অভিজাত এবং ক্লান্ত। বয়স ষাটের কিছু উপরেই হবে।

ভ্রূ কুঁচকেই ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "আমি আপনার জন্য কি করতে পারি, মিঃ ম্যাককর্ড ?"

"আমি খুব অল্প সময় হ'ল শহরে ফিরেই দুঃসংবাদটা পেলাম। আমি জেরি জেরেমির এক হতভাগ্য বন্ধু।"

ভদ্রলোকের মুখটা একটু উজ্জ্বল হয়েই আবার বিষণ্ণতায় ভরে গেল। "তাই নাকি ? কিন্তু সেতো আপনার কথা কখনো বলেনি। তাহলে জেরেমির এমন অনেক বন্ধু ছিল যাদের সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।"

"তা হ'তে পারে ! আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার সমবেদনা জানানোর সুযোগ চাই।"—মোরান জানায়।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বোধহয় কিছু একটা উত্তর দিতে চাইছিলেন। কিন্তু মোরান দ্রুত বলতে থাকে, "আমার কাছে জেরির একটা জিনিস আছে, যা আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত। আমি নিজে নিয়ে গেলেই বোধহয় ভাল হ'তো।"

পর্দার ভদ্রলোক একটু অস্বস্তিতে পড়েছেন বলে মনে হ'ল। শেষ পর্যন্ত বললেন, "ঠিক আছে, সকাল ন'টা নাগাদ

একটু ফাঁকা আছি। সেই সময় কয়েক মিনিটের জন্য দেখা হ'তে পারে।"

"খুব ভাল হবে! আমি তখনই দেখা করব।" রেক্স মোরান ভদ্রলোককে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই টিভির পর্দা বন্ধ করে দিল।

এবারে হাত পা একটু খেলিয়ে নিয়ে আপন মনে মন্তব্য করল, "এ পর্যন্ত ভালই কাটল। হয়ত এই ফোনটা ব্যবহার করা ঠিক হ'ল না। অবশ্য শেষপর্যন্ত ফল একই হ'ত।"

সে বাড়ি থেকে বেরোনোর জন্য 'ভাসমান-পরিবহন' ব্যবহার করল না। কারণ বাড়ির কম্প্যুটার ব্যাংকে যাতায়াতের সব তথ্য নথীভুক্ত হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। অতএব সে বেশ খানিকটা হেঁটে একটা সাধারণ পরিবহণ-আড্ডায় এল। ম্যাপ দেখে তার গন্তব্য স্থানের একটু আগে একটা জায়গা ঠিক করে পরবর্তী যে ভাসমান যানটা সেই জায়গার উপর দিয়ে যাবে তাতে উঠে বসল। ভাড়া মেটানোর জন্য ইউনি-ক্রেডিট কার্ডটা যন্ত্রে ঢুকিয়ে দিয়ে মনে হ'ল বন্দুকটা কেনার পর নগদ পয়সা আর বেশি ছিল না। যদি এই পরি-কল্পনাটা ভেস্তে যায় তাহ'লে হেঁটে বাড়ি ফিরতে হবে। দলের সকলেই একচোট হাসবে তাহলে। ভাসমান যানটা ছেড়ে খানিকটা হেঁটে ভাসিলি যেখানে থাকে সেই ফ্ল্যাট-বাড়িতে ঢুকল মোরান। এখন থেকে একটু সতর্ক থাকতে হবে। বাড়িতে অন্যলোক থাকলে সব গুবলেট হয়ে যাবে। খুঁটিয়ে পড়েছে সে খবরের কাগজটা। তাতে লেখা ছিল ভ্যাসিলি বাড়িতে একাই থাকে।

ঢোকার মুখে একটা পরিচয় জানানোর পর্দা ছিল। পর্দার দিকে তাকিয়ে বলল, "রয় ম্যাককর্ড ; মিঃ ফ্রাঙ্ক ভ্যাসিলির সঙ্গে দেখা করার জন্য আগে থেকে বলা আছে।"

দরজা খুলে যেতেই সে ঢুকে গেল ভেতরে। ভেতরে দুটো লিফ্‌ট। একটায় ঢুকে উচ্চারণ করল, "মিঃ ফ্রাঙ্ক ভ্যাসিলির ফ্ল্যাটে যাবো।" লিফ্‌ট চলতে শুরু করল।

ভ্যাসিলির ফ্ল্যাটটার উপরে আর একটা তলা ছিল। রেক্স মোরান লিফ্‌ট থেকে নামতেই সামনের দরজার উপরে ভাসিলির নাম লেখা দেখতে পেল। দরজার উপর আটকানো যন্ত্রটাকে বোতাম টিপে চালু করে দিল। সেখানে আলো জ্বলতেই সে বলল, "আমার নাম রয় ম্যাককর্ড, মিঃ ভ্যাসিলির সঙ্গে দেখা করতে আসার কথা ছিল।"

দরজা খুলে যেতে সে ভেতরে ঢুকল। কিন্তু কাল স্যুট পরে যে লোকটা সেখানে দাঁড়িয়েছিল সে একটু আগে টিভি ফোনের পর্দায় দেখা ভ্যাসিলি নয়। লোকটা জানাল, 'আসুন মিঃ ম্যাক্‌কর্ড! কর্তা আপনার জন্য ভেতরের ঘরে অপেক্ষা করছেন।"

কর্তা? ভ্যাসিলি চাকর রাখে নাকি? এখনকার দিনে চাকর পোষার কথা কে শুনেছে? কাগজের খবর অনুযায়ী বোঝা গেছিল যে লোকটা ধনী। কিন্তু একটা চাকর রাখার মত এতটা ধনী ভাবতেই পারেনি। যাই হোক সে পেছন পেছন চলল। এত বড় একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে সে আগে পা রেখেছে বলে মনে করতে পারল না। অনেক ক'টা ঘর পার হয়ে এসে একটা ঘরের দরজায় চাকরটা ঠুক্‌ঠুক্‌ করে আওয়াজ করল। তারপর উত্তর আসার আগেই দরজা খুলে জানালো, "মিঃ ম্যাককর্ড।"

একটা আরাম কেদারা থেকে টিভি ফোনে দেখা লোকটা মুখ তুলে তাকাল।

"আসুন মিঃ ম্যাক্‌কর্ড ; জেরেমির বন্ধু ; ভেতরে আসুন। বলুন আপনার কি বলার আছে।"

মোরান দাঁড়িয়ে থাকা চাকরটির দিকে তাকাতেই মিঃ ভ্যাসিলি তাকে ঘর ছেড়ে যেতে বললেন। সে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এরপর সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। মোরান পকেট থেকে খেলনা বন্দুকটা বের করে ভ্যাসিলিকে দেখিয়ে আবার পকেটে ভরে রাখল। তারপর গম্ভীরভাবে বলল, "আসলে এটা একটা সাজানো ব্যাপার, মিঃ ভ্যাসিলি।"

"তার মানে তুমি ·····তুমি একটা চোর। একটা মিথ্যে গপ্প ফেঁদে আমার বাসায় ঢুকেছ?"

মোরান অবিচলিত ভঙ্গীতে বলল, "আমি ঠিক ওই ভাবে কথাটা বলতে চাইছি না। আমার লাভের ভাগটুকু আমি কখনোই পাচ্ছি না। কর্তৃপক্ষ আমাকে তা দেবে না বলেই নিজে নিতে হচ্ছে।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, "তুমি একটা নির্বোধ! বুঝলে ছোকরা।"

"হতে পারি, আবার নাও হতে পারি।" রেক্স মোরান পকেটের বন্দুকটা একবার নাড়িয়ে কিছু বোঝাতে চাইল।

"আজকাল চোর হয়ে কোন লাভ নেই। প্রশাসন চোরের হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছে। ছোটখাট অপরাধ করে মজুরী পোষায় না আজকাল।"

রেক্স মোরান তার দিকে মুখ বেঁকিয়ে হাসল। "আমিও ছোটখাট অপরাধ করব বলে ঠিক করিনি। দেখি আপনার ক্রেডিট কার্ডটা আমার হাতে দিন তো।"

অন্য কি ধরনের অপরাধ করা সম্ভব? আমি ছাড়া আর কেউ তো আমার ক্রেডিট কার্ড থেকে ডলার খরচ করতে পারবে না। সেই কার্ড কি করে ছুড়ে ফেলে দেওয়া যায়?"

"সে আমি বুঝব।" রেক্স মাথা নাড়ে। "আপনার ইউনিভার্সাল ক্রেডিট কার্ড আমাকে দিন।" সে পকেটের বন্দুকটা আরেকবার নেড়ে নিল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক ভেতরের পকেট থেকে একটা সুন্দর ব্যাগ বার করে তার মধ্য থেকে কার্ডটা বের করে ওর হাতে দিল।

"আপনার কাছে কোনো স্বয়ংক্রিয় ভেলিভারী বাক্স আছে নাকি, আরে এই তো একটা। বেশ বড় তো। যে

আপনার ইউনি কার্ডটা আমাকে দিন তো

কোন মাপের জিনিসই এতে করে আনিয়ে নেওয়া যাবে।"

ভ্যাসিলি বললেন, "তুমি একটা হাঁদারাম। পুলিশের লোক এখনই তোমার পেছনে লাগবে।

মোরান একটু হেসে বাক্সটার সামনে বসল। তারপর ক্রেডিট-কার্ডটা টিভির পর্দার খাঁজে ঢুকিয়ে জানতে চাইল, "তহবিলে অবশিষ্ট কত ডলায় আছে ?"

একটা যান্ত্রিক গলায় উত্তর এল, "হস্তান্তর অযোগ্য মূলের দশটি শেয়ার। পরিবর্তনশীল মূলের শেয়ার রয়েছে দুই হাজার ছেচল্লিশটি। আর নগদ তহবিলে রয়েছে বিয়াল্লিশ হাজার ঊনত্রিশ ডলার এবং আঠার সেন্ট।" মোরান আনন্দে চীৎকার করে উঠ্‌ল, "এত টাকা !"

এবারে সে ফোন করল আলট্রা মারকেটে। একটা 38 স্বয়ংক্রিয় বন্দুক এবং এক বাক্স কার্তুজের আদেশ দিল। তারপর পছন্দ করল একটা পোলারয়েড পেনটাক্স ক্যামেরা আর কিছু ফিল্ম।

"আপনার বেশ কিছু টাকার শ্রাদ্ধ করে ফেললাম।" কথাচ্ছলে বৃদ্ধ ভদ্রলোককে বলল মোরান।

"কোনো শ্রাদ্ধ করার ক্ষমতা তোমার নেই। কর্তৃপক্ষকে যখনই তোমার এই চুরির কথা জানাব তখনই আমার তহবিলে চুরি করা সব টাকাই ফেরৎ চলে আসবে ক্ষতিপূরণ হিসেবে।" বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্রচণ্ড রেগে গেছেন।

মোরান চুপচাপ ফোন করে নতুন জামাকাপড় এবং জুতোর আদেশ দিল। তারপর খানিকটা ভেবে নিয়ে দুটো হীরের আংটি আর খানিকটা দড়ি পাঠানোর নির্দেশ দিল।

সবশেষ করে ভ্যাসিলির দিকে তাকিয়ে বলল, "একটু উঠে আসুন তো মশাই ; এই আদেশ দেওয়ার পর্দায় বুড়ো আঙ্গুলের ছাপটা দিন তো।"

"যদি না দিই ?"

মোরান যেন খুব অবাক হ'ল। "সে কি ! কেন ছাপ দেবেন না ? আপনিই তো বললেন আপনার কোন ক্ষতি নেই। সবই ফেরৎ পাবেন। আপনার আপত্তি কিসের ?" বৃদ্ধ আর কি করেন ? উঠে এসে পর্দার উপর ডানহাতের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপটা দিলেন।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব জিনিসগুলো এসে পৌঁছে গেল।

মোরান নতুন জামাকাপড়টা পরে নিয়ে ক্যামেরাটা কাঁধে ঝোলাল। বন্দুকে গুলি ভরে কোটের পকেটে রাখল হীরের আংটি দুটো অন্য পকেটে চালান করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর দড়ি দিয়ে বুড়োকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখতে রাখতে বলল, "আরও কিছু কেনার ইচ্ছে ছিল।

একসঙ্গে এত নিলে কম্পুটারের সন্দেহ হ'ত তাই নিলামনা।"

ভ্যাসিলি রাগ চাপতে পারল না। বলল, "ব্যাটা চোর এক্ষুনি ধরা পড়বি পুলিশের হাতে।"

মোরান হেসে বলল, "রাগেন কেন? চাকরটা এখনই আসবে।"

রাস্তায় বেরিয়ে সে ঠিক করল পরবর্তী জায়গায় সে হেঁটেই যাবে। পকেটে বা কার্ডে কিছুই অবশিষ্ট নাই। জায়গাটাও খুব দূর নয়। খেলনা বন্দুকের আর দরকার না থাকায় রাস্তায় ফেলে দিল সেটাকে। গন্তব্যস্থানে পৌঁছে একটা ছোট্ট কেনাবেচার দোকান খুঁজে বের করল। এ ধরনের দোকান আর থাকবে না ভবিষ্যতে।

"আপনার জন্য কি করতে পারি?" একজন পঞ্চাশোর্ধ প্রৌঢ় পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল রেক্স কে।

সে যেন কত লজ্জা পাচ্ছে এই ভাবে বলল, "শুনে ছিলাম আপনারা ব্যক্তিগত জিনিসপত্র কেনেন।"

"ঠিক শুনেছেন! কিনি আবার বিক্রীও করি।" আপনার নাম?"

"টিমথি অ্যাডাস," মোরান নিজের নাম বলল। "আমার মায়ের একটা হীরের আংটি ছিল। আমার কাছে এটার কোনো দাম নেই। তাই ভাবছিলাম,...আচ্ছা কত ডলার হতে পারে এর দাম?"

"তাহলে একটু বসতে হবে। যদিও এখন হীরের প্রচলন খুব কম, তাহলেও পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।"

মোরান চেয়ারে বসে পকেট থেকে একটা হীরের আংটি বের করে দিল। জহুরী ভদ্রলোক হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে বলল, "একেবারে নতুন ধরনের কাজ। আমি ভেবেছিলাম পুরোনো ধাঁচের জিনিস রেখে গেছেন আপনার মা।"

"আরে না না; মা মারা যাওয়ার বেশী আগে কেনা নয়। আমার বৌ বা অন্য কেউ থাকলে তাকেই দিতাম। কিন্তু তেমন কেউ তো নেই।"

"দেখুন মিঃ অ্যাডমস্! এখানে দু'নম্বরী কাজ কারবার হয় না।

"দু'নম্বরী বলতে?" রেক্স বোকার মত প্রশ্ন করে?

আমি চোরাই মাল রাখিনা। আপনার মা জিনিসটা কোথায় কিনেছিলেন।"

"ইউরো-এশিয়ায় ছুটি কাটাতে গিয়ে কিনেছিলেন। মনে হয় বুদাপেষ্ট কিংবা বেলগ্রেড।"

"তার মানে আমেরিকায় এর খোঁজ পাওয়া যাবে না।

দোকানের মালিক ভদ্রলোক একটা আতশ কাঁচ বের করে আংটিটা পরীক্ষা করে ফেরৎ দিতে দিতে বলেন, "শ' দুয়েক ডলার দেওয়া যেতে পারে এটার জন্য।"

"মাত্র দু'শো। মার কাছে শুনেছিলাম এটার দাম দু' হাজার ডলারের বেশী।"

"তাহলে তিনি ঠকেছিলেন। তাছাড়া হীরের অলংকার

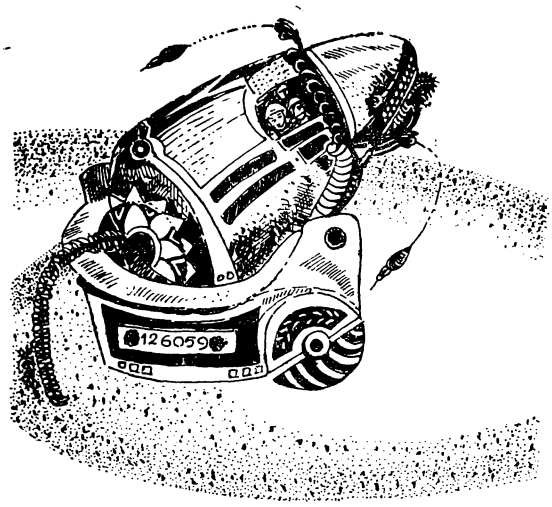

একটা গাড়ি ধরে শূন্য পথে শহরতলীর কাছে এল।

কম লোকে কেনে। অনেকদিন পড়ে থাকবে।"

শেষ যুক্তিটা যেন মোরানের মনে ধরল। সে বলল, ঠিক আছে তিনশ' ডলার দিন।"

দোকানদার রাজী হতেই মোরান নিজের ইউনি ক্রেডিট কার্ড বার করে বিনিময় যন্ত্রের পর্দার খাঁজে রাখল। দোকানদার ভদ্রলোকও তার ইউনি ক্রেডিট কার্ড বিনিময় যন্ত্রের পর্দার খাঁজে রেখে যন্ত্রকে নির্দেশ দিল, "দয়া করে আমার তহবিল থেকে তিনশ ডলার এই কার্ডে স্থানান্তরিত করে দিন।" একটি যান্ত্রিক স্বর ভেসে এল, "স্থানান্তরিত করা হয়ে গেছে।" রেক্স মোরান কার্ডটা পকেটে রাখতে রাখতে বলল "খুব ঠকে গেলাম।"

দোকানদার কোন কথা না বলে তার চলে যাওয়ার রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল।

রাস্তায় বেরিয়ে মোরান দ্রুত একটা ভাসামান যান পরিবহন আড্ডায় এল। এখন কার্ডে তিনশ ডলার আছে এবং জায়গাটা তাড়াতাড়ি ছাড়া দরকার। একটা গাড়ি ধরে শূন্য পথে শহরতলির কাছে এল। জায়গাটায় অনেক খাবারের দোকান আছে। বেলা প্রায় দুপুর কিন্তু সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। হাতেও বেশ কিছু ডলার জমা পড়েছে। অতএব একটা স্বয়ংক্রিয় ক্যাফেটেরিয়ায় ঢুকে ক্রেডিট কার্ডটা টেবিলের নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে ডানহাতের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে মুর্গীর রোস্ট আর পানীয়ের অর্ডার দিল।

একটু পরেই তার কব্জিতে লাগানো টিভি ফোন শব্দ করতে থাকল। সে একটু অবাকই হ'ল। তার এই কব্জি টিভি ফোনের নম্বর মাত্র দু'জন জানে। তাদের কেউই এখন ফোন করবে না। একটি অপরিচিত মুখ পর্দায় ভেসে উঠল। অপরিচিত গলার স্বর বলে উঠল, "আমি পুলিশের তরফ থেকে বলছি। রেক্স মোরান, ইউনি ক্রেডির কার্ডের

ব্যবহারের নিয়ম ভাঙ্গার জন্য আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল' আপনি যদি অপরাধের মাত্রা বাড়াতে না চান তাহলে নিকট বর্তী থানায় হাজিরা দিন এই মুহূর্তে।"

"যা বাবা ; এ আবার কি ঝামেলা।" সে যন্ত্রটা বন্ধ করে দিল। এত তাড়াতাড়ি এমন কি ঘটল যে পুলিশে তাড়া করতে শুরু করল। আংটির দোকানে কিছু ঘটল কি ? তাই বা কি করে হবে ? যদি কেউ আংটিটা কেনেও তাহলেও তো কম্পুটারে তার ক্রেডিট কার্ডের খোঁজ হওয়ার কারণ নেই।

তাহলে বোধ হয় বুড়ো ভ্যাসিলি পুলিশকে জানাতে এক মুহূর্তও দেরী করেনি। আংটির কথাও বলেছে। পুলিশ খোঁজ নিয়েছে আংটি দুটো কোথায় বিক্রী হতে পারে। তারপর কম্পুটারের মাধ্যমে ডলার বদল করার সময় তার নাম নথিভুক্ত হয়েছে।

কি করা যায়। আর তো এই ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা যাবে না। কম্পুটারে গতিবিধি ধরা পড়বে তাহলে। সে বিরক্তিতে হাতের টিভি ফোনটা খুলে ফেলতে চাইল। ঠিক এমন সময় পর্দায় আলো জ্বলে উঠ্‌ল। একটা নূতন মুখ ঘোষণা করছিল, "সমস্ত নাগরিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। রেক্স মোরান নামে সশস্ত্র এই লোকটি ডাকাতি, মারধোর, চোরাই মাল বিক্রী এবং ইউনি-ক্রেডিট-কার্ডের অপব্যবহার প্রভৃতি অপরাধ করেছে। সবাই যেন তাকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে সাহায্যে করে।"—তারপর পর্দায় রেক্সের অনেক পুরোনো একটা ছবি ভেসে উঠ্‌ল। খানিকটা বাঁচোয়া কারণ মুখের এখনকার কাটা দাগগুলো সে ফটোতে ছিল না। কব্জির যন্ত্রটাকে এক কোণে ছুড়ে ফেলেই সে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে পড়ল রেষ্টুরাণ্ট থেকে। দূর থেকে একটা সাইরেনের আওয়াজ শোনা গেল। কোনো গাড়ি কিংবা শূন্যযান ব্যবহার করা যাবে না। তাহলেই কম্পুটার গতিবিধি রেকর্ড করে ফেলবে অতএব অন্যবুদ্ধি বার করতে হ'ল।

সে রাস্তার একটা নির্জন জায়গা দেখে দাঁড়িয়ে যেন কোন লোকের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। অল্পসময় পরেই একটি লোক এল। রেক্স পকেট থেকে বন্দুকটা বার করে বলল, "এই যে ভায়া, একটু দাঁড়ান তো।"

লোকটি একবার বন্দুক, আরেকবার রেক্সের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আরে একটু আগেই আপনাকে টিভিতে দেখালো না।"

"ঠিক বলেছেন। আর আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি আমার সঙ্গে অসহযোগিতা করবেন না।"

লোকটার চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। ভয় পেয়ে বলে বসল, "সে তো বটেই ; সে তো বটেই।"

"তাহলে চট করে কব্জি-টিভি ফোনে ডায়াল করে একটা ভাসমান যান আনান তো।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, কোনো ভয় নেই," লোকটা আশ্বাস দিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই একটা ভাসমান যান এসে হাজির। কাছে আসতেই স্বয়ংক্রিয় দরজা খুলে গেল। রেক্স আদেশ করল, "জল্‌দি আপনার ইউনি-ক্রেডিট কার্ডটা গাড়ির টিভির পর্দার খাঁজে রাখুন ! তারপর আপনার ডান-হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপটা পর্দার ওপরে রাখুন।" লোকটা আদেশ পালন করতেই রেক্স তার গন্তব্যস্থান নির্দেশ করে বোতাম টিপল। অবশ্য লোকটাকে জানতে দিল না। তারপর ইউনি-ক্রেডিট-কার্ড যা ফিরিয়ে দিয়ে লোকটার কব্জি থেকে হাঁচকা টানে টিভি ফোনটা ছিনিয়ে নিয়ে পকেটে রাখল। এবারে গাড়ির দরজা বন্ধ করতেই গাড়ি চলতে শুরু করল। রেক্স গাড়ির নিয়ন্ত্রণ পর্দায় মুখ রেখে বলল, 'যতটা সম্ভব বেশি গতি তোলা যাবে—ততটা জোরে চলুন দয়া করে।"

একটা যান্ত্রিকগলা উত্তর দিল, "ঠিক আছে, চেষ্টা করছি।"

রেক্স মোরান কিন্তু বেশিক্ষণ শূন্য যানে থাকতে পারল না। ও জানে শেষের লোকটা পুলিশকে খবর দিলেই পুলিশ কম্পুটারে খোঁজ নেবে লোকটার কার্ডে কোন গাড়ি সর্বশেষ ডাকা হয়েছে এবং সেই গাড়ির কোথায় যাওয়ার জন্য বোতাম টেপা হয়েছে। সবকিছু কম্পুটারে রেকর্ড হয়ে যায়।

অতএব মাঝ রাস্তায় লাল আলোতে গাড়ি দাঁড়াতেই সে নেমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। আর গাড়ি তার গন্তব্য পথে চলতে থাকল আপনমনে। মোরানের সামনে এখন দুটো সমস্যা। প্রথমতঃ সকালে ভাল করে খেতে পারেনি —সেটা সারতে হবে। দ্বিতীয়তঃ লোকজনের সামনে থেকে সরে থাকতে হবে। সবাই না দেখলেও কেউ কেউ টিভি পর্দায় তার ছবি এবং বিবরণ দেখতে পারে। হঠাৎ পকেটে শেষ লোকটার কাছ থেকে ছিনতাই করা কব্জি টিভিতে আওয়াজ শোনা গেল। তাড়াতাড়ি বের করে ছোট্ট একটা বোতাম টিপে নিজের ছবি যাতে দেখা না যায় তার ব্যবস্থা করল। এবং শুনল তার সর্বশেষ অপরাধ সম্পর্কে জানানো হচ্ছে। লোকটা তাহলে পুলিশকে বলেছে। এখন মুস্কিল করবে টিভিটা। এটার বর্তমান অবস্থান টের পাওয়া পুলিশের কাছে কিছু ব্যাপার নয়। অতএব সেটাকে মাটিতে রেখে পা দিয়ে চাপ দিয়ে নষ্ট করে ফেলল মোরান।

হঠাৎ-ই নজরে পড়ল একটা রেষ্টুর‍্যাণ্ট। বড়লোকেরাই যায়। অনেক দিনের সাধ ছিল মোরানের ওখানে ঢোকার। পয়সার অভাবে পারেনি। আজকের ব্যাপার আলাদা। অঙ্গে দামী জামাকাপড়, ক্যামেরা কাঁধে ঢুকে পড়ল ভেতরে। এক-জন পরিচারক এগিয়ে এল। এরা আবার জ্যান্ত পরিচারক রাখে নাকি ? কোণার দিকে নিভৃতে একটা টেবিলে বসে জীবনের সাধ মিটিয়ে দামী দামী খাবার নিয়ে আসতে বলল। সেই ফাঁকে ক্যামেরা বের করে ভ্যাসিলির কাছ থেকে পাওয়া

ইউনি-ক্রেডিট-কার্ডটার ছবি তুলতে শুরু করল। বিশেষ করে বুড়ো আঙ্গুলের ছাপটার। ওটা খুব দরকারি। প্রথম বার বোতাম টেপার পর ক্যামেরা থেকে যে ছবিটা বেরোল সেটা ঠিক হুবহু এক হয়নি। তাই গোটা ছয়েক ছবি তোলার পর মনে হ'ল ওতে কাজ চালানো যাবে। পকেট থেকে ছুরি বার করে বুড়ো আঙ্গুলের ছাপটাকে নিখুঁত ভাবে আলাদা করে নিল।

পরিচারক খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল। খাবার যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে রেক্স খুবই ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়াল, দ্রুত পায়ে রিসেপসন্ কাউন্টারে ক্যাশিয়ারের কাছে এসে বলল, "আমার হঠাৎ একটা জরুরী প্রয়োজনের কথা মনে পড়েছে। এক্ষুনি না গেলেই নয়। খুবই অল্প সময় লাগবে। আমার দামী ক্যামেরাটা রেখে যাচ্ছি। টেবিলটায় যেন কেউ না বসে। আর পানীয় যেটা বললাম—দিয়ে দিন টেবিলে। আমি এই আসলাম বলে।"

ক্যামেরাটা বোধ হয় জামিন হিসেবে কাজ করল। পরিচারক মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, "নিশ্চয়ই স্যার।"

দরজা দিয়ে বেরিয়ে খানিকটা হেঁটে এল রেক্স তারপর চোখে ময়লা পড়েছে এমন ভাবে রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে কিছুটা দূরের এক অভিজাত হোটেলে ঢুকে পড়ল মুখখানা রুমালে আধখানা ঢাকা। রিসেপসনে গিয়ে বলল, "একটা ছোট স্যুট পাওয়া যাবে? একটা শোবার ঘর, একটা বসার ঘর আর বাথরুম থাকলেই হবে।"

"নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আপনার মালপত্র?"

"মালপত্র কিছু নেই। এই সবে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এসেছি কিছু জামা কাপড় ইত্যাদি কেনার জন্য। ওখানকার ছাঁটকাট আমার ঠিক পছন্দ হয় না।

"ঠিক আছে। আপনি কি নামধাম লিখবেন খাতায়?"

"আগে ঘরটা দেখি। পছন্দ হলেই ও সব করা যাবে।"

রেক্স ঝামেলা এড়িয়ে গেল।

"পছন্দ হবেই। আপনার ঘরের নম্বর ডবল্-এ'।"

রেক্স মোরান নম্বরটা একবার আউড়ে নিল। লিফটে উঠে পর্দার দিকে তাকিয়ে বলল, "ঘরের নম্বর ডবল্-এ।"

একটা যান্ত্রিক শব্দ শোনা গেল, "যে আজ্ঞে মহাশয়।"

বেশ কয়েকতলা উপরে উঠে লিফট্ থামল। সামনেই স্যুটটা বিশাল, দুটো ঘর বাথরুম। সব মিলিয়ে চমৎকার। এমন ঘরে আগে কখোনো থাকেনি মোরান। মনের আরেক ইচ্ছা পূরণ হ'ল। ঘরের টিভি ফোনের পর্দায় মুখ দিয়ে বলল, "স্যুটটা খারাপ না। কাজ চলে যাবে। এটাই নিলাম।"

"খুব ভাল কথা, স্যার। এবার দয়া করে আপনার ইউনি-ক্রেডিট-কার্ডটা টিভি পর্দার খাঁজে ঢুকিয়ে দিন।"

চরম মুহূর্ত। রেক্স মোরান গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভ্যাসিলির কার্ডটা বের করল। তারপর সেটাকে ঢুকিয়ে দিল যথাস্থানে। তারপর ভাসিলির ডানহাতের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপের ফটোটা রাখল পর্দায়, এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় তুলে নিল। একটা যান্ত্রিক স্বর ভেসে এল, "ধন্যবাদ।"

মোরান অনেকটা নিশ্বাস নিল—এতে কাজ হয়েছে।

রেক্স মোরান ফোন করে জানল যে তখন দুপুর প্রায় পার হতে চলেছে। প্রাণখুলে হাসল সে। তারপর তার একটু পান করার ইচ্ছে হ'ল। স্বয়ংক্রিয় পানীয়ের দোকানে ফোন করে আশ মিটিয়ে দামী দামী মদ আনিয়ে নিল। গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে ভাবল কি কি সাধ তার মেটানো বাকী আছে। পুলিশ যে কোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে। সময় কম।

ফোন করে নানা রকম দামী খাবার আনিয়ে নিল। কিছু কিছু খাবারের শুধু নামই শুনেছে জীবনে। প্রাণভরে খেয়ে আবার পানীয় নিয়ে বসল। এইভাবে যখন রাতের খাওয়ার সময় এল তখন তার আর ক্ষিদে ছিল না। সেদিনের শেষ যা মনে আছে তা হ'ল ভীষণ নরম বিছানায় নিজেকে তলিয়ে দেওয়ার স্মৃতি।

পানীয়গুলো এত দামী আর ভাল যে এত খেয়েও শরীরে কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি। মড়ার মত ঘুমিয়ে ছিল সে। টিভি ফোনে ক'টা বাজে জেনে নিয়ে প্রাতঃরাশের হুকুম দিল। খাদ্য যতটা ভাল হতে পারে এবং যথেষ্ট পরিমাণে। খাওয়া হলে দাড়ি কাটা ও স্নান সেরে তৈরি হয়ে নিল। তারপর আগের পদ্ধতিতে টিভি ফোন মারফৎ আলট্রা বাজার থেকে জামা কাপড় ছাড়াও নানা জিনিস আনিয়ে নিল। সেই ভ্যাসিলির ইউনি-ক্রেডিট কার্ড এবং তার বুড়ো অঙ্গুলের ছাপের ছবি ব্যবহার করল। সব পৌঁছে গেলে গুছিয়ে নিয়ে ফোন করল গাড়ির জন্য। এবার হোটেল থেকে বেরোতে হবে।

ঠিক দশটা দশমিনিটে তার ঘরের দরজার পরিচয় জ্ঞাপক পর্দায় দুটি মুখ ভেসে উঠ্‌ল। তার মধ্যে একজনের পরনে পুলিশের পোষাক।

তারা ঘরে ঢুকে দেখল চারিদিকে নতুন কেনা জিনিস-গুলো গোছানো অবস্থায় পড়ে আছে। পোষাক পরা পুলিশটি অবাক হয়ে বলল, "কি সর্বনাশ!"

লিফট্ ধরে নিচে নেমে মোরানকে তোলা হ'ল পুলিশের গাড়িতে। সাদা পোষাক পরা পুলিশ মোরানকে জিজ্ঞেস করল, "মনে হচ্ছে তুমি এই পুরো একদিন জীবনকে উপভোগ করেছ।"

মোরান প্রাণখুলে হাসল আরেক বার।

"খুব মজা লাগছে, তাই না? সাদা পোষাক মন্তব্য করে, "গতকাল সকালে ছোট স্বয়ংক্রিয় কাফেতেই ধরে ফেলতাম তোমাকে। টিভি ফোনের মাধ্যমে তোমাকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টাটা ভুল হয়েছে। আমাদের উচিৎ ছিল তোমার ক্রেডিট-টিভির-ফোনের অবস্থান ও গতিবিধি কম্পুটারের মাধ্যমে জেনে তোমাকে অনুসরণ করতে করতে ধরে ফেলা। তাহলে এত দেরি হ'ত না।"

"আমিও বুঝে পাচ্ছিলাম না তোমরা তা কেন করনি।" মোরান অবাক হয়। "পুলিশের অপদার্থতা।" পুলিশ তাকে নিয়ে যায় পুলিশের সদর দপ্তরে। তারপর তাকে দাঁড় করিয়ে দেয় স্বয়ং মারভিন রুথলিনের সামনে।

রুথলিন তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, "তুমি দোকানে একটা ভাসমান-স্পোর্টস কার কেন চেয়েছিল? ব্যাপারটা হাস্যকর।"

রেক্স মোরান অল্প হেসে চেয়ারে বসে। পোষাক পরা পুলিশটি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেও, সাদা পোষাকের লোকটি চেয়ারে বসে পড়ে। তার মুখও বড় কর্তার মত বিরক্তিতে বোঝাই।

মারভিন রুথলিন বলতে থাকে, "ভ্যাসিলি এই ব্যাপার নিয়ে কতদূর অব্দি যেতে পারে বলে তোমার ধারণা?" রেক্স মোরান একটু চিন্তা করে উত্তর দেয়, "আসলে কি ঘটেছে তা ওকে না বলাই ভাল। লোকটা কিছু ক্ষতি করতে চায়নি। খানিকটা উত্তেজিত হয়েছিল আর কি?"

"খানিকটা উত্তেজনা কি বলছ। যদি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেত তাহলে কি হ'ত? আর যে লোকটাকে বন্দুক দেখিয়ে রাস্তার মাঝে থামিয়ে তোমার জন্য গাড়ির হুকুম দিতে বলেছিলে—তার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।"

"সেটাতো তোমাদের খাতিরেই। তোমরা প্রমাণ চেয়েছিলে, আমি সেই প্রমাণ রাস্তায় রেখে গিয়েছিলাম।"

"প্রমাণ!" সাদাপোষাক পরা লোকটি বিরক্তি চাপতে পারে না। "আমার মনে হয় ঐ টিভিতে পুলিশের প্রচার ব্যাপারটার দফা রফা করা উচিৎ, আর না হ'লে এর পরের বার যখন রেক্স এই সব কাজ করতে নামবে তখন রাস্তাতেই কেউ ওকে গুলি করে মেরে ফেলবে।"

রুথলিন মোরানকে জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা? এই তোমার অপরাধ। আমাদের ধরতে দেরি করা—এসব সম্পর্কে তোমার মতামত কি?"

"দেখুন, এই ক্রেডিট-কার্ডগুলো সম্পর্কে আরও সাবধানতা অবলম্বন করা উচিৎ। বুড়ো আঙ্গুলের ছাপটা যে আসল সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিৎ। না হ'লে কোন সত্যিকারের বদমাশ লোক আত্মীয়-স্বজন-হীন কোনো ধনী লোককে খুঁজে বের করবে। তারপর তাকে গুম করে কোথাও নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে এবং দেহটা লুকিয়ে ফেলবে। তারপর তার ইউনি-ক্রেডিট-কার্ডখানা করায়ত্ত করে দেশের অন্য দিকে পালিয়ে যাবে। সেখানে সে আমার পদ্ধতি অবলম্বন করবে। বুড়ো আঙ্গুলের ছাপটার ফটো তুলে একটা নকল ছাপ তৈরি করে নেবে। তার সাহায্যে সারা জীবন ধরে মৃত লোকটির তহবিলে পরিবর্তন যোগ্য মূলের ওপর যা লভ্যাংশ জমবে সেটা ভোগ করবে।"

মারভিন রুথলিন তার দিকে তির্যকভাবে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, "ক্রেডিট-কার্ডগুলোর কি ব্যবস্থা আমরা করতে পারি?"

"তা আমি কি বলব? ও সব প্রযুক্তিবিদ্‌দের ভাবনার বিষয়। তা সে পর্দাতেই হোক আর কার্ডেই হোক—শরীরের উত্তাপ পরিমাপ করার একটা ব্যবস্থা থাকা উচিৎ। কি হবে তা জানিনা, তবে আমি প্রমাণ করে দিয়েছি যে এই কার্ডগুলো নিখুঁত নয়।"

"আর কি কি উপদেশ তুমি দিতে পার?" রেক্স মোরান খানিকটা ভেবে নিল। তারপর মাথা নেড়ে বলতে শুরু করল, "একটা কথা আমি ফ্রেডকে গাড়িতে করে আসার সময় বলেছি। ঐ যে একজন নাগরিককে নিজে নিজে নিকট বর্তী থানায় আত্মসমর্পন করতে বলার পদ্ধতি আছে—তা একেবারে অচল। এতে হয়ত বেশি লোক নিয়োগের দরকার হয় না, কিন্তু একজন সশস্ত্র বদমাস এতে ধরা দেবে না। তখন উচিৎ কোনো সাবধানবাণী না দিয়ে কব্জি টিভির অবস্থান কম্পুটারে জেনে নিয়ে আচমকা গ্রেপ্তার করা। অবশ্য যদি ধরে নেওয়া যায় যে লোকটা বোকার মত টিভি ফোন হাতেই বেঁধে রাখবে।"

সাদা পোষাকের পুলিশটা জানায়, "রেক্স এই কথাটা একদম খাঁটি বলেছে।"

মারভিন রুথলিন গভীর ভাবে নিঃশ্বাস ফেলল। "ঠিক আছে," সে স্বীকার করে, "বাজিটা তুমিই জিতেছ। তুমি পুলিশের নাগাল এড়িয়ে পুরো চব্বিশটা ঘণ্টা খুব স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরামে কাটিয়েছ। তহবিলে একটিও ডলার না থাকা সত্ত্বেও।" সে তার সহকর্মীর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আবার বলতে থাকে, "তবে আজ থেকে ছয়মাস পরে তুমি আবার এই রকম চব্বিশ ঘণ্টা গ্রেপ্তার এড়িয়ে থাকতে পারবে না। ততদিনে সব ত্রুটিগুলো শুধরে নিতে পারব বলে আশা রাখি।"

রেক্স মোরান তার দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর বলল, "সেটাও বাজি থাক তাহলে!"

অতিথি

প্রণব সেন

কালো মেঘের আড়াল থেকে
আলোর হাসি জড়িয়ে দিয়ে
আসছে ছুটে বিশাল যান
ভূতের মতো মানুষ নিয়ে :
অজানা এই দেশের থেকে
সাড়া দিয়েছে সংকেতে,
বাড়ির ছবি ভাসছে শুধু
কমপিউটারের অংকেতে।
ছুটে আসেন বন্ধু ঘোষাল
পৃথিবীর সেই বিজ্ঞানী,
অভিবাদন জানান হেসে
জ্ঞানের আলোর সন্ধানী।

নির্বাচিত প্রবন্ধ—1

সুবিরল ঘটনা—সুপারনোভা

রমাতোষ সরকার

আকাশের আঙিনায় কি ঘটছে, না-ঘটছে সে-সম্পর্কে যাঁরা কমবেশি খোঁজখবর রাখেন, তাঁরাও অনেকেই জানেন না গত ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশে কি এক ঘটনা ঘটেছে। সঠিক ভাবে বলতে গেলে, মহাকাশে ঘটনাটা ঘটেছে তার অনেক আগে—প্রায় এক লক্ষ সত্তর হাজার বছর আগে—কিন্তু খবরটা আলোর দ্বারা বাহিত হয়ে পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছে এই বছরে ফেব্রুয়ারির চতুর্থ সপ্তা'য়। যাঁরা খবরটা রাখেন তাঁদের মধ্যেও আবার সবাই যে তার সম্যক গুরুত্ব বোঝেন তা নয়। কিন্তু যাঁরা জানেন তাঁরা জানেন কি মূল্যবান তথ্যসম্পদ ঐ-ঘটনার সূত্রে বিজ্ঞানী-দের হস্তগত হতে পারে। আজ থেকে হাজার হাজার বছর পরেও অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী হয়তো বর্তমান বছরটিকে স্মরণ করবেন শুধু বিগত ফেব্রুয়ারির ঘটনাটির জন্যে, যেমন আজকের অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর আলাপ-আলোচনায় 1054 সনটি বারবার এসে পড়ে ঐ বছরের এক বিশেষ ঘটনার কারণে। 1054 সনে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে আরও অনেক কিছুই ঘটেছিল নিশ্চয়, কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিচারে, মহাজাগতিক পরিপ্রেক্ষিতে সে-সব তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে—অবিস্মরণীয় হয়ে আছে চীনদেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানী-দের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা এবং লিপিবদ্ধ করা ঐ বছরের অত্যাশ্চর্য এক আকাশীয় ঘটনা।

ফেব্রুয়ারির ঘটনাটা প্রথম লক্ষ্য এবং সনাক্ত করার কৃতিত্ব প্রধানত যাঁর প্রাপ্য, তাঁর নাম ইয়ান শেলটন (Ian Shelton)। ক্যানাডার টরণ্টো (Toronto) বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী, কিন্তু কাজ করছিলেন চিলির এক মানমন্দির থেকে। ঐ-মাসের 23-24 তারিখের রাতের আকাশের এক বিশেষ অংশের কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে গৃহীত দুটি আলোকচিত্র থেকে উনি বুঝতে পারেন যে একটি তারা উজ্জ্বলতর রূপ পরিগ্রহ করেছে। পরবর্তী বেশ কয়েক রাত ধরে এই ঔজ্জ্বল্যবৃদ্ধি দ্রুততর হল, 27 তারিখে হল উজ্জ্বলতম, তারপর শুরু হল ধীরে ধীরে তার ঔজ্জ্বল্য হ্রাস। গোটা ব্যাপারটা ওঁকে প্রত্যক্ষ করতে হয়নি - তার আগেই বুঝতে পারেন যে এক সুদুর্লভ ঘটনা ওঁর কাছে ধরা দিয়েছে। উনি সেকথা ঘোষণা করেন এবং দেখা যায় যে আরও কেউ কেউ ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছেন—কেউ কেউ খালি চোখেই। পরবর্তী ঘটনা-পরম্পরা ভারতসহ পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এখনও। ঠিক এমন সুযোগ আগে আর কখনও আসেনি—দূরবীন প্রভৃতি যন্ত্রপাতির সাহায্যে এত কাছ থেকে সুপারনোভা দেখা ওঁদের এই প্রথম। আবার কতদিন পরে যে দেখতে পেতে পারেন সে-কথা কেউ বলতে পারে না।

কিন্তু কি এই বস্তু—সুপারনোভা? সেটা বুঝতে হলে, 'সুপার'—আধিক্যসূচক এই ল্যাটিন উপসর্গটি ত্যাগ করে আগে 'নোভা' বস্তুটির সঙ্গে একটু পরিচয় করে নেওয়া ভাল।

নোভা শব্দটি আকাশের তারাদের প্রসঙ্গে প্রথম ব্যবহার করেন ডেনমার্কের এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহি (Tycho Brahi)। শুধু নোভা নয় অবশ্য—নোভা স্টেলা (Nova stella) অর্থাৎ নবতারা। সেই নামই পরে সংক্ষিপ্ত হয়ে নোভা হয়েছে। সে হল 1572 সালের কথা, দূরবীন আবিষ্কার হতে তখনও 36 বছর দেরী আছে। অন্য ব্যাপারে বিশেষ ব্যস্ত থাকার দরুন কয়েক রাত আকাশ লক্ষ্য না করে, টাইকো হঠাৎ এক সন্ধ্যায় ক্যাসিওপিয়া (Cassiopeia) মণ্ডলের মধ্যে একটি উজ্জ্বল তারাকে দেখতে পেলেন এবং বিস্ময়ে হতবাক হলেন। বলতে গেলে, আকাশ ছিল ওঁর নখদর্পণে। ক্যাসিওপিয়ার তারাগুলো, তাদের ঔজ্জ্বল্য এবং অবস্থান টাইকোর বেশ ভাল ভাবেই জানা ছিল। ও-তারাটি তো ওখানে ছিল না কোনকালে। বিশেষত অমন উজ্জ্বল—শুক্রগ্রহের চেয়ে বেশি উজ্জ্বল—এক তারা! না, অসম্ভব। তাহলে? আকাশে নতুন তারা দেখা দিয়েছে? তাই বা হয় কি করে? আগের যুগে জ্ঞানীগুণীরা, বিশেষ করে গ্রীসের মহাজ্ঞানী অ্যারিস্টট্‌ল তো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সে-সম্ভাবনার বিপক্ষে রায় দিয়েছেন। শুধু নিজের চোখের উপর ভরসা না-করে অন্য অনেককে দিয়ে যাচাই করে নিয়ে অবশেষে টাইকোকে কিন্তু সাব্যস্ত করতেই হল যে এক নতুন তারার আবির্ভাব ঘটেছে আকাশে, যে-তারাটির আচার-আচরণ সাবেকি তারাগুলোর মত নয়। তারাটি দারুণ উজ্জ্বলরূপে হঠাৎ দেখা দিয়ে, পরবর্তী কয়েক মাস ধরে ক্রমশ নিস্তেজ হতে হতে মাস পাঁচেক পরে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

টাইকোর মৃত্যুর 3 বছর পরে—1604 সালে—তাঁর শিষ্য জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী কেপলার (Kepler) আবার এক অনুরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। এবার ঘটনাস্থল আকাশের অন্য এক অঞ্চল—অফিউকাস (Ophiucus) মণ্ডল। অত অল্প সময়ের ব্যবধানে দু-দুবার অমন বিরল ঘটনাকে ঘটতে দেখা, এক অবিশ্বাস্য সৌভাগ্য বলা যেতে পারত। কিন্তু তা কিছুতেই বলা যায় না, বরং বলতে হয়, ইস্, কি দুর্ভাগ্য! কারণ, তখনও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সম্বল শুধু প্রকৃতিদত্ত দুই

চোখ, দূরবীন এল তার মাত্র 4 বছর পরে। অতএব একটি সুবর্ণসুযোগ অল্পের জন্য হাতছাড়া হয়ে গেল।

শুধু দূরবীন নয়, অতঃপর ক্রমে ক্রমে এল অনেক কলা-কৌশল, দক্ষতা ও তথ্যসম্ভার আর, বিরাট সুযোগ না-হলেও ছোটখাট সুযোগ আরও এল—ওগুলোর মত কাছে নয়, কিন্তু দূরে দূরে আরও কিছু অনুরূপ ঘটনা ঘটতে দেখা গেল। দূরবীন এবং ক্যামেরা প্রমাণ করল যে ওরা আক্ষরিক অর্থে নোভা বা নতুন তারা নয়। ওদের হঠাৎ জন্ম হয় না, হয় না অকস্মাৎ অকালমৃত্যু। ওরা চোখে ধরা দেবার আগে তো থাকেই, অনেক ক্ষেত্রে পরেও থাকে। মাঝের কিছুদিন ওরা অস্বাভাবিক দ্যুতিতে জ্বলে ওঠে, এটাই ওদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ওদের নাম বা নামের অংশ হিসাবে নোভা শব্দটা কিন্তু থেকেই গেল—ক্ষেত্রবিশেষে আর পাঁচটা সাধারণ তারা থেকে পার্থক্য সূচিত করতে ওদের এক পৃথক নামের প্রয়োজন ছিল। সাধারণভাবে নামের যেমন সার্থক হবার কোন বাধ্যবাধকতা নেই, কানা ছেলের নামও যেমন স্বচ্ছন্দে পদ্মলোচন হতে পারে, ওদের ক্ষেত্রেও তাই হল। নোভা শুধু নাম বা নামাংশ হয়ে রইল, অর্থপূর্ণ কিছু আর রইল না।

নোভা নামটি টিকে গেলেও, যে-তারার সূত্রে শব্দটি প্রথম আসে সেই টাইকোর তারা বা টাইকো-শিষ্য কেপলারের তারাকে এখন আর কেউ নোভা বলেন না কিন্তু। আধুনিক নামকরণে ওরা এখন হয়েছে সুপারনোভা। 1934 সালে সুইস-মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রিৎস ৎসুইকি (**Fritz Zwicky**) এই নামটি উদ্‌ভাবন করেন। বাহ্যিক বিচারে, সুপারনোভারা নোভাদের বৃহত্তর সংস্করণ। কিন্তু অভ্যন্তর বা মূলগত পার্থক্যও আছে।

নোভাদের মধ্যে খুঁটিনাটিতে বৈচিত্র্য বা পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু মোটের উপর কতকগুলো মিল দেখা যায়। দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের ঔজ্জ্বল্য হঠাৎ দু-এক দিনের ব্যবধানে—আরও কয়েকটা দিন বেশিও হয়তো বা হতে পারে—কম বেশি লক্ষগুণ বৃদ্ধি পায়। সূর্য ছাড়া অন্য সব তারা আমাদের কাছ থেকে এত দূরে আছে আর অল্প দু-চারটি বাদে বাকিগুলো সব এত এত দূরে যে, চোখে দেখে—খালি চোখে বা দূরবীনযুক্ত চোখে - ব্যাপারটার ঠিকমত আঁচ সাধারণত পাওয়া যায় না, যদিও আশপাশের তারাদের তুলনায় বা ঐ তারাটিরই পূর্বাবস্থার তুলনায় যে উজ্জ্বলতর হয়েছে সেটা বোঝা যায় ঠিকই। পরিমাণগত পরিবর্তনটা যথাযথ ভাবে বোঝা যায় মাপ জোক করে। অর্থাৎ তারাটির প্রকৃত দূরত্ব নির্ণয় করে, তার আপাত (**apparent**) ঔজ্জ্বল্য নির্ধারণ করে, আর তারপর এক বিশেষ সুনির্বাচিত দূরত্বে—32·6 আলোক বর্ষ দূরত্বে—থাকলে তার ঔজ্জ্বল্য কত প্রতীয়মান হবে সেটা নিরূপন করে। নোভাদের প্রায় লক্ষ্যগুণ উজ্জ্বলতর হয়ে যাওয়ার অদ্ভূত ব্যাপারটা এই ভাবেই বোঝা গেছে। প্রায় দপ্ করে জ্বলে ওঠার পর নোভাদের জীবনে আসে উল্‌টো যাত্রা, অন্য এক ছন্দে। 7 থেকে 70 দিনের মধ্যে ঔজ্জ্বল্য কমে প্রায় এক তৃতীয়াংশে পৌঁছয়, তারপর আরও আরও কম। কিন্তু ধীরে ধীরে পূর্ব ঔজ্জ্বল্যে বা তার কাছাকাছি পৌঁছতে কয়েক মাস বা কয়েক বছর পর্যন্ত লেগে যেতে পারে। সেই মত নোভাদের বলা হয় দ্রুত নোভা (**fast nova**) বা মন্থর নোভা (**Slow nova**)।

সুপার নোভাদের ব্যাপারটা আরও অনেক লোমহর্ষক। এতে তারাটি যখন তার ঔজ্জ্বল্যের শিখরে পৌঁছয় তখন তার দ্যুতি কম পক্ষেও 3 কোটিগুণ বৃদ্ধি পায়। সুপার নোভারা সত্যিই অসাধারণ।

সাধারণ অসাধারণ মিলিয়ে মহাকাশে সংখ্যাহীন তারা আছে। কিন্তু ওরা সর্বত্র সমান ভাবে ছড়িয়ে নেই, আছে ফাঁক ফাঁক দিয়ে, স্থানে স্থানে জোট বেঁধে। এক একটি জোট হচ্ছে এক-একটি ব্রহ্মাণ্ড (**galaxy**)। ঐ রকম একটি জোটের মধ্যে আছে আমাদের সূর্য, যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে আমাদের পৃথিবী, আমাদের খালি চোখে দেখা যত তারা এবং আরও অনেক বেশি—সংখ্যায় মোট প্রায় 10 হাজার কোটি তারা। এটিকে বলা হয় 'আমাদের ব্রহ্মাণ্ড' (**Our Galaxy**)! এর দূরতম তারাটি আছে আমাদের কাছ থেকে ঊর্ধ্বপক্ষে প্রায় ৫0 হাজার আলোকবর্ষ দূরে। কিন্তু আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ব্রহ্মাণ্ড যেটি, নাম তার 'বৃহৎ মাগেলানীয় মেঘ' (**Large Magellanic cloud**), সেটির যে কোন একটি তারা আছে আমাদের কাছ থেকে দ্বিগুনেরও বেশি দূরত্বে প্রায় 1,70,000 আলোকবর্ষ দূরত্বে। তবু তো এটি খুব কাছে আছে—এত কাছে যে, আন্তর্ব্রহ্মাণ্ড দূরত্বের বিচারে এই ব্রহ্মাণ্ডটি ব্যতিক্রম বলে গণ্য। সুপরিচিত 'অ্যান্ড্রোমিডা ব্রহ্মাণ্ড' (**Andromeda Galaxy**) আছে প্রায় 22 লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে। এখনকার সব চেয়ে শক্তিশালী দূরবীনের কাছে ধরা দিয়েছে এমন কয়েকটি ব্রহ্মাণ্ডের দূরত্ব হচ্ছে 97 কোটি আলোকবর্ষের মত। নিশ্চয় আরও দূরে দূরেও আছে।

আমাদের ব্রহ্মাণ্ডে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের জ্ঞাতসারে সম্ভবত 4টি সুপারনোভার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। দুঃখের বিষয় সেগুলোর বার্তা যখন পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় 1006, 1054, 1572 আর 1604 সালে তখন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলেন। না-ছিল দূরবীন, না-ছিল প্রাসঙ্গিক বা প্রয়োজনীয় কোন জ্ঞান। শেষ দুটিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন যথাক্রমে টাইকো ব্রাহি এবং কেপলার, আর প্রথম দুটি অজ্ঞাতনামা চৈনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা—হয়তে বা জাপানী এবং আরবী জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও। এদের মধ্যে দ্বিতীয়টির সুন্দর বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায় সমকালীন চীনা সাহিত্যে। বোঝা যায় যে, আমাদের হিসাবে 1054 সালের জুলাই মাসের গোড়ার দিকে—সম্ভবত 4ঠা তারিখে চীনা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বৃষরাশি (**Taurus**)-র মধ্যে অকস্মাৎ একটি উজ্জ্বল, নতুন

তারা লক্ষ্য করেন। তারাটির রূপ তখন হয়েছিল রাতের আকাশের অন্য যে কোন তারার চেয়ে উজ্জ্বলতর, এমন কি চাঁদকে বাদ দিলে যা উজ্জ্বলতম বলে পরিগণিত হয়ে থাকে সেই শুক্রগ্রহের চেয়ে 2-3 গুণ উজ্জ্বলতর। অন্ধকার মাটিতে ওর দ্বারা সৃষ্ট ছায়া পর্যন্ত দেখা যেত, আর জ্যোতিষ্কটি স্বয়ং কিছুদিন দিনের আকাশেই পরিলক্ষিত হত। তখন সেটিকে প্রতিদিন দেখা যেত শেষ রাত থেকে পড়ন্ত বিকেল পর্যন্ত। এ-সব ব্যাপার ঘটেছে যখন তারাটি তার সর্বাধিক ঔজ্জ্বল্য লাভ করেছিল। অত উজ্জ্বল রূপ তারাটি অবশ্য খুব বেশি দিন ধরে থাকেনি, কিন্তু তবু সে যুগের দূরবীন ছাড়া চোখে তাকে দেখা গেছে মোট প্রায় 2 বছর ধরে। তারপর সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে গেছে। চীনা জ্যোতির্বিদদের ভাষায় ওটি ছিল এক 'অতিথি তারা' (**guest star**)। আধুনিক জ্যোতির্বিদ বলেন সুপারনোভা। তুলনামূলক বিচারে ওটি পৃথিবীর খুব কাছে ঘটেছিল। মাত্র 6500 আলোকবর্ষের মত দূরত্বে।

কিন্তু তবু মানুষ নোভা বা সুপার নোভাদের ব্যাপারটা বোধ হয় বুঝতে পেরেছে! বুঝেছে যে, দু-ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট তারাটি কোন কারণে—কতকাংশে সদৃশ আবার কতকাংশে অসদৃশ দুই কারণে—প্রথমে দ্রুত বিস্ফারিত হয়, পরে হয় বিস্ফোরিত। বিস্ফোরণের শুরু থেকে বিস্ফোরণের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারাটি হয় উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর এবং অবশেষে উজ্জ্বলতম। এই পর্যায়ের কারণেই তারাটি হয় নোভা বা সুপারনোভা। বিস্ফোরণের ফলে তারাটির বহিরঙ্গ তো বটেই এমন-কি অনেক ক্ষেত্রে সমগ্র তারাটিই হয়তো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তারকাদেহের এই ভগ্নাবশেষ অতঃপর নীহারিকা (**nebula**) রূপে বিরাজ করতে থাকে। হয়তো কোটি কোটি বছর ধরে যতদিন-না কার্যকারণ পরম্পরায় তা থেকে নতুন কোন জ্যোতিষ্কের জন্ম হয়।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, তারারা প্রতিনিয়ত যে-বিপুল শক্তি বিকিরণ করে আলো প্রভৃতির রূপে তা উৎপন্ন হয় ওদের দেহের অভ্যন্তরে পারমাণবিক সংযোজন-প্রক্রিয়া (**fusion process**)-র মাধ্যমে। শক্তির এই আয়-ব্যয়ের মধ্যে সাধারণত এক সূক্ষ্ম সমতা বজায় থাকে, কিন্তু প্রধানত ভরের আধিক্যের কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে সাম্য বিঘ্নিত হয়, আর তখনই ঘটে বিপর্যয়—দেখা দেয় নোভা বা সুপার-নোভা। ছোট বা সূর্যের মত মাঝারি তারাদের ক্ষেত্রে এ-ব্যাপার ঘটে না, ঘটে বিরাটবপু তারাদের ক্ষেত্রে। আর ঘটলে ব্যাপারটা ঘটে তারার জীবনধারার শেষদিকে। যদি তারাটিতে অধিক ভর সমাবেশ হয় ধীরে ধীরে, তার আগ্রাসী আকর্ষণের দরুন নিকটবর্তী দুর্বল তারা থেকে সংগ্রহের মাধ্যমে, তাহলে বিপর্যয়টা আসে ছোট আকারে—আত্মপ্রকাশ করে নোভা। যদি শুরু থেকেই তারাটি বিপুলবপু হয়ে থাকে, তাহলে বিপর্যয় হয় বড়—দেখা দেয় সুপারনোভা।

বিজ্ঞানীদের তত্ত্বটিকে বিশেষ বিশেষ অংশে তথ্যের আলোকে যাচাই করে নেবার এক অপূর্ব সুযোগ এসেছে এবার। এই প্রথম একটি সুপারনোভাকে প্রায় শুরু থেকেই দূরবীন প্রভৃতির মাধ্যমে নানা দিক থেকে নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করা হল এবং হচ্ছে। আর, বেশ কাছে থেকে। কারণ, ব্যাপারটা ঘটেছে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডে নয় বটে, কিন্তু আমাদের নিকটতম ব্রহ্মাণ্ডে বৃহৎ ম্যাগেল্যানীয় মেঘে। যেহেতু দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশে ঘটেছে, অতএব সেখান থেকেই দেখা সম্ভব বা সুবিধাজনক। তাই পৃথিবীর ঐ-অংশে যত বড় বড় মানমন্দির আছে তার প্রায় প্রতিটিতে কোন-না-কোন দূরবীন **1987A** নামে অভিহিত ঐ-সুপারনোভাটির দিকে নিবদ্ধ করাই আছে—থাকবে আরও অন্ততপক্ষে কয়েক মাস ধরে।

চিত্র পরিচয়

(Patrick Moore-এর Astronomy গ্রন্থের 216 পৃষ্ঠার চিত্রের অনুসরণে অঙ্কিত স্কেচ।

কর্কট নীহারিকা (Crab Nebula) নামে পরিচিত এবং বৃষরাশি (Taurus)-র মধ্যে অবস্থিত এই নীহারিকাটি হচ্ছে 1035 সালের পরিদৃষ্ট সুপারনোভাটির বর্তমান রূপ। মূল তারাটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি, ক্ষয়িত হয়ে এখনও বিরাজ করছে। চিত্রের কেন্দ্রে ডানদিকে, নীচে তারাটিকে দেখা যাচ্ছে। চিত্রের অন্যান্য তারাগুলো, সুপারনোভার সঙ্গে সম্পর্কহীন—আকাশের প্রায় একই দিকে থাকার দরুন আলোকচিত্রে ধরা পড়ে গেছে।

রামন এফেক্ট

জয়ন্ত বসু

স্থান ঃ কলকাতায় 210 নং বউবাজার স্ট্রীট (বর্তমানে বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটে যেখানে গোয়েংকা কলেজ অব কমার্স), **কাল ঃ** 1928 খ্রীস্টাব্দের 28শে ফেব্রুয়ারীর রাত্রি, **পাত্র ঃ** অধ্যাপক চন্দ্রশেখর ভেংকট রামন। এই স্থান-কাল-পাত্রের সমন্বয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে কারণ এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে এমন এক আবিষ্কার যা বিজ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। অধ্যাপক রামনের নামানুসারে এই আবিষ্কারের নাম 'রামন এফেক্ট'। এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য রামনকে 1930 খ্রীস্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারের সম্মানে ভূষিত করা হয়। বর্তমান বছর রামন এফেক্ট-এর সুবর্ণজয়ন্তীবর্ষ হিসাবে পালিত হচ্ছে।

বিজ্ঞানের প্রায় সব আবিষ্কারের মতন এই আবিষ্কারেরও একটি পশ্চাৎপট ছিল। কয়েকটি 'ফ্ল্যাশ-ব্যাকে'র মাধ্যমে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হচ্ছে ঃ

প্রথম ফ্ল্যাশ-ব্যাক ঃ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র সি ভি রামন মাত্র 19 বছর বয়সে ভারতীয় অর্থ-বিভাগের সহকারী অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হয়ে ।907 সালে কলকাতায় আসেন। বাড়ি থেকে অফিস যাতায়াতের পথে বউবাজার স্ট্রীটে একটি সাইনবোর্ড তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 210 নং বাড়ির ঐ সাইনবোর্ডে ইংরেজিতে লেখা ছিল ঃ 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স' অর্থাৎ বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য ভারতীয় পরিষদ। বিজ্ঞানচর্চায় রামনের ঐকান্তিক আগ্রহ থাকায় তিনি একদিন সেই বাড়ির ভিতরে ঢুকে আলাপ করলেন ঐ পরিষদের তদানীন্তন সম্পাদক ডঃ অমৃতলাল সরকারের সঙ্গে—অমৃতলাল ছিলেন পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের পুত্র। পরিষদের গবেষণাগারে যন্ত্রপাতির অভাব ও আর্থিক অসচ্ছলতা জেনেও রামন হতোদ্যম হলেন না, অমৃতলালের অনুমতি নিয়ে পরিষদে গবেষণা শুরু করলেন। ছুটির দিনগুলি এবং অন্যান্য দিন সকলে ও সন্ধ্যায় শব্দবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর গবেষণা চলতে লাগলো। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁকে ঘিরে উৎসাহী গবেষকগোষ্ঠী গড়ে উঠলো।

দ্বিতীয় ফ্ল্যাশ-ব্যাক ঃ 1917 সালে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য স্বনামধন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিত অধ্যাপক পদে যোগ দিলেন ভারতীয় অর্থবিভাগের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে। নবগঠিত বিজ্ঞান কলেজে তাঁর শিক্ষকতা শুরু হল ; বাকি প্রায় সব সময়ই তিনি মগ্ন রইলেন গবেষণায়। প্রধানত ভারতীয় পরিষদেই তাঁর গবেষণা চলতে লাগলো।

তৃতীয় ফ্ল্যাশ-ব্যাক ঃ 1921 সালে রামন যখন ইওরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণে যান, তখন জাহাজ থেকে সমুদ্রের বিভিন্ন অংশের জলের নীল রঙের তারতম্য দেখে এ বিষয়ে তাঁর অনুসন্ধিৎসা জেগে ওঠে। আকাশের রঙ নীল কেন, লর্ড র‍্যালে কিছুকাল আগে তার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন—বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় অণুগুলি সূর্যের আলোকে যে বিচ্ছুরণ করে, তার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করে তিনি ঐ ব্যাখ্যা দেন। কেবল সমুদ্রের জল নয়, বিভিন্ন তরল পদার্থে আলোর বিচ্ছুরণ সম্পর্কে রামন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা একসময় লক্ষ্য করলেন যে, বেন্‌জিন নামক তরল পদার্থের উপর নীল আলো ফেললে পদার্থটি থেকে বিচ্ছুরিত আলোর মধ্যে ক্ষীণ সবুজ আলোও থাকে। প্রথমে তাঁরা ভাবলেন যে, বেন্‌জিনকে শোধন করলেও তার মধ্যে কোন প্রতিপ্রভ পদার্থ সামান্য পরিমাণে থাকবার ফলে এই ঘটনা ঘটছে। প্রতিপ্রভ পদার্থ অণুর ইলেকট্রনের ধর্ম থেকে যে এর ব্যাখ্যা করা যায়, তা আগেই জানা ছিল।

চতুর্থ ফ্ল্যাশ-ব্যাক ঃ 1923 সালে এ এইচ কম্পটন পরীক্ষালব্ধ ফল থেকে আবিষ্কার করেন যে, এক্‌স্‌-রশ্মি লঘু কঠিন পদার্থ থেকে বিচ্ছুরিত হলে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেড়ে যেতে পারে (অর্থাৎ তার কম্পাংক কমে যেতে পারে)। একে বলা হয় 'কম্পটন এফেক্ট'। কম্পটনের পরীক্ষার বিশদ ফল কোয়াণ্টাম তত্ত্বের ধারণার সঙ্গে ভালভাবে মিলে যায়। এখন, এক্‌স্‌-রশ্মি ও আলো আসলে একই ধরনের তরঙ্গ—বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গ (তফাৎ কেবল তাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে, আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত বেশি) ; সুতরাং রামন ভাবলেন, আলোর বিচ্ছুরণের ক্ষেত্রেও কম্পটন এফেক্ট-এর অনুরূপ কোন ঘটনা ঘটতে পারে—বেন্‌জিন থেকে নীল আলো বিচ্ছুরিত হলে যে সামান্য সবুজ আলো (অর্থাৎ বেশি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো) পাওয়া যাচ্ছে, তা হয়তো কোন প্রতিপ্রভ পদার্থের উপস্থিতির জন্য নয়। এ রকম যে হতে পারে, অন্য দু'তিনজন বিজ্ঞানীর তত্ত্ব থেকে আন্দাজ করা গেলেও এর কোন পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ ছিল না। রামন তাঁর ধারণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হলেন।

* * *

ফ্ল্যাশ ব্যাকের পালা এখানেই শেষ। এর পর 1928 সালের 28শে ফেব্রুয়ারি রামনের সেই পরীক্ষা, যাতে তিনি দারুণ ভাবে সফল হয়েছিলেন। আলোর উৎস হিসেবে তিনি একটি পারদরশ্মি বাতি (**mercury arc**) ব্যবহার করেছিলেন এবং বর্ণালী নিরীক্ষণ করেছিলেন একটি স্পেক্ট্রোগ্রাফ বা বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তোলা ফটোগ্রাফে। পারদরশ্মি বাতিকে উৎস হিসেবে ব্যবহার করবার সুবিধা এই যে, যদিও তা থেকে বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোক তরঙ্গ নির্গত হয়, তাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকায় তার বর্ণালীর ফটোগ্রাফে যে উজ্জ্বল রেখাগুলি দেখা দেয়, তাদের অবস্থান হয় যথেষ্ট দূরে দূরে—প্রত্যেক রেখার দু' পাশেই অনেকখানি জায়গা অন্ধকার থাকে। রামন আন্দাজ করেছিলেন যে, বিচ্ছুরিত আলোর বর্ণালীতে হয়তো মূল রেখার কাছাকাছি এক বা একাধিক নতুন রেখা দেখা দেবে; সেগুলিকে যাতে স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়, সেজন্যেই তিনি পারদরশ্মি বাতি ব্যবহার করেছিলেন। যা হোক, ঐ উৎস থেকে আলোকরশ্মি শোধিত বেন্‌জিনের উপর নিক্ষেপ করে যে বিচ্ছুরিত আলো পাওয়া গেল, তার বর্ণালীর ফটোগ্রাফে রামন দেখলেন যে, তাঁর অনুমান ঠিকই—মূল রেখার এক পাশে কয়েকটি নতুন রেখা দেখা যাচ্ছে; অর্থাৎ বিচ্ছুরণের ফলে কয়েকটি নতুন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আলোক তরঙ্গের উদ্ভব হয়েছে। এই হল রামন এফেক্ট-এর জন্মকাহিনী। ফটোগ্রাফে নতুন রেখাগুলির অবস্থান থেকে বোঝা গেল, নতুন আলোক তরঙ্গগুলির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য মূল তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে বড়। অন্য ভাবে বললে তাদের কম্পাংক মূল কম্পাংকের চেয়ে কম।

* * * *

অতঃপর রামন ও তাঁর সহকর্মীরা বেন্‌জিন ছাড়াও বহু তরল পদার্থ নিয়ে অনুরূপ পরীক্ষা করেন। কে এস কৃষ্ণান একদিন প্রথম লক্ষ্য করলেন যে, বিচ্ছুরিত আলোর বর্ণালীতে মূল রেখার কেবল এক পাশে নয়, অন্য পাশেও নতুন কয়েকটি রেখা দেখা যাচ্ছে (চিত্র দেখ)। এ থেকে জানা গেল, বিচ্ছুরণের ফলে মূল তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে কম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের (অর্থাৎ বেশি কম্পাংকের) আলোক তরঙ্গও উৎপন্ন হতে পারে। প্রথমোক্ত রেখাগুলিকে বিজ্ঞানী স্টোক্‌স্-এর নামানুযায়ী বলা হয় 'স্টোক্‌স্ রেখা'। শেষোক্ত রেখাগুলিকে বলে 'অ্যান্টি-স্টোক্‌স্ রেখা'। সব রেখাগুলিকে নিয়ে যে বর্ণালী, তাকে বলা হয় 'রামন বর্ণালী'।

এই যে সম্পূর্ণ রামন এফেক্ট, তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হল এই রকম ঃ—কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী আলোকতরঙ্গকে

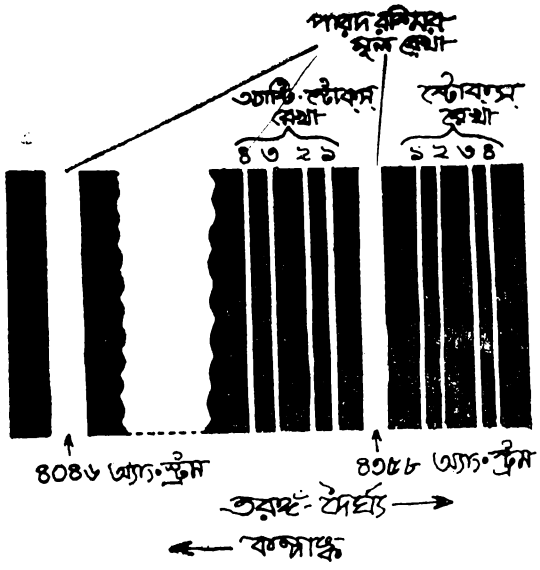

২ নং চিত্র- মেথাক্রোফর্মের রামন বর্ণালী
(১ অ্যাং-স্ট্রম = 10^{-8} সে. মি.)

আলোককণা বা ফোটনের সমষ্টি হিসেবে ভাবা যায়। এক-একটি ফোটনের শক্তি তার সঙ্গে তরঙ্গের কম্পাংকের সমানুপাতিক। পদার্থের অণুর সঙ্গে ফোটনের পারস্পরিক ক্রিয়ায় আণবিক স্পন্দনের মাধ্যমে অণু ফোটন থেকে কিছুটা শক্তি নিয়ে নিতে পারে। তখন সেই ফোটনের শক্তি কমে যায়, সেজন্যে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তরঙ্গের কম্পাংকও কমে! এই ভাবে স্টোক্‌স্ রেখার উৎপত্তি হয়। আবার কোন ক্ষেত্রে অণু তার স্পন্দনের কিছুটা শক্তি ফোটনকে দিয়ে দিতে পারে। তখন সেই ফোটনের শক্তি বেড়ে যায়, ফলে এক্ষেত্রে কম্পাংক বাড়ে। এই হল অ্যান্টি-স্টোক্‌স্ রেখার উৎপত্তির কারণ।

* * * *

বেন্‌জিন, ক্লোরোফর্ম ইত্যাদি তরল পদার্থেই কেবল নয়, কঠিন ও গ্যাসীয় পদার্থেও রামন এফেক্ট দেখা গেছে। যেহেতু রামন বর্ণালী পদার্থের আণবিক স্পন্দনের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেজন্যে এই বর্ণালী নিরীক্ষণ করে বিভিন্ন পদার্থের অণুর স্বরূপ সম্বন্ধে নানান তথ্য জানতে পারা গেছে। পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে রামন এফেক্ট-এর বহুল প্রয়োগ আছে। রামন এফেক্ট যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তা বোঝা যায় এই থেকে যে, এর উপর ভিত্তি করে অন্তত পাঁচ হাজার মৌলিক গবেষণাপত্র রচিত হয়েছে এবং রামনের আবিষ্কারের প্রায় 60 বছর পরেও এর প্রয়োগের ক্ষেত্র ক্রমেই বিস্তৃত-তর হচ্ছে।

প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র

সুধাংশু পাত্র

অনেক দিন আগেকার কথা !

একবার বর্ষাকালে আজকের বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার লোনসিং নামে এক গাঁয়ে ঘটেছিল এক অদ্ভুত ঘটনা। গ্রামের প্রান্তে ছিল বহুদিনের পরিত্যক্ত এক পোড়ো ভিটে। বর্ষাকালে রাতে বর্ষা নামলেই শুরু হত আলোর নাচন। সে আলো প্রদীপের স্বর্ণাভ শিখার মত নয়, কাঠ কয়লার আগুনের মত লাল গনগনেও নয়, লক্ষ জোনাকির প্রভার মত নীলাভ দ্যুতিসম্পন্ন আশ্চর্য কতকগুলো আলোর সমাবেশ।

আলোগুলো আবার স্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকত না। কখনও থর থর করে কাঁপতো, কখনও কয়েকটাকে একত্রে ছুটে যাওয়ার মত মনে হত, আবার কখনও সবগুলো একসঙ্গে নিভে যেত। গাঁয়ের লোকেরা ধরে নিল, পরিত্যক্ত এই ভিটেতে অশরীরী প্রেতাত্মাদের আগমন হয়েছে। আকাশ থেকে টুপটাপ বৃষ্টি ঝরতে শুরু করলে তারা আলো জেবলে খেলাধুলায় মেতে ওঠে। রাত্রিতে তো দূরের কথা, দিনের বেলায়ও কেউ সেই ভিটের ত্রি-সীমানায় ভিড়ত না।

সেই গাঁয়ে বাস করতেন সংস্কারমুক্ত এক তরুণ। অনুসন্ধিৎসু তাঁর মন, প্রখর বুদ্ধি এবং ভয়লেশহীন মুখ। একদিন বন্ধুদের বললেন 'পাঁচীর মায়ের' ভিটেয় ঐ আলোটার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন না করলে নয়। সবাই মিলে একবার যাই চল সেখানে !

কথাটা শোনা মাত্রই বন্ধুরা আঁৎকে উঠল। বলল—কি দরকার ভাই ! জেনে শুনে ভূতের পাল্লায় পড়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

তরুণটি কিন্তু সহজে হাল ছেড়ে দিলেন না। অনেক করে বোঝালেন বন্ধুদের। শেষে মাত্র দু-জন বন্ধু সম্মত হল তাঁর সঙ্গী হতে।

নিশুতি রাত। মাথার ওপর টিপটিপ করে ঝরছে বৃষ্টি। চারদিকে পোকামাকড়ের রিনঝিন শব্দ, ব্যাঙের গাঁঙর গ্যাঁঙর ডাক, পেঁচার কর্কশ চিৎকার, দূরে থেকে ভেসে আসছে খেঁকশিয়ালের অট্টহাসি। তিন বন্ধু ছাতা মাথায় এবং হাতে হ্যারিকেন নিয়ে কাদা ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে গেলেন আলো লক্ষ্য করে। যত কাছাকাছি হলেন ততই অদ্ভুত সব আলোর খেলা চোখে পড়তে লাগল। ততক্ষণে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে সেই নীলাভ দ্যুতিগুলো। জ্বলছে, নিভছে, ছুটোছুটি করছে, যেন নেচে নেচে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভিটেময়।

তিন বন্ধুর হঠাৎ যেন হৃৎকম্প উপস্থিত হল। একজন তো সেইখান থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালালো ঘরের দিকে। অপরজন পালাবে কিনা ভাবছে—এমন সময় তরুণটি তার হাতখানা চেপে ধরে সজোরে দিলেন এক ঝাঁকুনি। বললেন—ভয় কী ! এসো আমার সঙ্গে !

বন্ধুটির সর্বাঙ্গ তখন থর থর করে কাঁপছে। বলল—না, ভূতের পাল্লায় পড়ার মত আমারও সাহস নেই। আমি চললাম।

ভয় তরুণটির মনেও। তবু এত দূরে এসে কাপুরুষের মত পালিয়ে যেতে কেমন যেন লজ্জা হল তাঁর। বললেন—তুমি যদি নিতান্তই আলোর কাছে যেতে না চাও তাহলে ছাতা মাথায় এইখানে বসে রাম নাম কর। আর আমি একটু একটু করে এগুই। তবে আমি তোমার নাম ধরে ডাক দিতে দিতে যাবো। আর তুমি প্রতি বারে আমার ডাকে সাড়া দেবে।

এবার সম্মত হল বন্ধুটি। সে রাম নামের অক্ষয় কবচ ধারণ করে বসে রইল এবং তরুণটি যতদূর সম্ভব মনকে শক্ত করে এগিয়ে গেলেন।

একটা মোড় ঘুরতেই তরুণটি বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন। আলো অনেকগুলি নয়। একটিই। সেটি আবার নিভছে না, নড়ছে না, নাচছেও না। একটা জায়গায় একেবারে স্থির হয়ে আছে।

তরুণটি এবার একটু দাঁড়ালেন। ভাবতে চেষ্টা করলেন, কেন দূরে থেকে আলোটা এমন অদ্ভুত ঠেকছিল ?

সে কী দৃষ্টির বিভ্রম, নাকি মানুষের গন্ধ পেয়ে ভূতগুলো এক জায়গায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে এবং আক্রোশে ফুলছে!

অকস্মাৎ একটা দমকা হাওয়া শন্ শন্ করে বয়ে গেল ঝোপগুলোর মাথার ওপর দিয়ে। ঝোপের ডালপালাগুলো নড়তেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। আলোকে ঘিরে রেখেছে কতকগুলো ডালপালা। বাতাসে আন্দোলিত হলেই ডালপালার ফাঁক দিয়ে অনেক আলো দেখা যায় এবং নাচতে বা জ্বলতে-নিভতেও দেখা যায়।

এবার তরুণটির মনে একটু একটু করে সাহস ফিরে এল। দ্রুত পা চালিয়ে দিলেন আলোটার কাছে। দেখলেন এক তাজ্জব ব্যাপার! আলোটা বার হচ্ছে বহুদিন আগে কেটে নেওয়া হাত খানেক উঁচু একটা তেঁতুল গাছের গুঁড়ি থেকে। বৃষ্টির জলে ভিজে ভিজে উপরের কাঠটা একরকম পচে উঠেছে আর সেই পচা কাঠের ওপর গজিয়েছে এক ধরনের ছত্রাক। তরুণ আলতোভাবে হাতটাও ঠেকালেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! হাতেও দেখা গেল ঠিক সেই ধরনের আলোর দ্যুতি।

তরুণটি কাঠের টুকরো খসাতে খসাতে বন্ধুর নাম ধরে উচ্চৈস্বরে ডাক দিলেন—ওরে চলে আয়, চলে আয়! ভূতের আলো এ নয়। কাঠের উপর গজিয়েছে একগাদা ছাতা। সেই ছাতাই বিতরণ করছে আলো।

কেবল আলোর রহস্য উদ্ঘাটন করে ক্ষান্ত হলেন না তরুণ। পরীক্ষার জন্য বেশ কয়েক টুকরা কাঠ ভেঙ্গে আনলেন। পরে বুঝতে পারলেন, পচা কাঠে বিশেষ এক ধরনের ছত্রাক উপনিবেশ গড়ে তোলে এবং ভিজে অবস্থায় আলোও বিতরণ করতে পারে।

অনুসন্ধিৎসু ও সাহসী এই তরুণটির নাম গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। 1894 সালের 1লা আগস্ট অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত ফরিদপুর জেলায় লোনসিং নামক এক অখ্যাত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন অত্যন্ত গরীব। যজন যাজনের মাধ্যমে যতটুকু উপার্জন করতেন তাতেই কষ্টে সৃষ্টে সংসার চলতো।

গোপালচন্দ্র ছিলেন পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর, বয়স। যখন মাত্র পাঁচ বছর সেই সময় হারালেন পিতাকে। প্রকৃতপক্ষে মা শশিমুখী দেবীই অত্যন্ত দুঃখ কষ্টের ভেতর দিয়ে মানুষ করেছিলেন গোপাল চন্দ্র এবং তাঁর তিন ভাইকে।

গোপালচন্দ্র ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন অত্যন্ত শান্তশিষ্ট এবং মনটি ছিল সরল ও অনুসন্ধিৎসু। ঘরে মায়ের কাছে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শুনতে শুনতে একেবারে তন্ময় হয়ে যেতেন। আবার বাইরে পা দিলে মুগ্ধ হতেন অপরূপা প্রকৃতির রূপরাশি দেখে। গাছপালা ও জীবজন্তু থেকে ছোট ছোট পোকামাকড় পর্যন্ত কেউ তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারতো না। কাজ ফেলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অদ্ভুত সে সব কাহিনী।

কথিত আছে, কিশোর বয়সে একবার পুকুরে স্নান করতে যাওয়ার সময় হঠাৎ গাছ থেকে থলথলে জেলির মত কী একটা জিনিসকে সামনে খসে পড়তে দেখলেন। স্নান করা মাথায় উঠল। কিম্ভূতকিমাকার সেই জিনিসটাকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বসে পড়লেন রাস্তার ওপরেই।

কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। থলথলে পদার্থটা হঠাৎ দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। ভারি মজা পেলেন তিনি। পরে কী ঘটে দেখার জন্য আরও কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। শেষে আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, থলথলে সেই পদার্থটি প্রথমে দুই, দুই থেকে চার, এইভাবে ক্রমান্বয়ে বিভক্ত হতে হতে অনেকগুলি খণ্ডে পরিণত হল এবং নড়তে নড়তে এগিয়ে যেতে থাকল।

অদ্ভুত সেই জিনিসটিকে লক্ষ্য করতে গিয়ে তাঁর সেদিন যজমানের বাড়িতে পুজো করা হয় নি, ইস্কুলে যাওয়া হয় নি এবং সারাদিন অন্নও জোটেনি। কিন্তু ব্যাপারটা তাঁর মনে একটা বিরাট দাগ কেটে দিয়েছিল। পরিণত বয়সে বুঝতে পেরেছিলেন, সেটি ছিল না-উদ্ভিদ, না-প্রাণী এমন এক জাতীয় জিনিস—যা কালেভদ্রে কারও কারও চোখে পড়েছে।

খুঁটিনাটিভাবে দেখার লোভ সংবরণ করতে না পারার জন্য মাঝে মাঝে তাঁকে দুর্ভোগও কম ভুগতে হয়নি। একবার পথে যেতে যেতে চোখে পড়ল, পথের পাশে এক বাড়ির জানলায় এক মাকড়সা জাল বুনে চলেছে। আর পথ হাঁটা হল না তাঁর। জানলার পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন মাকড়সার কারিগরী।

এদিকে অনেকক্ষণ ধরে এক অপরিচিত ভদ্রলোককে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঘরের মালিক হলেন কুপিত। তিনি যথেষ্ট তিরস্কার করে ক্ষান্ত হননি, গোপালচন্দ্রকে গলাধাক্কা পর্যন্ত দিয়েছিলেন।

ছেলেবেলা থেকে সবকিছুকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার আগ্রহ এবং চোখ দুইই ছিল বলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে কোন ডিগ্রী গ্রহণ না করেও গোপালচন্দ্র পরিচিত হয়েছিলেন প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানীরূপে।

গোপালচন্দ্র অবশ্য মেধাবী ছিলেন। একমাত্র দারিদ্র্যের জন্যই তাঁর লেখাপড়া বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি। 1913 সালে স্ব-গ্রামের লোনসিং হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য মৈমনসিং আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। দু-বছর পড়ার পর অর্থাভাবে পরীক্ষা দিতে না পারায় সেইখানে তাঁর লেখাপড়ার পরিসমাপ্তি ঘটে।

এরপর শুরু হয়, তাঁর কর্মজীবন। প্রথমে সেই লোনসিং হাইস্কুলেই শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। কিন্তু গোপালচন্দ্র ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া। প্রথম থেকেই উচ্চবর্ণের হিন্দুদের গোঁড়ামি এবং ভণ্ডামি সহ্য করতে পারতেন না। নিতান্ত দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও প্রভাবশালী ও অর্থবান ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি গঠন করেন 'কমল কুটীর' নামে একটি সংস্থা। উক্ত সংস্থাটির মাধ্যমে সমাজের অস্পৃশ্যদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করেন এবং ভবিষ্যতে তারা যাতে যৎসামান্য রুজিরোজগার করতে পারে তার জন্যও সচেষ্ট হন।

শুধু কি তাই ? উচ্চ জাতের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সেই সময় বহু ব্যঙ্গ কবিতা, ছড়া, কবি গান, নাটক ইত্যাদি রচনা করেছিলেন। একটা কবিগানের দলও খুলেছিলেন তিনি। এবং অতি অল্প দিনের মধ্যে কবিয়াল হিসাবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। শোনা যায়, কোন কোন কবিগানের আসরে এখনও গুরু গোপাল ভট্টের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। আপদ বিনাশিনীর ব্রতকথা নামক পুস্তিকা রচনা করেও প্রচার করেছিলেন। ব্যঙ্গ কবিতাগুলি প্রকাশ করতেন 'শতদল' নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকার মাধ্যমে।

গোপালচন্দ্রের সমাজসংস্কারমূলক কাজগুলি উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরা পদে পদে বিরোধিতা করেছিলেন এবং তাদেরই চক্রান্তে বিদ্যালয়ের চাকরি হারাতে হল। তখন তিনি বাধ্য হয়ে গ্রাম ছাড়েন এবং কলকাতার কাশীপুর এলাকায় চেম্বার অব কমার্সের একটি অফিসে টেলিফোন অপারেটারের কাজ গ্রহণ করেন।

প্রকৃতপক্ষে গোপালচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভার প্রকাশ পায় কলকাতায় আসার পরেই। কিশোর বয়সে সেই যে নীলাভ আলো বিতরণকারী উদ্ভিদের সন্ধান পেয়েছিলেন সে সম্বন্ধে একটি মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করে পাঠিয়ে দেন প্রবাসী পত্রিকায়। 1326 বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে বহু গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অতঃপর আরও একটি মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় পরের বছর আষাঢ় সংখ্যায়।

সে সময় বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র 'বসু বিজ্ঞান মন্দিরে' উদ্ভিদদের নিয়ে গবেষণা করছিলেন। প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি পাঠ করে তিনি লেখক সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠেন এবং পরিচিত হন।

এবার যেন মণিকাঞ্চন একত্রে যুক্ত হল। জগদীশচন্দ্রের উৎসাহে গোপালচন্দ্র যোগ দিলেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। এতদিনে তাঁর প্রতিভা বিকাশের পথ হল উন্মুক্ত।

গোপালচন্দ্রের ছেলেবেলা থেকেই ছিল পোকামাকড়দের প্রতি তীব্র আকর্ষণ। ওদের জীবন রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য সেই ছেলেবেলায় কত প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন! কতবার কত মৌমাছি, বোলতা, বিছে প্রভৃতির দংশন সহ্য করেছেন; পিঁপড়ের কামড়ে অস্থির হয়েছেন, প্রজাপতি ও ফড়িংদের পেছু পেছু ধাওয়া করেছেন, মাকড়সাদের ঘর বানানো দেখতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতীক্ষা করেছেন, আজ সুযোগ পেয়ে তাদেরই সম্বন্ধে মেতে উঠলেন গবেষণায়। গবেষণাগারে পিঁপড়েদের জন্য ঘর বানালেন, ব্যাঙাচিদের ওপর অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে তাদের জীবনচক্র সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য আহরণ করলেন, জীবাণুদের প্রতিপালন করতে লাগলেন এবং বিভিন্ন ধরনের মাকড়সাকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালালেন।

অতঃপর তাঁর গবেষণার ফলাফলগুলি প্রকাশিত হয় দেশী বিদেশী বহু পত্র পত্রিকায়। প্রায় 800 গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন তিনি। তাদের মধ্যে প্রায় 22টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ইংরাজী ভাষায়। এবং প্রত্যেকটি প্রবন্ধের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন জীববিজ্ঞানীরা।

গোপালচন্দ্রের লেখা বাংলা প্রবন্ধগুলি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে অনেকখানি। তাঁর লেখার হাতটি ছিল ভারি চমৎকার। গাম্ভীর্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি লেখার গুণে সাধারণের কাছেও অতি উপভোগ্য। একমাত্র রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছাড়া এত চমৎকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আজ পর্যন্ত আর কারও দ্বারা লেখা সম্ভব হয়নি বললে মনে হয় অত্যুক্তি করা হবে না। অপরদিকে তাঁর লেখা এত প্রসাদ গুণে ভরা যে, পড়তে গেলে বাংলা শিশু সাহিত্যের যুগন্ধর শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে মনে করিয়ে দেয়। অবনীন্দ্রনাথের মত তাঁর লেখা যেন টুকরো টুকরো কতকগুলো ছবি।

গোপালচন্দ্রের গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি বিজ্ঞানকেও সমৃদ্ধ করেছে। কীটপতঙ্গদের আচার আচরণ সম্বন্ধে বহু নতুন নতুন তথ্য যুক্ত করেছেন। আলোক উৎপাদনকারী উদ্ভিদদের সম্বন্ধে গবেষণাগুলিও অতি উচ্চাঙ্গের। বহু বিজ্ঞানীকে গবেষণা করতে সাহায্যও তিনি করেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত ছত্রাক বিজ্ঞানী সহায়রাম বসু অন্যতম। বসু বিজ্ঞান মন্দিরে যে সব বিদেশী বিজ্ঞানীর আগমন হতো তাঁরা গোপালচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করে অত্যন্ত প্রীত হতেন। এ দেশের গাছ গাছড়া ও কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে বহু তথ্যও লাভ করতেন গোপালচন্দ্রের কাছ থেকে।

গোপালচন্দ্রের অন্যতম প্রধান কীর্তি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামক পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠা। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। সেই পরিষদের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশ করেছিলেন 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা। এক রকম জন্ম লগ্নেই আচার্যদেব পত্রিকা প্রকাশের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন গোপালচন্দ্রের ওপর। গোপাল-

চন্দ্র পরম নিষ্ঠা ভরে সে দায়িত্ব প্রতিপালন করেছিলেন সুদীর্ঘ 30 বছর কাল ধরে। এর ফলও হয়েছে সুদূর-প্রসারী। বর্তমানের বিজ্ঞান লেখক মাত্রেই কোন না কোন দিক থেকে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ, গোপালচন্দ্র এবং তাঁদের জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার কাছে ঋণী। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপায়ে আজকের বিজ্ঞান লেখক গোষ্ঠীকে তৈরি করেছেন তাঁরাই। যার জন্য মাতৃভাষায় বিজ্ঞান রচনার একটা যেন প্লাবন এসেছে।

গোপালচন্দ্র ছিলেন এক নীরব বিজ্ঞানসাধক। বিজ্ঞানের কোন ডিগ্রী ছিল না তাঁর। একমাত্র অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে আমাদের চারপাশের বস্তুরাশিকে দেখতে গিয়েই তিনি বিজ্ঞানীরূপে পরিচিত হয়েছিলেন। এদিক থেকে টমাস আলভা এডিসন, হেনরি ফোর্ড, ফ্যারাডে প্রমুখ বিজ্ঞানীদের মত তিনিও এক ব্যতিক্রম। অপরদিকে ফ্রান্সের প্রখ্যাত স্বভাব বিজ্ঞানী জাঁ আঁরি কাসিমির ফ্যাবারের সমতুল। ফ্যাবারেরও বিজ্ঞানে কোন ডিগ্রী ছিল না এবং একমাত্র অনুসন্ধিৎসাই তাঁকে বিজ্ঞানীর মর্যাদা দিয়েছিল। তাই আমাদের দেশের তরুণদের কাছে গোপালচন্দ্র এক মূর্তিমান উৎসাহ।

গোপালচন্দ্র ছিলেন একেবারে প্রচার বিমুখ। সারা জীবন ধরে যা কিছু লিখে গেছেন তার অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। এমন কি কোন পাণ্ডুলিপি রাখারও প্রয়োজন অনুভব করেননি তিনি। তাঁর এই নীরব সাধনার যোগ্য-মূল্যও দেয়নি তাঁর দেশবাসী। এমন কি সারা জীবন অবহেলিত থেকে গেছেন। যা কিছু স্বীকৃতি এসেছে তা একেবারে জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়ানোর পর। মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস আগে ৮৬ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁকে প্রদান করেছে সম্মানসূচক ডি. এস. সি. ডিগ্রী। সাহিত্যে স্বীকৃতিস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান করেছেন 1975 সালে 81 বছর বয়সে। আর 80 বছর বয়সের সময় তিনি লাভ করে-ছিলেন 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি ফলক'। শুধু যথাসময়ে 'আনন্দ পুরস্কার' প্রদান করে অত্যন্ত দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকা। গোপালচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কথা প্রসঙ্গে একদিন আক্ষেপ করে বলেছিলেন 'আমাদের দেশে কত হীরে-মাণিক এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, কিন্তু কেউ তার খোঁজ করে না। আর খোঁজ করে না বলেই আমাদের দেশটা এত খাটো।' উক্তিটি গোপালচন্দ্রের নিজের জীবনেও পুরোপুরি সত্য।

গোপালচন্দ্র কেবলমাত্র বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান লেখক ছিলেন না। দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সেবকও ছিলেন। স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে যে গুপ্ত সমিতি একদিন গড়ে উঠেছিল তার এক সক্রিয় সদস্য ছিলেন গোপালচন্দ্র। বসু বিজ্ঞান মন্দিরে বসে গোপনে চালিয়ে যেতেন সমিতির কাজ। কথিত আছে, নতুন নতুন ফরমুলার সাহায্যে কিছু কিছু বিস্ফোরক তৈরি করে তিনি তুলে দিয়েছিলেন বিপ্লবীদের হাতে।

গোপালচন্দ্রের সত্যিই কোন তুলনা নেই। তাঁর জীবনটাই একটা রোমাঞ্চ ভরা নাটকের মত। আজীবন দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোরভাবে লড়াই করেছেন কিন্তু মুখের হাসিটি ছিল অম্লান। দারিদ্র্য থেকে মুক্তির জন্য কোন চেষ্টাও তিনি করেননি। তাঁকে রাগ করতেও কেউ দেখেনি কোন দিন। এমন কি অতি বৃদ্ধ বয়সেও না। 1981 সালের 8ই এপ্রিল এই মহান সাধক 86 বছর বয়সে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেছেন।

'প্রত্যয় প্রকাশ' এর নতুন বই

সুনির্মল রায়

চাঁদে পাড়ি ১০৲

সাধন দাশগুপ্ত

ভাষা গণিত ২০৲

দেবব্রত চক্রবর্তী-র

শেরিং হত্যা রহস্য ১০৲

সাধন দাসগুপ্ত

আলো আরও আলো ১৫৲

সাধন দাশগুপ্ত

রোমাঞ্চকর রসায়ন ১২৲

দেবব্রত চক্রবর্তী

চক্রতীর্থের চমক ১০৲

: পরিবেশক :

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

৮৬।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯

নক্ষত্র বিজ্ঞানী রাধাগোবিন্দ

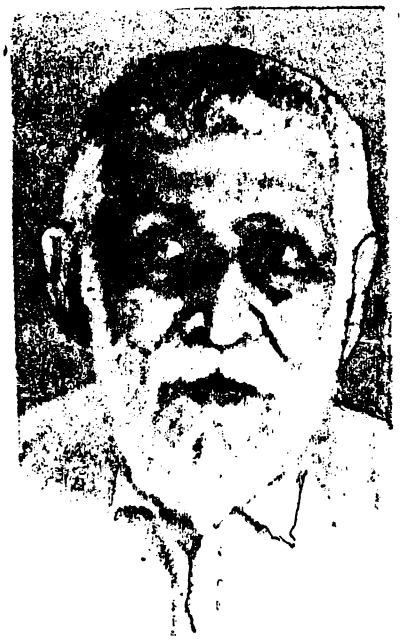

রবীন বসু

দুর্নিবার কৌতূহল, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের গুণে যে কয়েকজন বাঙালি বিজ্ঞানী বিশ্বের দরবারে খ্যাতি ও স্বীকৃতি লাভ করেছেন রাধাগোবিন্দ চন্দ্রের নাম তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাধাগোবিন্দ চন্দ্র আমাদের দেশে সমসাময়িককালে হয়তো ততটা খ্যাতি ও পরিচিতি লাভ করতে পারেন নি। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানের দরবারে তিনি পেয়েছিলেন স্বীকৃতি ও সম্মান। জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় তাঁর গবেষণা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নানা প্রবন্ধ সেকালের বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

অথচ এই পল্লী নক্ষত্রবিদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না, ছিল না বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উঁচু ডিগ্রী। ফলে আধুনিক গবেষণাগারের সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহারের কোন সুযোগই তিনি পান নি।

আজ থেকে প্রায় 110 বছর আগে বাংলাদেশের যশোর জেলায় রাধাগোবিন্দের জন্ম। বিদ্যালয়ের প্রথাগত পাঠাভ্যাস তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। তবে নানাধরনের বই পড়ায় তাঁর ছিল ভীষণ আগ্রহ. বিশেষতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক বই। রাতের আকাশের উজ্জ্বল গ্রহ-নক্ষত্রের বিস্ময়কর চলাফেরা কিশোর রাধাগোবিন্দকে গভীরভাবে কৌতূহলী করে তুলেছিল। 1910 সালে হ্যালির ধূমকেতুকে একটি সাধারণ বাইনকুলারের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করে রাধাগোবিন্দ চন্দ্র একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বস্তুতঃ এই প্রবন্ধ রচনার সূত্র ধরেই নক্ষত্র পর্যবেক্ষণে তাঁর দৃঢ় পদক্ষেপের সূচনা হয়। বাংলায় বিজ্ঞান রচনায় অন্যতম পথিকৃৎ জগদানন্দ রায় রাধাগোবিন্দের প্রবন্ধটি পড়ে মুগ্ধ হন। এবং তিনি রাধাগোবিন্দকে একটি টেলিস্কোপ সংগ্রহ করে আকাশ পর্যবেক্ষণে উৎসাহিত করেন। সেই থেকেই সুরু।

তিনি লণ্ডন থেকে সরাসরি একটি তিন ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট একটি টেলিস্কোপ সংগ্রহ করলেন। শুরু হল তার নক্ষত্র-গবেষণা।

রাতের পর রাত তিনি টেলিস্কোপে চোখ রেখে কাটাতে লাগলেন। এবং তার পর্যবেক্ষণ ও গবেষণালব্ধ তথ্য পাঠাতে লাগলেন দেশ-বিদেশে। বিজ্ঞান পত্র-পত্রিকায় সেগুলি প্রকাশিত হত। সামান্য একটি তিন ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট টেলিস্কোপের সাহায্যে তিনি আকাশের নানা জ্যোতিঃপদার্থই পর্যবেক্ষণ করেছেন। এবং তাঁর পর্যবেক্ষণ লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে রচিত তাঁর প্রবন্ধাবলী পড়ে সেকালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মুগ্ধ হয়ে যেতেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধাবলী British Astronomical Association, Harvard College University, American Association of Variable star observers প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। রাধাগোবিন্দের গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ লণ্ডন, ফ্রান্স ও আমেরিকার জ্যোতির্বিজ্ঞান সংস্থাসমূহ তাঁকে মাননীয় সদস্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। হার্ভার্ড মানমন্দির থেকে তাঁর গবেষণার কাজে সুবিধার জন্য তাঁকে উপহার দিয়েছেন একটি শক্তিশালী দূরবীন। ফ্রান্সের সরকারী শিক্ষাবিভাগও তাঁকে বিশেষ উপাধি ও রৌপ্যপদক অর্পণ করে সম্মানিত করেছিলেন।

রাধাগোবিন্দ আকাশের জ্যোতিঃপদার্থ নিয়ে গবেষণা করেছেন প্রায় 40 বছর। রাধাগোবিন্দ চন্দ্রের জীবন ও গবেষণার কথা উল্লেখ করে ডঃ জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেছেন, 'বিজ্ঞানীমহলে স্বর্গীয় রাধাগোবিন্দ চন্দ্রের নাম খুব পরিচিত না হলেও নক্ষত্রবিজ্ঞানে তাঁর দান অতুলনীয়। রাধাগোবিন্দ চন্দ্র কোন বড় মান-মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, বড় টেলিস্কোপ এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের

সুযোগ তিনি পান নি। তাঁর ছোট দূরবীন নিয়ে রাতের পর রাত পরিবর্তনশীল নক্ষত্রগুলির (Variable stars) স্বরূপ জ্ঞান লিপিবদ্ধ করতেন। এবং সংগৃহীত তথ্যগুলি বিশ্বের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে পাঠাতেন। তাঁর পাঠানো ম্যাপগুলি এতই উচ্চমানের ছিল যে, আমেরিকার এক নক্ষত্রবিজ্ঞানী সংস্থা (AAVSO : American Associan of Variable Stars observers) চাঁদা তুলে তাঁর কাজের সুবিধার জন্য একটি 6 ইঞ্চি ব্যাসের টেলিস্কোপ তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। রাধাগোবিন্দ সেইটির উপযুক্ত ব্যবহার করে বহু পরিবর্তনশীল নক্ষত্রের স্বরূপ নির্ধারণ করেছিলেন।'

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই স্বভাববিজ্ঞানী নীরবে তাঁর সাধনা চালিয়ে গেছেন। অথচ পেশায় ছিলেন সামান্য করণিক। অদম্য কৌতূহল, বিজ্ঞান প্রবণতা ও কঠিন অধ্যবসায়ের ফলেই তিনি বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলের শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি লাভ করেছেন। আমাদের দেশে পঞ্জিকা সংস্কার আন্দোলনেও রাধাগোবিন্দের দান বিশেষভাবে স্বীকৃত। 97 বছর বয়সে 1975 সালে পল্লী নক্ষত্রবিদ রাধাগোবিন্দ চন্দ্রের মৃত্যু হয়।

সংগ্রহসূত্র : রণতোষ চক্রবর্তী ও ইন্দুশেখর সিন্‌হা সম্পাদিত "ধূমকেতু" : রাধাগোবিন্দ চন্দ্র।

ছড়া

পূর্ণেন্দু পত্রী

সূর্য যে ওঠে পুব দিকে তা তো বললে,
কিন্তু কোন্‌টা পুব দিক ?
পাহাড় উঠেছে জল থেকে ? যদি সত্যি
তাহলে আবার ডুব দিক।

চাঁদে যদি থাকে অনেক গর্ত-গহ্বর,
কলকাতা কেন চাঁদ নয় ?
গাছে যদি প্রাণ, তবে নিশ্চয় জলসায়
গাইতে তো তার সাধ হয়।

জ্বালালে-পোড়ালে তাকে যদি বলে অগ্নি
কুসুম নামটি কেন পেল তবে ভগ্নি ?

বিদ্যুৎ চুরি মেনে নেবেন ?

এই যে হঠাৎ কারেণ্ট গেল
ঝুপ করে হায় নামলো আঁধার—
রাখেন কি খোঁজ চুরির ভারে
পুড়লো দামী ট্রানস্‌ফরমার ?

কারখানাতে বন্ধ মেসিন
চাষের ক্ষেতেও উঠছে না জল,
পড়াশোনায় চরম ক্ষতি
হাসপাতালে যন্ত্র বিকল,
চোখ রাখলেই দেখতে পাবেন
পড়শী কারেণ্ট করছে চুরি,
হুক্ আর ট্যাপের জ্বালায় দেশের
ক্ষতি ভুরি-ভুরি।

বিজলী গ্রাহক ভুগবে কেন
রাস্তা, ঘরে, কলে, ক্ষেতে ?
আসুন, চোরের হাত বেঁধে দিই
বাঁচি আলোয় আনন্দেতে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ
(কর্পোরেট জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত)

কৃষিবিজ্ঞানী শিব প্রসাদ

অমিত চক্রবর্তী

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার বোড়াল হাইস্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসের এক ছাত্র—পড়াশুনোয় তেমন মন আছে বলে মনে হয় না। গুরু বললেন, তুই বরং কলা-কচুর চাষ কর।

গুরু বাক্য তো আর ফেলে দেওয়া যায় না। কুড়ুল-কোদাল নিয়ে সত্যি সত্যিই ছেলেটি একদিন নেমে পড়লো চাষের ক্ষেতে। এদিকে, বামুনের ছেলের চাষবাসে মন দেওয়াটা পছন্দ হলো না আত্মীয় স্বজনের। তা, ছেলেও তেমনি একরোখা। সবার নিষেধ-আপত্তি এড়িয়ে কচু-কলার চাষ করলো বেশ দিনকতক। এদিকে পড়াশুনোটাও চালিয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বছর দুয়েক বাদে সবাইকে একবারে তাক লাগিয়ে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করলো। প্রথাগত পড়াশুনো অবশ্য ঐ পর্যন্তই। চাকরি-বাকরি? না, তাতেও কোন উৎসাহ নেই। উৎসাহ হবেই বা কি করে? যে গুরুর শিষ্য ও, তাঁর মতে—গোলামী যদি করতেই হয় তবে আর পড়াশুনো করা কেন? শেষ পর্যন্ত মহাউৎসাহে চাষের কাজেই নেমে পড়লো ছেলেটি। দিন কতক যেতে না যেতেই ধরলো বীজ-এর ব্যবসা। আমেরিকা-ডেনমার্কের সব ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে উন্নত মানের শষ্যবীজ আমদানি করে আশেপাশের চাষীদের কাছে বিক্রিবাটার বন্দোবস্ত করা। আয়ও নেহাৎ মন্দ হচ্ছিলো না। তা কি যে আবার খেয়াল-চাপলো মাথায়—বিদেশী কোম্পানীর ক্যাটালগ পড়ে ভাবলো—ওরা যদি উন্নতমানের বীজ বানাতে পারে তবে আমরাই বা পারবো না কেন? অমনি শুরু হলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা। পালং-এর সঙ্গে বীট-এর মিশ্রণ ঘটিয়ে তৈরি হলো সংকর জাতের এক পালং—ফলন যার সাধারণ পালং-এর চেয়ে বহুগুণ বেশি। বাজারে তার খ্যাতি হলো 'ব্যানার্জী'স জায়েণ্ট' নামে। গাছ-গাছালি নিয়ে জীবন-ভর গবেষণার সেই শুরু।

* * *

গুরুর নাম আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আর শিষ্য হলেন শিবপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়। প্রকৃতির গবেষণাগারে জীবনের প্রায় পঞ্চাশটা বছর কাটিয়ে দিলেন শিবপ্রসাদ! ফল-ফুল-সবজীর অসংখ্য প্রজাতি সৃষ্টি করেছেন; উন্নতমানের সার তৈরি করেছেন—যা দিয়ে অনেক কম জলেও শষ্যের ভাল ফলন পাওয়া যায়; পশুপাখি-কীটপতঙ্গের আচার আচরণ পর্যবেক্ষণ করেছেন গবেষকের দৃষ্টি নিয়ে এবং সবচেয়ে বড় কথা, প্রকৃতি-পরিবেশকে কি করে টিঁকিয়ে রাখা যায় তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন—কার্যকরী প্রস্তাব রেখেছেন সরকার এবং সাধারণ মানুষের কাছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর এই একান্ত প্রিয় শিষ্যটির একসময় নামকরণ করেছিলেন —'লুথার বারব্যাংক অফ মডার্ণ ইণ্ডিয়া'। তকমা আঁটা বিজ্ঞানী না হয়েও শিবপ্রসাদ দেশী-বিদেশী বহু কৃষি-বিশেষজ্ঞের নজর কেড়েছেন। তার চেয়েও বড় কথা—তাঁর গবেষণালব্ধ ফল কাজে লাগিয়ে উপকার পেয়েছেন অসংখ্য মানুষ!

* * *

শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম 1901 সালের 4ঠা জানুয়ারী—মামারবাড়ি খুলনা জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে। বাবার নাম নিবারণচন্দ্র, মা— সরোজবাসিনী। পৈতৃক নিবাস—চব্বিশ পরগণা জেলার বোড়াল গ্রাম।

বাবাকে হারিয়েছিলেন মাত্র আড়াই বছর বয়সে: ছোট-বেলাটা কেটেছে মামারবাড়িতে। শিবপ্রসাদের বয়স যখন বছর এগারো-বারো—এক বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল গোবিন্দপুরের বাড়ি। মা সরোজবাসিনী ছেলেকে নিয়ে যখন দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন—হরিলাল বসু নামে জনৈক শুভানুধ্যায়ী এসে শিবপ্রসাদের দায়িত্ব নিলেন। তাকে নিয়ে এলেন ইছামতীর তীরে, টাকীর উল্টোদিকে টাউন শ্রীপুর গ্রামে।

সে সময় টাউন শ্রীপুরে নতুন স্কুল খুলেছেন খুলনার

শরৎ রায়চৌধুরী। তার আগে ঐ অঞ্চলের সব ছেলেরা নদী পেরিয়ে পড়তে যেতো টাকী স্কুলে। টাউন শ্রীপুরের নতুন স্কুল খোলার পেছনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সক্রিয় সাহায্য ছিল। হরিলাল বসু ঐ স্কুলেরই এইট্‌থ্‌ ক্লাসে (এখনকার ক্লাস থ্রি) ভর্তি করে দিলেন শিবপ্রসাদকে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র মাঝে মাঝে আসতেন ঐ স্কুলে; ওঁর সঙ্গে শিবপ্রসাদের পরিচয় হয় সেখানেই। স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে শিবপ্রসাদ বলেছেন—বাবার চেম্বারটা আমার আবছা আবছা মনে ছিল; ওঁর ছিল ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। ঐ দাড়ির জন্যই কিনা জানি না—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করতাম।...আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে সেই যে পরিচয়—আজীবন তাঁর আর সঙ্গ ছাড়েননি তিনি। একটু বড় হতেই চলে এসেছিলেন পৈত্রিক গ্রাম বোড়ালে; ভর্তি হয়েছিলেন বোড়াল হাইস্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগটা তখন আরও দৃঢ় হয়। সপ্তাহে অন্ততঃ দুদিন যেতেন সায়েন্স কলেজে—আচার্যের কাছে। কথা হতো নানান বিষয়ে; চাষবাসের কাজে যা কিছু প্রেরণা তা পেয়েছেন ওঁর কাছ থেকেই। পরবর্তীকালে নিজের ক্ষেতে যা কিছু গবেষণা করেছেন সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন পরামর্শ নিয়েছেন ওঁর কাছ থেকে।

কলকাতার দক্ষিণে গড়িয়া ছাড়িয়ে বোড়াল—বেশ বড়সড় বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সারাজীবনে শিবপ্রসাদের যা কিছু সাধনা তা ঐ বোড়ালের নিজস্ব এক ছোট্ট খামারে। ওঁর গবেষণায় প্রথম সাফল্য আসে বীট ও পালং-এর বর্ণসংকরে তৈরি অতিকায় এক পালং-এ। ওঁর তৈরি ব্যানার্জীস্‌ জায়েণ্ট পরীক্ষা করে মেঘনাদ সাহা এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা রায় দিলেন—শিবপ্রসাদের মিশ্রণটি পুরোপুরি বিজ্ঞান-সম্মত। পরবর্তী সময়ে আরও উন্নত জাতের পালং তৈরি করেছেন তিনি—নাম যার 'সরবতী পালং'। ওঁর তৈরি ঐ পালংকে কাঁচা অবস্থায় সরবৎ বানিয়ে খাওয়া যায়। রান্না করতে গিয়ে পালং শাকের খাদ্যগুণ অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়ঃ সেদিক থেকে কড়াইশুঁটি অথবা বাদামের গন্ধওয়ালা মিষ্টি স্বাদের সরবতী পালং শরীরে বাড়তি ভিটামিন যোগানোর এক রাস্তা খুলে দিয়ে ছিল।

এসব 1933 সালের কথা। বছর কয়েক বাদে শিবপ্রসাদ তৈরি করলেন নতুন এক কপি জাতীয় সবজি—নাম দিলেন 'পলি ফ্লাওয়ার'। 1939—40 সালে ইটালীয়ান ব্রাকোলীর সাথে দেশী ফুলকপি 'ব্রিড' করে পেলেন ঐ 'পলি' কে। তার আবার গন্ধটা তেমন জুৎসই নয় বলে, 'কেল' নামে এক ধরনের ঝুঁটি-বিহীন বাঁধাকপির সঙ্গে 'ব্রিড' করালেন তাকে। এর ফলে পাওয়া গেল বড় আকারের 'পলি'—স্বাদ গন্ধে যা অতুলনীয়।

শুধু কি পালং আর কপি-ই বানিয়েছেন শিবপ্রসাদ? মোটেই না। সবজির পাশাপাশি তৈরি করেছেন অন্ততঃ 25 জাতের গোলাপ ফুল। সেগুলি নথিভুক্ত হয়েছে 'আমেরিকান রোজ সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া'তে। বুনো গোলাপের খোঁজে উনি ঘুরে বেড়িয়েছেন জলে জঙ্গলে। একবার মুর্শিদাবাদে গিয়ে শুনলেন—কাছেই নদীর চড়ায় নলখাগড়ার বনে নতুন ধরনের এক গোলাপ দেখা যায়। অমনি তিনি ছুটলেন সেই গোলাপের খোঁজে। সে গোলাপ নিয়ে এসে পরীক্ষা করে দেখলেন—বিশ ফুট জলের নিচে তিনমাস ডুবে থাকলেও মরে না তা। শুরু হলো সেই গোলাপের সংকর জাত তৈরির চেষ্টা।

এছাড়াও রয়েছে শিবপ্রসাদের তৈরি প্রায় বারো-তের রকমের সংকর টোমাটো—আঙুরের মতো, আমের মতো, পটোলের মতো দেখতে তাদের। বেল, বাতাবীলেবু, পেয়ারা, কাঁঠাল—এসবেরও উন্নত প্রজাতি তৈরির জন্য এক-সময় গবেষণা চালিয়েছেন উনি।

শিবপ্রসাদের আর এক অবদান—'গোলাকার' বা 'ফলিয়ার ফীড'। 1955 সালে এই সার তৈরি করেন তিনি। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর যে সার তিনি বানালেন তার ব্যবহারে ফসলের পরিমাণ যেমন বাড়ে তেমনি তাতে সেচের প্রয়োজনও হয় অন্ততঃ চল্লিশ শতাংশ কম। স্থানীয় চাষীদের কপি অথবা তাই চুং ধানের ফলন বাড়াতে 'ফলিয়ার ফীড' যথেষ্ট কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছিল। নিজের তৈরি সার চাষীদের মধ্যে বিলোনোর সময় তিনি নিজের তৈরি ছড়া কাটতেনঃ

মাত্রাটা অতিকম কিলো দুই একরে
চালু আছে যত সার এত কাজ কে করে?

শিবপ্রসাদের তৈরি সেই অভিনব সার ব্যবহার করে বাড়ির ছাদেও ধান চাষ করা সম্ভব হয়েছিল। সেই সময় খবরের কাগজে 'গৃহশীর্ষে ধান চাষ'—এই শিরোনামে শিবপ্রসাদের কৃতিত্ব ফলাও করে ছাপা হয়। দক্ষিণ বাংলার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের চাষীদের কাছে 'ফলিয়ার ফীড' এক সময় এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে তিন টাকার সার কেনার জন্য লোকে পাঁচ টাকা খরচ করে এসে সারাদিন পড়ে থাকতো শিবপ্রসাদের বাড়িতে।

না, আর্থিক এবং পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার দরুণ শিবপ্রসাদ তাঁর 'ফলিয়ার ফীড' নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা চালাতে পারেন নি। শুধু ঐ মিশ্রসার-ই নয়, ফুল ফল নিয়ে ওঁর বহু গবেষণাই অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। নিজের কাজের স্বীকৃতি যে পান নি উনি, তা নয়। 1984 সালে কল্যাণীর বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ওঁকে 'ডক্টরেট অফ সায়েন্স' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে; কিন্তু তাতে যে উনি তৃপ্তি পেয়েছেন এমনটা মনে হয় না। ওঁর গবেষণার কাজকে সম্পূর্ণ করতে সরকার বা কোন বিশ্ববিদ্যালয় যে আজও এগিয়ে আসে নি—সে কি কম ক্ষোভের কথা?

সাইকেলে চেপে টো-টো করে ঘুরে বেড়ানো শিবপ্রসাদকে দেখে মনেই হবে না ইতিমধ্যে উনি চুরাশী বছরে পা দিয়েছেন। শরীরটা শীর্ণ, চুলগুলো ধবধবে সাদা—অথচ মুখে সব সময় লেগে রয়েছে সজীবতার প্রতীক এক অদ্ভুত শিশুসুলভ হাসি। এক রোববারের সকালে —ওঁর সঙ্গে দেখা হতে একথা সেকথার পর জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এখন কি নিয়ে গবেষণা করছেন?

—মানুষকে নিয়ে। হেসে জবাব দিয়েছিলেন উনি।

আমি হাঁ করে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। উনি হেসে বলেছিলেন—প্রকৃতির বিচিত্রতম জীবটিকে নিয়েই এবারে পড়েছি। মানুষ কি করে মানুষ হয়ে উঠতে পারে—সে সম্পর্কে গবেষণা শুরু হওয়া উচিৎ নয় কি?

পরিবেশ দূষণের ভয়াবহ দিকটা নিয়েও যথেষ্ট চিন্তিত দেখাচ্ছিলো ওঁকে। বললেন—আমাদের এই বোড়ালের চারপাশে এখন শ'য়ে শ'য়ে ইঁটখোলা গড়ে উঠছে; ওগুলোর ধোঁয়ায় চারপাশের গাছগাছালি সব শুকিয়ে যাচ্ছে! এই তো কাছেই এক কারখানায় বছরে চারহাজার মণ কাঁচা কয়লা পোড়ে—অথচ ওখানে শ্রমিক বলতে বারো জন কি চোদ্দ জন। ওই কজন মানুষের রুটি-রুজি আর মালিকের লোভের সামাল দিতে গিয়ে এ অঞ্চলের নারকেল গাছগুলোর ফলন হয়েছে অর্ধেক। সজনে ডাঁটা, জাম আর আগের মতো হয় না। আম ফলে, কিন্তু কচি থাকতেই সব শুকিয়ে যায়। গ্রামের লোকের ফল-পাকুড় থেকে যেটুকু আয় হতো—তা বন্ধ। শুধু কি তাই? আমাদের মতো বুড়ো মানুষেরা সব ভুগছে হাঁফ-কাশিতে। দূষণের মোকাবিলা কিভাবে সম্ভব তা ভেবেছেন কখনো? জিজ্ঞাসা করেছিলাম ওঁকে।

—কলকারখানা একেবারে বন্ধ করাটাতো চলবে না। স্পষ্ট জবাব দিয়েছিলেন উনি। তবে বড় বড় শহরকে ঘিরে সবুজ বলয় গড়ে তুলতে হবে। প্রকৃতির সঙ্গে সেখানে কোন বিরোধ রাখা চলবে না। সহাবস্থানের নীতি অবলম্বন করে সেই সবুজ বলয়ের মাঝে চাষবাস চালাতে হবে—ছোটখাটো শিল্পও থাকতে পারে তবে শহরগুলোকে আর বাড়তে দেওয়া ঠিক হবে না।

বললাম কৃষিবিজ্ঞানের নানান শাখার দুনিয়ায় আজ কত গবেষণা হচ্ছে—সেসব জানতে ইচ্ছে করে না?

আমার দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে উনি বললেন—এই ম্যাগাজিন পড়ার আর সুযোগ পেলাম কই? সারাজীবনে যা কিছু শিখলাম—সবই প্রকৃতির কাছ থেকে। গাছপালা —পোকামাকড়—কুকুর-বেড়াল-মৌমাছি—সবার কাছ থেকে শিখেছি। এ বিষয়ে আমার নিজের লেখা একটা কবিতা শোনাই বরং—

পশুত্ব থেকে দেবত্বে যেতে জাগে যত জিজ্ঞাসা—
অবচেতনের আঁধারে যে জট গোপনে বেঁধেছে বাসা ঃ
অভূতপূর্ব যত সমস্যা এ যুগে দিয়েছে দেখা,
সমাধান তার ইঙ্গিতে আছে প্রকৃতির বুকে লেখা।

—বলেই সাইকেলের প্যাডেলে পা-রাখলেন চুরাশী বছরের তরুণ শিবপ্রসাদ।

ছুটি কাটাতে বাইরে যাবেন? কি করে?

ছুটিতে দেখবার মত বেড়াবার মত পশ্চিমবঙ্গে কত জায়গাই তো আছে। রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা দূর-পাল্লা বাস-সার্ভিসের মধ্য দিয়ে নিম্নলিখিত দ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে নিয়মিত যাতায়াতের ব্যবস্থা রেখেছে অল্প সময়ে ও কম খরচে।

"বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, চিত্তরঞ্জন, পুরুলিয়া, দীঘা, ডায়মণ্ড-হারবার, হলদিয়া, ঝাড়গ্রাম, জয়রামবাটী, কেওনঝড়, কাকদ্বীপ, কামারপুকুর, নামখানা, পলাশী, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, রামপুরহাট, নবদ্বীপ, রায়দীঘি, রায়চক্, বক্রেশ্বর, তারাপীঠ, শান্তিনিকেতন, রাঁচী, সাঁওতালডিহি, কৃষ্ণনগর, ফারাক্কা, বাসন্তী, ইটিণ্ডাঘাট, রাইদীঘি।"

এসব জায়গায় এবং আরও অন্যান্য জায়গায় আমাদের নিয়মিত দূর-পাল্লার সার্ভিস চালু আছে।

টিকিট প্রাপ্তিস্থান ঃ—দূর পাল্লার বাস স্টেশন।

এসপ্লানেড—ফোন নং—২৩-১৯১৬।

উল্টোডাঙ্গা—ফোন নং—৩৫-৪৭৬৬।

কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা,

৪৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ

কলিকাতা—৭০০০১৩।

বিজ্ঞানব্রতী সত্যেন্দ্রনাথ

কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছু মানুষকে পিলসুজের সঙ্গে তুলনা করা চলে। পিলসুজ যেমন মাথায় প্রদীপ ধরে চারপাশ আলোয় ভরিয়ে দেয়, কিন্তু নিজেকে প্রদীপের নিচের অন্ধকারে আড়াল করে রাখে, তেমনি ঐ ব্যক্তিগণ মানুষের অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করার ভার মাথায় নিয়ে সারা-জীবন কঠোর পরিশ্রম করে যান নিজেকে অতি সাধারণ করে রেখে, এমনই এক মানুষ হলেন সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। তিনি ছাত্র জীবনেই সকল মানুষকে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের আকাঙ্ক্ষায় লেখনী ধারণ করেছিলেন। যে সময় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার সম্ভাবনা নিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী বিজ্ঞানীদের মধ্যে তুমুল মতপার্থক্য চলছে, অন্য-দিকে খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণ কিছু কিছু বিজ্ঞানের বিষয়কে বাংলা ভাষার মাধ্যমে রসাল গল্পাকারে পাঠক মহলে পরিবেশন করছেন সেই সময় শুধু বিজ্ঞান বিষয়গুলি নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে শুরু করেছিলেন যে কয়জন মনীষী সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁদেরই একজন। এই মনীষিগণের কৃতিত্বের ফসল 'বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্য।'

সত্যেনবাবুদের আদি বাড়ি ছিল বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত বিক্রমপুর কামারখাঁড়া অঞ্চলে। তাঁর পিতা শ্রী গিরিজাশঙ্কর সেনগুপ্ত আসামে ডাক্তারী করতেন। ওখানেই সত্যেনবাবুর জন্ম, বাল্যকাল ও স্কুল জীবন অতিবাহিত হয়। পড়াশুনার শুরু থেকেই তিনি অন্য বিষয় অপেক্ষা সাহিত্য বেশি পছন্দ করতেন। সাহিত্য নিয়ে পড়বার আকাঙ্ক্ষাই তাঁর ছিল। কিন্তু বড়দের ইচ্ছায় তাঁকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে হয়। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজ থেকে রসায়ন বিদ্যায় স্নাতক হন। এই সময় থেকে তিনি শিশুসাথী পত্রিকায় ছোটদের উপযোগী করে বিজ্ঞান প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে তিনি বিজ্ঞান গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে ইচ্ছা করেন, এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কাছে আবেদন করেন। বিজ্ঞানাচার্য তাঁর পরীক্ষার ফল দেখে খুশী হয়ে তাঁকে তাঁর সহকর্মী পদে নিযুক্ত করেন। 1924 খ্রীস্টাব্দে তিনি বিজ্ঞান মন্দিরে যোগ দেন। এখানে তিনি বহুবিজ্ঞানীর সান্নিধ্যে আসেন। তিনি আচার্যদেবের বিস্ময়কর উদ্ভাবন ক্রেস্কোগ্রাফ নিয়ে কাজ করতেন। ক্রেস্কোগ্রাফের দ্বারা উদ্ভিদের বৃদ্ধি দশ হাজার গুণ বর্ধিত করে নির্ণয় করা যায়। এই পরীক্ষায় ভূষাকালী মাখা কাঁচে সূচকের সাহায্যে বিন্দু বিন্দু আকারে বৃদ্ধির চিহ্ন পড়ে। এই কাচ ফলক থেকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে এর ফল নির্ণয় করার কাজ করতেন সত্যেনবাবু। তিনি কৌতূহলী হয়ে আলোক চিত্রের সাহায্যে এর ফল নির্ণয় করার চেষ্টা করেন এবং সফল হন। কিন্তু তাঁর সহকর্মীগণ এই ব্যাপারটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। এতে তিনি আশাহত হন এবং এই অধীনতামূলক রুটিনবদ্ধ আনন্দহীন গবেষণা ছেড়ে দেবেন বলে মনস্থির করেন।

প্রবন্ধ লেখার প্রতিই তাঁর আকর্ষণ ছিল বেশি। এর মধ্যে তাঁর লেখা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই সময় ডঃ সত্যচরণ লাহা তাঁর শিক্ষক অধ্যাপক বিপিন বিহারী গুপ্তের পরামর্শে বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞান পত্রিকা 'প্রকৃতি' প্রকাশ করেন। ডঃ লাহা সত্যেন বাবুর লেখা পড়ে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে এই পত্রিকা পরিচালনার ভার

গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। সত্যেনবাবু আনন্দের সঙ্গে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই পত্রিকায় অনেক যশস্বী বিজ্ঞানীদের লেখা প্রকাশিত হতে শুরু হয়। পত্রিকা চালনাকালে তিনি আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র, মেঘনাদ সাহা প্রমুখ বিজ্ঞানীগণের প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

প্রকৃতিতে সত্যেনবাবু নামে ও বেনামে অনেক লিখেছেন। অনেকে ইংরাজিতে লেখা পাঠাতেন। তিনি সেগুলি বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতেন। এই সময় ভিয়েনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রেক্টার এবং প্ল্যান্ট ফিজিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ডাক্তার হান্‌স্‌ মলীস বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আসেন। তিনি 'দীপক উদ্ভিদ' ও 'মাইক্রো কেমিস্ট্রি' সম্বন্ধে গবেষণা করতেন। এদেশে প্রকৃতি প্রেমিক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে নির্গত সজীব আলোর সন্ধান পেয়েছিলেন, সম্ভবত এগুলি পরীক্ষা করে দেখতেই ভিয়েনার বিজ্ঞানী এদেশে এসেছিলেন। তাঁর লেখা 'সজীব আলোক' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকৃতির বাংলা 1335 সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিদেশী বিজ্ঞানীর কাছ থেকে রচনাটি সংগ্রহ করে অনুবাদ করেছিলেন সত্যেন বাবু। তিনি শিশুসাথী, মাসপয়লা, অতিথি, বাংলার খাতা, সোনার বাংলা, কিশোর ভারতী, আত্মশক্তি, বসুমতী, যুগান্তর প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় লিখেছেন। এছাড়াও তিনি 'উদ্ভিদের চেতনা' ও 'গাছের কথা' নামে দুখানি পুস্তক লিখেছিলেন। উদ্ভিদের চেতনা প্রকাশিত হয়েছিল এবং পাঠক মহলে প্রশংসিত হয়েছিল।

তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন বিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে পাঠ্য পুস্তকের গণ্ডি পার করে এনে সমস্ত পাঠক পাঠিকার আগ্রহের বিষয় করে তোলার জন্য। শ্রীপরিমল গোস্বামী একবার যুগান্তরে প্রকাশের জন্য তাঁকে প্রবন্ধ লিখতে অনুরোধ করেন। তিনি যুগান্তরে প্রবন্ধ পাঠিয়ে দেন। ঐ পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। পরে আরও অনেক প্রবন্ধই তিনি যুগান্তরে লিখেছেন। তিনি এত লিখতেন কিন্তু লেখার জন্য আর্থিক সাম্মানিক গ্রহণ করতেন না।

ডঃ সত্যচরণ লাহা ছিলেন পক্ষিবিশারদ। তাঁর সঙ্গী ছিলেন সত্যেনবাবু। পাখিদের বিষয়ে তাঁর সংগৃহীত অনেক তথ্য ভারতকোষে প্রকাশিত হয়েছে।

এসব ছাড়াও তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ছিলেন। বর্তমানে বাংলা দেশের অন্তর্গত বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে অল্প কিছুদিন অধ্যাপনা করেছিলেন। সারাজীবন মর্যাদার সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করে চলেছেন। আজ 87 বছর বয়সে দমদমে 229 নগেন্দ্র নাথ রোডে নিজের বাড়িতে বসে অতীতের স্মৃতিচারণ করতে করতে বললেন, 'সে যুগটা ছিল মনীষীদের যুগ, অনেকেই খ্যাতিমান, কিন্তু কেউই যশের কাঙাল নন। সকলেই কিছু করবার আকাঙ্ক্ষায় ব্যস্ত।'

কার্টুন ঃ রেবতীভূষণ

বসুবিজ্ঞান মন্দিরের আশু-বিনয়বাবু

বিনয়কৃষ্ণ দত্ত

আশুতোষ গুহঠাকুরতা

দিবাকর সেন

এখন যাঁরা নতুন এসেছেন তাঁরা হয়ত অনেকেই চিনবেন না। কিন্তু বসু বিজ্ঞান মন্দিরে যাঁরা অন্তত পনেরো বছরের পুরোনো তাঁদের কাছে আশু-বিনয়বাবু নামটি খুবই পরিচিত। আশু-বিনয়বাবু নামে মানুষদু'টি এক সময় আলাদা আলাদা নামে চিহ্নিত হতেন। পরবর্তী পর্যায়ে কে আশুবাবু আর কে বিনয়বাবু এ নিয়ে গোলমাল হতো। ক্রমশ কালের ব্যবধানে মানুষদু'টিকে সবাই আশুবিনয়বাবু নামে সম্বোধন শুরু করে।

ব্যাপারটা গোড়া থেকেই বলি। 1923 সালের কথা। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ইয়োরোপে তাঁর ষষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সফরের জন্য তৈরি হচ্ছেন। প্রস্তুতি পর্বের শেষলগ্নে তিনি ঠিক করলেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আরও দু'জন বিজ্ঞানকর্মী নিয়োগ করবেন। খবর পেয়ে নির্দিষ্ট দিনে হাজির হলেন অনেক কর্মপ্রার্থী। কর্মী নেওয়ার ব্যাপারে আচার্যদেবের একটি সুচিন্তিত নিজস্ব ধারণা ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন বিজ্ঞান গবেষণার প্রশ্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিই শেষ কথা নয়। তাই কর্মী নিয়োগের সময় তিনি নিজে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখতেন। প্রার্থীদের সঙ্গে নিজে কথা বলতেন।

নির্দিষ্ট দিনে আচার্যদেব সমাগত প্রার্থীদের সঙ্গে কথা বললেন। সেদিন বিকেলেই জানিয়ে দেওয়া হ'ল সফল প্রার্থীদের নাম। একজন আশুতোষ গুহঠাকুরতা। অন্য জন বিনয়কৃষ্ণ দত্ত। এদের কোন উচ্চ ডিগ্রি ছিল না। যে দৃষ্টিকোণ থেকে জগদীশচন্দ্র একদিন বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যকে নিয়োগ করেছিলেন এঁরা তাঁর ব্যতিক্রম ছিলেন না। 1923 সাল থেকে 1931। এই আট বছর কাল এরা দু'জনেই ছিলেন বিজ্ঞান মন্দিরের প্রবীণ কর্মীদের সহকারী হিসেবে। সে সময় বিজ্ঞান মন্দিরের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। কর্মী সংখ্যাও ছিল খুব কম। সবাই ছিলেন যেন এক পরিবারের মানুষ জনের মত। তাই সবাইকে গবেষণা সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষার সবরকম কাজ নিজে হাতে করতে হতো। সাহায্যের জন্য বেয়ারার প্রচলন ছিল না। এছাড়া গবেষণা পত্রের পাণ্ডুলিপি টাইপ করা, যন্ত্রের ছবি আঁকা, ফটো তোলা ইত্যাদি সব রকম কাজ সবাইকে ভাগ করে করতে হতো। 1929 সাল পর্যন্ত আশুবাবু ও বিনয়বাবুর এভাবেই কেটে গেল। এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞান মন্দিরের সব গবেষণাপত্র আচার্যদেবের তত্ত্বাবধানে ও তাঁর নামে প্রকাশিত হত। সহকারী হিসেবে বিজ্ঞানকর্মীদের নাম থাকতো।

1929 সালের শেষভাগের কথা। আচার্যদেব বিজ্ঞান মন্দিরের প্রবীণ কর্মীদের ডেকে বললেন তাঁর বয়েস হয়েছে। তিনি আর বিশেষভাবে কিছু দেখাশুনো করতে পারবেন না। বিশ্রাম প্রয়োজন। ছাত্রদের স্বাবলম্বী হতে হবে। নিজের গবেষণা নিজেই করতে হবে। এর পর তিনি আশুবাবু ও বিনয়বাবুকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "তোমরা দু' জনে একসঙ্গে কাজ শুরু কর।" আচার্যদেবের এ সিদ্ধান্ত ছিল যথাযথ। কারণ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, আশুবাবুর ভেতর সমসাময়িক বিজ্ঞানের কাজ সম্পর্কে পড়াশুনো করার একটা প্রবণতা রয়েছে। অন্যদিকে বিনয়বাবুর ভেতর রয়েছে যন্ত্র নির্মাণের এক আশ্চর্য সহজাত প্রতিভা।

আচার্যদেবের নির্দেশিত পথে দু'জন কাজ শুরু করলেন। দু'য়ের কর্মক্ষমতা একত্রীকরণের ফলে প্রতি বছর নতুন নতুন গবেষণাপত্র ছাপা হতে আরম্ভ হলো। সে সময়

বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি করার কোন প্রশ্ন ছিল না। আচার্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি কাজে লাগিয়ে বা অনেক সময় যন্ত্রপাতির কিছু রদবদল করে নানা বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধানে তারা নিজেদের নিয়োজিত করলেন।

আশু-বিনয়বাবু সর্বমোট পঞ্চাশ বছর কাল বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁরা শতাধিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই সব কাজের বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিল।

বনচাঁড়াল গাছের স্বতঃস্পন্দন যে বিশেষ শক্তি সরবরাহের উপর নির্ভরশীল—এ তথ্য তাঁদের গবেষণায় উদ্ঘাটিত হয়েছিল। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখান, "অপরিণত অবস্থায় পাতার স্পন্দন রাতের বেলায় থেমে থাকে, কিন্তু গ্লুকোজ প্রয়োগ করলে ঐ স্পন্দন রাত দিন অবিরামভাবে চলতে থাকে। ···কচি পাতায় ক্লোরোফিলের পরিমাণ কম থাকায় পাতার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ কর্বোহাইড্রেট সঞ্চিত হতে পারে না এবং তার ফলে সঞ্চিত শক্তি নিঃশেষিত হওয়ায় রাতের বেলায় স্পন্দন থেমে যায়।" অন্য একটি পরীক্ষায় তাঁরা দেখিয়েছিলেন স্পন্দনজনিত উত্থান-পতনে শ্বাসক্রিয়ার গতি একই রকম থাকে না। গ্লুকোজ প্রয়োগে শ্বাসক্রিয়ার গতি প্রায় তিনগুণ বেড়ে যায়। বনচাঁড়াল গাছের স্পন্দনে অক্সিজেন অপরিহার্য এ তথ্য সে সময় জানা ছিল। আশু বিনয়বাবু এ সম্বন্ধীয় একটি গবেষণার পর নতুন একটি সিদ্ধান্তে আসেন। বায়ুর চাপ কমালে বনচাঁড়ালের স্পন্দনের হার কমে যায়। কিন্তু অক্সিজেনের স্বাভাবিক পরিমাণ অক্ষুণ্ন রেখে 500 মিলিমিটার চাপ কমালেও গাছটির স্পন্দনের কোন তারতম্য ঘটে না।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় ত্রিশ বছর পরে ষাটের দশকে আশু-বিনয়বাবু জগদীশচন্দ্রের "ফাইটোগ্রাফ" যন্ত্রের সঙ্গে আধুনিক 'ইলেকট্রনিক' যন্ত্রের সংযোগ ঘটিয়ে বনচাঁড়াল গাছের বৈদ্যুতিক লিপি নিয়ে পরীক্ষা করেন। প্রাপ্তলিপি যেন মানুষের হৃদপিণ্ডের বৈদ্যুতিক সাড়ার প্রতিচ্ছবি। জগদীশচন্দ্র এ পরীক্ষা করেছিলেন তখনকার যান্ত্রিক ব্যবস্থায় ও গ্যালভানোমিটারের সাহায্যে। সে সময় জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে অনেকে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু ষাটের দশকের এই পরীক্ষা জগদীশচন্দ্রের সিদ্ধান্তকেই প্রতিষ্ঠা করেছিল। আশুবিনয় বাবু ছিলেন নীরব কর্মী। প্রচার বিমুখ। নীরবে কাজ করে গেছেন। কোন সম্মান তাঁদের ভাগ্যে জোটে নি। 1979 সালের ডিসেম্বর মাসে বিনয়বাবু মারা যান। 1980 সালের 30শে নভেম্বর তারিখে বিজ্ঞান-মন্দিরের তরফ থেকে আশু-বিনয়বাবুকে হীরক জয়ন্তী রৌপ্য পদক প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়।

আশুবাবু আজও জীবিত। বর্তমানে আশুবাবুর সময় কাটে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা আর দর্শনের বইপত্র নিয়ে। বিশদভাবে কিছু পড়াশুনো করতে পারেন না। শরীর সুস্থ নয়। এক সময় গবেষণার বাইরেও নানা ধরনের প্রবন্ধ লিখতেন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়।

ছোটদের সেরা বই

সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

দূরদিগন্তের ঝড় ১০৲

রিন্টু চট্টোপাধ্যায়

কবি কালিদাস ১০৲

শুভদেব চক্রবর্তী অনুদিত

কুয়োভাদিস ১২৲

অচিন চৌধুরী

ছোটদের চার্লি চ্যাপলিন ১২৲

এনিড ব্লাইটন

তুষার পাহাড়ের রহস্য ১২৲

প্রেমেন্দ্র মিত্র

নোবেলজয়ী মণিমাণিক্য ১৫৲

রিন্টু চট্টোপাধ্যায়

মারাঠাসূর্য শিবাজী ৭৲

হাননান আহ্‌সান

গ্রিমভাইদের রূপকথা ৮৲

অধীর বিশ্বাস

চোর শালিক আর ভূত ৮৲

আলেকজাণ্ডার ডুমা

দি কাউণ্ট অব মণ্টিক্রিস্টো ১০৲

অধীর বিশ্বাস

রূপোর বিছে ৮৲

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

মড়া যদি জ্যান্ত হয় ১২৲

চিরঞ্জীব সেন

কাসিমের জুতো রহস্য ৮৲

রাইডার হ্যাগার্ড

কিং সালোমনস্ মাইনস্ ১৫৲

গীতাঞ্জলি প্রকাশনী

শৈব্যা পুস্তকালয়

৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কল-৭৩

বাঙলায় সাম্প্রতিক বিজ্ঞানচর্চা

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

উনিশশো চুয়াত্তর সাল থেকে আমাদের দেশে বিজ্ঞান যে একটি অবশ্যপাঠ্য বিষয় তা তোমরা অবশ্যই জানো। অবশ্যপাঠ্য হবার ফলে গত তেরো চোদ্দ বছর ধরে বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক তোমাদের পড়তেই হচ্ছে। মনে রাখতে হবে; বিজ্ঞানকে অবশ্যপাঠ্য করার জন্যে এবং বাঙলা অর্থাৎ আমাদের মাতৃভাষায় বিজ্ঞানকে সহজপাঠ্য করার পেছনে গত দেড়শো বছর ধরে আমাদের লেখক ও বৈজ্ঞানিকদের ক্লান্তিহীন চেষ্টা ও আমাদের শিক্ষাবিদ্‌দের অম্লান শুভেচ্ছা রয়ে গেছে। বাঙলায় বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসও লেখা হয়েছে কিছুকাল আগে। কিন্তু চর্চা তো থেমে নেই। সেইজন্যই একটু পুরোনো ইতিহাসের জের টেনে অতি সাম্প্রতিক কালে বাঙলায় বিজ্ঞানচর্চার মোটামুটি একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি। এ পরিচয়ে ব্যতিক্রম থাকলেও মূলত পাঠ্যপুস্তক রচনার বাইরে বিজ্ঞানচর্চার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। গত পঁচিশ বছরের কথা যদি ভাবি তাহলে দেখবে, বাঙলা

জগদীশ বসু

মেঘনাদ সাহা

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা যেমন পরিমাণে বেড়েছে তেমনি পরিবেশনের গুণে অনেকখানি সাধারণ পাঠকের কৌতূহল মেটাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু তার আগেও বাঙলায় বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে বিচিত্র বিষয়ে সহজবোধ্য রচনার যে চেষ্টা হয়েছে তা এখনকার সাধারণ পাঠক হয়তো কমই খবর রাখেন। অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদানন্দ রায়, সুকুমার রায় প্রমুখ লেখক ও বৈজ্ঞানিকদের কথা তো তোমরা সকলেই জানো।

পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ভূবিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদ-বিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে এই সব নামী লেখকেরা পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে এবং বই লিখে বয়স্ক এবং শিশু ও কিশোর পাঠকদের মাতৃভাষার সাহায্যেই বৈজ্ঞানিক মানসিকতা তৈরি করে দেবার চেষ্টা করে গেছেন। সাম্প্রতিক কালে বাঙলায় বিজ্ঞান চর্চার যে উৎসাহ বিচিত্র-মুখী তার পটভূমি হিসেবে পূর্বসূরীদের এই অক্লান্ত অনুশীলনের কথা মনে রাখতেই হবে। তেমনি মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে ও চেষ্টায় বিশ্ব-বিদ্যা-সংগ্রহ গ্রন্থমালার উদ্‌বোধনের ঘটনাটি। সাহিত্য সংস্কৃতি ধর্ম দর্শন ছাড়াও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যুগোপযোগী চিন্তাভাবনাকে সাধারণ পাঠকের হাতে পৌঁছে দেবার জন্যে বহু বিজ্ঞানী উৎসাহিত হয়ে বিজ্ঞানের নানা শাখায় সহজপাঠ্য বই লিখেছিলেন। এই ভাবেই চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে গণনাথ সেনের আয়ুর্বেদ পরিচয়, দুঃখহরণ চক্রবর্তীর রঞ্জন দ্রব্য, সুকুমাররঞ্জন দাসের হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা, সুকুমার সরকারের নভোরশ্মি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিব্যক্তি, প্রিয়দারঞ্জন রায়ের বিজ্ঞান ও বিশ্ব-জগৎ, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের বিশ্বের উপাদান, প্রমথনাথ সেনগুপ্তের নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ, সুধীররঞ্জন খাস্তগীরের বেতার, নীলরতন ধরের আমাদের খাদ্য, রাজশেখর বসুর ভারতের খনিজ, সর্বাণীসহায় গুহসরকারের রসায়নের ব্যবহার ইত্যাদি বিজ্ঞানের সহজপাঠ্য ভালো ভালো বই বেরিয়েছে।

পরবর্তীকালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে এবং বিশেষ করে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর চেষ্টায় জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা যেমন বিজ্ঞানের কঠিন বিষয়কে মাতৃ ভাষায় প্রকাশ করার সুযোগ করে দিয়েছে, তেমনি পঞ্চাশের দশকে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বিজ্ঞান-বিচিত্রা সিরিজ শিশু-কিশোরদের কাছে বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব ও তথ্য-গুলিকে গল্পচ্ছলে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা শুরু করেছে। এই সব চেষ্টার পাশাপাশি মাতৃ ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার ব্যক্তিগত চেষ্টা বেশ কিছু ভালো বই আমাদের হাতে পৌঁছে দিয়েছে। একদিকে যেমন শুভেন্দুকুমার মিত্রের সম্পাদনায় বৈজ্ঞানিক অভিধান বেরিয়েছে, বেরিয়েছে অমলেন্দু সেনের জীব অভিধান, অন্যদিকে ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ও পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর সম্পাদনায় ছোটদের বিশ্বকোষ কিশোরদের তথ্য-কৌতূহল মেটাতে শুরু করেছে। অন্য-দিকে তেমনি আবার মনে রাখবার মতো বই সমরেন্দ্রনাথ সেনের বিজ্ঞানের ইতিহাস। সমরেন্দ্রনাথ সেনের অদৃশ্য জগৎ আরও একটি উল্লেখযোগ্য বই। কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষের ভারতের বনৌষধি তেমনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্লাসিক বই। রাজেশ্বর রায়ের কৃষি-বিজ্ঞান কিংবা সুধীররঞ্জন দাসের উৎখনন-বিজ্ঞান বিজ্ঞানের বিশেষ

শাখার বিস্তৃত আলোচনা। এ জাতীয় বই অবশ্য আরো একটু বড়ো হলে তোমাদের ভালো লাগবে, কাজেও লাগবে।

এই ঐতিহ্যকে রক্ষা করেই বৈজ্ঞানিকেরা সাম্প্রতিককালে বিচিত্র বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ ও বইপত্তর লিখে চলেছেন। সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সমস্যা নিয়ে লেখা বিখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বিজ্ঞানের সংকট ও অন্যান্য প্রবন্ধ বইটি তো তোমাদের অবশ্যপাঠ্য বই। বৈজ্ঞানিক সমস্যাকে কত সহজ করে বলা যায় তার আদর্শ প্রমাণ এই বইটি। জীববিদ্যা ও শরীরবিদ্যা নিয়ে কতো রসিয়ে যে লেখা যায় তার প্রমাণ শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের লাবণ্যের অ্যানাটমি এবং অণুর উত্তরায়ণ। পৃথিবী ও তার পার্বত্য অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক অনেক আকর্ষণীয় তথ্য মনোরম ভঙ্গিতে বলা হয়েছে সুকুমার বসুর হিমালয় এবং ধরিত্রী এই দুটি বইতে। তেমনি উল্লেখ্য সংকর্ষণ রায়ের দুটি বই ভূতাত্ত্বিকের চোখে পশ্চিম বাঙলা এবং ভূতাত্ত্বিকের চোখে বিশ্বপ্রকৃতি। পরমাণু রহস্য নিয়ে খুবই উল্লেখযোগ্য দুটি বই শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় ও এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের পরমাণু জিজ্ঞাসা এবং দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের পরমাণুতত্ত্ব। দুটি বই-ই সাধারণ পাঠকের উপযোগী পরিচ্ছন্ন ভঙ্গিতে লেখা। প্রাণী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের বাঙলার কীটপতঙ্গ যেমন তোমাদের অবশ্য পাঠ্য, তেমনি অবশ্যপাঠ্য অজয় হোমের লেখা অন্তত দুটি বই ঃ বাঙলার পাখি এবং বিচিত্র জীবজন্তু। সম্প্রতি জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় একটি উল্লেখযোগ্য বই লিখেছেন ঃ পশুপাখির আচার ব্যবহার। জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং মহাকাশ নিয়েও একালের তরুণ বিজ্ঞানীরা সাধারণ পাঠকের উপযোগী বেশ কিছু বই লিখেছেন। জগদানন্দ রায় যেমন এককালে নক্ষত্র নিয়ে বই লিখেছিলেন তেমনি এ কালেও বিমান বসু আকর্ষণীয় দুটি বই লিখেছেন ঃ গ্রহ পরিচয় এবং নক্ষত্র

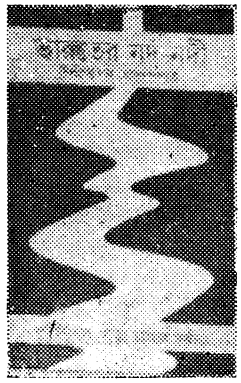

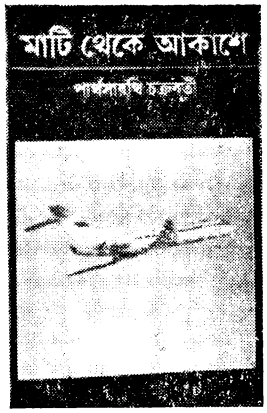

পরিচয়। অমল দাশগুপ্তের 'মহাকাশের ঠিকানা' বইটিও অবশ্য পাঠ্য। এককালে রাজশেখর বসু যেমন লিখেছিলেন ভারতের খনিজ কিছুকাল আগে দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ভারতের খনিজ সম্পদ। এই লেখকেরই আরেকটি উল্লেখযোগ্য বই ভারতের নদনদী।

পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন উপশাখায় অনেক উল্লেখযোগ্য বই বেরিয়েছে। নিছক পাঠ্য পুস্তকের চাহিদা ছাড়াও লেখার পরিচ্ছন্নতায় কয়েকটি তো খুবই আকর্ষণীয়। জয়ন্ত বসুর পদার্থ বিজ্ঞানের বিস্ময় এবং সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্রের পদার্থ বিকিরণ ও বিশ্ব এ জাতীয় দুটি বই। এই সূত্রেই আরো দুটি সুখপাঠ্য বইয়ের নাম করতে পারি ঃ অমিত চক্রবর্তীর সাত সমুদ্র এবং শচীনাথ মিত্রের জল ও সমুদ্র। অনেক দিন আগে বীরেশচন্দ্র গুহ জলের রূপকথা নামে এই জাতীয় সাধারণের পাঠযোগ্য একটি সুন্দর বই লিখেছিলেন। শক্তির উৎস ও ব্যবহার এখন বৈজ্ঞানিকদের কাছে খুব বড় পরীক্ষা ও সন্ধানের ক্ষেত্র। সিদ্ধার্থ ঘোষের সূর্য থেকে শক্তি কিংবা অমিতাভ রায়ের শক্তি ঃ বিভিন্ন উৎস এক্ষেত্রে নিশ্চয় তোমাদের প্রাথমিক কৌতূহল মেটাবে। এই সূত্রে আলোর কথা মনে পড়বে। সাধন দাসগুপ্তের লেখা আলো আরো আলো এ বিষয়ে খুবই সুখপাঠ্য একটি বই।

এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় থেকে নিশ্চয় সব রকম বিজ্ঞানের বইয়ের সামগ্রিক ধারণা করা যাবে না। তবু কত বিচিত্র বিষয়ে বৈজ্ঞানিকরা মাতৃভাষায় সাহস করে বই লিখছেন এবং শিশু কিশোর থেকে বয়স্ক পাঠকের কৌতূহল ও অতি প্রয়োজনীয় প্রাথমিক জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটাচ্ছেন তার আরো কিছু পরিচয় দিয়ে আলোচনা শেষ করি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সৌজন্যে লোকবিজ্ঞান গ্রন্থসিরিজে পুরোনো ও নতুন কিছু

বিজ্ঞানের বই প্রকাশ করছেন। গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদারের উদ্ভিদজীবন, প্রিয়দারঞ্জন রায়ের অতিকায় অণুর কাহিনী, বীরেন্দ্রনাথ বসুর কাচ ও কাচ শিল্প, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের পদার্থবিদ্যা (দু-খণ্ড) এই পর্যায়ে পড়ে। তাছাড়াও কতরকম আকর্ষণীয় বই প্রায়ই বেরোচ্ছে। স্থাপত্য-বিদ্যার ক্ষেত্রে নারায়ণ সান্যালের অপরূপা অজন্তা এবং কলিঙ্গের দেবদেউল তো আমাদের স্থায়ী সম্পদ। অমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের ব্যবহার-বিজ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যবহারিক মূল্য বুঝিয়ে দেবার ক্ষেত্রে বোধ হয় প্রথম চেষ্টা। রোগ, চিকিৎসা ইত্যাদি ব্যাপারে আমাদের সচেতনতা এসেছে অনেকটাই মাতৃভাষায় চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোচনা করে। অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেডিক্যাল অভিধান, অমিয় কুমার মজুমদারের হার্ট অ্যাটাক ও তার প্রতিকার, অমিয়কুমার হাটির ক্যানসার এবং রমেন মজুমদারের সুখাসনে সুখাহার প্রকাশিত অনেক বইয়ের মধ্যে সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য বই। এছাড়াও অরূপরতন ভট্টাচার্যের প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞান, অমরনাথ রায়ের সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া, অমল দাশগুপ্তের মানুষের ঠিকানা, সুনির্মল রায়ের চাঁদে পাড়ি, সমরজিৎ করের সম্পাদনায় স্টুডেন্টস বুক অব নলেজ ও অগ্রজবিজ্ঞানী, পার্থসারথি চক্রবর্তীর ছোটদের বিজ্ঞানকোষ, সুধাংশু পাত্রের বিশ্ব-পরিবেশ ও মানুষ, প্রাণেশ চক্রবর্তীর রক ক্লাইমবিং, সোমপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমপিউটার, অনাদিনাথ দাঁ-র ইলেকট্রনিক্স, কিংবা বিমান দাসগুপ্তের বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাস, অমল ভৌমিকের গণিত নিয়ে গণৎকারী অথবা শঙ্কর চক্রবর্তীর মহাবিশ্বে আমরা কি নিঃসঙ্গ ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ের আকর্ষণীয় আলোচনা বুঝিয়ে দেয় মাতৃ-ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চায় আমরা মোটেই পিছিয়ে নেই। এছাড়াও জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, অশোক বাগচি, সুবীর দত্ত, বিকাশ সিংহ ইত্যাদি অনেকেরই প্রকাশিত প্রবন্ধ তোমাদের নিশ্চয় মনোযোগ আকর্ষণ করবে। রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা আমাদের বিজ্ঞানজগৎ এবং গণিতচর্চা তোমাদের অনেক কৌতূহল মেটাবে। এছাড়া বিজ্ঞানের ধাঁধা, ক্যুইজ ইত্যাদির অনেক বই বেরোচ্ছে, মাথা খাটানোর জন্যে কিংবা একেবারেই পুরোনো বা খুবই সাম্প্রতিক তথ্য জানার জন্যে সেগুলির প্রয়োজন সম্পর্কে তোমাদের বলে দিতে হবে না। আর এই ব্যাপারে সোরগোল তুলেছে যে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকা সে তো তোমাদের সঙ্গেই রয়েছে।

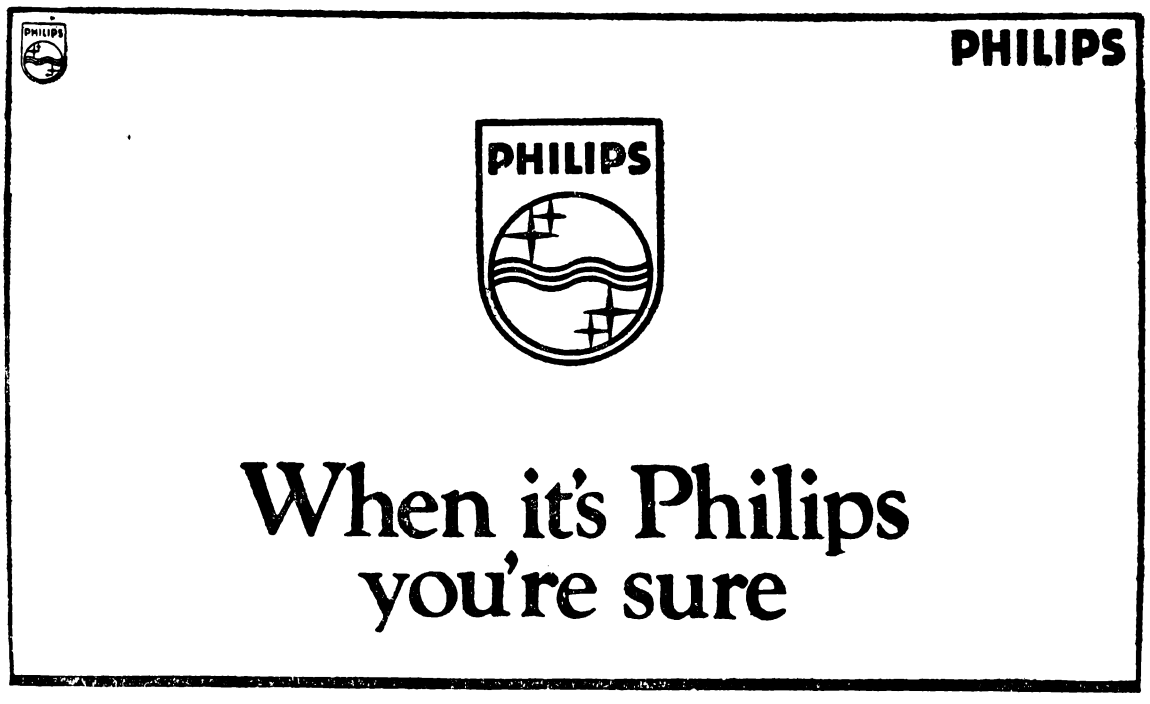

চিলড্রেনস্ গিফ্ট গ্রোথ ফান্ড ১৯৮৬

একটি বিনিয়োগ ৫ বছর অন্তর বোনাস ডিভিডেন্ডের সাথে যা ১২ গুণ অব্দি বাড়ে

ঠিক এর জন্যই আপনি অপেক্ষা করছিলেন। চিলড্রেনস গিফ্ট গ্রোথ ফান্ড ১৯৮৬ এমনিই এক প্রকল্প যা প্রিয় শিশুটির প্রতি আপনার যত্ন ও ভালবাসাকেই প্রকাশ করে তোলে।

এই প্রকল্পে আছে বছরে ১২.৫% হারে সুনিশ্চিত ডিভিডেন্ড যা আপনা থেকেই মূল বিনিয়োগের সাথে যোগ হয়। এবং প্রত্যেক ৫ বছরে আছে বিশেষ বোনাস ডিভিডেন্ড। এ সবের অর্থ হল আপনার উপহারটি ৬ বছরে দ্বিগুণ আর ২১ বছরে ১২ গুণ হয়ে যায়।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্যঃ

যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক, পিতামাতা, স্বজন বা শুভাকাঙ্খী, ১৫ বছরের নীচে যে কোন শিশুকেই এই উপহার দিতে পারেন। বয়স যাচাইয়ের প্রয়োজন নেই।

এই উপহার শিশুটির ২১ বছর বয়সে পূর্ণতা লাভ করে। ১৮ বছর বয়সেও ভাঙিয়ে নেওয়ার এক বিশেষ ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তার আগে মূল বিনিয়োগ বা ডিভিডেন্ড কোনটাতেই কেউ হাত দিতে পারবেন না।

ন্যূনতম ৫০টি ইউনিট এবং ১০-এর গুণিতকে যে কোন সংখ্যক ইউনিটের জন্য আপনি আবেদন করতে পারেন। কোন উর্ধ্বসীমা নেই।

১৯৮৬-র ফিনান্স অ্যাকটে উপহার কর ছাড়ের সীমা ২০,০০০টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

ইউনিট প্রতি ১০ টাকা সমহারে এই প্রকল্পটি সারা বছর চালু থাকে।

অনুগ্রহ করে আমাকে একটি বিনামূল্যে সি জি জি এফ পুস্তিকা পাঠান

নাম _____

ঠিকানা _____

পিন কোড _____

ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া

(একটি সরকারী ক্ষেত্রের আর্থিক সংস্থা)

প্রধান কার্যালয়: ১৩ স্যার ভিঠলদাস থ্যাকারসে মার্গ, (নিউমেরিন লাইনস), বোম্বাই ৪০০ ০২০ ফোন: ২৫৬৮৮৭

আঞ্চলিক কার্যালয়

২ ও ৪ ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা ৭০০ ০০১ ফোনঃ ২০৯৩৯১, ২০৬২৩৮

শাখা কার্যালয়

আশা নিবাস ২৪৬ লুইস রোড, ভুবনেশ্বর ৭৫১ ০১৪ ফোনঃ ৫৬১৪১

পি. ডি. চালিহা রোড, শিলুগুরি, গুয়াহাটি ৭৮১ ০০৩ ফোনঃ ২৩১৩১

জীবন দীপ বিল্ডিং, একজিবিশন রোড, পাটনা ৮০০ ০০১ ফোনঃ ২২৪৭০

Sista's-UTI/110-87-BEN

শতক যখন একুশে

আনন্দ বাগচী

টাইম স্পেসের ব্যাপার নিয়ে নিত্য মাথা খাটাই
শূন্যে যখন উড়ছে ঘুড়ি হাতের মধ্যে লাটাই।
চতুর্দিকে রহস্যেরা দানা বাঁধছে কেবল
দিনের বেলা ঘুরছে হাতে রাতের টাইম টেবল।
সব কিছু আজ উলট্-পালট গণ্ডগুলে ব্যাপার
সৌরকণায় হচ্ছে বোনা এই পৃথিবীর র‍্যাপার।
সভ্যতা ঠিক ঝুলছে যেন জন্মকানা বাদুড়
মেঘের ওপর মানুষ পাতে স্পেস-স্টেশনের মাদুর।
মহাশূন্যে দুইপা রাখা মাটির দিকে মগজ
অঙ্ককষে পাইনে হদিস ছিটের বহর ক' গজ!
চারদিকে সব ছায়ামানুষ আজগুবি কাণ্ড যে
নাস্তা-ডিনার সবকিছু খায় হোমিওপ্যাথির
ডোজে!
হাত ফোল্ডিং পা ফোল্ডিং, ইচ্ছে মাফিক বাড়ে
শরীরখানা ভাঁজ করা যায় ভেলকি দেখায় হাড়ে।
খুলির ভেতর মাইক্রো-ক্যাসেট, যন্তর-মন্তর
বোতাম-টেপা উনিশ শতক এখন গ্রহান্তর॥

★ ★ ★ ★

ছড়া

জয়ন্ত মণ্ডল

যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে ঘুরছে মানুষ গ্রহান্তরে
ভূ-সৃষ্টির তথ্য সকল হচ্ছে যে ভুল বারে বারে,
আজ যা জানি, পরে সে ভ্রম এমন যদি হয়
ভয় হয় তাই 'বিগব্যাঙ্গ' ওই ভুল না হয়ে যায়।

ঘুমের আগে পরে

সুনীল বসু

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন যখন উঠবে হঠাৎ ফুটে
তারই ছবি জলছবিতে দিব্যি যাবে উঠে—
সকাল বেলায় চোখ মুছে ভাই খুললে খাতা
দেখবে চেয়ে জলছবিতে ভরেই গেছে পাতা!
রাতের বেলায় বিছানাতে পড়বে যখন ঢুলে
তখন শুধু আবছা আলোয় রাখবে খাতা খুলে
ঘুমিয়ে থেকে দেখবে যত আবোল-তাবোল ছবি
সেই ছবিরই আঁকিবুকির পড়বে ছাপ সবই!
নীল বালিশের মধ্যে আছে তারের গোলকধাঁধা
সেই বালিশে রাখলে মাথা বাজবে যন্ত্রপাতি;
বাজনা শুনে পড়বে মনে পাখির গলা সাধা
ঘুমের বনে ফুটবে ফুল আপেল-ন্যাসপাতি!
মজার বালিশ স্বপ্ন বানায় মাথায় দিতে
স্বপ্ন আবার খাতায় ওঠে বিশেষ আলো লেগে,
ঘুম থেকে ভাই পড়লে উঠে শিশিরধোয়া প্রাতে
ঘুমের মধ্যে কি দেখেছি, যাবেও দেখা জেগে!

যন্ত্র-মানব

প্রবীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভোর না হতেই শ্রীমান রোবু বেড-টি নিয়ে হাজির,
যন্ত্র-মানব যান্ত্রিক বটে, বিচার-বোধটি কাজির!!
চায়ের সঙ্গে হাজির করে নিউজ-পেপার দৈনিক,
শিষ্টাচারে হার মেনে যায় সুশিক্ষিত সৈনিক!!
কাজ করে যায় নির্ভুল সব, হার মেনে যায় ঘড়ি,
মাইনে বাড়াও স্লোগান নেই, চায়না টাকা-কড়ি!!
রাতের বেলায় পাহারা দেয়, দিনেতে করে কাজ,
রাগ-রোষ নেই, অভিমান নেই, নেইকো কোন লাজ!!
এমন ভৃত্য গর্ব সবার,—বল এবং ভরসা
সুযোগ পেলেই টাকা-কড়ি হঠাৎ করে না ফর্সা!!
তবে রোবুর বিপদ অন্য, কথা কয় না মুখে,
মুখ দেখে তার যায় না বোঝা, দুঃখে আছে
না সুখে!!
সুখ-দুঃখের কথা কয় না, আলাপনে নয় সঙ্গী
সব কিছু তার নিয়মে বাঁধা, ভারী সিরিয়াস ভঙ্গী!!
চাই না এমন ভৃত্য-রোবট, চাই না শুধুই যন্ত্র,
রোবট-তন্ত্রে কিঞ্চিৎ থাক মানব-হৃদয় তন্ত্র!!

বাংলায় বিজ্ঞান পত্র-পত্রিকা

অশোক দাস

মানুষের লক্ষণ হল সে ভাবতে পারে, সে চিন্তা করতে পারে। আধুনিক দর্শনের মূল কথাই হল ঃ আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি। বিজ্ঞান হচ্ছে দর্শনের একটা অংশ। বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা তাই দার্শনিক হিসেবেই চিহ্নিত। আমাদের বাংলার জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা প্রমুখ বিজ্ঞানীরা চিন্তাবিদ এবং দার্শনিক। বিজ্ঞান অতি জটিল ও দুরূহ বিষয়, ওসব নিয়ে বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামাবেন, আমরা ওসবের কি বুঝি—এ মনোভাব ঠিক নয়। বিজ্ঞানের গবেষণা নিশ্চয় বিজ্ঞানীদের কাজ। কিন্তু সাধারণ লোককে বিজ্ঞান-মনস্ক হতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে তার অনুশীলন চাই। ধর্মের নামে আমাদের দেশে অনেক বুজরুকি চলে। তা মানুষের ক্ষতি করে। শুধু ধর্মের নামেই নয়, বিজ্ঞানের নামে সমান তালে কপটতা চলে। বিজ্ঞান-মনস্ক হলে তবেই আমরা এদের এড়িয়ে চলতে পারব। সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চা তাই এত প্রয়োজনীয়।

প্রাচীনকালে আমাদের ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা হত এবং আমরা ভারতবাসীরাও ছিলাম উন্নত। পরে বিজ্ঞানচর্চার অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জাতি হিসেবে আমাদের অধঃপতন শুরু হয়। এই অবস্থা চলতে থাকে গত শতাব্দীর প্রথম দিকেও। আধুনিক কালে বিদেশীদের এদেশে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নতুন করে বিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন হয়েছি। ইংরেজরাই আমাদের দেশে নতুন করে সূত্রপাত করল বিজ্ঞানচর্চার। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 1813 খ্রীস্টাব্দের যে সনদ পায় তাতে বলা ছিল যে প্রতি বছর অন্তত এক লক্ষ টাকা ভারতবর্ষের ইংরেজ অধিকৃত এলাকার অধিবাসীদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে হবে। উদ্দেশ্য হিসেবে বলা ছিল দুটি বিষয়ের। প্রথমত, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নতুন করে চালু করতে হবে এবং তাকে করতে হবে আরও উন্নত। দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা এদেশে প্রচলন করতে হবে। এই হল শুরু। পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার আরম্ভ এখান থেকে। বিশদ আলোচনায় যাচ্ছি না। এ বিষয়ে অনেক লেখা হয়েছে, আগ্রহ থাকলে বড় হয়ে পড়ে নিতে পার। মোটামুটি জেনে রাখ 1817 খ্রীস্টাব্দ দুটি কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ (অর্থাৎ বর্তমান হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজের পূর্বসূরী) এবং ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়। দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটির কাজ ছিল বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করা। সোসাইটি প্রথম প্রকাশ করল একটি গণিতের পুস্তক। এর পর প্রকাশিত হল 'পশ্বাবলী'। বইটির লেখক লোসন। তার অনুবাদ করলেন পিয়ার্স। বিষয় ছিল জীবজন্তু। প্রতি মাসে নিয়মিত বের হত। এক অর্থে এটিকেই বাংলা ভাষার প্রথম বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা বলা যেতে পারে। অবশ্য পশ্বাবলীর ছ'টি সংখ্যার পর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। পরে এই ছ'টি সংখ্যা একত্র করে গ্রন্থাকারে স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশ করে (1822)। পরবর্তী কালে হিন্দু স্কুলের শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র পশ্বাবলীর নবপর্যায় প্রকাশ করেছিলেন। তারও ষোলটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর আবার বন্ধ হয়ে যায়। নবপর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হল যে বাম পৃষ্ঠায় থাকত ইংরেজী এবং ডান পৃষ্ঠায় বাংলা।

বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা দুটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রসারিত। এর দুটি মাধ্যম—একটি গ্রন্থ আর অপরটি হল সাময়িক পত্রিকা। লক্ষ করার বিষয় সাময়িক পত্রের মাধ্যমে বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা বেশি হয়েছে। বাংলা গ্রন্থের মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চার কথা লিখেছেন উজ্জ্বলকুমার মজুমদার। তোমরা নিশ্চয়ই তা পড়ে নিয়েছ। এখানে বলা হচ্ছে সাময়িক পত্রের কথা।

'পশ্বাবলী' যদি প্রথম বিজ্ঞান-পত্রিকা হিসেবে ধরা হয় তবে দ্বিতীয় যে পত্রিকার কথা মনে আসে তা হল শ্রীরামপুর মিশনের 'দিগ্‌দর্শন' (মাসিক)। শ্রীরামপুর মিশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এদেশে খ্রীস্টধর্ম প্রচার। সেই কারণে তাঁরা এই পত্রিকা প্রকাশ করে 1818 খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকায় পদার্থবিদ্যা, জীব ও রসায়ন বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের উপরও আলোচনা থাকত নিয়মিত। ছাত্রদের প্রয়োজনের কথা ভেবে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যা অনেক খণ্ড করে কিনত। 'বিজ্ঞানসেবধি'র কথা এর পর আসে। এটাও মাসিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ এপ্রিল 1832। প্রকাশ করত 'সোসাইটি ফর ট্র্যান-স্লেটিং ইউরোপিয়ান সায়েনসেস' প্রতিষ্ঠান। নামেই বুঝতে পারছ যে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনার বাংলা অনুবাদ। এর পরের বছর সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হতে শুরু করল 'বিজ্ঞানসারসংগ্রহ'। এটি ছিল দ্বি-ভাষিক (ইংরেজি-বাংলা) পত্রিকা। প্রথমে ছিল পাক্ষিক, পরে হল মাসিক।

একটা কথা আগে বলা উচিত ছিল। 'বিদ্যাহারাবলী'র কথা। এটা ঠিক সাময়িক পত্রিকা নয়। তবে 'পশ্বাবলী'র মত এর বিভিন্ন খণ্ড প্রতি মাসে নিয়মিত বের হত। এটি বাংলায় এনসাইক্লোপিডিয়া। উইলিয়ম কেরীর পুত্র কেলিক্স কেরী এই বিরাট পরিকল্পনায় হাত দিয়েছিলেন। দুঃখের কথা জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহের অভাবহেতু এই কোষগ্রন্থ তিনি শেষ করতে পারেন নি। এর প্রকাশ শুরু হয় অক্টোবর 1819 এবং 1820 খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরের পর বন্ধ হয়ে যায়।

'বিদ্যাদর্শন' (মাসিক) এই যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা। শুরু হয় জুন 1842। অক্ষয়কুমার দত্ত এই পত্রিকার অন্যতম পরিচালক ছিলেন। অনুমান করা যায় তিনিই এই পত্রিকার বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধগুলির লেখক। এক অর্থে তিনি বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার দিশারী পুরুষ ছিলেন। অবশ্য অক্ষয়কুমার দত্তের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ লাভ করে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায়। এই পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেছিলেন দীর্ঘ বারো বছর (1843-1855)।

তারপর দুটি পত্রিকার নাম এক সঙ্গে করতে হয়—'বিবিধার্থসংগ্রহ' (অক্টোবর 1851) এবং 'রহস্য-সন্দর্ভ' (ফেব্রুয়ারি 1863)। দুটিই ছিল মাসিক পত্রিকা। দুটির নাম এক সঙ্গে করার কারণ—রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই উভয় পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং তাঁরই সম্পাদনার গুণে পাঠকদের মনোরঞ্জনে সফল হয়েছিল। বিবিধার্থ-সংগ্রহে প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা ও ভূগোল বিষয়ক প্রবন্ধ নিয়মিত থাকত। রহস্য-সন্দর্ভে অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয় ছাড়া পদার্থবিদ্যার অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হত।

এই হল মোটামুটি গত শতাব্দীর সাময়িক পত্রিকার কথা। এ ছাড়াও আরও অনেক পত্রিকা ছিল যেমন 'আয়ুর্বেদদর্পণ' (1840), 'দূরবীক্ষণিকা' (1850), 'চিকিৎসা-রত্নাকর' (1853), 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' (1856), 'বিজ্ঞান কৌমুদী' (1862), 'আয়ুর্বেদ পত্রিকা' (1863), 'কৃষিতত্ত্ব' (1879), 'সচিত্র বিজ্ঞান-দর্পণ' (1882), 'নবজীবন' (1884) ইত্যাদি। এখানে বলে রাখা ভাল যে শেষোক্ত 'নবজীবন' পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আবির্ভাব ঘটে।

এই শতাব্দীর কথায় আসা যাক। বিংশ শতাব্দীর প্রথম উল্লেখ্য বিজ্ঞান-পত্রিকা হল 'প্রকৃতি'—যাঁর সম্পাদক ছিলেন বিখ্যাত পক্ষিতত্ত্ববিদ সত্যচরণ লাহা। এটি ছিল দ্বি-মাসিক পত্রিকা। আবির্ভাব বাংলা 1331 সন। এতে সেই সময়কার বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখতেন। বৈশিষ্ট্য ছিল এই পত্রিকার প্রবন্ধের ভাষাও সাধারণের সহজবোধ্য। লেখক তালিকায় ছিলেন: আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রমুখ। চৌদ্দ বছর সাফল্যের সঙ্গে চলবার পর 1345 সনে এর প্রকাশ বন্ধ হয়। আর এক পক্ষিতত্ত্ববিদ অজয় হোমের সম্পাদনায় প্রকৃতির নবপর্যায় শুরু হয়েছিল 1976 সালে।

এ সব গেল অতীতের কথা। ইতিহাসের বিষয়। এখন বিজ্ঞান নিয়ে কিছু মানুষ ভাবছেন এবং বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞানের ভাবধারা প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছেন। সব অর্থেই মানুষের মুক্তি বিজ্ঞানের দ্বারা সম্ভব। বিজ্ঞানচর্চা আরও প্রয়োজন এই কারণে যে, কিছু মতলবী ব্যবসায়ী ও রাজনীতির লোক বিজ্ঞানকে মানুষের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার না করে ক্ষতির কাজে লাগাচ্ছে। আমাদের কাছে বিজ্ঞান তখন আশীর্বাদ না বলে অভিশাপ বলে মনে হয়। ধর্মের নামে চলে অনেক বুজরুকি। সে সম্বন্ধে আমরা মোটা-মুটি সচেতন। বিজ্ঞানের নামেও যে অনেক অসাধুতা চলছে সে ব্যাপারে আমরা অজ্ঞ। স্কুল-কলেজে বিজ্ঞান নিয়ে পড়লে বা বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করলেই বিজ্ঞান-মনস্ক হওয়া যায় না। এর উদাহরণ আমরা আশেপাশে সর্বদা দেখতে পাই। মানুষকে বিজ্ঞান-মনস্ক করে তোলার ব্যাপারে পত্রিকার গুরুত্ব গ্রন্থের চাইতে বেশি। অনেক বিষয় আছে যা নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করা যায় না বা গেলে তৎক্ষণাৎ সে বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ আমরা আশা করতে পারি না। যেমন ধর হ্যালির ধূমকেতুর কথা। এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় কিছু বই বার হয়েছে। কিন্তু হ্যালির ধূমকেতু চলে যাবার পর তার বিষয়ে নতুন নতুন কি কি তথ্য পাওয়া গেল সে বিষয়ে কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু এই বিষয়ে তোমাদের 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান-এ লেখা হয়েছে এবং তোমরা তা পড়েছ। তাই বিজ্ঞান গ্রন্থের সঙ্গে বিজ্ঞান পত্রিকা নিয়মিত পড়া দরকার।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রকাশিত জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্তমানে এপার বাংলা ও ওপার বাংলা—উভয় বাংলায় অনেক বিজ্ঞান পত্রিকা বের হয়। প্রথমে এপার বাংলার কথা বলি। এদের মধ্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার কথা ভেবেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়ে বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপন করেন।—এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় 1948 সালের 25 জানুয়ারি। কেবল বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চাই নয় পরিষদের আরও অনেক উদ্দেশ্য আছে। লোকসাহিত্য ও শিশুসাহিত্যকে সর্বপ্রকারে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্পর্কে সমৃদ্ধশালী করা। ছাত্রদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক

মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা। বিভিন্ন গ্রাম থেকে ছাত্র ও শিক্ষকদের সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা ইত্যাদি।

সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল থেকে বছর দশেক ধরে 'বিটা' বলে একটি পত্রিকা বের হচ্ছে। বাংলা ভাষায়ও প্রকাশিত হয়। এঁরা পত্রিকা প্রকাশ করা ছাড়াও আরও কিছু কাজ করে থাকেন। যেমন কিছুদিন আগে শিক্ষিত মেয়েদের কর্মমুখী ও আত্মনির্ভরশীল হবার জন্য শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা করেছিলেন।

সরকারী প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ থেকে বের হয় 'আমাদের বিজ্ঞান জগৎ'। এই পত্রিকায় উচ্চ স্তরের তত্ত্বমূলক প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। দুঃখের বিষয় এত ভাল একটি পত্রিকার সে রকম প্রচার নেই। 'গণিত জগৎ' বলে আরও একটি পত্রিকা পর্ষদ বার করেছিল।

রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত
বিজ্ঞান জগৎ

বাংলা দেশ থেকে প্রকাশিত
বিজ্ঞান বার্তা

'বিজ্ঞানমেলা' (মাসিক) পত্রিকাটির শুরু হয়েছে 1981 সালে। সম্পূর্ণ ছোটদের জন্য পত্রিকাটি প্রকাশ আপাতত বন্ধ রয়েছে। এতে হাতে কলমে বিজ্ঞান শেখানোর ব্যবস্থা আছে।

বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা নিষ্ঠার সঙ্গে প্রকাশিত করে আসছেন মাসিক 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকা। এখানে প্রকাশিত অনেক প্রবন্ধে ভাবনার খোরাক পাওয়া যায়।

'অন্বেষা' হল আরও একটি চোখে পড়ার মত পত্রিকা। চার বছর হল পত্রিকাটি বের হচ্ছে। ছোট থেকে বড় সকলের উপযোগী লেখা এতে থাকে। এটি পরিচালনা করে থাকেন 'বিজ্ঞানচেতনা' গোষ্ঠী।

বিজ্ঞানের বিশেষ বিভাগ নিয়েও কিছু পত্রিকাও আছে। যেমন 'স্বাস্থ্য দীপিকা'। অনেক দিনের পুরনো কাগজ (প্রতিষ্ঠা : 1963)। বহু প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। ফটোগ্রাফি ও ইলেকট্রনিকস নিয়েও একটি পত্রিকা আছে। নাম : 'ফোটন'। 'মানবমন' এ-রকম আরও একটি পত্রিকা। মনস্তত্ত্বই হচ্ছে এর প্রধান উপজীব্য বিষয়। প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। 1962 সাল থেকে এর যাত্রা শুরু। বিজ্ঞানী পাভলভ-এর চিন্তাধারায় এঁরা বিশ্বাসী।

এ-ছাড়া রয়েছে আরও অনেক পত্রিকা। সকলের কথা বলা গেল না। 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান'-এর কথা তোমাদের কাছে বলা অবান্তর।

এ-সব পত্রিকা রাজধানী কলকাতা থেকে বের হয়। কলকাতার বাইরে থেকেও অনেক পত্রিকা বের হচ্ছে। প্রথমেই নাম করতে হয় ত্রিপুরা রাজ্যের 'জ্ঞান বিচিত্রা'র কথা। 1977 সাল থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এতে সাধারণের উপযোগী এবং শিক্ষামূলক প্রবন্ধ থাকে। উত্তর বঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত হচ্ছে 'বিজ্ঞান নিরীক্ষা' পত্রিকা (1984)। এখানে সাধারণের উপযোগী প্রবন্ধ যেমন থাকে, সঙ্গে থাকে কিছু তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ। কাঁথি (মেদিনীপুর) থেকে সদ্য প্রকাশ হতে শুরু করেছে 'সুস্বাস্থ্য' পত্রিকা। পত্রিকাটির স্বাস্থ্য সত্যিই সুন্দর। এটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা। এটি পরিচালনা করেন স্থানীয় কিছু সমাজদরদী চিকিৎসক। অস্বাস্থ্য-এর কারণ কি এবং তা কেমন করে দূর করা যায়; কেমন করে সুস্বাস্থ্য অর্জন করা যায় এবং তা বজায় রাখা যায়—এ সব নিয়ে পত্রিকায় আলোচনা থাকে। নবজাতকের প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা রইল।

আগরতলা থেকে প্রকাশিত
জ্ঞান বিচিত্রা

এবার বলি প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের কথা। যদিও এঁদের পত্র-পত্রিকা এখানে সহজলভ্য নয়। তবুও তোমাদের মধ্যে যারা আগ্রহী তারা সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে পার। বাংলাদেশীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে বাংলা ভাষার প্রতি তাঁদের আগ্রহ ও ভালবাসায় কোন খাদ নেই, যেটা এপার বাংলায় বড় চোখে পড়ে। 'বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা'র মত কাগজ যে কোন ভাষার পক্ষে গর্বের বিষয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির বছর তিনেক বাদে এর প্রকাশ শুরু হয়েছে (1974)। বছরে দুটি করে সংখ্যা বের হয়। তথ্যমূলক প্রবন্ধ ছাড়াও বেশ কিছু উচ্চস্তরের তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ এখানে থাকে। তোমরা যারা উঁচু ক্লাসে পড় তারা এই পত্রিকাটি দেখতে পার। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীরা এতে নিয়মিত লিখে থাকেন।

কোন সাপ্তাহিক বিজ্ঞান পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গে না থাকলেও বাংলাদেশে তা কিন্তু আছে। 'সাপ্তাহিক বিজ্ঞানচর্চা'র কথা বলছি। 1985 সাল থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। বেশ কিছু বিজ্ঞানী যুক্ত আছেন এই পত্রিকাটির সঙ্গে। ছোটদের জন্যও

আছে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ। একটি পাক্ষিক বুলেটিনের কথাও বলতে হয়। 'আজকের বিজ্ঞান' হচ্ছে পাক্ষিক

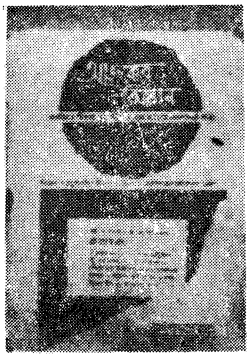

বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত
আজকের বিজ্ঞান

বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত
বিজ্ঞান চর্চা

ফিচার বুলেটিন। এটি ছাপানো পত্রিকা নয়। সাইক্লোস্টাইল করে প্রচার করা হয়। আরও বেশ কিছু পত্রিকা বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়—সবায়ের কথা বলা গেল না।

এপার বাংলার দুটি বিজ্ঞান গোষ্ঠীর কথা সবার শেষে বলি। এঁরা হলেন 'উৎস মানুষ' ও 'নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন' গোষ্ঠী। কেবল বিজ্ঞান-প্রচারই এঁদের লক্ষ্য নয়। এঁরা এক রকম আন্দোলনে নেমেছেন। রীতিমত এঁরা ক্যামপেন চালাচ্ছেন—অলৌকিকতা থেকে অপবিজ্ঞান পর্যন্ত সব রকমের অমঙ্গলের বিরুদ্ধে। প্রথম গোষ্ঠীর নিজস্ব পত্রিকা আছে। নামও 'উৎস মানুষ' (প্রতিষ্ঠা 1980)। পত্রিকা প্রকাশেই এঁরা সন্তুষ্ট নন। বিষয় অনুযায়ী প্রবন্ধ নিয়ে কয়েকটি গ্রন্থও তাঁরা প্রকাশ করেছেন। সব কটিই আমাদের পড়া দরকার। দু-তিনটির উল্লেখ করছি। একটি গ্রন্থের নাম ঃ 'বিজ্ঞান ঃ জ্যোতিষ ঃ সমাজ'। নামেই স্পষ্ট গ্রন্থের বিষয়-বস্তু কি। এই প্রবন্ধগুলি 'উৎস মানুষ'-এর একটি বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলিকে নিয়ে এই গ্রন্থ। এঁদের প্রথম গ্রন্থ হচ্ছে 'বিজ্ঞান ঃ অবিজ্ঞান ঃ অপবিজ্ঞান'। প্রথম বছরে তাঁদের পত্রিকার প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধের সংকলন। ভুঁইফোড় শিব, খনার বচন, ভূতে ধরা, বারমুড়া ট্রায়ঙ্গেল থেকে সাঁইবাবা, নিশির ডাক, দাঁতের পোকা—কিছুই বাদ যায় নি এই গ্রন্থের আলোচনায়। 'প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়' এ রকম আরও একটি বই। দৈনন্দিন জীবনে 'বৈজ্ঞানিক' পন্থায় তৈরি যে সব প্রয়োজনীয় (!) জিনিস আমরা ব্যবহার করি তার কথা আছে। বিজ্ঞাপনের ফাঁদে আমরা কেমন করে ধরা পড়ে এই সব ক্ষতিকর বা অপ্রয়োজনীয় জিনিস ব্যবহার করছি তার আলোচনা আছে গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলিতে। গায়ে মাখার ক্রিম, সর্দির ভিক্স, অমৃতাঞ্জন, হরলিকস্, কমপ্লান থেকে বেবি ফুড পর্যন্ত সব 'প্রয়োজনীয়' জিনিসের ব্যাখ্যা আছে। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর নিজস্ব কোন পত্রিকা নেই ঠিকই তবে তাঁরা পুস্তিকার আকারে নিয়মিত বুলেটিন বার করে থাকেন। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গ্রাহক হওয়া যায়। স্বয়ংসম্পূর্ণ পুস্তিকাগুলি পত্রিকার মতই। নরমান ছিলেন কানাডার লোক। পেশায় চিকিৎসক। চীনের গৃহযুদ্ধের সময় দীর্ঘকাল ছিলেন চীনে। সেখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁরই স্মৃতিতে এই সংগঠন কাজ করে চলেছেন এবং 'জনস্বাস্থ্য গ্রন্থমালা' নিয়মিত প্রকাশ করছেন। ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ন'টি বুলেটিন বা পুস্তিকা—পেটের অসুখ, অপুষ্টি, রোগ প্রতিরোধে টিকা, এসব ওষুধ খাবেন না, কৃমি সংক্রমণ, জ্বর, কাশি এবং প্রসঙ্গ ওষুধ। সব কটির কথা এখানে বলা সম্ভব নয়, কেবল প্রথমটির কথা বলছি। এতে বলা হয়েছে পেটের অসুখ হলে আজে বাজে ওষুধ না খাইয়ে ঘরে তৈরি স্যালাইন ওয়াটার খাওয়ান। তৈরির প্রণালী ঃ এক লিটার জল ফুটিয়ে নিয়ে তাতে আট চামচ চিনি, এক চামচ নুন এবং তার সঙ্গে আধ চামচ খাওয়ার সোডা মিশিয়ে সেই মিশ্রণ রোগীকে ঘনঘন খাওয়ান। এটিই একমাত্র ওষুধ।

এবার শেষ করা যাক। আপসোস হচ্ছে অনেক পত্রিকার কথা বলা গেল না। বিশেষ করে উভয় বাংলার গুটিকয়েক ভাল পত্রিকা অনুল্লিখিত রয়ে গেল। তবে সার কথা হচ্ছে বিজ্ঞান গ্রন্থ ও পত্রিকা পড়ে আমাদের বিজ্ঞানমনস্ক হতে হবে। তাতেই সমাজের উন্নতি। এই আন্দোলনে তুমি আমি দু-চারজনই যুক্ত থাকলে চলবে না। এটা সামাজিক ব্যাপার—সকলকে এই আন্দোলনে জোটাতে হবে। দু-একটা উদাহরণ দিলে বুঝবে। রান্নাতে বেশি ঝাল বা মশলা ব্যবহার করা উচিত নয়। ভাজা-ভুজি খাওয়া উচিত নয়। এটা তুমি শুধু বুঝলে কোন কাজের কাজ হবে না—আমাদের সকলকেই বুঝতে হবে। সাপে কাটলে ওঝা কিছু করতে পারবে না, হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে। এটা তোমার জানা থাকলেই চলবে না। বড়দেরও জানতে হবে। তাই এই বিজ্ঞান-মনস্ক হওয়ার আন্দোলনে আজ সকলকে আসতে হবে। 'আরও কবিতা পড়ুন' এই স্লোগানের চাইতে 'আরও বিজ্ঞান পড়ুন' বিজ্ঞানকে জানুন, বিজ্ঞান-সচেতন হোন স্লোগান আরও বেশি প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়েই শেষ করি ঃ

'গল্প এবং কবিতা বাংলাভাষাকে অবলম্বন করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মনে মননশক্তির দুর্বলতা এবং চরিত্রের শৈথিল্য ঘটাবার আশংকা প্রবল হয়ে উঠছে। এর প্রতিকারের জন্যে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা আচরাৎ অত্যাবশ্যক। বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার।"

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য—বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাময়িক পত্র এবং চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চা (দেশ, সাহিত্য সংখ্যা। 1371)।

ভারত জন-বিজ্ঞান জাঠা

'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ' সহ ভারতের ছাব্বিশটি বিজ্ঞান সংগঠনের উদ্যোগে, কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কম্যুনিকেশন বিভাগ ও রাজ্য সরকারগুলির সহায়তায় আগামী 2 অক্টোবর থেকে 7 নভেম্বর 'ভারত জন-বিজ্ঞান জাঠা' সংগঠিত হচ্ছে। ভারতের উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাঁচটি শহর থেকে জাঠা বের হয়ে প্রায় পঁচিশ হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে 7 নভেম্বর ভোপাল শহরে মিলিত হবে এবং সেখানে 1000 বিজ্ঞানী ও 5000 শিক্ষক সহ এক বিরাট সংখ্যক বিজ্ঞান অনুরাগীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

পূর্বাঞ্চলের জাঠা দোসরা অক্টোবর মালদহ শহর থেকে বের হবে এবং এগারো দিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ঘুরে বিহারে প্রবেশ করবে। পূর্বাঞ্চলের জাঠা কলকাতায় আসছে 7 অক্টোবর তারিখে, ঐ দিন কলকাতার নানা স্থানে বিজ্ঞানপ্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জাঠা-পূর্ব কর্মসূচীর মধ্যে আছে একাধিক বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা, যেমন প্রবন্ধ, কুইজ, বিতর্ক, পোস্টার অঙ্কন প্রতিযোগিতা। এতে ছাত্র-ছাত্রী সহ সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশ নিতে পারেন। জাঠা ও প্রতিযোগিতা সম্পর্কে উৎসাহী ব্যক্তি, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, গবেষক, বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান ক্লাবকে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভারত জন-বিজ্ঞান জাঠা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি
কক্ষ নং-5, রাজ্য যুব কেন্দ্র, মৌলালী,
কলিকাতা-14

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ
কর্তৃক প্রচারিত

মুণ্ডর ছাপ®
অজন্তা
হাওয়াই®

সর্বাধুনিক মেসিনে উন্নত কারিগরি নিপুণতায় প্রস্তুত বলিয়া শুধু নামেই নয় সবসময় গুণেও সেরা।

- হাওয়াই চপ্পলে গ্যারান্টি প্রথা "মুণ্ডর ছাপ অজন্তাই" সর্বপ্রথম চালু করে এবং সেই থেকে শ্রেষ্ঠত্বের মানও বজায় রেখেছে।
- "অজন্তা হাওয়াই" এর স্ট্রাপ কখনই হঠাৎ ছিঁড়ে গিয়ে বা ফেটে গিয়ে আপনাকে বিব্রত করবে না।

বাজারে গুজব আমরা অন্য নামে হাওয়াই চপ্পল বাজারে ছাড়িয়াছি ইহা সম্পূর্ণ অসত্য

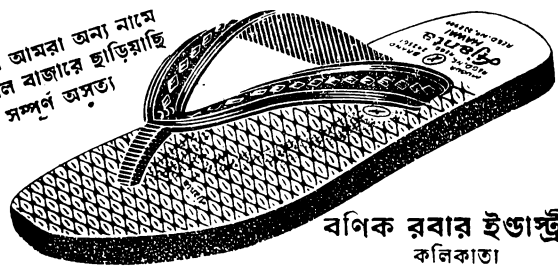

বণিক রবার ইণ্ডাস্ট্রীজ
কলিকাতা

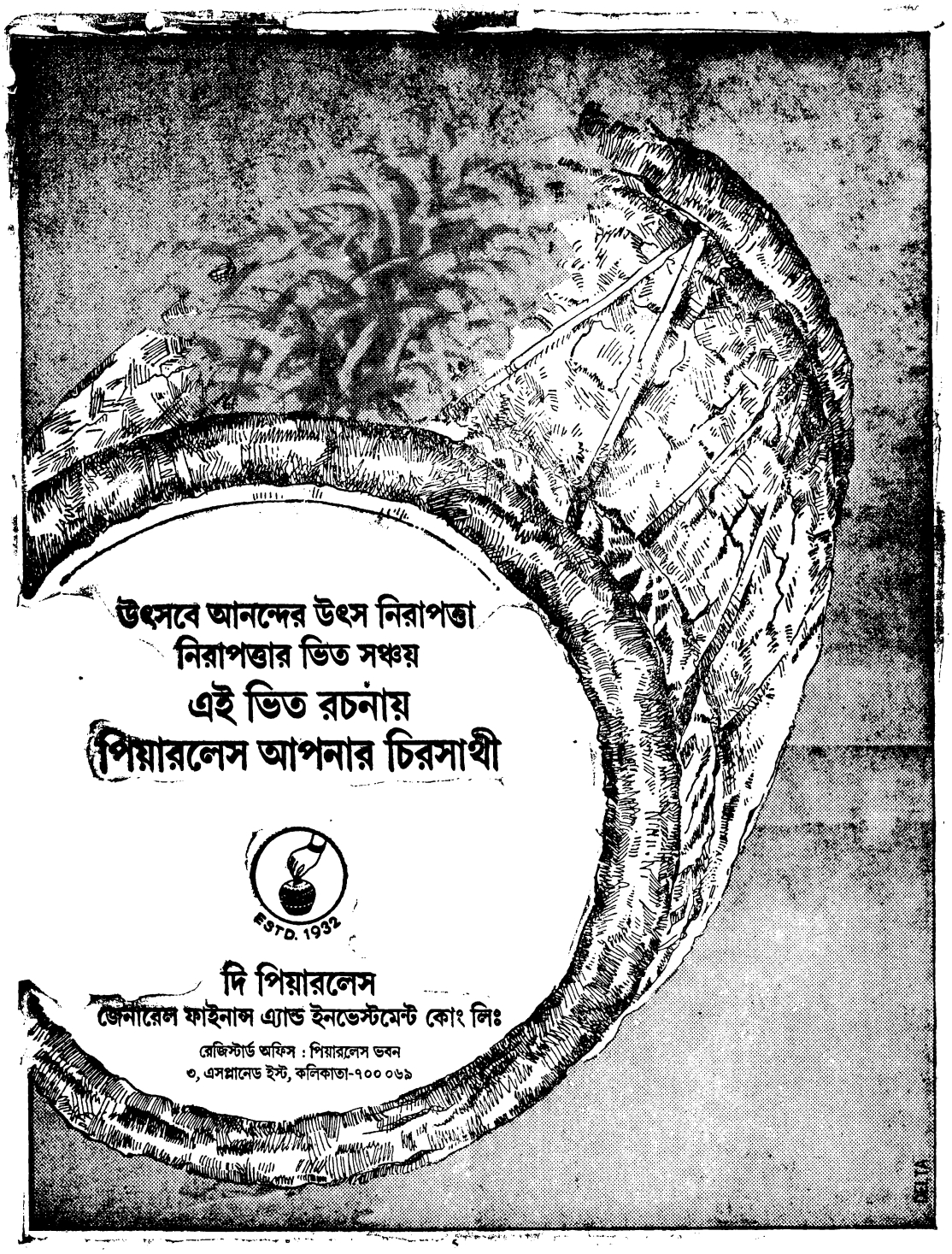
উৎসবে আনন্দের উৎস নিরাপত্তা
নিরাপত্তার ভিত সঞ্চয়
এই ভিত রচনায়
পিয়ারলেস আপনার চিরসাথী
ESTD. 1932
দি পিয়ারলেস
জেনারেল ফাইনান্স এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং লিঃ
রেজিস্টার্ড অফিস : পিয়ারলেস ভবন
৩, এসপ্লানেড ইস্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯

সায়েন্স

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

গো-হাটার হারু মুদি রোজ তার ছেলে ফটিককে বলে, ওরে ফটিক সায়েন্স না জানলে কিছু হবে না, বুঝলি? আসল কথাই হল ওই সায়েন্স।

ফটিক গাঁয়ের স্কুলে পড়ে। সায়েন্স কাকে বলে তা সে সামান্যই জানে। সে বাপকে জিজ্ঞেস করে, সায়েন্স কী জিনিস বাবা?

ওরে বাবা সে সাঙ্ঘাতিক জিনিস, এমন একটা যন্ত্র আছে সেটা কানে তুলে তুই যদি বলিস, হালুম, তাহলে বস্তরটাও তোর কানে হালুম বলে উঠবে। আর ওই যে দেখিস না আকাশে মস্ত কলের ফড়িং-এর মতো হাওয়াই জাহাজ ওড়ে ওটাও হল গে ওই সায়েন্স। ঠেসে সায়েন্স পড় বাপ, ঠেসে সায়েন্স পড়।

তা ফটিক এসব শুনে মহাদেব পণ্ডিতকে গিয়ে ধরে, পণ্ডিতমশাই, আমি সায়েন্স পড়ব।

পণ্ডিতমশাই তলচোখে চেয়ে বললেন, তুই কি ম্লেচ্ছ যে, সায়েন্স পড়বি? আগে ভাল করে শতকিয়াটা শেখ, আর মুগ্ধবোধ।

ফটিকের বয়স মোটে দশ বছর। পড়াশুনো ছাড়া আর সবকিছুই তার ভাল লাগে। তাই সে আর পণ্ডিতমশাইকে ঘাঁটাল না।

একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে রোজকার মতো নিধিরামের আমবাগানের ভিতর দিয়ে ফিরছিল ফটিক। এই আমবাগানটায় আর আম ধরে না দেখল। সব বুড়ো গাছ। সাপখোপ আছে বলে লোকজনও বিশেষ আসে না। ফটিক একা একাই ফিরছিল।

হঠাৎ সে দেখল কতগুলো রোগা রোগা লোক—ঢলঢলে জামা আর হাফ প্যাণ্ট পরা—হামাগুড়ি দিয়ে আমাবাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর হাত দিয়ে ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখে পুরে আরামে চিবোচ্ছে।

ফটিককে দেখে হঠাৎ একটা লোক তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল, এই যে খোকা, এইদিকে ভাল নধর ঘাস কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারো?

ফটিক খুব অবাক হল। বলল, গরুর জন্য তো?

লোকটা মাথা সবেগে নেড়ে বলল, না না, আমাদের জন্যই।

ফটিক দেখল, লোকটার মাথা প্রায় ন্যাড়া, আর যেন একটা বড়সড় টিকিও রয়েছে মাথায়। আর টিকিটা মাঝে মাঝে আপনা থেকে খাড়া হয়ে উঠছে, ফের নেতিয়ে ঝুলে পড়ছে।

এই কাণ্ড দেখে ফটিক হি-হি করে হেসে উঠল। আর লোকগুলো মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল।

এত রোগা লিকলিকে লোক ফটিক জীবনে দেখেনি, তার ওপর ওরকম ঢোলা সব পোশাক, তার ওপর আবার জ্যান্ত টিকি।

লোকটা ফটিকের দিকে চেয়ে বলল, তুমি হাসছো! আর আমাদের যে বেজায় খিদে পেয়েছে।

তোমরা কি ঘাস খও?

খাই, ঘাস খেতেই তো পৃথিবীতে আসি। এরকম সুন্দর জিনিস আর কোথাও পাওয়া যায় না। ভাল ঘাস-জমির সন্ধান দিতে পারলে ভোলাকে একটা জিনিস দেবো।

ফটিক ঘাস জমির সন্ধান জানে। মতিবাবুর পুরোনো ইঁটখোলার দক্ষিণধারে ব্রজবাসীর মস্ত খাটাল ছিল। খাটাল কবে উঠে গেছে। এখন সেখানে বুকসমান ঘাস হয়েছে।

ফটিক বলল, চলো দেখিয়ে দিচ্ছি।

ব্রজবাসীর খাটালের ঘাস দেখে লোকগুলোর এত আহ্লাদ হল যে, তাদের টিকি সব সঙ্গীনের মতো উঁচুতে উঠে গেল। তারা ধিনতা ধিনা করে খানিকক্ষণ নেচে ঘাস জমিতে নেমে পড়ল।

ফটিক দেখল, লোকগুলো ঘাস ছিঁড়ে খড়মড় করে করে চিবোচ্ছে আর আরামে চোখ বুজে ফেলছে।

পেট ভরে ঘাস খেয়ে এবং প্রত্যেকে বগলে একটা করে ঘাসের আঁটি বেঁধে নিয়ে উঠে এল।

সেই লোকটা বলল, ওই নিধিরামের বাগানের পাশে আমাদের পটলটা আছে। চলো আমাদের এগিয়ে দেবে।

ফটিক মজা দেখতে পিছু পিছু গেল। গিয়ে দেখল সরবনের মধ্যে বাস্তবিকই একটা পটল দাঁড়িয়ে আছে। তবে বিরাট আকৃতির পটল। লোকগুলো সেই পটলের গায়ে একটা দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে গেল। তারপর সেই লোকটা বেরিয়ে ফটিকের হাতে একটা পেনসিল দিয়ে বলল, এই তোমার প্রাইজ, আমরা আবার ঘাস খেতে আসব, তখন দেখা হবে।

এই বলে লোকটা যেই পটলের মধ্যে ঢুকল অমনি পটলটা সোঁ সোঁ শব্দ করে একখানা হাউইয়ের মতো আকাশে উঠে মিলিয়ে গেল।

পরদিন স্কুলে সে বন্ধুদের কাছে ঘটনাটা বলল, তারা কেউ বিশ্বাস করল না। তখন ফটিক তাদের পেনসিলটা দেখিয়ে বলল, এই দেখ ওরা এটা আমাকে দিয়ে গেছে।

পেনসিলটা দেখতে ভারী সুন্দর। গো-হাটে এরকম পেনসিল পাওয়া যায় না। গজু নামে একটা গুণ্ডা ছেলে ফস করে পেনসিলটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলল, এঃ, এটা তো আমার। আমাকে কলকাতা থেকে মামা এনে

ফটিককেও পটলের মধ্যে তুলে নিল

দিয়েছে। তুই এটা কবে চুরি করিছিলি বল তো! কী চোর ছেলে রে বাবা!

গজুকে সবাই চেনে এবং ভয় খায়। গজু এরকমভাবে বহু ছেলের পেনসিল, বই, লজেন্স, মার্বেল কেড়ে নেয়। সবই নাকি তাকে তার মামা কলকাতা থেকে এনে দিয়েছে।

ফটিক মলিন মুখে বলল,—বাঃ রে, আমি চুরি করব কেন? তারাই যে আমাকে দিয়েছে!

গজু তার মাথায় একটা রাম-গাঁট্টা মেরে বলল, ওসব গাঁজাখুরি গল্প ঢের শুনেছি। ফের তর্ক করলে ঘুঁষি খাবি।

গজুর ঘুঁষি খুব বিখ্যাত। কাজেই ফটিক আর কিছু বলতে সাহস পেলনা। তবে তার চেখে জল এসে গেল।

আশ্চর্যের বিষয় সেদিন গজু পেনসিলটা দিয়ে খাতায় চমৎকার অঙ্ক কষল। একটা অঙ্কও ভুল গেল না। শুধু তাই নয়, পেনসিলটা দিয়েই গজু এমন সব ইংরেজি ট্রানস্লেশন করল যে মাস্টারমশাইরা মুগ্ধ হয়ে বললেন, ওরে, তোর মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে।

কিন্তু এসব যে পেনসিলের গুণ তা আর কেউ না বুঝলেও ফটিক ঠিকই বুঝল। কিন্তু গজুর কাছ থেকে পেনসিলটা উদ্ধারের কোনো উপায় সে মাথা থেকে বার করতে পারলনা।

স্কুলের পর যখন সে বাড়ি ফিরছে তখন গজু তার পিছু পিছু এসে আমবাগানে তাকে ধরে বলল, পেনসিলের কথা যদি কাউকে বলিস তাহলে আধলা ইঁট মেরে মাথা ফাটিয়ে দেবো। বুঝলি?

ফটিক বুঝল। সে আর কী-ই বা করতে পারে মুখ বুজে থাকা ছাড়া?

দিন যায়। গজুর এখন স্কুলে দারুণ সুনাম। অ্যানুয়েল পরীক্ষায় সে ফার্স্ট হয়ে ওপরের ক্লাসে উঠেছে।

আর ফটিক। মনের দুঃখে তার কেবল চোখে জল আসে। সে কোনোরকমে টেনেমেনে পাশ করেছে।

অ্যানুয়্যাল পরীক্ষার ফল বেরিয়ে সবাই নতুন ক্লাসে উঠেছে। সরস্বতী পুজোও হয়ে গেল। ফটিক একদিন আমবাগান দিয়ে বাড়ি ফিরছে, হঠাৎ সামনে সেই লোকটাকে দেখতে পেল। সেই রোগা লিকলিকে চেহারা, সেই জ্যান্ত টিকি আর ঢোলা পোশাক।

এই যে খোকা তোমার মুখখানা অত শুকনো কেন?

ফটিক একথায় কেঁদে ফেলল। বলল, তোমরা যে যে পেনসিলটা দিয়েদিলে সেটা গজু কেড়ে নিয়ে কত কী করে ফেলল। আর আমি কিছুই হইনি।

এই কথা! বলে লোকটা খুব হাসল।

ফটিক বলল, তোমাদের জন্য ভাল ঘাসজমি দেখে রেখেছি। রাণীর বাঁধের কাছে, বাঁশবনের ভিতরে। যাবে?

পটলটা আগের জায়গাতেই নেমেছে। তার গেট থেকে লিকলিকে আরো কয়েকজন লোক বেরিয়ে এল।

লোকটা বলল, চলো চলো। ঘাস খেতেই তো আমরা পৃথিবীতে আসি।

ফটিক তাদের নিয়ে গিয়ে ঘাসজমিটা দেখিয়ে দিল। আর লোকগুলো আজও ইচ্ছে মতো ঘাস খেয়ে একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল।

তারপর সবাই এক আঁটি করে ঘাস নিয়ে তাদের পটলে ফিরে এল। আর সেই লোকটা ফটিককেও পটলের মধ্যে তুলে নিয়ে বলল, গজু তোমার পেনসিল নিয়েছে তো কী হয়েছে! আমরা এমন ব্যবস্থা করব যে গজু তোমার কাছে হেরে ভূত হয়ে যাবে।

পটলের ভিতরটা দেখে ফটিক হাঁ হয়ে গেল। চারদিকে যত সব যন্ত্রপাতি! কী দারুন সব জিনিস! একেই কি সায়েন্স বলে! লোকটা তার মনের কথা বুঝে নিয়ে বলল, হ্যাঁ খোকা, এই হল সায়েন্স।

এই বলে ফটিকের মাথাটা ধরে একটা যন্ত্র দিয়ে ফট করে তার খুলিটা খুলে ফেলল লোকটা। ফটিক একটুও ব্যথা পেল না। লোকটা কিছুক্ষণ নানা যন্ত্রপাতি দিয়ে তার মাথার মধ্যে কী সব করল। তারপর খুলিটা ফের ফটাস করে বন্ধ করে সেঁটে দিয়ে বলল, যাও এবার গজুকে শিক্ষা দিয়ে দিতে পারবে।

পটলটা চলে যাওয়ায় পর ফটিক হঠাৎ টের পেল, তার মগজ এত পরিষ্কার হয়ে গেছে যে আর বলার নয়। সে ইচ্ছে করলেই এক কোটি চল্লিশ লক্ষ সাত শো বারো। কে দুহাজার তিনশো তেরো দিয়ে মুখে মুখে এক সেকেণ্ডে ভাগ করে দিতে পারে। সে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে পারছে। সে সাহেবদের মতো ইংরেজি বলতে পারছে। ব্যাকরণের গোটা বইখানা তার চোখের সামনে নাচছে।

পরদিন স্কুলে ফের হৈ-চৈ পড়ে গেল। ফটিকের অঙ্ক কষা, ট্রানস্লেশন, করা দেখে মাস্টারমশাইরা মুগ্ধ। তাঁরা বারবার বলতে লাগলেন, নাঃ এ যে দেখছি গজুকেও হার মানাবে।

হার মানতে গজুর আর বিশেষ বাকী ছিল না। কারণ তার পেনসিল ক্ষয় হয়ে হয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। আর বেশীদিন চলবে না। গজু ভাবল, ফটিক বোধহয় আর একটা পেনসিল জোগাড় করে তার ওপর টেক্কা দিচ্ছে। সুতরাং গজু ওত পেতে রইল। আর স্কুলের পর আম-বাগানে গিয়ে ফটিককে ধরল।

এই, তোর পেনসিলটা দে তো।

কেন দেবো!

ফের মুখে মুখে কথা। বলে গজু ফটিককে পেল্লায় একটা ঘুঁষি মারল।

ফটিকের একটুও লাগলনা। যে গজুকে হঠাৎ জাপটে ধরে তিন হাত দূরে ছিটকে ফেলে দিল। "ওরে বাবা রে, গেছিরে" বলে গজু চেঁচাতে লাগল।

ফটিল বলল, গজু, এ হল সায়েন্স!

শনি-রবি

আর্থার সি. ক্লার্ক
অনুবাদ: ধরনী ঘোষ

ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর রলিংস একটু দুঃখিতভাবে বললেন "মঙ্গলগ্রহে আমরা খুব একটা অপরাধ দেখি না। সেই জন্যই ত ইয়ার্ডে ফিরে যাচ্ছি। এখানে বেশীদিন থাকলে অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে।"

আমরা ফোবোশ মহাকাশ বন্দরের প্রধান লাউঞ্জে বসে আছি। বাইরে ছোট্ট চাঁদটার খাঁজকাটা পাহাড়ের চূড়াগুলির ওপর ঝলমলে রোদ। যে রকেটটা আমাদের মঙ্গলগ্রহ থেকে এনেছিল দশ মিনিট হল চলে গেছে আর এখন দূরে তারাদের মধ্যে ঝুলন্ত গেরুয়া রঙের গোল জিনিসটার ওপর পড়বার জন্য তৈরি হচ্ছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা পৃথিবীতে যাওয়ার মহাকাশযানটিতে উঠব। বেশির ভাগ যাত্রীই ঐ গ্রহটিতে কখনও পা দেয় নি তবুও তারা ওটাকেই বাড়ি মনে করে।

"তবে", ইন্সপেক্টর বলে চলেছেন," মাঝে এক আধটা চনমনে মামলা পাওয়া যায়। মিঃ ম্যাকার আপনার ব্যবসা ত শিল্পসামগ্রী নিয়ে। আপনি নিশ্চয়ই মেরিডিয়ান সিটিতে দু'মাস আগের গোলমালটার কথা শুনে থাকবেন।"

উত্তর এলো, "আমার ত মনে হয় না।" ভদ্রলোক মোটাসোটা, ছোট-খাট, গায়ের চামড়া কাঁচা জলপাইয়ের রঙের। আমি ভেবেছিলাম অন্য সবাইর মত ইনিও কেবল

বেড়াতে এসেছিলেন, এখন ফিরে যাচ্ছেন। মনে হচ্ছে ইন্সপেক্টর এরই মধ্যে যাত্রীদের তালিকা দেখে নিয়েছেন। একটা খট্‌কা লাগল, আমার সম্বন্ধে তিনি কতটা জানেন। তারপরই নিজেকে প্রবোধ দিলাম যে আমার বিবেক—কি বলব—মোটামুটি পরিষ্কার। মঙ্গলগ্রহে থেকে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে সবাই কিছু না কিছু নিয়ে আসে।

"ব্যাপারটা বেশ ভালভাবেই চেপে দেওয়া গেছে, ইন্সপেক্টর বলতে থাকেন। "তবে সব কিছুত আর বেশীদিন লুকিয়ে রাখা যায় না। থাক গে, পৃথিবীর এক জহরৎ চোর চুরি করতে চেয়েছিল মেরিডিয়ান যাদুঘরের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ—সাইরেন দেবী।"

"অসম্ভব", আমি আপত্তি জানাই। বস্তুটি নিঃসন্দেহে অমূল্য, কিন্তু আসলে বেলেপাথরের একটা ঢেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোথাও বিক্রী করা যাবে না। চোরে মোনা লিসা নিলেই পারে।"

ইন্সপেক্টরের মুখে একটু নিরানন্দ হাসি দেখা দিল। "তাও ত একবার হয়েছে। হয় ত এক্ষেত্রেও একই উদ্দেশ্য ছিল। এরকম জিনিসের জন্য কোন কোন শিল্প-সংগ্রাহক প্রচুর টাকা দিতে পারে। যদিও অন্য লোককে দেখানোর সুখ তারা পাবে না, কেবল নিজেদেরই দেখতে হবে। আপনার তাই মনে হয় না, মিঃ ম্যাকার?"

"একেবারে খাঁটি কথা। আমার ব্যবসায় অনেক পাগলের দেখা মেলে।"

"মোট কথা এই লোকটা—নাম ছিল ড্যানি উইভার—তাদের একজনের কাছ থেকে বেশ কিছু নিয়েছিল। আর কপাল খারাপ না থাকলে দাঁও মেরে দিত।"

লাউড স্পীকারে ঘোষণা করা হল শেষবারের মত জ্বালানি পরীক্ষার জন্য মহাকাশযান ছাড়তে আর একটু দেরি হবে। কিছু যাত্রী নির্দেশ পেল তথ্যকেন্দ্রে যাওয়ার। যতক্ষণ ঘোষণা চলছিল আমি সাইরেন দেবীর কথা ভাবছিলাম। যদিও আমি মূল মূর্তিটি দেখি নি। অন্য পর্যটকদের মতই আমারই মালপত্রের মধ্যে এটির একটি নকল আছে। তার গায়ে মঙ্গল গ্রহের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তরফ থেকে লেখা: "এটি তথাকথিত সাইরেন দেবীর যথার্থ নকল। আসলটি সিরেনিউম সাতারে আবিষ্কার করেছিল 2012 খ্রীস্টাব্দের (23 মঙ্গলাব্দ) তৃতীয় অভিযানে।"

এত বড় একটা বিতর্ক সৃষ্টির পক্ষে জিনিসটা বড়ই ছোট। আট নয় ইঞ্চির বেশি উঁচু নয়। পৃথিবীর কোন যাদুঘরে থাকলে কেউ এটার দিকে একবারের বেশি তাকাবে না। একটি যুবতী। মুখ চোখ পূবের দেশের লোকেদের মতন, কানের লতি লম্বা, প্রায় খুনির সঙ্গে মিশে যাওয়া ছোট কোঁকড়া চুল, ঠোঁট দু'টি অল্প ফাঁক যেন আনন্দিত বা বিস্মিত,—আর কিছু নেই। কিন্তু এতই রহস্যময় যে একে ঘিরে শ খানেক ধর্মীয় গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। আর বেশ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক পাগল হতে বসেছেন। কারণ মঙ্গলগ্রহে নিখুঁত মানুষের মাথা থাকার কোন যুক্তি নেই। সবাই জানে এই গ্রহের বুদ্ধিমান অধিবাসীরা ছিল কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণী। খবরের কাগজরা যাদের শিক্ষিত চিংড়িমাছ বলতে ভালবাসে। মঙ্গলগ্রহের আদিবাসীরা মহাকাশযাত্রা কাকে বলে জানত না, আর পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের আগেই তাদের সভ্যতা লুপ্ত হয়ে যায়! স্বাভাবিক কারণেই এই দেবী সৌরজগতের এক নম্বর রহস্য। মনে হয় না আমার জীবৎকালে এর উত্তর মিলবে,—কখনও পাওয়া যাবে কি?

"ড্যানির ফন্দির তারিফ করতে হয়।" ইন্সপেক্টর তখনও থামেন নি। "আপনারা জানেন রবিবারে মঙ্গল-গ্রহের শহরগুলি একেবারেই প্রাণহীন হয়ে পড়ে। সব কিছু বন্ধ থাকে আর ঔপনিবেশিকরা বাড়িতে বসে পৃথিবীর টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখে। এই ভরসায় ড্যানি পশ্চিম মেরিডিয়ানের একটি হোটেলে শুক্রবার বিকেলে ঘর ভাড়া নেয়। শনিবারটা সে রেখেছিল যাদুঘরের আশপাশ ঘুরে দেখার জন্য আর রবিবারটা আসল কাজের জন্য। সোমবার সকালে সে হয়ে যেত একজন সাধারণ পর্যটক।"

শনিবার সকালে সে একটা ছোট পার্ক পার হয়ে বেড়াতে চলে গেল পূর্ব মেরিডিয়ানে। যেখানে যাদুঘর। আপনারা হয়'ত জানেন, শহরটির এই নাম হওয়ার কারণ এটি ঠিক 180° দ্রাঘিমার ওপরে দাঁড়িয়ে। ঐ পার্কে পৃথিবী বা আকাশের মধ্যরেখা খোদাই করা একটি বড় পাথরের চাঁই আছে, লোকে একই সঙ্গে দুই গোলার্ধে পা রেখে ছবি তুলতে পারে। ভাবতে পারেন কত সহজে এদের মজা লাগে?

"যে কোন হিসেবী পর্যটকের মতই ড্যানি দিনটা যাদুঘর দেখে কাটাল, যেন পয়সা পুরো উসুল করে নিতে চায়। কিন্তু বন্ধ হওয়ার পর বাইরে গেল না, একটি গ্যালারিতে লুকিয়ে রইল। সেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। কর্তৃপক্ষ প্রাচীন মঙ্গলগ্রহ সভ্যতার (Canal period বা পরিখা যুগের শেষ ভাগে) ওপর একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করছিলেন কিন্তু কাজ শেষ হওয়ার আগেই টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল। ড্যানি মাঝরাত পর্যন্ত সেখানে ছিল, বলা ত যায় না হয়ত কোন উৎসাহী গবেষক রয়ে গেছে। তারপর সে বেরিয়ে এসে কাজ শুরু করল।"

"এক মিনিট", আমি বাধা দিলাম। "রাতের পাহারা-দারের কি হল?"

ইন্সপেক্টর হাসলেন।

"ভাই মঙ্গলগ্রহে এইসব বিলাসিতা নেই। ওরা অ্যালার্ম পর্যন্ত রাখে না। পাথরের ঢেলা চুরি করতে কার ইচ্ছে হবে? তবে মূর্তিটি একটি কাচ আর ধাতুর বাক্সে বন্ধ রাখা ছিল। হঠাৎ যদি কোন স্মারক শিকারীর পছন্দ

……ভাই মঙ্গলগ্রহে এইসব বিলাসিতা নেই।

হয়ে যায়। কিন্তু চুরি হলেও চোরের লুকোবার জায়গা ছিল না। আর মূর্তি খুঁজে না পাওয়া গেলে যা কিছু বাইরে আসবে সবই খানাতল্লাসী করা হবে।"

সে কথা সত্যি। আমি পৃথিবীর মতন করে ভাবছি, ভুলে গেছি যে মঙ্গলগ্রহের প্রতিটি শহরের একটি নিজস্ব বদ্ধ জগৎ আছে যাকে একটি বল-ক্ষেত্র বা Force Field তুষারশীতল বায়ুশূন্যতা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই ইলেক্ট্রনিক আবরণগুলির বাইরে আছে মঙ্গলগ্রহের অতি প্রতিকূল জনহীন প্রত্যন্ত প্রদেশ সেখানে অরক্ষিত মানুষ মুহূর্তে মারা যেতে পারে। এই জন্যই আইন শৃঙ্খলার কাজ খুব সহজ। চুরি ডাকাতি যে এত কম তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই…

"ড্যানির বড় সুন্দর এক সেট্ যন্ত্র ছিল, সেগুলো ঘড়ির মিস্ত্রিদের কল-কব্জার মতই সূক্ষ্ম। মুখ্য অস্ত্র একটা ছোট উকো, রং-ঝালাই করার লোহার চেয়ে বড় নয়। তাতে লাগানো ছিল শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী একটা পাতলা ফলা যা কাঁচ বা ধাতু মাখনের মত কেটে ফেলতে পারে। শুধু একটা চুলের দাগ থাকবে। ড্যানির কাছে এটা মস্ত সুবিধা, কারণ কাজের কোন চিহ্ন রাখা বিপদজনক।

"আপনারা নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছেন সে কিভাবে কাজ সারতে চেয়েছিল। বাক্সটার নীচটা কেটে ফেলে আসল দেবীর বদলে একটা নকল মূর্তি রেখে দেওয়া। বছর দু'য়েক পরে হয় ত কোন অনুসন্ধিৎসু বিশেষজ্ঞ অমোঘ সত্যটি খুঁজে বার করত। তার অনেক আগেই প্রত্যায়িত নকল বলে আসলটা স্বচ্ছন্দে পৃথিবীতে পাচার হয়ে যেত। খুবই পরিচ্ছন্ন চিন্তা তাই না?

"অন্ধকার গ্যালারিতে লক্ষ লক্ষ বছরের পুরোনো মূর্তিদের মধ্যে কাজ করা এক ভূতুড়ে অভিজ্ঞতা। রাতে পৃথিবীর যে কোন যাদুঘরকেই যথেষ্ট খারাপ লাগে, তবে সেখানে অন্ততঃ মানুষের ছোঁয়া আছে। আর তৃতীয় গ্যালারি, সেখানে দেবী থাকেন বিশেষ ভয়ের জায়গা। অবিশ্বাস্য সব জন্তু-জানোয়ার তার মধ্যে মারামারি করছে, অবশ্য ছবিতে। তাদের দেখতে বিশাল গুবরে পোকার মত। জীবাশ্ম বিজ্ঞানীরা বলেছেন তাদের কোন কালেই অস্তিত্ব ছিল না। তবে কল্পনা বা বাস্তব যাই হোক না কেন, তারা ড্যানিকে দেবীর মত এত বিরক্ত করে নি। তিনি ওর দিকে সোজা তাকিয়ে ছিলেন, যেন জানতে চাইছেন, 'তুমি এখানে কেন?' ড্যানির গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। আমি জানলাম কি করে? ও-ই বলেছে।

"জহুরী যেমন সাবধানে হীরে কাটে ড্যানি তার চেরেও সতর্ক হয়ে কাজ শুরু করল। বাক্সের চোরা দরজা কেটে ফেলতেই রাত গেল। ড্যানি যখন কাজে ঢিল দিয়ে উকোটা

নামিয়ে রাখল তখন প্রায় ভোর। আরও অনেক কাজ বাকি তবে শক্ত ব্যাপারটা চুকে গেছে। নকলটা বাক্সে রাখতে, ড্যানি সঙ্গে যে সব ফটোগ্রাফ এনেছে তাদের সঙ্গে মেলাতে, পায়ের দাগ ইত্যাদি মুছতে রবিবারেও বেশ কয়েক ঘণ্টা যাবে। তবে ড্যানির কোন চিন্তা ছিল না। আরও চব্বিশ ঘণ্টা হাতে আছে। সোমবার সকালে বহু লোক যাদুঘর দেখতে আসে সে চাইছিল যাতে সে তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে অলক্ষ্যে বেরিয়ে যেতে পারে। "অথচ" পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় প্রধান দরজাগুলো সশব্দে খুলতে লাগল। যাদুঘরের ছজন কর্মচারীই ডিউটিতে এসে গেল। ড্যানি কিছুক্ষণ হতভম্ব থেকে যন্ত্রপাতি, দেবী, সব কিছু ফেলে রেখে জরুরী অবস্থায় বেরোবার দরজার দিকে চম্পট দিল। রাস্তায় এসে আর এক বিস্ময়।

জহুরী যেমন সাবধানে হীরে কাটে, ড্যানি তার চেয়েও সতর্ক হয়ে কাজ শুরু করল

কোথাও কোন লোক থাকার কথা নয়; তাদের বাড়িতে বসে রবিবারে কাগজ পড়া উচিত। কিন্তু এ কি ব্যাপার, পূর্ব মেরিডিয়ানের লোকেরা অফিসে বা কারখানায় চলেছে। আজ ত তা হলে ছুটি নয়।

"বেচারী ড্যানি যখন হোটেলে ফিরে এল আমরা তার জন্যে বসে আছি। পৃথিবী থেকে খুব সম্প্রতি আসা কোন অপরাধী যদি না জানে মেরিডিয়ান শহর কেন বিখ্যাত আর তার ফলে ধরা পড়ে, আমরা তার জন্য বিশেষ কৃতিত্ব দাবী করতে পারি না। আপনারা বোধ হয় জানেন গোলমালটা কি হয়েছিল।"

"আমি অন্ততঃ জানি না", আমার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি। ছ'সপ্তাহে মঙ্গলগ্রহের কিছুই দেখা যায় না। আমি সিরটিস মেজর (Sytius Major) এর পূর্ব দিক যেতে পারি নি।

"হাস্যকর ব্যাপার, তবে ড্যানিকে খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না। স্থানীয় লোকেও মাঝে মাঝে ভুল করে। পৃথিবীতে এ নিয়ে কোন গোলযোগ দেখা যায় না, কারণ সমস্যাটা প্রশান্ত মহাসাগরে ফেলে দেওয়া গেছে। কিন্তু মঙ্গলগ্রহে সবই শুকনো জমি। অর্থাৎ কাউকে না কাউকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা নিয়ে কষ্ট পেতে হয়।

"ড্যানি পশ্চিম মেরিডিয়ান থেকে কাজ শুরু করেছিল। সেখানে ঠিকই রবিবার ছিল। এমন কি সেদিন আমরা ওকে গ্রেফতার করেছি সেটাও রবিবার। কিন্তু আধ মাইল

দূরে পূর্ব মেরিডিয়ানে তখন শনিবার। ঐ পার্কে ভিতর দিয়ে যাওয়াতেই গণ্ডগোল হয়েছে। বলেছিলাম না কপাল খারাপ।"

একটা দীর্ঘ মুহূর্ত চুপ থেকে আমরা সমবেদনা জানালাম। তারপর আমার প্রশ্ন "কি সাজা হল।"

"তিন বছর জেল," বললেন ইন্সপেক্টর।

"খুব বেশি মনে হচ্ছে না।"

"মঙ্গলগ্রহের তিন, আমাদের কাছে প্রায় ছয়। আর একটা জরিমানা। ঘটনা চক্রে দেখা গেল ড্যানির পৃথিবীতে ফেরার টিকিটের দাম আর জরিমানার অঙ্ক একই। ও কিন্তু জেলে নেই। মঙ্গলগ্রহে এ ধরনের অনুৎপাদক আরাম চলে না। ড্যানি চাকরি করে, তবে তার ওপর নজর রাখা হয়। মনে আছে বলেছিলাম যাদুঘরে রাতের পাহারাদার নেই। কিন্তু এখন একজন আছে। কে বলুন ত?

লাউড স্পীকারে শোনা গেল, "সমস্ত যাত্রীরা দশ মিনিটের মধ্যে মহাকাশযানে ওঠবার জন্য তৈরি হন। মালপত্র নিয়ে নিন।

এগোতে এগোতে একটা প্রশ্ন না করে পারলাম না।

"যারা ড্যানিকে কাজে লাগিয়ে ছিল। তাদের কি হল? ওর পেছনে নিশ্চয়ই অনেক টাকা ছিল। আপনারা কিছু বার করতে পেরেছেন?"

"এখনও নয়। তারা কোন চিহ্ন রাখে নি। ড্যানি বলছে,—আমার ধারণা সত্যি কথা—সে কিছু জানে না। তবে বলেছি ত মামলা আমার নয়। আমি ইয়ার্ডে পুরোনো চাকরিতে ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু পুলিশের লোকের চোখ সব সময় খোলা থাকে,—শিল্প-সামগ্রীর ব্যবসাদারদের মতই, তাই না মিঃ ম্যাকার? সে কি আপনার চেহারা ত ভাল ঠেকছে না। আমার কাছে মাথা ঘোরার ট্যাবলেট আছে। খাবেন না কি?

"ধন্যবাদ, দরকার নেই", বললেন মিঃ ম্যাকার। "আমি খুব ভাল আছি।"

তাঁর গলার আওয়াজ বন্ধুত্ব পূর্ণ মনে হল না। গত কয়েক মিনিটে আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আমি ইন্সপেক্টর এবং মিঃ ম্যাকার দুজনের দিকেই তাকালাম। হঠাৎ মনে হল আমাদের যাত্রায় অনেক কিছু ঘটতে পারে।

আর্থার সি. ক্লার্কের Tales of Ten worlds গ্রন্থের 'Troubie with time' গল্পের অনুবাদ

ছড়া

জাহাজডুবি

সাধনা মুখোপাধ্যায়

মণিকাদি ঃ বলো দেখি কী করে যে তৈয়ারি হইল,
সমুদ্রে ভাসমান বড় হিমশৈল?

মন্টু ঃ হিমবাহ ভেঙে ভেঙে সমুদ্রে পড়ছে,
বরফের পর্বত ধীরবেগে নড়ছে।

মণিকাদি ঃ জলের তলায় আছে কতখানি অংশ,
ওপরে কতটা ভাসে বরফের অংশ?

মন্টু ঃ জলের তলায় আচে ন'টি ভাগে পুরো যে,
ওপরে ভাসছে শুধু এক ভাগ চুড়ো যে।

মণিকাদি ঃ এরা যে ভয়ঙ্কর কেন তুমি জান তা,
কেন যে এদের নিয়ে এত সাবধানতা?

মন্টু ঃ কত যে জাহাজডুবি হয়েছে অসংখ্য,
নাবিকের মনে তাই ভীষণ আতঙ্ক।

মাণিকদি ঃ বিখ্যাত কোনও এক জাহাজের নাম
বললে তোমার জ্ঞান কতটা তা বুঝতাম?

মন্টু ঃ টাইটানিকের নাম সকলেই জানে তো,
ডুবে গেল কত নৌকা মরে গেল প্রাণ তো।

মণিকাদি ঃ মন্টু অনেক জানে নেই বাগাড়ম্বর,
তোমাকে দিলাম আমি পুরোপুরি নম্বর।

অভিযান

জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার

কোন কুইনের চেয়েও দ্রুততর বেগে পুনে থেকে বম্বের পথে ছুটে চলেছে জিজামাতা এক্সপ্রেস। পুনের এদিকটায় এখনো বিশেষ শহরাঞ্চল গড়ে ওঠেনি। প্রথম স্টেশন লোনাউলায় এসে ট্রেন দাঁড়ালো 40 মিনিট পর। এর পরের স্টেশন ঘাট সেকশন। অধ্যাপক গায়টণ্ডের আগের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এসব এলাকার কোন কিছুই পরিবর্তন হয়নি। কাজরাত স্টেশনে অল্পক্ষণ থেমে ট্রেন আগের চাইতেও দ্রুততর বেগে গর্জন করতে করতে কল্যান স্টেশন পার হয়ে গেল।

অধ্যাপক গায়টণ্ডে আগেই ভেবে নিয়েছিলেন বম্বে পেঁাছে তিনি কি কি করবেন। সত্যিই তাঁর মতো একজন ঐতিহাসিকের বিষয়টি নিয়ে আগেই ভাবা উচিত ছিল। বম্বে পেঁাছে তিনি একটি বড় গ্রন্থাগারে গিয়ে ইতিহাসের বইগুলিতে আর একবার চোখ বোলাবেন। ঐতিহাসিক পটভূমিতে কিভাবে বর্তমান অবস্থায় এসে আমরা পেঁাছলাম—এটা নিশ্চিতভাবে জানতে হলে আর একবার ইতিহাসের বইগুলি ওল্টানো দরকার। অবশ্য এটাও তিনি মনে মনে ভেবেছেন বম্বে থেকে পুনেতে ফিরে এসেই রাজেন্দ্র দেশপাণ্ডের সঙ্গে এ নিয়ে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করবেন। এবং রাজেন্দ্র দেশপাণ্ডে তাঁকে প্রকৃত ঘটনা বুঝতে নিশ্চিত সাহায্য করবে।

ভাগ্যিস বর্তমান পৃথিবীতেও রাজেন্দ্র দেশপাণ্ডের মতো একজন লোক আছে!

একটি দীর্ঘ টানেল পার হয়ে এসে ট্রেনটি থামল একটি ছোট স্টেশনে। স্টেশনটির নাম সারহাদ। রেলের ইউনিফর্ম পরে একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ট্রেনে উঠলো সকলের টিকিট চেক করার জন্য।

—ঠিক এইখান থেকেই ব্রিটিশ রাজত্বের শুরু। আমার মনে হচ্ছে আপনি প্রথম বম্বে যাচ্ছেন?– খান সাহেব প্রশ্ন করলেন।

—হ্যাঁ। উত্তর দিলেন অধ্যাপক গঙ্গাধরপন্থ গায়টণ্ডে। উত্তরটি যথার্থই ঠিক। কারণ অধ্যাপক গায়টণ্ডে এই বম্বে শহর কখনো দেখেন নি। কিন্তু আপনি কি করে পেশোয়ারে যাবেন খান সাহেব?—অধ্যাপক গায়টণ্ডে কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন।

—ট্রেনটি যাবে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস পর্যন্ত। আমি সেণ্ট্রাল থেকে ফ্রনটিয়ার মেল ধরবো।

—কিন্তু সেটাই বা কোন পথে কতদূরে যাবে?

—বম্বে থেকে দিল্লী। তারপর লাহোর এবং শেষ পর্যন্ত পেশোয়ার। দীর্ঘ পথ। আমি পেশোয়ারে পেঁছিব আগামী পরশু।

এরপর খান সাহেব গঙ্গাধরপন্থের মতো একজন উৎসাহী শ্রোতা পেয়ে তাঁর ব্যবসার নানা কথা বলতে লাগলেন। খান সাহেবের গল্পের মাধ্যমেই অধ্যাপক গায়টণ্ডে বর্তমান ভারতীয় জীবনযাত্রার এক অভিনব পরিচয় পেলেন, যা তাঁর জানা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

ট্রেনটি দ্রুত শহরতলীর রেল ট্রাফিক পার হয়ে চলে গেল। নীল রঙের ছোট ছোট কামরাগুলি শুধু চিঠি ভর্তি। কামরার গায়ে লেখা জি. বি. এম. আর। জি. বি. এম. আর মানে বুঝলেন? ব্যাখ্যা করলেন খান সাহেব—গ্রেটার বম্বে মেট্রোপলিটান রেলওয়ে। ঐ দেখুন ছোট ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা। প্রতিটি কামরার গায়ে আঁকা। ঐ পতাকাই মনে করিয়ে দেয় আমরা ব্রিটিশ রাজত্বে বসবাস করছি।

দাদার পার হয়ে ট্রেনের গতি কমে এল এবং অবশেষে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে এসে থেমে গেল। অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভি.টি. স্টেশনে বেশিরভাগ কর্মচারীই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, সামান্য কিছু পার্শী ও ইংরেজ। স্টেশন থেকে বেরিয়েই গঙ্গাধর পন্থ যে বিশাল বাড়িটির সম্মুখীন হলেন সেটি বম্বে শহরের একটি বিশেষ ঐতিহ্য। বাড়িটির গায়ে বড় বড় হরফে এর পরিচয় খোদাই করা রয়েছে:

ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউস

প্রধান কার্যালয়: ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী

অনেক চমকপ্রদ ঘটনার জন্য তৈরি থাকলেও অধ্যাপক গায়টণ্ডে এতটা আশা করেন নি। এটা কি কার সম্ভব? 1857-এর কাছাকাছি সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের সব কাজ-কারবার গুটিয়ে নেয়। অন্তত ইতিহাস তো তাই বলে। যদিও অতীতে এখানে তাদের দপ্তর ছিল, কিন্তু এখন শুধু অস্তিত্ব নয়—এখনো রীতিমতো জাঁকিয়ে বসে আছে। তাহলে ইতিহাসের গতি পালটেছে। এবং তা 1857-এর আগেই। কিন্তু কখন? কিভাবে এই পরিবর্তন ঘটেছিল? তাঁকে এর উত্তর পেতেই হবে।

অধ্যাপক গায়টণ্ডে যে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন, লোকেরা তাকে হর্ন বি রোড নামেই জানে। রাস্তার দুধারের দোকানপাট অফিস কাছারি সব যেন ভিন্ন ধরনের। কোন হ্যাণ্ডলুম হাউসের দোকানপাট তাঁর নজরে পড়ল না। বরঞ্চ, বুটস, উলওয়ার্থের বিভাগীয় বিপণি, লয়েডস্, বারক্লে এবং অন্যান্য ব্রিটিশ ব্যাঙ্কের অফিস কাছারি দেখে অধ্যাপক গায়টণ্ডের মনে হল ইংলণ্ডেরই কোনও একটি রাস্তায় তিনি এসে পড়েছেন। তিনি ডানদিকে হোম স্ট্রীটের দিকে বাঁক নিয়ে ফোর্বস বিল্ডিংয়ে ঢুকে পড়লেন।

—আমি বিনায়ক গায়টণ্ডের সঙ্গে দেখা করতে চাই। অনুগ্রহ করে—ইংরেজ রিসেপশনিস্টের দিকে তাকিয়ে কথাগুলি বললেন গায়টণ্ডে।

ইংরেজ রিসেপশনিস্ট ভদ্রমহিলা টেলিফোনের নামের তালিকায় বিনায়কের নাম খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতিষ্ঠানের সব কটি শাখার কর্মীদের নামের তালিকা খুঁছে দেখতে লাগলেন। এবং সব কিছুর পরে তিনি সামান্য মাথা নেড়ে বললেন, আমাদের প্রতিষ্ঠানের চারটি শাখার কোন শাখাতেই এই নামটি কর্মীর তালিকায় খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি কি নিশ্চিত যে তিনি এখানে কাজ করেন? খুব অপ্রত্যাশিত না হলেও অধ্যাপক গায়টণ্ডে এবারে ভীষণ ধাক্কা খেলেন। তবে বর্তমান পৃথিবীতে তাঁর নিজেরই যেখানে মৃত্যু হয়েছে—সেখানে তাঁর ছেলের বেঁচে থাকার সম্ভাবনাই বা কতটুকু? হয়তো ছেলের জন্মই হয়নি। তিনি ভদ্রমহিলাকে বিনীতভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন। কারণ যেখানে থেকে তিনি কাজকর্ম করবেন সেখানে নিজেকে উদ্বিগ্ন করাটা তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর এখন প্রধান লক্ষ্য এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীতে গিয়ে ইতিহাসের ধাঁধার জট ছাড়ানো।

নাকে মুখে কিছু গুঁজেই তিনি সোজা টাউন হলে এসে পেঁছিলেন। হ্যাঁ, এই সেই টাউন হল, যে বাড়িটাতে এখন লাইব্রেরী হয়েছে। তিনি রীডিং রুমে পেঁছে এক সেট ইতিহাসের বই চাইলেন, যার মধ্যে তাঁর নিজের লেখা ইতিহাস বইও রয়েছে। তাঁর নিজের লেখা ইতিহাসের পাঁচ খণ্ড বইই তাঁর টেবিলে এসে পেঁছিল। তিনি প্রথম খণ্ডের গোড়া থেকে পড়া শুরু করলেন। প্রথম খণ্ডে তিনি লিখেছেন সম্রাট অশোকের কাল পর্যন্ত। দ্বিতীয় খণ্ডে সমুদ্র গুপ্ত, তৃতীয় খণ্ডে মুহম্মদ ঘুরী এবং চতুর্থ খণ্ডে তিনি এসেছেন আওরংজেবের মৃত্যু পর্যন্ত। এ পর্যন্ত তাঁর জানা ইতিহাসের সঙ্গে কোন অমিল নেই। তাহলে

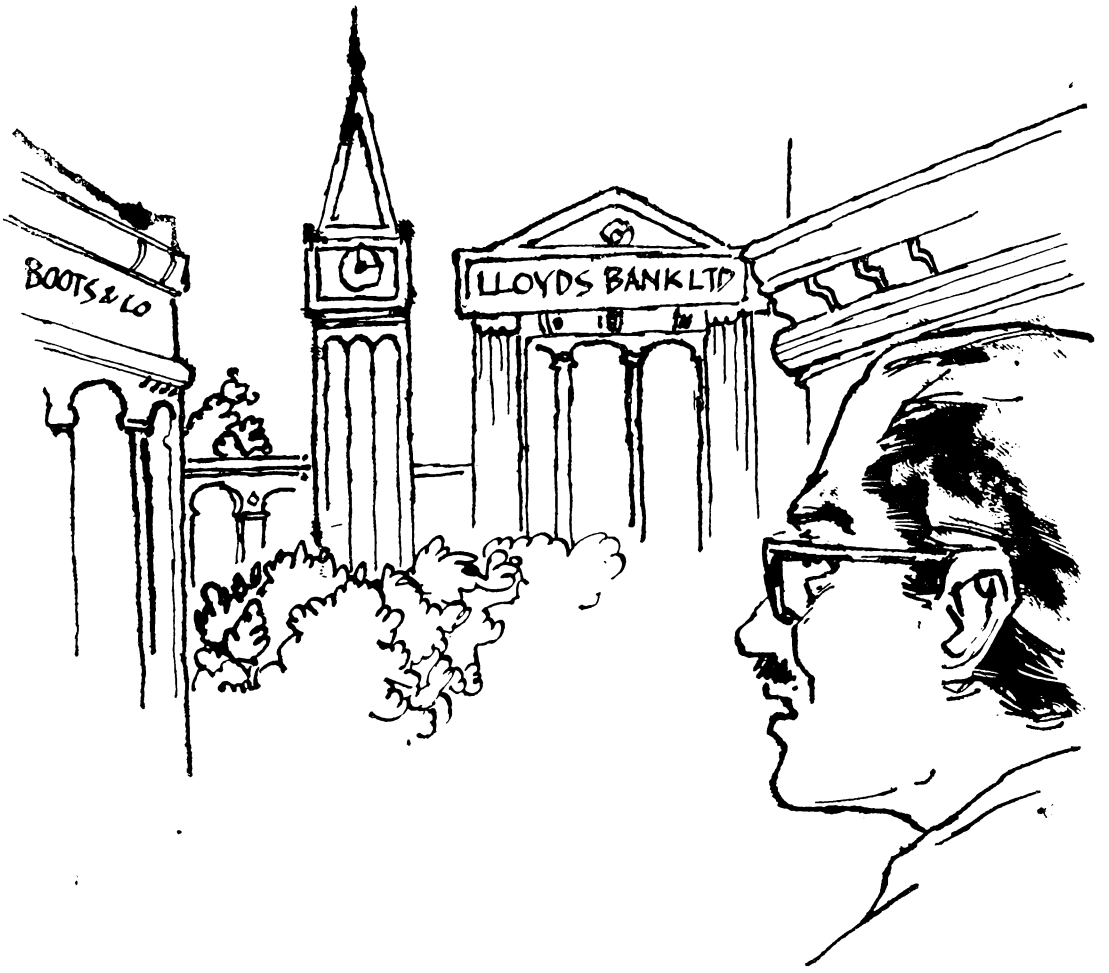

অধ্যাপক গায়টণ্ডের মনে হল, তিনি ইংলণ্ডেরই কোন রাস্তায় এসে পড়েছেন।

এই পঞ্চম ও শেষ খণ্ডেই সেই বিস্ময়কর পরিবর্তনটি ঘটেছে। পঞ্চম খণ্ডটি মনোযোগ দিয়ে পড়তে পড়তেই অধ্যাপক গঙ্গাধরপন্থ গায়টণ্ডে আবিষ্কার করলেন—যেখানে ইতিহাসের গতি অন্তর্ভুতরকমভাবে ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছে। বইটির একটি পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে—পানিপথের যুদ্ধে মারাঠারা সাফল্যের সঙ্গে জয়ী হয়েছে। আবদালির সৈন্যগণ সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়ে কাবুলের দিকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। এবং বিজয়ী মারাঠা সৈন্যদের যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন সদাশিব রাও ও তার ভাইপো বিশ্বাসারাও। গ্রন্থটিতে যদিও এর পরবর্তীকালের বিস্তৃত যুদ্ধবিবরণ আর নেই। তবে কিভাবে ভারতে শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত হল তার বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। গঙ্গাধরপন্থ মনোযোগ দিয়ে সমস্ত বিবরণই পড়লেন। এবং রচনাশৈলী একান্তভাবেই তার নিজস্ব ছাড়া অন্য কারোর হতেই পারে না। যদিও এ সমস্ত বিবরণ জীবনে তিনি প্রথম পড়ছেন।

যুদ্ধে জয়লাভ মারাঠাদের শুধু নৈতিক সাহসই যোগায়নি, সমস্ত উত্তর ভারতে তাদের প্রভুত্বও প্রতিষ্ঠিত করে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দূর থেকে এ সমস্তই নীরবে লক্ষ্য করছিল। এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পেশোয়াদের মধ্যে ভাওসাহেব এবং বিশ্বাসারাও-এর প্রভাব অত্যন্ত বেড়ে গেল। 1780 খৃস্টাব্দে বিশ্বাসারাও পিতার মৃত্যুর পর পেশোয়া হলেন। একমাত্র দাদাসাহেব কিছুটা অসুবিধা সৃষ্টি করলেও তিনি শেষ পর্যন্ত রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ালেন।

মারাঠাদের শক্তিবৃদ্ধিতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লো। তারা নতুন মারাঠা শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ব্যর্থ হল। বিশ্বাসারাও ও তাঁর ভাই মাধব রাওয়ের সম্মিলিত শক্তি, সাহস ও শাসননৈপুণ্যে সারা ভারতে মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষমতা ও প্রভাব অন্যান্য ইওরোপীয় বণিকদের মতোই শুধু বম্বে,

কলকাতা ও মাদ্রাজেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। রাজনৈতিক কারণে পেশোয়াগণ দিল্লীতে মুঘল মসনদকে খেলার পুতুল হিসেবে নামেমাত্র টিকিয়ে রাখল। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই পুনের এই শাসনকর্তারা ইওরোপে বিজ্ঞানের নবযুগের সূচনায় উৎসাহিত হয়ে পড়েন। ফলে তারা নিজেরাই বিজ্ঞান ও কারিগরী প্রযুক্তিবিদ্যা চর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অগ্রণী হন। এই সুযোগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সাহায্যের হাত প্রসারিত করলে ভারতীয় শাসনকর্তাগণ শুধুমাত্র নিজেদের কেন্দ্রগুলিকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ করার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ সীমাবদ্ধ রাখলেন।

বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিম ভারতে আন্দোলনের ফলে ভারতের ইতিহাস পুনরায় পরিবর্তিত হল। ভারতে গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটলো। ক্রমশঃ পেশোয়াদের উৎসাহ উদ্দীপনায় ভাটা পড়ে এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের বদলে নতুন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। এই বিরাট পরিবর্তনের মধ্যেও দিল্লীর সুলতানী আমল কোন রকমে টিকে ছিল। কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সংসদের সিদ্ধান্তগুলিকে নিয়মমাফিক অনুমোদন করা ছাড়া বস্তুতঃ তাদের কোন ক্ষমতাই ছিল না।

গঙ্গাধরপন্থ যতই পড়ছিলেন ততই তিনি বিস্মিত হচ্ছিলেন তাঁর আগের জানা ভারতবর্ষের কথা ভেবে। আশ্চর্য! ভারতবাসী কখনোই সাদা চামড়ার গোলামী করেনি! আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ভারত ধীরে ধীরে নিজেই শক্তি সঞ্চয় করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। শুধুমাত্র বাণিজ্যিক কারণেই তারা ইংরেজদের বম্বেতে থাকার অধিকারটুকু দিয়েছিল। 1668 সালের এই চুক্তিটিও শেষ হয়ে যাবে 2001 সালে। গঙ্গাধরপন্থ কিছুতেই তাঁর জানা ইতিহাসের সঙ্গে চারপাশের পরিবেশ মেলাতে পারছিলেন না। যদিও তাঁর অনুসন্ধান তখনও শেষ হয়নি। কারণ তিনি মারাঠাদের জয়লাভের কারণ সম্পর্কে তখনো নিঃসংশয় হতে পারেন নি। মারাঠারা কিভাবে যুদ্ধে জয়লাভ করল?

কারণটা সঠিক জানতে হলে তাঁর আরও কিছু ইতিহাসের বই ঘাঁটা দরকার। আর সত্যি সত্যিই আরও কিছু বই ও পত্র-পত্রিকা ঘাঁটতে ঘাঁটতে তিনি বাখরের বইতে একটি সূত্র পেলেন। বাখর লিখেছেন কিভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বিশ্বাসারাও বেঁচে যান। তিন লাইনের একটি বর্ণনায় তিনি লিখেছেন, 'বিশ্বাসারাও দ্রুত ঘোড়ায় চেপে তাঁর সেনাবাহিনীর কাছে ছুটে যান। সহসা একটি বুলেট তাঁর প্রায় কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যান।'

রাত ৪টার সময় গ্রন্থাগারিক এসে অধ্যাপককে গ্রন্থাগার বন্ধ হয়ে যাবার কথা বলায় অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করলেন —কাল কখন আবার গ্রন্থাগার খুলবে? আমার সব নোট নেওয়া শেষ হয়নি। আমি কালকেও এই বইগুলি আবার পড়তে চাই।

গ্রন্থাগারিক মৃদু হেসে উত্তর দিলেন—আবার কাল সকাল ৪টায়। বইগুলির প্রতি নিমগ্ন অধ্যাপককে দেখে গ্রন্থাগারিকের মনে হল—এতদিনে একজন মনের মতো গবেষক পাওয়া গেছে।

কাগজে লেখা কিছু তথ্য পকেটে ভরে অধ্যাপক উঠে পড়লেন। অন্যমনস্কভাবে তিনি বাখরের লেখা বইটিও অন্য পকেটে রেখে লাইব্রেরী ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। কাছাকাছি একটি অতিথিশালা পেয়ে সেখানেই তিনি রাত্রিবাসের সিদ্ধান্ত নিলেন। এবং সামান্য কিছু খাওয়া-দাওয়া করেই বেরিয়ে পড়লেন পদচারণার উদ্দেশ্যে। সামনেই আজাদ ময়দান। বহু লোকের সমাবেশ ঘটেছে। বিরাট প্যাণ্ডেল। নিতান্ত অভ্যাসবশেই অধ্যাপক গায়টণ্ডে পায়ে পায়ে প্যাণ্ডেলের দিকে এগিয়ে চললেন। যদিও বক্তৃতা চলছিল কিন্তু লোকজনের যাওয়া-আসার বিরাম ছিল না। তিনি সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে ছিলেন সভামঞ্চের দিকে। আশ্চর্য! বক্তৃতা চলছে। সভামঞ্চে সভাপতির চেয়ার ও টেবিল রয়েছে। কিন্তু চেয়ার সম্পূর্ণ ফাঁকা। ব্যাপারটা ভাবাই যায় না। চৌম্বকাকৃষ্ট লৌহখণ্ডের মতো তিনি ধীর পায়ে চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেলেন। বক্তার বক্তৃতা মাঝ পথে থেমে গেল...

নানারকম ক্রুদ্ধ চিৎকার চারদিক থেকে ভেসে এল।

'চেয়ার থেকে উঠুন।'

'এই বক্তৃতামালায় কোন সভাপতি নেই।'

'প্লাটফর্ম থেকে নেমে আসুন।'

—কি তোমরা বোকার মতো কথা বলছ? অধ্যাপক গায়টণ্ডে বিরক্ত হলেন। সভাপতি ছাড়া এই জাতীয় জনসভা কি কখনো হতে পারে? সভাপতি ছাড়া এই বক্তৃতা যেন ডেনমার্কের যুবরাজহীন সেক্সপীয়ারের হ্যামলেট।

—আমরা চেয়ার থেকে কোন উপদেশ শুনতে চাই না। আপনি প্লাটফর্ম থেকে নেমে আসুন—ক্রুদ্ধ জনতা আরও জানাল—আমরা এসব প্রাচীন প্রথা বহু আগেই ত্যাগ করেছি।

অধ্যাপক গায়টণ্ডে এর আগে 999টি জনসভা করেছেন। পুনের জনতাকে তিনি ভালভাবে চেনেন। কিন্তু তিনি তাঁর বক্তৃতা থামালেন না। ফলে জনসাধারণ ক্রমশঃ উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ক্রমশঃ অধ্যাপকের দিকে টিম, টম্যাটো, ইঁট-পাটকেল প্রভৃতি এসে পড়তে লাগলো। এবং একদল জনতা মঞ্চে উঠে পড়ল তাঁকে জোর করে নামিয়ে দিতে। চারিদিকে হৈ হট্টগোল ভীড়।

ঠেলাঠেলির মাঝে অধ্যাপক গঙ্গাধরপন্থ গায়টণ্ডেকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

* * * * *

এই হল আমার অভিজ্ঞতা, রাজেন্দ্র। এবং এও জানি যে, আজ সকালে আমাকে আজাদ ময়দানে পাওয়া গেছে। আমি আবার এই পৃথিবীতেই ফিরে এসেছি। তোমার সঙ্গে কথা বলছি। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল এই দুদিন কোথায় ছিলাম?

অধ্যাপক গায়টণ্ডের এইসব প্রশ্নের উত্তরে রাজেন্দ্র কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে রইল।

—আচ্ছা, ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগার আগে আপনি ঠিক কি করছিলেন মনে আছে? রাজেন্দ্র অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমি ইতিহাসের আশ্চর্য পরিবর্তনের কথাই ভাবছিলাম।

—ঠিক, আমিও তাই ভেবেছি। রাজেন্দ্র মৃদু হাসল।

—ও রকম রহস্যজনক ভাবে হেসো না রাজেন্দ্র। তুমি যদি ভেবে থাক যে, এ সবই আমার স্বপ্ন, খেয়াল-খুশির কল্পনা তা হলে এই কাগজটা একবার দেখতে পারো। অধ্যাপক গায়টণ্ডে বাখরের বইটার একটা ছেঁড়া পাতা রাজেন্দ্রের হাতে তুলে দেন। মূল বইটা আজাদ ময়দানেই কোন রকমভাবে খোয়া গেছে। রয়ে গেছে শুধু একটি পাতা। রাজেন্দ্র মন দিয়ে সেই ছেঁড়া পাতাটি পড়লেন। হাসির বদলে তার মুখ ক্রমশঃ গম্ভীর হয়ে এল। এবার গঙ্গাধর পন্থ বের করে আনলেন—তাঁর নিজের লেখার ইতিহাস বইটা। যেখানে লেখা রয়েছে কিভাবে বুলেট-বিদ্ধ হয়ে বিশ্বাসারাও মারা যান। অথচ বইয়ের ছেঁড়া পাতায় ছাপার হরফে লেখা রয়েছে—কিভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বিশ্বাসরাও বেঁচে যান। যে ঘটনায় মারাঠা সৈন্যরা জয়লাভই শুধু করে না—ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাও বদলে যায়।

বিষয়টা গভীরভাবে ভাববার। রাজেন্দ্র বলল ইতিহাসের ছেঁড়া পাতাটা না দেখলে আমি এ সব আপনার অলীক কল্পনা বলেই মনে করতাম। এখন প্রকৃত তথ্যটি কি তাই জানার চেষ্টা করছি।

প্রকৃত তথ্যটা কী বল রাজেন্দ্র— অধ্যাপক গায়টণ্ডে তাঁর গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন।

— অধ্যাপক গায়টণ্ডে, আমি আপনার অভিজ্ঞতাকে দুটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করছি। আমি জানি না, আপনাকে আমি বোঝাতে পারব কি না—তবে আপনি যে একটি রোমাঞ্চকর শুধু অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

—তুমি তাড়াতাড়ি শুরু করো রাজেন্দ্র আমি মন দিয়ে শুনছি—অধ্যাপক অধৈর্য হয়ে উঠলেন।

রাজেন্দ্র ধীরে ধীরে তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন।

—আপনি ইতিহাসের অনেক বিস্ময়কর পরিবর্তনের কথাই বিভিন্ন সেমিনারে আলোচনা করেছেন ও শুনেছেন। ধরা যাক পানিপথের যুদ্ধের কথা।

একদিকে মারাঠা সৈন্য অন্যদিকে আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালির সৈন্য। উভয় দিকেই শিক্ষিত সুসজ্জিত সৈন্য। উভয় দিকেই যোগ্য যুদ্ধ পরিচালকগণও রয়েছেন। কিন্তু বিশ্বাসারাওয়ের মৃত্যুতেই মারাঠা সৈন্যদের মনোবল নষ্ট হয়ে যায়—ফলে তাদের পতন হয়। কিন্তু ইতিহাসের ছেঁড়া পাতায় আমরা দেখলাম—এক চুলের ব্যবধানে বুলেট বিশ্বাস রাওয়ের কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এই

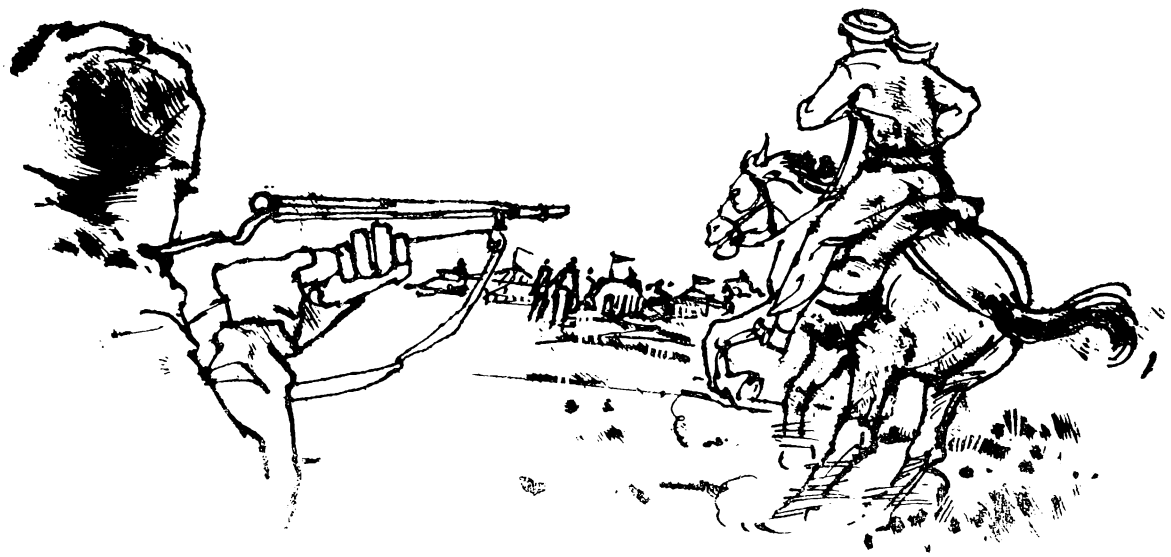

কিন্তু একচুলের ব্যবধানে কানের পাশ দিয়ে বুলেটটি বেরিয়ে যায়

ঘটনাই মারাঠা সৈন্যদের মনে বিপরীত প্রতিক্রিয়া করে। তাদের নৈতিক সাহস বাড়ে। যুদ্ধের গতি পাল্টে যায়—পাল্টে যায় ইতিহাসের ধারাও।

কিন্তু তাতো হয় নি। অধ্যাপক প্রতিবাদ করলেন। কি হলে হতে পারতো—তা নিয়ে শুধু জল্পনা কল্পনাই চলতে পারে। কিন্তু বাস্তবে তা অচল।

আমি আপনার সঙ্গে একমত অধ্যাপক। রাজেন্দ্র বললেন, কিন্তু বাস্তব কি? বাস্তব বলতে আমরা কি বুঝি। বাস্তব বলতে আমরা যা প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বুঝতে পারি তাই। বা বিভিন্ন যন্ত্র-পাতির সাহায্যে যা অনুভব করতে পারি তাই। কিন্তু এ সবই তো আমাদের দেখা জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আমাদের দেখার বাইরেও কি ভিন্ন জগৎ আছে? তার স্বরূপ সম্পর্কে কি আমরা কোন ধারণা করতে পারি? রাজেন্দ্র না থেমে বলতে লাগলেন—এই বাস্তব অভিজ্ঞতা আবার সর্বক্ষেত্রে একই রকম নাও হতে পারে। একটি পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে পরমাণু ও তার অনুসঙ্গ পদার্থ-গুলির চালচলন সবক্ষেত্রে একই বাস্তব নীতি অনুসৃত হয় না। পদার্থবিদ্যার সব রকম নীতি অনুসরণ করেও পদার্থবিদ্‌গণ লক্ষ্য করেছেন ওইসব অণু পরমাণুর গতি-বিধি নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। যেমন ধরুন, আমি একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে একটি ইলেকট্রন নিক্ষেপ করলাম। কিন্তু এটা কোথায় যাবে নিশ্চিত করে বলা যাবে না। অথচ নির্দিষ্ট দিকে এবং নির্দিষ্ট গতিতে যদি বন্দুক ছুঁড়ি আমি বলতে পারব বন্দুকের গুলিটি কোথায় গিয়ে পড়বে। কিন্তু ইলেকট্রন? এর সম্পর্কে কোন ধারণাই করা যাবে না। ইলেকট্রন, এখানে, ওখানে যেখানে খুশি যেতে পারে।

—তুমি কোয়ান্টাম তত্ত্বের কথা বলতে চাইছ। যে তত্ত্বের উপর অনিশ্চয়তা সূত্রের প্রস্তাব হয়েছে। এবং যে সূত্র অনুসারে জগতের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণু পরমাণু জগতের ঘটনাবলী কখনোই জানতে পারা যাবে না। আমার মতো ইতিহাসের লোকও ও-কথা শুনেছে। অধ্যাপক উত্তর দিলেন।

—তাহলেই ভেবে দেখুন। পৃথিবীর নানা চেহারার কথা কল্পনা করুন। একটা পৃথিবীতে ইলেকট্রন যেখানে অন্য পৃথিবীতে ইলেকট্রন আবার ওখানে। অন্য জায়গায় আবার অন্য খানে। অর্থাৎ যখনই যেখানে আমরা তাকে দেখতে পাই তখনই আমরা সেই পৃথিবীর আলোচনা করি। ভিন্ন ভিন্ন পৃথিবীর অস্তিত্ব কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। রাজেন্দ্র দ্রুত তাঁর ভাবনাগুলিকে সাজিয়ে নিল—

কিন্তু এই দুটি পৃথিবীর মধ্যে কি কোন যোগাযোগ থাকা সম্ভব? অধ্যাপকের ব্যাকুল প্রশ্ন।

—হ্যাঁ এবং না। দুটোই হতে পারে অধ্যাপক গায়টণ্ডে আপনি দুটি পৃথিবীর কথা ভাবুন। যেখানে একটি মাত্র ইলেকট্রন—পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে।...

ঠিক যেভাবে গ্রহগুলি প্রদক্ষিণ করছে সূর্যকে—অধ্যাপক গায়টণ্ডে বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

—না ঠিক সেভাবে নয়। আমরা গ্রহদের পরিক্রমণ পথ জানি। কিন্তু ইলেকট্রন আরও অনেক বৃহত্তর পরিধি নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে চলাফেরা করতে পারে। এই বিভিন্ন পর্যায়ক্রম থেকেই আমরা পৃথিবীর প্রকৃত রূপ বুঝতে পারি। প্রথম পর্যায়ে ইলেকট্রন হয়তো উচ্চশক্তিসম্পন্ন অবস্থায় আছে। দ্বিতীয় অবস্থায় আরও কম শক্তিসম্পন্ন। কিন্তু ইলেকট্রন উচ্চশক্তি থেকে অপেক্ষাকৃত নিম্নশক্তিতে চলে যেতে পারে—সামান্য তেজস্ক্রিয় বিকিরণ করে। অথবা দ্বিতীয় থেকে প্রথম পর্যায় যাবার সময়েও সামান্য তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হওয়া সম্ভব। আণুবীক্ষণিক পর্যায়ে এ জাতীয় ঘটনা হামেশাই ঘটতে দেখা যায়। মহাজাগতিক পর্যায়ে এরকম কিছু একটা ঘটে থাকলে অবাক হবার কি আছে?

—আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি রাজেন্দ্র। তুমি কি বলতে চাইছ—একটি জগৎ থেকে আর একটি জগতে আমার উত্তরণ ঘটেছিল। এবং পুনরায় বর্তমান জগতে ফিরে এসেছি!—অধ্যাপক গায়টণ্ডে জানতে চাইলেন।

যদিও ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হয়, ওটাই একমাত্র ব্যাখ্যা যা হতে পারে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, চরম মুহূর্তে একটি অন্য জগতের সূচনা হতে পারে। সুতরাং আমার মনে হয় বাস্তবক্ষেত্রে সব কিছুই হওয়া সম্ভব। কিন্তু একজন মানুষ একটি নির্দিষ্ট সময়ে কেবলমাত্র একটি পৃথিবীর চেহারাই দেখতে পায়।

তাহলে সংক্রমণের ফলেই আপনি দুটি পৃথিবী দেখতে পেয়েছেন। অবশ্য এক সঙ্গে নয়। একেকবারে এক একটি পৃথিবীর চেহারাই আপনি দেখতে পেয়েছেন। একটি পৃথিবী যেখানে আপনি এখন রয়েছেন—অন্যটি যেখানে আপনি দুদিন কাটিয়ে এলেন। একটির ইতিহাস যা আমরা জানি, আর অন্যটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে ইতিহাস পানিপথের যুদ্ধ থেকেই ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। এবং এর সূত্র ধরেই আমরা বলতে পারি হয়তো আরও অনেক অজানা পৃথিবীর ইতিহাস বিভিন্ন সময়ে সৃষ্টি হয়েছে যা আমাদের অজানা।

কিন্তু রাজেন্দ্র আমার আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ কি?—প্রশ্নটা অনেকক্ষণ ধরেই গঙ্গাধর পন্থ মনে মনে তৈরি করেছেন।

—এই প্রশ্নের উত্তরটা জানা থাকলে আমি তো বিরাট সমস্যার সমাধানই করে ফেলতে পারতাম। দুঃখের বিষয় বিজ্ঞানের বহু অমীমাংসিত প্রশ্নের মধ্যে এটিও একটি। তবে এ ব্যাপারে আমার অনুমানটা আপনাকে আমি জানাতে

পারি। এ জাতীয় উত্তরণের জন্য কিছুটা মানসিক প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন। হয়তো যখন দুর্ঘটনাটি ঘটে, তখন আপনি যুদ্ধের চরম মুহূর্তের কথাটাই ভাবছিলেন। আপনার মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ এই অবস্থান্তরের জন্য উদ্দীপকের কাজ করেছে।—

তুমি ঠিকই বলেছ রাজেন্দ্র। আমি ঠিক সেই কথাটাই ভাবছিলাম যদি পানিপথের যুদ্ধে মারাঠারা জয়ী হত তা হলে কি হত! সত্যি কথা বলতে কি এটাই ছিল আমার সহস্রতম বক্তৃতামালার বিষয়।

—কিন্তু এখন তো আপনাকে অনুমান করতে হবে না। আপনি তো সশরীরে সে যুগের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেই এসেছেন।

—না রাজেন্দ্র, আমি আমার সহস্রতম বক্তৃতামালা সেদিন আজাদ ময়দানেই শেষ করে এসেছি। যে অধ্যাপক গায়টণ্ডে সেদিন চেয়ার ছেড়ে উঠে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁকে আর ভবিষ্যতে কোন সভা-সমিতিতেই দেখা যাবে না। আমি পানিপথের সেমিনারের উদ্যোক্তাদের দুঃখপ্রকাশ করে সে কথা জানিয়ে দিয়েছি।

অনুবাদঃ রবীন বসু

জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকার টাটা ইনস্টিটিউট অব ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চে থিওরেটিক্যাল ফিজিক্স-এর বিভাগীয় প্রধান। গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাঁর গুরু ফ্রেড হয়েলের মতোই বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ও প্রবন্ধ লিখতে ভালবাসেন; বাংলায় একমাত্র কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকাতেই তাঁর গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়

উপরের গল্পটি 'Illustrated Weekly of India' পত্রিকায় প্রকাশিত 'The Adventure' গল্পের অনুবাদ।

সম্পাদক

গ্রামীণ

এনেছে অপরূপ রুচি
রুচিসম্মত বস্ত্রসম্ভার॥

বিশেষ রিবেট

সুতি খাদি—৩৫%
রিল্ড সিল্ক—২০%
স্পান সিল্ক—৩০%
পলিবস্ত্র —২০%

আদি ও অকৃত্রিম বালুচরী, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ি, আধুনিক পলিবস্ত্র এবং ঐতিহ্যপূর্ণ সুতি, রেশম ও পশম খাদির রঙে, রুচিতে ও ডিজাইনের মনোরম পসরা।

আমাদের শো-রুম

মহাকরণ
১২, বি. বা. দি. বাগ
ভবানীপুর
গোলপার্ক
হাওড়া (সাবওয়ে)
বোলপুর
মালদহ
রায়গঞ্জ
বেহালা (ম্যাণ্টন)
বেলঘরিয়া
তমলুক
বেনাচিতি (দুর্গাপুর)
বসিরহাট
বিষ্ণুপুর

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ
২, মুজাফফর আহমেদ স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত

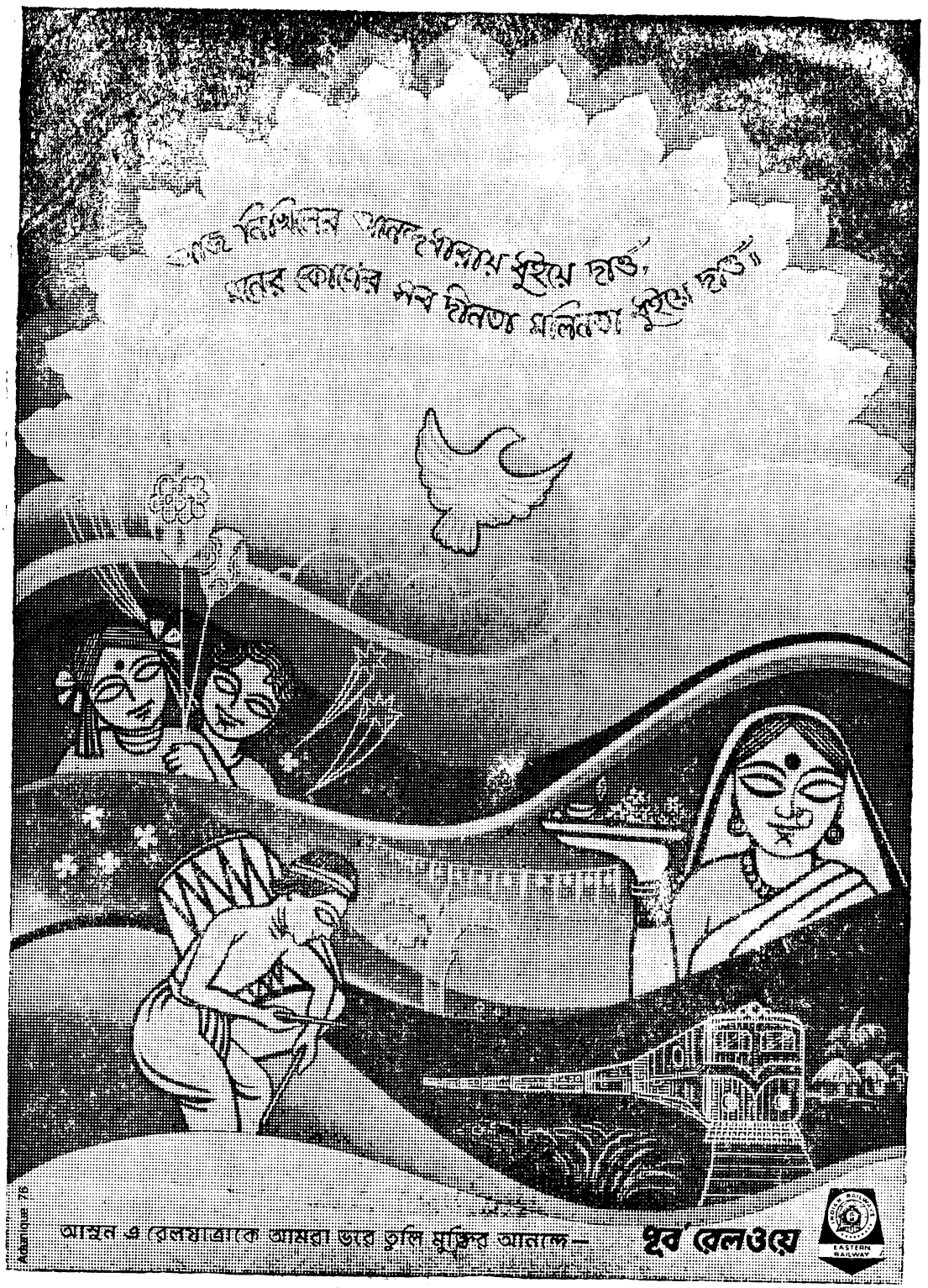
"তে বিশ্বজনের মিলনধারায় ধুইয়ে দাও,
মনের কোণের সব মলিনতা ধুইয়ে দাও"
আসুন এ রেলযাত্রাকে আমরা ভরে তুলি মুক্তির আনন্দে—
পূর্ব রেলওয়ে
EASTERN RAILWAY

আপন করে, যতন ভরে, আনো মা শান্তি ধরার পরে...
ঘুচুক বিভেদ, ঘুচুক বিবাদ, আসুক স্বস্তি সকল ঘরে...

কেয়ো-কার্পিন

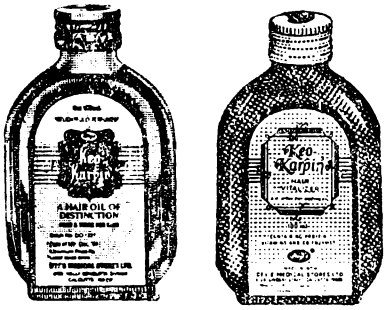

হেয়ার অয়েল হেয়ার ড্রেসিং

অ্যান্টিসেপ্টিক্ ক্রীম

দে'জ মেডিক্যাল Dey's যাদের যত্নই আপনার আস্থা

DMS/Puja-2/87

শারদীয় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান—1987

'বুদ্ধিশুদ্ধি' প্রতিযোগিতার কুপন

আমি .....

.....

বাড়ির ঠিকানা .....

.....

বয়স..... .....শ্রেণী.....

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা.....

.....

.....

বুদ্ধিশুদ্ধি প্রতিযোগিতার উত্তর পাঠালাম।

স্বাক্ষর

স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে
কিংস হোমোটোন

ম্যাজিকের মতো কাজ করে

কিং এণ্ড কোং (হোমিও কেমিস্ট) প্রাইভেট লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়
৯০/৬এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৭

ফোন ঃ ৩১-৪১৬৬

শাখা ঃ ভবানীপুর, বেহালা, বালীগঞ্জ, রয়েড স্ট্রীট

প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত

টারজন অমনিবাস

অ্যাড্‌গার রাইজ বারুজ

চার খণ্ডে সম্পূর্ণ ॥ প্রতি খণ্ড ২৫ টাকা

এই লেখকের আর একটি বই

ভূতের গল্প ভয়ংকর ১২·০০

সন্ধানী ॥ ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ৭৩

বিমান বসুর

নক্ষত্র পরিচয়

প্রকাশিত হয়েছে। ১০·০০

অমরনাথ রায়ের

স্টুডেন্টস সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া

প্রকাশিত হয়েছে। ২৫·০০

পার্থসারথি চক্রবর্তীর

বুদ্ধি নিয়ে খেলা

প্রকাশিত হয়েছে। ১০·০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

EGG NOODLES

FUN FRIEND AND Licia®

Other pasta of Licia range—
- CUT MACARONI • SPAGHETTI
- LONG MACARONI • MACARONI RICE
- INSTANT NOODLES • VERMICELLI
- CHOW CHOW & CHOW NOODLES

for Vegetarians—all make delicious dishes to satisfy your taste.

LICIA MACARONI

36, PEMANTLE STREET • CALCUTTA 700 016
PHONE 24-4835

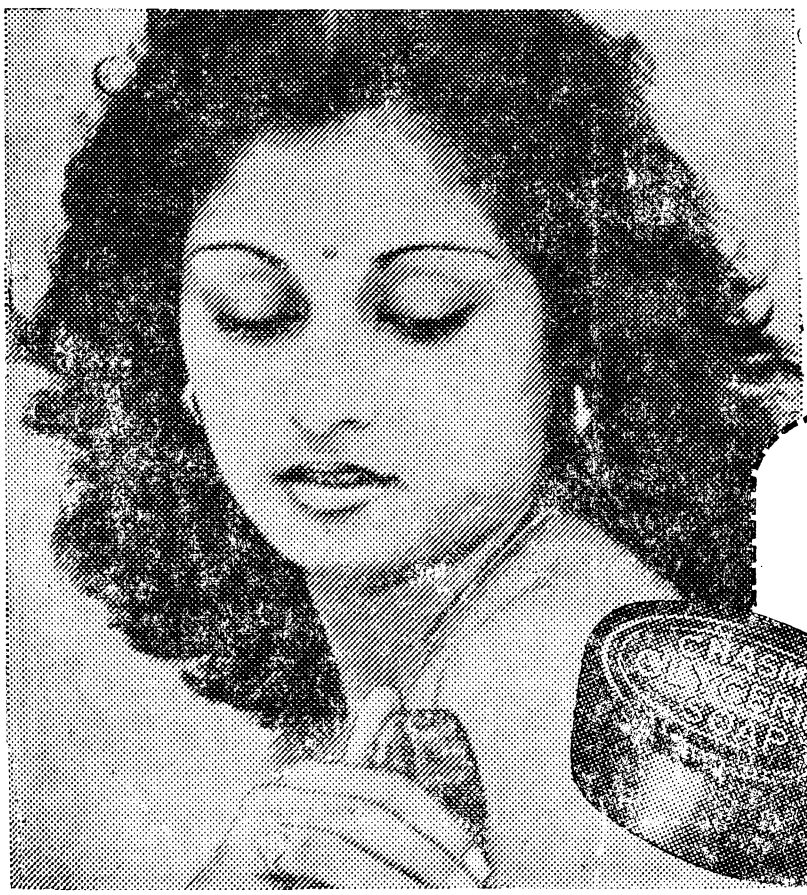

শীতের রুক্ষতায় আনে
বসন্তের মধুর পরশ

iaa 2842

চেসমী

গ্লিসারিন সাবান

এখন
এতে পাবেন
আরও উঁচু মানের
পারফিউম

চেসমী কেমিক্যাল
কলিকাতা

'বুদ্ধিকে সতর্ক ও
মোহমুক্ত করার জন্য
প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞান চর্চার'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ
কর্তৃক প্রচারিত

R/No 37390/81 KISHORE JNAN BIJNAN REGD NO WBEC 316 7TH YR ● PUJA

মেনকার গর্ভে পুনঃ জনমিলা সতী। অন্যরূপে মহামায়া, নাম হৈমবতী॥

প্রজাপতি দক্ষের কন্যা মহাদেবের পত্নী সতী পিতার মুখে পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া অপমানে দুঃখে যজ্ঞস্থলে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

পরজন্মে সেই পতিব্রতা সতী ভূতলে অবতীর্ণা হইবার বাসনায় হিমালয় মহিষী মেনকার গর্ভস্থা হইলেন। যেইদিন সতী গিরিরাজপুত্রীরূপে ভূমিষ্ঠা হইলেন, সেইদিন চেতন অচেতন সকলের পক্ষেই পরম সুখকর হইল। জগন্মাতার জন্মগ্রহণে ত্রিজগৎ যেন জাগিয়া উঠিল, দশদিক আনন্দে প্রসন্নতা লাভ করিল। সুখস্পর্শ সমীরণে পৃথিবী ভরিয়া গেল—সেই সমীরে ধূলির কণামাত্রও রহিলনা।

আকাশমণ্ডল দেবগণের শঙ্খধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল এবং নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

জ্যোৎস্নাপূর্ণ নব নব কলাসংযোগে শশীলেখা যেরূপ সমধিক সৌন্দর্যসম্পন্না হয়, তদ্রূপ সেই নবকুমারী লাবণ্যবিকশিতা হইতে লাগিলেন।

পরম আদরণীয়া কন্যার নামকরণ উৎসবে নগাধিরাজ হিমালয় সমগ্র দেব ঋষিগণকে আমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহাদের সকলের ইচ্ছায় হিমবানকন্যার নাম হইল হৈমবতী।

পর্বতকন্যা হৈমবতী আজিও প্রতি আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষে বঙ্গভূমিতে দুর্গারূপে আগমন করেন। ভক্তিবিনম্র চিত্তে দেবীকে সপরিবারে আবাহন জানায় বঙ্গবাসী—অর্ঘে, আরাধনায়, অঞ্জলিমন্ত্রে এবং আরতির উজ্জ্বল প্রভায় পরিপূর্ণ হয় বঙ্গভূমির দুর্গোৎসব।

শারদশুভেচ্ছা সহ
বোরোলীন

sponse 1045

শোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত
ীনবন্ধু লেন কলিকাতা ৬ নিউ জয়কালী প্রেস থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ ও রঙিন পাতা মুদ্রণে
র্ন স্টুডিও প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা ১২